মুখ চাই মুখ

মিলন মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া, ১৩৭১

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৯

মুদ্রক :
নিউ শশী প্রেস
শ্রীঅশোককুমার ঘোষ
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
মিলন মুখোপাধ্যায়
গৌতম রায়

নিতান্তই রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ-মানুষী, যাঁরা, রূঢ় মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে শুধু কিছু স্বপ্ন দেখবার সুখের জন্যে লড়াই করেছেন, করছেন নিরন্তর, সেইসব শিল্পী-কবিদের নামবিহীন রক্তাক্ত হাতে, লেখকের সশ্রদ্ধ নিবেদন—

অঙ্গারের মত তেজ কাজ করে অন্তরের তলে,—
যখন আকাঙ্ক্ষা এক বাতাসের মত বয়ে আসে,
এই শক্তি আগুনের মত তার জিভ তুলে জ্বলে।
ভস্মের মতন তাই হয়ে যায় হৃদয় ফ্যাকাশে!
জীবন ধোঁয়ার মত,—জীবন ছায়ার মত ভাসে;
যে-অঙ্গার জ্ব'লে জ্ব'লে নিভে যাবে,—হয়ে যাবে ছাই,—
সাপের মতন বিষ লয়ে সেই আগুনের ফাঁসে
জীবন পুড়িয়া যায়;—আমরাও ঝ'রে পুড়ে যাই।
আকাশে নক্ষত্র হয়ে জ্বলিবার মত শক্তি—তবু শক্তি চাই!

—জীবনানন্দ দাশ
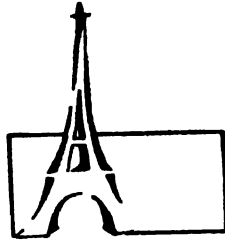
[illegible] অথবা বোম্বাইয়ের খার বাজার কল্পনা করো। কেউ [illegible] ভাগা কাটছে, রূপোলী ইলিশ মাছ হাতে করে চিৎকার [illegible] ধীর পায়ে, থলে হাতে সন্ধানী চোখ তাজা মাছ খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটি ছোট্ট সংসারের পেছন-পেছন হাঁটছিলুম। সাহেব, মেমসাহেব, ছোট্ট মেয়েটি।

—"মুখ চাই, মুখ? আপনার পোত্রেত্‌, মাদাম মঁসিয়? আপনার ফুটফুটে খুকুর মিষ্টি পোত্রেত্‌ করে দেব! সাদা-কালোয় কিংবা রঙীন! রঙীন ছবিতে ওকে দারুণ মানাবে! না-না, পছন্দ না হলে নেবেন না!"

ছোট্ট সংসারটি ওকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। সাহেব-মেমসাহেব-খুকু। ওদের পেছন-পেছন হাঁটছিলুম। শিল্পী এবার আমায় ধরল,

—"মুখ চাই, মুখ? আপনার পোত্রেত্‌?"

ছিপছিপে চেহারার মানুষটি। অবিন্যস্ত চুল, দাড়ি, গোঁফ নিয়ে লম্বাটে ধরনের মুখ। লাল রংয়ের গলাবন্ধ সোয়েটার পরে যেন যিশুখৃষ্ট। বাঁ হাতের ড্র[illegible] বোর্ডে পিন দিয়ে আঁটা সাদা কাগজ। ডান হাতে ছোট্ট বাক্স। ওতে নিশ্চয়ই পেন্সিল, ক্রেয়ন অথবা রঙীন প্যাস্টেল রাখা আছে। সাদা-কালো পোর্ট্রেটের কত দাম পড়বে জানতে চাইলুম যিশুখৃষ্টের কাছে। ব্যস? সঙ্গে সঙ্গে এক কোণে রাখা ভাঁজ-করা চেয়ারটা ফট করে খুলে ফেলল। বলল,

—"বসুন, বসুন।"

হাসি হাসি মুখে বললুম,

—"না ভাই। কত দাম পড়বে আগে বলুন?"

—"হুট করে কি দাম বলা যায়? পঞ্চাশ থেকে একশো ফ্রাঁর মধ্যেই করে দেব। বসুন তো মশায়!"

চোখ কপালে তুলে বললুম,

—"পঞ্চাশ থেকে এ-ক-শো ফ্রাঁ !!"

নিজে ছোট্ট টুলটির ওপরে বসে ড্রয়িং বোর্ড বাগিয়ে ধরল যিশুখৃষ্ট। বলল "আগে ছবিটা তো হোক, তারপর আপনার পছন্দ মতন একটা রফা করা যাবে।"

চারপাশে যদুবাবুর বাজারের মতো গোলমাল। হয়তো তার চেয়ে একটু কম। 'গুঞ্জন' বলা যেতে পারে। বোর্ড বাগিয়ে বসে খদ্দরদের ছবি আঁকছে শিল্পীরা। যাদের হাতে এখন খদ্দের নেই, তারা সন্ধানী চোখ আর হাতে বোর্ড নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাজারের মধ্যে। বউ, জানো তো, প্যারিসের এমন বাজার আর সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই। এক নজরে মনে হয় শ' তিনেক শিল্পীর ভিড় এখানে। পিগাল ছাড়িয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে এসেছি। বিশাল গীর্জাটিকে ডানদিকে রেখে। পাথর বাঁধানো ছোট্ট গলি ঘুরে ঘুরে গীর্জার পেছনে এই মোঁমাত্র্‌। বহু যুগ আগে ছিল শিল্পীদের পীঠস্থান। আধপেটা খেয়ে-না-খেয়ে, উপোস দিয়ে দিয়ে যে সব শিল্পীদের পেটে কড়া পড়ে যেতো, অথচ ছবি ছাড়া কিছু মাথায় আসতো না, সেই সব শিল্পীদের আখড়া। সুস্থ শহরবাসীরা পাগলদের কাণ্ড দেখতে আসতো। কলকাতার ফুটপাথে কোনো খুদে শিল্পীকে কল্পনা কর, যার ডান হাতটা নেই। বাঁ হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রঙীন খড়ি ঘসে ঘষে ফুটপাথ অথবা কালো পিচের রাস্তায় ঠাকুর-দেবতার ছবি আঁকতো—দাঁড়িয়ে দেখতুম আমরা। পথ চলতি মানুষজন দুদণ্ড থেমে মজা দেখে যেতো। আমরা ছোটরা ও আলুকাবলী খেতে খেতে গিয়ে দাঁড়াতুম ইস্কুলের টিফিনের সময়। কি দারুণ গণেশের মুখটা বানিয়েছে। লক্ষ্মীর প্যাঁচার চোখ দুটো ছ্যাখ, ঠিক একেবারে প্যাঁচার মতোন! ভিড়ের মধ্যে উদার কেউ হয়তো আনা-দুআনা ছুঁড়ে দিতেন গণেশ বা লক্ষ্মীর গায়ে। পয়সা পড়ার শব্দে আমরা ঘুরে দেখলে বলতেন,

—"নুলো-কানা সেজে ভিক্ষে করার থেকে এ অনেক ভালো, না কি বল?"

যিশুখৃষ্টের কটা চোখের দিকে তাকিয়ে চেয়ারটি ভাঁজ করে পাশে রাখলুম। অল্প হেসে বললুম,

—"আপনাদের বাজারটা একটু ঘুরে দেখে নিই, তারপরে আসবো'খন—"

হঠাৎ বোধ হয় অভিমান বা শিল্পীর দম্ভে ঘা লাগল। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে বেশ রুক্ষ গলায় বলল যিশু,

—"আচ্ছা, আচ্ছা! ঠিক আছে!" বলেই উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে নতুন

দের খুঁজতে লাগল যেন। আমি জানি, ও রাগ করেছে? আর কথা না দাঁড়িয়ে ওকে পেছনে রেখে দু' পা হাঁটতেই শুনলুম,

—"ইণ্ডিয়ান।"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি 'হের হিটলার'-এর ভঙ্গিতে ডান হাত তুলেছে যিশুখৃষ্ট। বেশ উঁচু গলায় বলছে,

—"অন্য কোথাও বসে পড়লে কিন্তু রাগ করবো"

হেসে আমিও হাত তুললুম,

—"কথা দিচ্ছি, পোর্ট্রেট করাতে কোথাও বসব না।"

শীত যাব-যাব। বসন্ত আসে নি এখনো। গত তিনদিন বৃষ্টি হয় নি। আকাশ থমথমে! বর্ষা ফুরোলেই মোঁমাত্র্-এর মেলা শুরু হয়। রোজগেরে শিল্পীদের মরশুম। পাহাড় বা এই বিশাল টিলার ওপরে এতখানি সমতল চত্বরের প্রায় সবটাই শিল্পীদের দখলে। চারপাশ ঘিরে নানান আকারের বাড়ি। সব বাড়ির একতলাতেই দোকান-পাট, রেস্তোরাঁ, আলুভাজা বা মদের দোকান। রেস্তোরাঁ থেকে কয়েক জোড়া টেবিল-চেয়ার যেন ছিটকে এসে খোলা চত্বরে বসে পড়েছে। বিয়ার বা ওয়াইনের বোতল ঘিরে বিদেশীরা বুঁদ। ওপরে সোজা আকাশ। গোটা চত্বরটি কলকাতার ছোটখাটো ঘাস-বিহীন পার্কের মতো।

খড়্গনাসা ফরাসী শিল্পীদের ভাঁড়ের মধ্যে হঠাৎ দেখি এক থ্যাবড়া নাক। কোনো সেলুনের নরসুন্দরের মতো হাতে-ধরা কাঁচি কচ-কচ করছে। জাপানী শিল্পীটির বগলে শুধু একটি থলে ঝুলছে। তার গায়ে ফরাসী এবং ইংরেজীতে লেখা—"দু' মিনিটে মুখ, শুধু পাঁচ ফ্রাঁ।"

এমনি কাঁচি হাতে আরো জনা চার-পাঁচেককে ঘুরতে দেখলুম।

শুধু এক জোড়া কাঁচি হাতে শিল্পী ভাবতে পারো, বউ? কলম, পেন্সিল ক্রেয়ন, রং, তুলি, বোর্ড—কিচ্ছু নেই—শুধু কাঁচি। দর্জি বা নরসুন্দর এঁরাও অবশ্যই এক জাতের শিল্পী। চুল-দাড়ি-গোঁফ কেটে ছেঁটে, আমার জামা বা তোমার ব্লাউজের নকশা কত সুন্দর, কত মাপসই হতে পারে—তার অনেকখানিই এঁদের হাতে। কিন্তু দু' মিনিটে তোমার মুখের নকশা বানিয়ে দিচ্ছে, শুধু একটি কাঁচি সম্বল, এমন শিল্পী আমি অন্তত দেখি নি কোথাও।

আসলে ব্যাপারটা তখনো পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারছি না। ওদের পিছে-পিঠে ঘোরাঘুরি করতে লাগলুম। একটু বাদেই দেখি চারজন মধ্যবয়সী সাহেব বেশ মৌজে হেঁটে আসছেন এদিকে। লম্বা-চওড়া লোকটির মৌতাত

একটু বেশীই হয়েছে মনে হল। অসামাল পা ফেলে ফেলে হাঁটা। জাপানী শিল্পী অল্প এগিয়ে গেল কাঁচি কচকচ করতে করতে। ভাঙা ফরাসীতে বললে—"দু' মিনিট দিন আমাকে, মুখ করে দিই।"

চারজনের কেউই দাঁড়িয়ে পড়ল না। চোখের কোলে শিল্পীকে দেখে নিল। হাঁটতে হাঁটতে সেয়ানা গোছের সঙ্গীটি মুখ খুলল। মাথা দুলিয়ে বলল,—"আমাদের মহা-মূল্যবান জীবনের দু'টো মিনিট, ইজ ইকোয়াল টু একটি মুখের নকশা—অ্যাঁ?"

জড়ানো গলায় থেমে থেমে কথাগুলি বলেই দাঁড়িয়ে পড়ল। বাকি তিনজনও পাশাপাশি দাঁড়াল। গায়ে গা লাগিয়ে। আগের লোকটি তাঁর কথা শেষ করল,

—"কিন্তু, বলি কার মুখ আমায় দেবে বাছা?"

শিল্পী খদ্দেরের 'মুড' বুঝে ফেলেছে। এক গাল হেসে ফেলল। থলে থেকে এক খণ্ড চৌকো মতোন কাগজ বের করতে করতে কথা বলতে লাগল। কলকাতার ছোটখাটো হিন্দু হোটেলগুলো থেকে খেয়ে-দেয়ে কাউণ্টারের সামনে এসে দাঁড়ালে পেছন থেকে দ্রুত গলায় যেমন শোনা যায়—'মাছে ডালভাত-বেগুনভাজা ডালএকআনা লেবুকলাপাতা অছি!' ঠিক সেই রকম গড়গড় করে বলে গেল,

—"যার মুখ বলবেন! আপনার বা আপনার বন্ধুদের, দ্য গল, নিক্সন, চার্চিল, বব হোপ বা যে কোনো বিখ্যাত লোকের—"

না, একখণ্ড নয়, পকেট ডায়েরী সাইজের দু'খণ্ড সাদা কাগজ গায়ে গায়ে লেপ্টে লাগানো। বাঁ হাতে সেই কাগজটি নিজের চোখের সামনে উঁচু করে ধরল শিল্পী। ডান হাতে কাঁচি তো আছেই। তৃতীয় সঙ্গীটি বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে টাল সামলে বললে,

—"ঠিক আছে ভায়া! আমার আগামী সুদীর্ঘ জীবন থেকে শুধু দু'টো মিনিট তোমার নামে উৎসর্গ করলেই যদি একটি মুখ আমাকে দাও, তবে নাও—" বলে ডান হাতের কব্জি উলটে ঘড়িতে চোখ রাখল, "এই মুহূর্ত থেকে আমার দু'টো মিনিট—তোমার। টিক-টিক-টিক-টিক—"

শিল্পীর দাঁত তখনো হাসির ভঙ্গিতে চকচক করছে। আরো একটু মুখব্যাদান করে বললে,

—"শুধু দু'মিনিট আর আমার পারিশ্রমিক পাঁচ ফ্রাঁ।" থলের লেখাটি তুলে দেখাল ওদের, "কার মুখ চাই বলুন?"

এতক্ষণে লম্বা চওড়া লোকটি জড়ানো গলায় বললে,

—"তুমি তো জাপানী শিল্পী ?"

—"হ্যাঁ, মঁসিয় !"

—"তবে আঁকো ! হিরোশিমার মুখ আঁকো,"—বলেই ভদ্রলোক খ্যালখ্যাল করে হাসতে লাগলেন আর মুখ দিয়ে দু'বার শব্দ করলেন—"বুম্-বুম্" !

শিল্পীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার হাসি পেল। ওর মুখের হাসিটি মিলিয়ে যাব-যাব করছে। চোখ সামান্য গোল হয়েছে। ঠোঁট দুটিও একত্রে একটি বৃত্তের মতো প্রায়। অর্থাৎ এতক্ষণে উনি ঠাওর করেছেন যে এঁরা মোটামুটি কঠিন খদ্দের।

চতুর্থ ভদ্রলোক একটু তফাতে একলা দাঁড়িয়ে বোধহয় ঝিমোচ্ছিলেন। হঠাৎ গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বের করে বললেন,

—"বেড়ে বলেছিস, হিরোশিমার মুখ ! জমপেশ কবিতার বিষয় ! আহা—হিরোশিমার মুখ—" বলেই আবার বুকের ওপর থুতনি ফেলে ঢুলতে লাগলেন।

চারজন ফরাসী ভদ্রলোক এবং এক জাপানী শিল্পীর মধ্যে যে এইসব কথাবার্তা চলছে, সোদিকে মোঁমাত্র্-এর আর কারো বিশেষ খেয়াল নেই, একমাত্র আমি ছাড়া। কারণ একটানা গুঞ্জন গোটা চত্বরের পৌ ধরে রেখেছে ;

শিল্পী একটু সামলে নিয়ে বলল,

—"দেখুন মশায়, হিরোশিমা তো ঠিক কোনো মানুষ নয় ! মানে, তার মুখ আঁকতে পারা যায় বলে তো—"

তৃতীয় জন যেন শিল্পীর প্রতি যথেষ্ট করুণা দেখিয়ে বললে,

—"আচ্ছা বাছা, থাক ! হিরোশিমায় যদি তোমার খুব অসুবিধে হয় তো যেতে দাও ! কোনো বিখ্যাত লোকের মুখ আঁকতে পারবে তো ?"

খানিকটা থই পেয়ে তুবড়ির মতো বলে উঠল শিল্পী,

—"দ্যগলনিক্সনমাওনাসেরবব্হাপহিচ্কক্—কার মুখ চাই শুধু একবার মুখ ফুটে বলুন ?"

—"দক্ষিণ ফ্রান্সের বিখ্যাত উকিল মঁসিয় ভিৎসের মুখ আঁকো !"

লম্বা-চওড়া ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললেন,

—"না-না ! আমার চাই না—"

বাকি তিনজন একসঙ্গে থামিয়ে দিলেন ওঁকে,

—"চো-ও-ও-প !" তারপর শিল্পীকে আবার,

"কই, বিখ্যাত উকিলের মুখ কই ?"

আমি আর থাকতে পারলুম না, হাসির শব্দকে খানিকটা কাশির মতো ক বের করে দিলুম। শিল্পীর মুখের চেহারা তুমি কল্পনা করতে পারবে না ব কতিপয় সুন্দরীদের সঙ্গে গদ্‌গদভাবে কথা বলতে বলতে কোনো ফিটফাট যুবক.ক যদি থামিয়ে দাও এবং কানে কানে বলো যে, 'মশাই আপনার প্যান্টের বোতা সব খোলা' তাহলে তার মুখের চেহারা বোধহয় অনেকটা এইরকম হবে। খানিকটা সেই "ছেড়ে দে মা" গোছের বিভ্রান্ত ভাব। যার নাম কখনো শোনে নি, জীবনে যাকে কোনো অবস্থাতেই সে দেখে নি কোথাও তার মুখ কি করে আঁকবে ?

—"মাফ করুন, ওঁকে আমি চিনি না—ওঁর মুখ আঁকা আমার পক্ষে সম্ভব ন অন্য কাউকে বলুন—"

বলে শিল্পী ঘুরতে যাবে, মোটা মতোন ভদ্রলোক ঝপ করে তার হাত ধরলে। বললে,

—"তা তো চলবে না ভাই! যে কোনো বিখ্যাত লোকের মুখ তুমি আমাদের দেবে বলেছো—"

সামান্য রাগ-রাগ গলায় শিল্পী বললে,

—"কি মুশকিল। বলি, তাঁকে না দেখে তাঁর মুখ আমি বানাব কি করে ?"

—"না দেখে মানে!" মোটা ভদ্রলোকের চোখ ডিমের মতো গোল।

অন্যজন বললে,

—"তুমি তো অন্ধ শিল্পী নও ভাই! জলজ্যান্তো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আর তাঁকে কিনা তুমি দেখতে পাচ্ছো না! অ্যাঁ !!"

বলে লম্বা লোকটির কাঁধে হাত রাখলে। উনি তখন বিখ্যাত লজ্জায় মৃদুমন্দ হাসছেন।

শুরু হয়ে গেল 'ম্যাজিক'! এ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ মাথায় আসছে বউ। বাঁহাতে সেই কাগজের স্যাণ্ডউইচ সামান্য উঁচু করে ধরা, ডান হাতে কাঁচি কাজ শুরু করল কুচ-কুচ-কুচ। দক্ষিণ ফ্রান্সের বিখ্যাত উকিল মঁসিয় ভি চোখ পিট্-পিট্ করে তাকাচ্ছেন শিল্পীর দিকে। বিশাল শরীর অল্প-অল্প দুলছে শিল্পীর চোখ শুধু দুটি জায়গার মধ্যে নড়া-চড়া করছে। ভিৎসের মুণ্ডু আর কাগজে স্যাণ্ডউইচ। কাগজের স্যাণ্ডউইচ, উকিলের মুণ্ডু। এতক্ষণে চারপাশে গো মতোন ছোটখাট ভিড় জমেছে। প্রায় সকলেরই চোখ ওই দুটি বস্তুর ওপ

ঘোরাফেরা করছে। মাঝে মধ্যে শিল্পীকেও দেখে নিচ্ছি আমরা। ওর মুখে খই ফুটছে এখন। রোদ্দুরের কথা, বৃষ্টির কথা। শীত এবং বসন্তের কথা। এবার মরশুমে ভিড় কেমন হবে, তাই নিয়েও কথা চলছে। উকিল সাহেবের বাকি তিন বন্ধুও কথা বলছে। এখন ওদের ভিৎসের মক্কেল বলে মনে হচ্ছে আমার। দক্ষিণ ফ্রান্সের কোনো মোকদ্দমায় জিতে-টিতে হয়তো ফুর্তি করতে এসেছে প্যারিসে। মোঁমাত্র্-এ। ভিড়ের মধ্যে থেকে ফোড়ন কাটছে দু'একজন। মুখের ওপর দিক অর্থাৎ চুলের এবং টাকের দিক থেকে আরম্ভ করে কপাল, উন্নত নাক বেয়ে তর তর করে নেমে আসছে কাঁচি। কথার ফাঁকে হঠাৎ হয়তো শিল্পী বলে উঠছে, —"মঁসিয় ভিৎস, একটু বাঁদিকে ঘুরুন—আর একটু, ঠিক আছে!" অথবা "আপনি যদি বারান্দার ওই সুন্দরীর দিকে অতখানি মুখ ঘুরিয়ে ফেলেন তাহলে তো মুশকিল—" আমরা সবাই হেসে সুন্দরীকে দেখে নিলুম। মোটা-সোটা অন্তত ষাট বছর বয়সের এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে বারান্দায়। হাসির হররা উঠল। উকিলবাবুও খ্যালখ্যাল করে হেসে নিলেন খানিক। শিল্পী বললে —"হাসির সেকেণ্ডগুলো কিন্তু দু'মিনিট থেকে বাদ যাবে!"

ঠোঁট থুতনি ছাড়িয়ে গলা বেয়ে নেমে এল কাঁচি। কাগজ শেষ। 'প্রোফাইল' ছবি কাটা হয়ে গেল। ঠিক দু'মিনিট না হলেও বড়জোর চার। কাঁচিটি পকেটে রেখে ম্যাজিক দেখানোর ধরনে দু'বার কাগজটিতে ফুঁ দিল শিল্পী। দিয়ে আলতো হাতে কলার খোসা ছাড়ানোর মত দু'দিক থেকে সাদা কাগজ দুটি তুলে ফেলে দিল। ভেতরকার তৃতীয় কাগজটির রং কালো। কালো কাগজের ওপরে মুখের নকশা। একটু উঁচুতে তুলে চার বন্ধুকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল শিল্পী। 'কাট-আউট প্রোফাইলে' উকিলের কপাল, নাক, ঠোঁট অথবা থুতনি স্পষ্ট চেনা যায়। 'সিল্যুয়েটে' মঁসিয় ভিৎসের মুখ।

—"হয়ে গেল?"

হাত বাড়িয়ে ছবিটি নিলেন উকিলবাবু।

চাপা গলায় দু'একটি ভালোমন্দ মতামত শোনা গেল। মঁসিয় ভিৎস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর বেশ উঁচু গলায় বিশুদ্ধ ফরাসীতে যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করলেন,

—"আমাকে, কি বলে গিয়ে, এই রকম দেখতে?"

দু'দণ্ড সব চুপ।

বিদেশী সুন্দরীদের ছোট একটি দল পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে

পড়ল। গলা বাড়িয়ে উৎসুক চোখে মঁসিয় ভিৎসের মুখ এবং কালো প্রোফাইল লক্ষ্য করল। ওদেরই একজন তেমনি বিশুদ্ধ ফরাসীতে জবাব ছুঁড়ে দিল,—"হ্যাঁ মঁসিয়! ঘোর অমাবস্যার রাত্তিরে!"

চারিদিকের গুঞ্জন ছাপিয়ে হেসে উঠলুম সবাই।

'দু' মিনিটে মুখ, শুধু পাঁচ ফ্রাঁ' বলতে বলতে ওরই মধ্যে আর একটি খদ্দের ধরে ফেলেছেন জাপানী শিল্পী। দক্ষিণ ফ্রান্সের উকিলবাবু তাঁর অন্ধকার মুখ হাতে করে তুলছেন তখনো। সুন্দরীদের পেছন পেছন হাঁটতে লাগলুম আলু-ভাজার দোকানের দিকে। খিদে খিদে পাচ্ছে। পেতি-কাফে-নোয়া বা কালো ছোট্ট কফি আর একটি বিয়ার ছাড়া সারাদিনে পেটে পড়ে নি কিছুই।
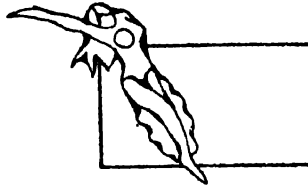
রোজমারীর বয়েস এখন কত জানো, বউ? রোজমারী মুলিনো-এর? একচল্লিশ। আর নোয়েল, আমাদের নোয়েলের চৌতিরিশ। রোজমারীরও অমত ছিল না। নোয়েলেরও নয়। তবু ওরা একসঙ্গে থাকতে পারে নি আমাদের দেশে। বোম্বাই শহরে কয়েকটি মাস কাটিয়েছিল শুধু।

বউ, তুমি তো জানোই, ভালোবাসাবাসি-টাসি আমি আবার ভালো বুঝতে পারি না। কেমন যেন তালশাঁস মনে হয়। কিংবা প্যাচ্‌প্যাচে কাদার ওপর দিয়ে কাপড় সামলে হাঁটার কথা মাথায় আসে। তোমার সঙ্গে আলাপের দিনই সন্ধ্যেবেলা তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম মনে নেই? সেই যে,

—"প্রেম-ট্রেম করেছেন?"

তুমি অবাক হয়ে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিলে,

—"কেন বলুন তো?"

—"এমনিই জিজ্ঞেস করছি। কিন্তু, আপনি হাসছেন কেন? কথাটা কি হাসির?"

—"না, তা নয়। তবে প্রথম আলাপেই কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে এই ধরনের প্রশ্ন করতে পারে, ভাবা যায় না।"

চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে আবার একটু হেসেছিলে তুমি। তোমার চোখ দেখেই বুঝতে পারছিলুম, ভেতরে ভেতরে খানিকটা অবাক এবং মুগ্ধ-মুগ্ধ ভাব। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষম প্রস্তাবটি টেবিলে ফেলে দিয়েছিলুম চিত করে।

—"কোনো মহিলার পক্ষে কি আমার মতো চরিত্রকে সারাজীবন সহ্য করা সম্ভব ?"

—"আপনার সঙ্গে তো তেমন ঘনিষ্ঠতা হয় নি, যাতে এ ধরনের প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারি !"

আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার ইচ্ছেটিকে আড়াল করে করে শব্দ ছুঁড়ছিলে তুমি। আমি বলেছিলুম,

—"না, তবু—ধরুন,—আন্দাজ ?"

ভেতরে ভেতরে ততক্ষণে অনেকখানি প্রশংসা আমার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে তোমার। আর, আমিও তখন বুঝে ফেলেছি, পদবী পালটে তুমি একটি আপন সংসার গড়ার জন্যে যথেষ্ট উদগ্রীব—ঠিক আমার মতোই। কারণ, দিকবিদিক দেখে আমার বয়েস তখন বত্রিশ, তোমার তিরিশ। তাই, তুমি বলেছিলে,

—"কেন নয় !"

এই কথাগুলিকে প্রেমের সংলাপ বলা যায় কিনা জানি না। তবে, এর আগে বা পরে আমি তোমাকে কখনো সেই বিখ্যাত চাঁদ, ফুল অথবা পাখি দেখাই নি। "তোমাকে কি দারুণ পরীর মতো দেখাচ্ছে"—আপাত চেহারা তোমার এমন প্রলাপ বকবার সুযোগও আমাকে দেয় নি কখনো। তোমাকে যদি সাংঘাতিক সুন্দরীর মতো দেখতে হত তাহলে ওসব কথা হয়তো বলতুম এবং খেটে যেত। কিন্তু, ওগুলো কি প্রেমের কথা ? প্রেমের কথা, প্রেম ভালোবাসার মধ্যে কী কথা, কিসের কথা—এ সব আমার জানা নেই।

যা বলছিলুম, রোজমারী এককালে হয়তো যথেষ্ট সুন্দরী ছিল। এখন একচল্লিশ। শরীরে অস্পষ্ট ভাঙনের শব্দ চাপিয়ে থাস ব্রুটেনের গন্ধ রঙে, কথায়-বার্তায় বা ব্যবহারে। নোয়েল ম্যাঙ্গালোরের ছেলে। শান্ত স্বভাব। খুব ভাবুক-ভাবুক চোখ দুটি। সাংবাদিকতা করত। হঠাৎ 'হিচ্-হাইক করতে বেরিয়ে পড়ল। এখানে এই প্যারিসে এসে ছিল প্রায় বছরখানেক। তখন চেনাজানা হল রোজমারীর সঙ্গে।

বউ, এ রাজ্যে বাদামী বা কালো রঙের প্রতি কিছু মানুষ-মানুষীর প্রচণ্ড

আকর্ষণ। টম্ এম্‌বা কালো মানুষ। বিশাল চেহারা। রোজমারীর বাড়িতে অনেক পরে টম্ এম্‌বার ছবি দেখেছিলুম। মাথায় গুঁড়ো গুঁড়ো চুল। এক কথায় দশাসই একটি কালাপাহাড়। বাঁ হাতে তেল রঙের প্যালেট, ডান হাতে বুরুশ নিয়ে তাকিয়ে আছে। রোজমারী বলেছিল, গান বাজনাতেও নাকি চৌকস ছিল। এক যুগ এই কালাপাহাড়টির সঙ্গে বসবাস করেছে রোজমারী। ওর কথায় মনে হল, খুব বিশ্বাস এবং ভালোবাসা-বাসি-টাসি ছিল দু'জনের মধ্যে। আমাদের দেশে যেমন প্রেম ইত্যাদিতে ফেঁসে গেলে বিয়ে-টিয়েটাই স্বাভাবিক— না হলে অকথা-কু কথার ঝামেলা। ইউরোপ, বিশেষ করে প্যারিসে তেমন কোনো প্রশ্নই নেই। তাই, টম্ এবং রোজমারীর শুভ-বিবাহ হয়েছিল কিনা সে কথা অবান্তর। তবে, ওদের দু'জনের কোনো সন্তান নেই। বারো বছর ওরা ঘরে-বাইরে বন্ধুর মতো, বিছানায় স্বামী-স্ত্রীর মতো কাটিয়ে দিয়েছে। তারপর, টম্ এম্‌বা রোজমারীকে সাইতিরিশে তুলে দিয়ে কি কারণে যে ইউরোপ ছেড়ে স্বদেশে চলে গেল তা রোজমারীও জানে না। জানলেও আমাকে বলে নি। ও দারুণ নম্র, নরম স্বভাবের মেয়ে। গভীর হৃদয়ে আত্মসচেতন। টমের চলে যাওয়ার জন্যে ওর অভিমান, ক্ষোভ যা যা হওয়া উচিত,—নিশ্চয়ই হয়েছিল। কিন্তু, তা ও প্রকাশ করতে পারে নি—এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, আপন সম্মানবোধের দেওয়াল ভেঙে করুণা ভিক্ষা কিংবা তার প্রকাশ ওর মতো বৃটিশ মহিলার পক্ষে অসম্ভব।

তারপর, ওর জীবনে আমাদের নোয়েল। নোয়েল রড্রিগ্‌স। ওদের পরিচয়, ঘনিষ্ঠতার ইতিবৃত্ত আমি জানি না। বোম্বাই ফিরে আসার পর নোয়েল হন্যে হয়ে বাড়ি খুঁজতে লেগে গেল। কি ব্যাপার? না, ওর এক বান্ধবী প্যারিসের চাকরি ছেড়ে এখানে চলে আসছে।

বোম্বাইয়ের এক বিলিতি কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে এল রোজমারী। নোয়েল ওকে নিয়ে গিয়ে উঠল একটা মাঝারি হোটেলে। আর, আমরা সকলে মিলে ওদের জন্যে বাড়ি খুঁজতে লেগে গেলুম। কলকাতার ভবানীপুর বা কালীঘাটের মতো বোম্বাইয়ের দাদার এলাকা। শিবাজী মহারাজের মাওয়ালী সৈন্যের বংশধররা নাকি এই এলাকায় বর্তমান। ওখানে অনেক খুঁজেপেতে একটি দুই ঘরের বাসা পাওয়া গেল, প্রায় মাস তিনেক বাদে। বাসা, ভালোবাসা পাওয়া গেলেও ওরা দু'জনে এক সঙ্গে এগারো মাসের বেশী থাকতে পারল না। মেমসাহেব প্যারিসে এসে পালিয়ে বাঁচল। মন পড়ে রইল ভারতবর্ষে।

নোয়েলের দেওয়া টেলিফোন নম্বরে রোজমারীকে পেলুম। সন্ধ্যেবেলা আপিস ফেরত ও আমার সঙ্গে দেখা করবে।

দুপুর থেকে প্রচুর বীয়ারের পর এখন বিকেল। বিকেল না বলে সন্ধ্যে বলাই ভালো। জানুয়ারী মাসে সূয্যিঠাকুর মেঘের আড়াল নিয়ে আলো দেন সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে অবধি। তার ওপরে বৃষ্টি, মাঝে মধ্যে তুষার আর জমপেশ শীত তো আছেই। মোঁপানাসের 'লা দোম' রেস্তোরাঁর কাচের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছি। সামনে ফুটপাথ, তারপর রাস্তা, আবার ফুটপাথ। ফুটের গর্ত বেয়ে মেট্রোর সিঁড়ি নেমে গেছে। বউ, মেট্রো মানে কিন্তু সিনেমা-টিনেমা নয়। প্যারিসে এই শব্দটির অর্থ হল মাটির নিচে রেললাইন। লণ্ডনে বলে 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড', স্টকহোমে 'টিউব' এবং প্যারিসে 'মেট্রো'। ওপরে শহরের বাড়ি-ঘর-দোর যেমন-কে তেমন রইল, মাটির নিচে অতিকায় পাইপের মধ্যে দিয়ে রেলগাড়ির চলা ফেরা। এখন, আমার চোখের সামনে মোঁপানাস্ রেল স্টেশনে নেমে যাবার বা প্ল্যাটফর্ম থেকে শহরে উঠে আসবার সিঁড়ি। জোড়ে-বেজোড়ে সাহেব-মেমরা ওঠা-নামা করছে সিঁড়ি বেয়ে। একভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, লম্বা লম্বা কোট, ধুমসো টুপি পরে ওরা সব ভিজতে ভিজতে কোনো কবরখানায় নেমে যাচ্ছে। শুকনো কবরখানা থেকে বৃষ্টির মধ্যে উঠে আসছে একের পর এক।

দুটি মেয়ে সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠে 'লা দোম'-এর সামনে এসে দাঁড়াল। প্রায় আমার মুখোমুখি। দু'জনের গায়েই গরম ওভারকোট ভিজে ভসভসে। বৃষ্টির কোট নেই। টুপিও নেই মাথায়। একজনের লালচে চুল, অন্যজনের সোনালী। সারা গায়ে কোট উপচে দারুণ যৌবন ওদের। সোনালী আরো এগিয়ে এল। একেবারে কাচের দেওয়ালের গায়ে। আমার দিকে দেখলই না। কাচে মুখ লাগিয়ে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেতরের মানুষজনকে দেখতে লাগল। কাউকে খুঁজছে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওকে। নাকটা গেছে চেপ্টে। চতুর দুটি সবুজ চোখের মণি ঘুরছে। কপাল, লাল টুকটুকে ঠোঁট কাঁচের সঙ্গে লেপটে আছে। মাথার সোনালী চুল বেয়ে বৃষ্টির জল লাগছে কাচে। সোজা লাইনে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। আমাদের দু'জনের মধ্যে ব্যবধান কয়েক ইঞ্চি। কাচের দেওয়ালটা না থাকলে ওর গলা জড়িয়ে ধরতে পারতুম। মনে হল, আমার মাথার মধ্যে গুবরে পোকাটার গায়ে মদের ফোঁটা পড়েছে। সারাদিন ঘুমিয়ে থাকে। পড়ে থাকে চিত হয়ে। সন্ধ্যের পর ফোঁটা ফোঁটা মদ মাথায়

গিয়ে ওকে ভিজিয়ে দেয়। তখন শুরু হয় ওর ছট্‌ফটানি। মুখ ঘুরিয়ে সোনালী সুন্দরীর ঠিক ঠোঁটের সামনে ঠোঁট চেপে ধরলুম আচম্‌কা। ও চট্‌ করে মাথাটা পিছিয়ে নিল। ভেতরের অনেকেই ওকে লক্ষ্য করছিল। কয়েকজন শব্দ করে হেসে উঠল। বাইরের মেয়েটিও হেসে পেছনে সঙ্গিনীকে দেখে নিল। নিয়ে, আবার কাচের দেওয়ালে ঠোঁট চেপে ধরল। ওর নাকে আমার নাক, ওর কপালে আমার কপাল, চোখে-চোখ, ঠোঁটে-ঠোঁট লাগিয়ে কয়েক সেকেণ্ড। দু'জনের মাঝখানে কাচ। আমার শুকনো দিক, ওর ভেজা। সরে গিয়ে হাসল মেয়েটি। হেসে হাত নাড়ল। তারপর সঙ্গিনীর হাত ধরে মেট্রোর সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। হঠাৎ আবিষ্কার করলুম আমিও হাসছি আর অল্প অল্প হাত নাড়ছি। গুবরে পোকাটা লাফাচ্ছে তখন। একবার ভাবলুম, ছুটে গিয়ে ভাব জমাই। ধরে এনে এখানে দুটো হুইস্কি খাওয়াই। তারপর দেখা যাক্‌!

ভেতরে চোখ ফিরিয়ে এনে দেখলুম, কয়েকটি টেবিল এখনো আমার দিকে মিটিমিটি হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। আর ওঠা হল না আমার। পাশের টেবিলের ভদ্রলোক অল্প হেসে আমায় বললেন, "প্রায় রোজই ওর ছেলেবন্ধু বা স্বামীর সঙ্গে এখানে আসে। আজ তাকে না দেখে ফিরে গেল।" তারপর একটু থেমে আবার বললেন, "বেশ মজা করলেন তো আপনি।"

জবাব দিতে ইচ্ছে করছিল না। গুবরে পোকা ভিজে গেলে, অপরিচিত পুরুষ অসহ্য মনে হয় কখনো কখনো। গায়ে-পড়া হলে তো কথাই নেই। মুণ্ডু নেড়ে মুচকি হাসলুম। গেলাস শেষ করে ফেললুম ঢক্‌ করে।

মোঁপানাস বিয়েঁভিনিউ-এর উল্টো ফুটে 'ল রোতোঁদ' রেস্তোরাঁ। সেখানেও ঝাপসা ভিড়। এই সব ভিড় আর গাড়ির চলন্ত স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সোনালী মেয়েটির মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। সরে গেল আবার। অন্য একটি মুখের নকশা এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। আয়ত চোখ, ফর্সা মুখ, সুন্দর মুখ বব্‌কাট চুল। নামটা এক্ষুনি মনে আসছে না, বউ। এলেই বলব। বোম্বাইয়ের সান্তাক্রুজ বিমান বন্দর। তোমরা সবাই কাচের ওপারে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছো। আমিও হাত নেড়ে নেড়ে বিমান বন্দরের বাসে গিয়ে উঠলুম। তোমাদের মুখগুলি চোখের সামনে থেকে সরে গেছে তখন। দু'-চারটে জায়গা খালি ছিল বাসে। আমি এই মেয়েটির পাশে বসলুম। এই আয়ত চোখ, ফর্সা মুখের পাশে। বেল-বটম্‌ প্যান্ট বা গেঞ্জী সত্ত্বেও চেহারায় বাঙালী ছাপ। মনে উল্লাস, মুখে সযত্ন সংযম রেখে আলাপ করলুম। প্রথমে ইংরিজিতে

পরে বাংলায়।—"সারারাত এক সঙ্গে যেতে হবে, নামটি জেনে রাখলে ক্ষতি নেই, কি বলেন?" আমার নাম বললুম। মনে পড়েছে বউ। ওর নাম বলেছিল অর্চনা বিশ্বাস। বোয়িং উড়োজাহাজের বাঁ-দিকের শেষ সারিতে আমার জায়গা জানলা ঘেঁষে। পুরো সারিটাই খালি। লক্ষ্য রাখলুম, অর্চনা বসল একেবারে সামনের দিকে, দ্বিতীয় সারিতে। জীবনে প্রথম উড়োজাহাজে বসেছি। ছোটবেলায় বড় সাধ ছিল বউ, একবার এরোপ্লেনে চড়ব। চড়ে নিদেন কলকাতা থেকে ঢাকা বা বাগডোগরা অর্থাৎ দার্জিলিং যাব। সাধ মিটল। কিংবা সাধের চেয়ে অনেক বেশী। কারণ, ঢাকা-টাকা নয়, দেশের মানচিত্রের বাইরে চলে যাব। বোম্বাই থেকে হাজার হাজার মাইল দূর উড়ে উড়ে চলে যাব সারারাত ধরে একেবারে ইটালী। রোমে। সামান্য ভয় ছাপিয়ে উত্তেজনা। 'টেক্-অফ'এর সময় আমার পাশে খালি তৃতীয় আসনে এসে বসল একজন 'ক্রু'। বেল্ট বাঁধল কোমরে।—"আমি বাঙালী। আপনার দেশ?"

দু' জনেরই দেশের নাম ভারতবর্ষ তা জানি। কিন্তু, আমরা দিশী লোককেও তার দেশের নাম জিজ্ঞেস করে বিব্রত করি না! কারণ, উত্তরে শুনতে পাই, আসাম, বিহার বা পাঞ্জাব! ওড়িশা বা মাদ্রাজ! প্লেন দৌড়তে শুরু করল। —"মহারাষ্ট্র!" 'ক্রু'র জবাব শুনলে তো বউ! এই রকমই হয়ে আসছে। চলে আসছে সেই কবে থেকে। এখনো চলছে. আরো চলবে বহু কাল। 'জনগণ-মন' গানের তলায় দাঁড়িয়ে আমরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাম বলে যাব।

একটু চুপ থেকে 'ক্রু' আবার কথা বলল, ভাঙা ভাঙা বাংলায়, "আমিও একটু একটু বাংলা ভাসা বোলতে জানি।"

—"বাহ্! সুন্দর বাংলা বলেন আপনি।"

মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে এলুম। আশেপাশে ঝোপ না পিটিয়ে সোজাসুজি বললাম ভদ্রলোককে, "রোম অবধি যাব। একা একা সারারাত যেতে হবে। একটু উপকার করবেন আমার?"

—"নিশ্চয়ই। কি বলুন?"

—"সামনের দিকে দ্বিতীয় সারিতে পরিচিতা এক বাঙালী মহিলা বসে আছেন। ওঁর পাশে তো জায়গা খালি নেই ওঁকে যদি একটু আসতে বলেন—"

বেল্ট খুলে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। বললেন, "ঠিক আছে, আমি বলে দেখছি।"

—"বলবেন, আমার পাশে জায়গা খালি আছে, আপত্তি না থাকলে যেন আসেন।"

'ক্রু' সামনের দিকে গিয়ে ঝুঁকে অর্চনার সঙ্গে কথা বললেন। ফিরে যেতে যেতে উনি জানিয়ে গেলেন, "উনি আসছেন।"

বাড়তি উত্তেজনায় সিগারেট ধরিয়ে ফেললুম।

হাতব্যাগ এবং কোট হাতে পিছিয়ে এল অর্চনা। আপ্যায়ন করলুম, "আসুন, আসুন। দু'জনেই একা-একা 'বোর' হয়ে যেতুম। সেই জন্যেই—"

বসতে বসতে বলল অর্চনাও,

—"যা বলেছেন, অনেকটা পথ তো!"

তিন-আসনের সারির দু' পাশে দু'জনে বসলুম। মধ্যিখানে ও ওর হাতব্যাগ কোট রাখল। বেশ লম্বা তন্বীর সিঁথিতে সিঁদুর লক্ষ্য করলুম এতক্ষণে। বললুম, "হুইস্কি খান তো?"

চোখ তুলে তাকিয়ে নরম গলায় বললে, "খাই। অল্প!"

খুশি মনে সিগারেট এগিয়ে দিলুম।

—"আমি একটু কড়া সিগারেট পছন্দ করি। ফিল্টার ঠিক চলে না।" বলে চারমিনার বের করলে ব্যাগ থেকে।

পৃথিবীর সেরা হুইস্কি আধ বোতল, বরফসমেত দুটি কাচের গেলাস চলে এলো হোস্টেসের হাতে হাতে। গেলাসে চুমক দিয়ে আরম্ভ করলুম, "কোথায় চললেন?"

—"লণ্ডন।"

—"বম্বে থেকেই উঠলেন?"

—"না। কলকাতা থেকে।"

—"বিলেত বেড়াতে চললেন বুঝি?"

—"আমার স্বামী আছেন ওখানে।"

বালীগঞ্জ এবং যাদবপুরের মেয়ে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক। বিয়ের পরই বরের সঙ্গে বিলেত চলে যায়। তারপর মাস ছয়েক কলকাতায় কাটাতে এসেছিল স্বামীর সঙ্গে। কর্তা আগেই চলে এসেছে। ও প্রায় দু'মাস বেশী থেকে ফিরছে। একে আমি চিনি। মানে, এদের আমি চিনি। এ রকম দু'একজনের সঙ্গে আমার চেনা জানা ছিল এককালে। 'টপ্ সিক্রেট' রাখার প্রতিশ্রুতি বা ইঙ্গিত পেলে এরা সুস্থ পুরুষমানুষ ভালোবাসে।

শুয়ে-বসে তৃপ্তি পায়, ভয় পায় না। বেশ ভারিক্কি, চিন্তাশীল এবং 'কনজারভেটিভ' একটি খোলস পরে ঘুরে বেড়ায়। লেখা-পড়ায় ভালো হয়, ভালো ঘরে বিয়ে হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত বা কবিতা পছন্দ করে। তবে খোলসটি কচ্ছপের পিঠের মত হয় না।

খাওয়া-দাওয়ার আগে এবং পরে অনেকখানি হুইস্কি চলে গেছে পেটে। দু'জনেরই। মাথায় চিত হয়ে পড়ে-থাকা গুবরে পোকাটার গায়ে মদের ফোঁটা। আস্তে আস্তে খেলা শুরু হল। নানান কথার ফাঁকে খেলা। শব্দের মারবেল গুলি একে অন্যের গায়ে গায়ে গড়াতে লাগল গর্তটিকে ঘিরে।

—"প্রেম করেছেন যাদবপুরে থাকতে?"

—"আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে!"

—"আমারও। বিয়ের আগের কথা জিজ্ঞেস করছি।"

—"ভাব-ভালোবাসা তো হতেই পারে। তবে, সব ছেলেমানুষি।"

—"নিশ্চয়ই!" ঘোর উৎসাহিত গলা আমার চাপাস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিল প্রায়।

ওর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা নেই। কব্জি থেকে অন্যান্য আঙুলগুলো পর্যন্ত পোড়া চামড়া।—"কি করে হল?" জানতে চাইলুম।

—"কলেজে। প্র্যাকটিকাল ক্লাসে অ্যাসিড পড়ে গিয়েছিল।"

—"আমার কিন্তু দারুণ 'অ্যাট্রাক্টিভ' লাগছে এই জায়গাটুকু।" হাত ধরা গেল। ক্রমশ পোড়া জায়গাটায় চুমু খেয়ে একটা মারবেল জিতে গেলুম। কথায় কথায় কখন যে আমার পাশে অর্থাৎ মাঝখানের খালি আসনটায় ওকে আসতে বলেছি এবং কখন যে ও উঠে এসে বসেছে খেয়াল নেই।

শীত শীত ভাব। ওপর থেকে উড়োজাহাজের সম্পত্তি একটি কম্বল নামিয়ে দু'জনের বুক অবধি ঢেকে নেওয়া গেল। মাটি থেকে হাজার হাজার ফুট ওপরে দুটি অপরিচিত মুখ সামান্য সময়ে পরিচিত ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল কেমন! যৎপরোনাস্তি আদরে আদরে মদ এবং রাত্রি ফুরিয়ে আসতে লাগল। অন্যান্য সব যাত্রীরা আলো নিবিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মৃদু আলোয় আমরা দু'টি গুবরে পোকা জেগে জেগে খেলা করছি, খেলা করছি, খেলা করছি···

চোখের সামনে, হাতের মধ্যে ক্যালিডোস্কোপের নল ঘুরে গেল। রোজমারীর মুখের নকশা। 'লা দোমে'র কাচের দরজা ঠেলে রোজমারী এসে ঢুকলো। গোলাপী টুপি পরে সশরীরে রোজমারী মুলিনো! কতকাল পরে দেখছি ওকে।
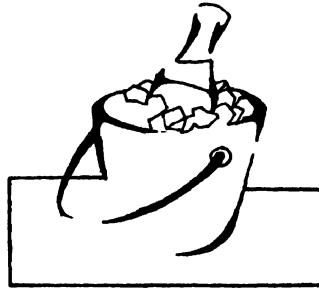
একেবারে এক কোণে বসে আছি। দরজা ঠেলে ঢুকে চট করে আমাকে দেখে ফেলা মুশকিল। প্রত্যেকটি টেবিলে চোখ বোলাতে লাগল রোজমারী। হাত তুললুম। আমায় দেখতে পেয়ে টুপিটি খুলে আস্তে আস্তে হেঁটে আসতে লাগল। দু'পাশে টেবিল চেয়ার খদ্দেরদের ভেতর দিয়ে এগিয়ে এল কাছে। উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালুম। ভারতবর্ষে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে দুদিন কি তিন দিন। সব মিলিয়ে একশো শব্দও আমরা বলি নি একে অন্যকে। উঠে দাঁড়াতেই বুঝলাম অনেক বীয়ার এবং তিনটি হুইস্কির ঝিম ধরেছে। দু'জনে হাত মেলালুম। কোট খুলতে সাহায্য করলুম ওকে। তারপর, মুখোমুখি বসে পড়লুম।

রুমাল দিয়ে সাবধানে মুখ মুছতে মুছতে ও বলল,

—"কতক্ষণ বসে আছো ?"

—"ঘণ্টাখানেক !"

—"কিন্তু, আমি তো দেরি করি নি আসতে।"

—"না না। আমিই আগে আগে এসে বসে আছি। এমনিই।"

ওর টকটকে মুখের দিকে দেখলুম। দু'বছর আগে যা দেখেছি তাই আছে। উনিশ-বিশও হয় নি মনে হল। উজ্জ্বল চোখ-দুটি তেমনি সরল, গম্ভীর। সোনালী চুলে বাইরের কোনো সবুজ আলো এসে পড়েছে। জিজ্ঞেস করলুম,

—"তোমার খবর কি ? শরীর-গতিক ভালো তো ?"

—"হ্যাঁ। তোমার ?"

—"ভালোই।"

—"শীত কেমন বুঝছো ? ঠাণ্ডা লাগে নি তো ?"

—"এখনো নয়।"

ওয়েটার এগিয়ে এল আমাদের টেবিলে। রোজমারীকে জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি খাবে—"

অল্প হেসে বলল,

—"সে আমি বুঝব। তুমি কি খাচ্ছো?"

ও চাকরি করে। বেশ ভালো চাকরি। বললুম,

—"হুইস্কি।"

ওয়েটারের দিকে ঘুরে ও বলল,

—"একটা বড় হুইস্কি আর একটা ব্র্যাণ্ডি।"

লোকটি চলে যেতেই বললুম,

—"তার মানে তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে।"

—"না। লাগতে পারে। দু'দিন ধরে বেশ বৃষ্টিতে ভিজছি। তাই আগে থেকে সাবধান হবার চেষ্টা।"

ও হাসলে গালের ভাঁজ দুটি স্পষ্ট হয়। তাছাড়া, বয়েস কোথাও তেমন করে লাফিয়ে ওঠে না। চোখদুটিতে হাসি আর ভয় ছড়িয়ে পড়ে। ওর ছবি আঁকতে হলে হাসি বাদ দিয়ে আঁকা উচিত। মোটামতোন সেই গুঁফো জার্মানটাকে হাসতে বলেছিল শিল্পী। মোঁমাত্র্-এর যিশুখৃষ্টের দলের শিল্পী। ঘুরতে ঘুরতে সেদিন ওর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। খুব রসিক ছেলেটি। রঙিন প্যাস্টেল দিয়ে গুঁফোর পোর্ট্রেট আঁকছে। গুঁফো কুতকুতে চোখ নিয়ে লালচে গম্ভীর মুখে বসে। আউট-লাইন কপাল ইত্যাদি হয়ে গেছে। গোঁফের কাছে সবুজ প্যাস্টেলসমেত ডান হাতের আঙুল নড়ছে শিল্পীর। হঠাৎ ইংরিজিতে বলে উঠল,

—"একটু হাসুন।"

নাক দিয়ে ঘোঁৎ মতোন একটা শব্দ করল গুঁফো। মুখের কোনো রেখা নড়ল না। শিল্পী আবার বললে,

—"আর একটু!"

আমি হাসি চেপে দাঁড়িয়ে আছি। গুঁফো তার বিশাল গোঁফের ফাঁক দিয়ে একদা 'হ্যা-হ্যা' মতোন শব্দ বের করল। ওপরের ঠোঁট দেখা গেল না। গোঁফ এক চুলও নড়ল না। মুখের রেখা না নড়লে হাসিমুখ বানানো অসম্ভব। হাসির শব্দ তো আর ছবিতে তুলে ধরা যাবে না। শিল্পী আমার দিকে তাকিয়ে হতাশভাবে হাসল। কাগজে, মডেলের গম্ভীর গোঁফের ওপর সবুজ ঘষতে লাগল।

অনড় মুখে চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছে না। পাথরের মতো বসে জার্মান মডেল। জাঁদরেল মৎস্যশিকারী যেন ছিপ ফেলে বসে আছে টান হয়ে। গালের কাছে লেমন-হলুদ ঘষতে ঘষতে আমার দিকে কথাটা ছুঁড়ে দিল শিল্পী,

—"কিরকম বুঝছেন ?"

—"কোন্‌টা।"

জবাব শুনে এক মুহূর্তে ভুরু কুঁচকে আমার চোখ দেখল শিল্পী। তারপর হা-হা করে হেসে উঠল,

—"না-না। ছবিটার কথা বলছি।"

আমি হেসে ফেললুম। মডেল তার নিজের ছবি দেখতে পাচ্ছে না। বললে,

—"ফিনিশ ?"

—"আর একটু।" শিল্পী হাত চালাল আবার। কাজ করতে করতেই বলল,

—"পোর্ট্রেট মিলেছে বলছেন ?"

বুঝলুম, খদ্দেরের মনে জমি তৈরির চেষ্টা। দর যাতে একটু উঁচু হাঁকা যায়, তার জমি। আমি বললুম,

—"আশ্চর্য মিলেছে।"

কথা বুঝল কিনা কে জানে, গুঁফো এবার আমার দিকে চোখ তুলে দেখল। বললুম,

—"দারুণ হচ্ছে !"

নাক দিয়ে গুঁফোর জবাব,

—"হুঁ !"

শিল্পী ধন্যবাদ জানালে আমায়,

—"মেরসী বোকু।" সেই সঙ্গে আমাকে খদ্দের ঠাউরে জুড়ে দিল. "এরপরে কি আপনার ছবি করে দেব ?"

হাঁটতে শুরু করে বললুম,

—"না ভাই ! মেরসী বোকু।"

এক মহিলা শিল্পীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। জনা দশেক মহিলা-শিল্পী আছে বাজারে। কয়েকজন যিশুর মতো রঙিন প্যাস্টেল বা ক্রেয়ন নিয়ে খদ্দেরদের পেছনে ধাওয়া করে, অন্যরা ভাঁজ করা 'ঈজেল' খুলে তার ওপরে সাদা ক্যানভাস বসিয়ে তেল-রঙা ছবি আঁকে। একটার পর একটা। একটা শেষ হলে সেটা নামিয়ে রাখে। অন্য সাদা ক্যানভাস তুলে নেয়।

এই মহিলাটি মাঝবয়সী। সামান্য মেদ জমেছে আশে-পাশে। নিচে ঈজেলের পায়ার কাছে দুটি কাঁচা ছবি। কাঁচা মানে ভেজা। কাঁচা মানে পাকা নয়—এও বলা যায়। কারণ, খুব উন্নত মানের ছবি ও দুটো নয়। মডার্ন প্যাটার্ন। কম্পোজিশন তেমন আহামরি কিছু নয়। আমাদের দেশে কোনো সিগারেট কোম্পানী যদি একটু আধুনিক হবার চেষ্টা করে 'প্রেষ্টিজ' ক্যালেণ্ডার বানায় তাহলে হয়তো এই ধরনের সস্তা ছবি কিনে ফেলবে। ভদ্রমহিলা বাঁ হাত কোমরে রেখে আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। ডান হাতে স্প্যাচুলা। ছোট সাইজের কর্নিক বলতে পারো। ডান পাশের ছোট্ট টেবিলে প্যালেট; প্যালেটে নানান রং এবং তেলের ডিবে।*

খুব 'পোজ' নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে সদ্য-লাগানো ক্যানভাসটির দিকে দেখছেন। একটু এগিয়ে যাচ্ছেন আবার আসছেন পিছিয়ে। তবে, বেশী পেছুবার উপায় নেই। বড়জোর দু'তিন হাত। তারপরে অন্য শিল্পী তাঁর সরঞ্জাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পেছুতে পেছুতে দু'জন শিল্পীর ঠোকাঠুকি যে না হয় এমন নয়। তবে প্রত্যেকেই মোটামুটি নিজস্ব জমি বা এলাকার ব্যাপারে সচেতন।

ঝপ্ করে খানিকটা 'সেরুলীয়ান' নীল স্প্যাচুলায় তুলে নিলেন ভদ্রমহিলা। থপাৎ করে থেবড়ে লাগিয়ে দিলেন সাদা ক্যানভাসের ওপরের দিকে। ক্রমশ ওই রংটুকু ঘষে ঘষে অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে দিলেন। দু'চারজন সাহেব আমার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। বিদেশী দর্শক বুঝে শিল্পী আরো গম্ভীরভাবে স্প্যাচুলা ঘষতে লাগলেন ক্যানভাসে।

মোঁমাত্র্-এর বাজার, মজার বাজার। আমাদের দেশে হাতে-আঁকা ছবি সাধারণ, অতিসাধারণ মনুষ্য সমাজের কাছাকাছি পৌছোয় নি এখনো। যেটুকু পৌছেছে, তাতে শুধু মাথা নেড়ে বাহবা বলা যায়। কিন্তু, ছবি কেনার লোক শতকরা ক'জন! কোনো আসল বা ওরিজিনাল পেইন্টিং গ্যালারী থেকে কিনতে গেলে আমাদের দেশের সম্পন্ন মধ্যবিত্তেরও কালঘাম ছুটে যায়। রামবাবুর বন্ধু শ্যামবাবুর বিয়ে। রাম-শ্যাম দু'জনেই হাতে-আঁকা ওরিজিনাল ছবির ভক্ত। এখন, রাম যদি শ্যামের বিয়েতে দিশী কোনো শিল্পীর আঁকা ভালো একটি ওরিজিনাল তেলরঙা ছবি উপহার দেওয়ার কথা ভাবেন, তাহলে তাঁকে কমপক্ষে শ' চার-পাঁচেক টাকার যোগাড় দেখতে হবে। সাধারণ একটি স্কেচ কিনতে গেলেও পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা। ভারতবর্ষের ক'জন কলা-প্রেমিকের একশো

টাকা দিয়ে একটি সাধারণ স্কেচ্ কিনে বন্ধুর বিয়েতে উপহার দেবার ক্ষমতা আছে ?

তাই, অনেক ঘুরে-ফিরে রামবাবু বন্ধুর বিয়ের আগের দিন কলেজ স্ট্রীট চষে বেড়াবেন। বাঘা-বাঘা সাহিত্যিকের বই ঘেঁটে-ঘুঁটে একখানি থান ইঁট কিনে ফেলবেন। ছাপা-বাঁধাই উত্তম। উজ্জ্বল মলাটের কোনো বিখ্যাত সাহিত্যকে সুন্দর মোড়কে জড়িয়ে পরদিন হাঁটা দেবেন বিয়েবাড়ি।

সেদিক থেকে মোঁমাত্র্ অনেকখানি মাটির কাছাকাছি। সাধারণ পুলিশ কনস্টেবলের মাইনে যেখানে হাজার দু'হাজার ফ্রাঁ, প্রায় দেড়-দু'হাজার টাকা, সেখানে যে কেউ পঞ্চাশ বা একশো ফ্রাঁর একটি পেইন্টিং আপন ঘর সাজাবার বা বন্ধুকে উপহার দেবার জন্যে নিতে পারে। চোখ বুজে একটু কল্পনা কর তো বউ, আমাদের একটি ডিগডিগে লাল পাগড়ি পুলিশ কাব্‌লি জুতো ফাটিয়ে অ্যাকাডেমির গ্যালারীতে ঢুকে তেল-রঙা ছবি কিনছে !

মোঁমাত্র্ থেকে বিদেশীরা স্যুভেনির হিসেবে ছবি কিনে নিয়ে যায়। স্থানীয় লোকেরাও পছন্দমতোন ওরিজিনাল ছবি সস্তা দামে কিনতে চলে আসে। একটা ভালো মোটা বই কুড়ি ফ্রাংকে কিনবে না একটা স্কেচ তিরিশ-চল্লিশ ফ্রাঁতে কিনে নেবে—এটা এরা ভাবে। কেউ বই কিনে ফেলে, কেউ কেনে ছবি। কারণ, এখানকার পিওন-পোস্টম্যান বা ঝাড়ুদাররাও পিকাসোর নাম জানে। তাঁর ছবি কোন্ গ্যালারীতে দেখতে পাওয়া যাবে চোখ-কান বুজে বলে দিতে পারে। ভারতবর্ষে কটি সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষ অবনঠাকুর, নন্দলাল বোস, হুসেন কিংবা যামিনী রায়কে নিয়ে মাথা ঘামায় !

মহিলা-শিল্পী পোড়া 'সিয়েনা'র সঙ্গে খানিকটা সাদা আর সবুজ মিশিয়ে একটা ঠাণ্ডা রং তৈরি করল প্যালেটে। ক্যানভাসের নিচের দিকে কর্নিক দিয়ে ঘষতে লাগল। টুপি মাথায় এক বুড়ো সাহেব তাঁর বুড়ি মেমের সঙ্গে এসে দাঁড়ালেন আমাদের পাশে। ছবি আঁকা দেখতে লাগলেন। ঠাণ্ডা রংটি এবং হালকা সবুজ ভাগে ভাগে লাগিয়ে নৌকো এবং জলের আভাস ফুটে উঠল।

বুড়ো সাহেব শিল্পীর একটু কাছাকাছি এগিয়ে গেলেন। গলা ঝেড়ে নিয়ে বেশ বিনীতভাবে বললেন,

—"পাঁর্দ। মাফ করবেন, মাদমোয়াজেল ! ছবিটির দাম জানতে পারি কি ?"

আকাশ, জল এবং নৌকোর আভাসওয়ালা ছবিটির কথা বলছেন। শেষ

হয় নি এখনো, দেখেই বোঝা যায়। মহিলাটি ক্যানভাসের সামনে ঘুরে দাঁড়িয়ে বুড়োকে বললেন,

—"আপনার চাই ছবিটি? দশ মিনিট অপেক্ষা করুন। দেখুন, কেমন ঠাণ্ডা ছবি হবে।" তারপর একটু থেমে কর্নিক ঘষতে ঘষতে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার দেয়ালের রং কি?"

বুড়ি মেম এগিয়ে এসে বললেন,

—"না, না, দেয়ালে টাঙানোর জন্যে নয়। আসলে ওঁর দিদির বিয়ে, দিদিকে একটা উপহার—"

আমাদের দর্শকদের মধ্যে কে যেন শব্দ করে বিষম খেল। মহিলা শিল্পী আরো গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেন। আমি বুড়ো সাহেবের আপাদমস্তক ভালো করে দেখলুম। পরিষ্কার করে দাড়ি-গোঁফ কামানো। ঝকঝকে গালে অজস্র ভাঁজ। ভাঁজের পাশে পাশে মেদ জমে ফুলে ঝুলে আছে। চোখের নিচে অর্ধচন্দ্র ঝুলছে। গলা এবং থুতনির মধ্যে গুটি পাঁচেক থর নেমেছে। খয়েরী রংয়ের ঝোলা কোট্-প্যাণ্ট। গলায় মাফলার আলতো করে জড়ানো। হাতে দস্তানা। বয়েস কমপক্ষে যাট-পঁয়ষট্টি। এর দিদির বিয়ে! উনি বাঁ হাতে টুপিটা সামান্য উঁচু করে টাক চুলকে নিলেন। খুব বোদ্ধার মতো অল্প অল্প মাথা দুলিয়ে বললেন,

—"কি রকম দাম পড়বে এটার?"

মহিলা শিল্পী 'দিদির বিয়ে'র ধাক্কা সামলে নিয়েছেন। গম্ভীর গলায় বললেন,

—"আপনার দিদির বাড়ির দেয়ালের রং কি হালকা ধরনের কিছু?"

তালকানা জ্যোতিষীর মতো আবছা অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে খদ্দের নরম করার চেষ্টা। সাধারণত, বেশীর ভাগ বাড়ির দেয়ালের রং হালকাই হয়। বুড়ো-বুড়ির বাড়ি হলে তো কথাই নেই। সাদা, ছাই, সবুজ বা নীলচে। বুঝতে পারলুম, ছবিটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিল্পী দরদামের আলোচনায় যেতে চাইছে না। বুড়োও ছাড়বার পাত্র নন। ঘুরে ফিরে সেই এক কথায় ফিরে এলেন আবার,

—"ওঁদের নতুন বাড়িতে যাই নি এখনো। তা, দাম কত বললেন?"

শিল্পী বললেন,

—"এখনো শেষ হয় নি তো। মিনিট দশেকের মধ্যেই করে দিচ্ছি। দু' শো দিয়ে দেবেন।"

বুড়ি কত্তার দিকে তাকালেন। কত্তা নির্বিকারভাবে ওপরে-নিচে ঘাড় দুলিয়ে শব্দ করলেন,

—"হুঁ।" করে, নিচে ঈজেলের পায়ার কাছে রাখা ছবি দুটো দেখতে লাগলেন। ভুরু কুঁচকে কোমরে হাত রেখে। আকারে দুটিই একটু ছোট। নিসর্গ চিত্র। মিষ্টি মিষ্টি ছবি। গাছওয়ালা ছবিটি হাতে তুলে শিল্পী বললেন, গলায় উৎসাহ,

—"আজকেই শেষ করেছি এটা। এখনো ভেজা রং। বলেন তো যত্ন করে 'প্যাক' করে দিই। এটার দামও কম। এক শো পঁচিশ ফ্রাঁ। দেবো?"

এর পর ঠিক যদুবাবুর মাছের বাজার কিংবা চীনেবাজারের জুতোর দোকানের মতো দরাদরি আরম্ভ হল। আমার বেশ অসোয়াস্তি লাগছিল বউ। সাধারণ মানুষ-মানুষির কাছাকাছি নেমে এসেছে ফরাসী দেশের আঁকা ছবিরা। 'ওরিজিনাল পেইন্টিং' সব। মোঁমাত্র্-এর গোটা ব্যাপারটা মিলেমিশে মজার হলেও— এখানকার দুশো পাকা শিল্পীর কোনো ছবিই সম্ভবত কলকাতার ভদ্র পত্র-পত্রিকার পাতায় সমালোচনার যোগ্য নয়। কলকাতা বোম্বাই বা দিল্লীর কয়েকটি গ্যালারীতে যেমন প্রায়ই অখাদ্য একক শিল্পীর প্রদর্শনী হয়ে থাকে সাদামাটা, ল্যাপাপোঁছা 'ছবি ছবি' গোছের ছবি সাজিয়ে, এখানকার অবস্থাও অনেকটা সেই রকম। তবে সকলেই ভোঁতা শিল্পী, তা নয়। অনেকেরই পোর্ট্রেট মেলাবার ক্ষমতা চম্‌কে দেবার মতো। অনেকেরই মোটা বুরুশ অথবা কর্নিকের ঝাপটা ক্যানভাসের সাদামাটা রং বা বিষয়বস্তুকে যথেষ্ট উন্নত স্তরে পৌঁছে দিচ্ছে। কিন্তু, হলে কি হবে! গোটা ব্যাপারটাই যে পেট, পোশাক-আশাক অর্থাৎ সুস্থভাবে জীবনধারণের প্রশ্ন থেকে। দৈনিক খিদে-তেষ্টা মেটানোর জন্যেই যে এই জীবিকা এখন। ফিরিওয়ালা, মাছ-বিক্রেতা, দরজি, কুম্ভকার অথবা নরসুন্দরের মতো আপন-মনে-ছবি-আঁকিয়ে শিল্পীদেরও খিদের নাম বাবাজী। এই ফরাসী রাজ্যে প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার এমন শিল্পী রয়েছেন। সেখানে, সংসার, সামান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দায়ে শিল্পকে, শিল্পীকে সাধারণ মানুষের তথা ক্রেতার বৃহত্তর বৃত্তের কাছে নেমে আসতে হবে। সস্তা হতে হবে সব দিক থেকেই। কারণ, ভালো ছবি, উন্নত মানের ছবি আঁকতে গেলে যে চিন্তা, যে সময়ের প্রয়োজন মোঁমাত্র্-এ সে অবসর নেই। আঁকো আঁকো। দ্রুত, আরো দ্রুত। এটা শেষ হয়ে গেল। নামিয়ে রাখো। শুকোক্। আর একটা শুরু করে দাও, দেরি কোরো না। আঁকো, আঁকো—তোমার চারপাশে সব দিশী-বিদেশী

খদ্দের ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছবির বঁড়শী যত বেশী তৈরি থাকবে, খদ্দের বেঁধে যাবার সম্ভাবনাও ততই বেশী। এঁকে যাও বাছা! দ্রুত, আরো দ্রুত। তাই, যিনি নদী-নালা আঁকছেন, তিনি একের পর এক নদী-নালাই এঁকে চলেছেন। কম্পোজিশনে সামান্য ইতরবিশেষ, রংয়ের মধ্যে অল্পস্বল্প হেরফের। বাড়ি-ঘর-দোরের গোলকধাঁধায় যে শিল্পীর হাত দ্রুততম, তিনি বাড়ি-ঘর-দোর নিয়েই পড়ে আছেন। যাঁর বুরুশে দ্রুত ফুলের জন্ম হয়, তাঁর বিষয় ফুলের পর ফুল, টবের মধ্যে ফুল, বাগানের মধ্যে ফুল···।

একশো পঁচিশ থেকে সত্তর ফ্রাঁতে নেমে এসেছে সবুজ-গাছওয়ালা ছবিটি। বুড়ো সাহেব যখন বুঝলেন এর থেকে আর কমানো যাবে না, তখন গিন্নীকে বললেন,

—"না থাক। চলো। তার চেয়ে বরং ওই গোলাপী কার্ডিগানটাই কিনে ফেলি ওর জন্যে।" বলে, ঘুরতে যাবেন, শিল্পী ছবিটা নিয়ে উবু হয়ে বসতে বসতে বললেন,

—"ঠিক আছে, ভেজা ছবির স্পেশাল প্যাকিং করে দিচ্ছি—পঁয়ষট্টিতে নিয়ে যান।"

আরো পাচ ফ্রাঁ কমে গেল। কত্তাগিন্নী থমকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন "স্পেশ্যাল প্যাকিং"। ক্যানভাসের সমান আকারের একটি প্লাই-উড এসে গেল। তার চার কোণে চারটি আলপিনের মতো বোর্ডপিন লাগানো। মাথা ঠুকে ঠুকে উল্টোদিকে সঙ্গিনের মতো বের করা রয়েছে ছুঁচোলো মুখগুলো। পিনসমেত প্লাই-উডটি উপুড় ক'রে রাখা হল ক্যানভাসের ওপর। ইতিমধ্যে পাশের ঢ্যাঙা শিল্পী এগিয়ে এসেছে মহিলাটিকে সাহায্য করতে। এমন হয়, এখানে মনোমালিন্য ঝগড়াঝাঁটিও হয়তো আছে। ঈর্ষাও যে নেই তা নয়। কিন্তু সবকিছুর সঙ্গে মিলিমিশে আছে সখ্য। একই নৌকোর যাত্রী তো সবাই।

হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে পিন চারটে ক্যানভাসের কাঠে ঢুকিয়ে দিল দু'জনে মিলে। এখন ভেজা ছবিটির ওপরে আধ ইঞ্চির মতো ফাঁক এবং তার ওপরে ছাদের মতো আবরণ রইল প্লাই-উডের। সাবধানে কাগজ জড়িয়ে দেওয়া হল ছাদওয়ালা ক্যানভাসটির চারদিকে। এই ধরনের প্যাকিং আমাদের দেশে হয় না বোধহয়। দরকারই তো নেই। শুকনো, তৈরি ছবি বিক্রি করতেই শিল্পীর ঘাম ছুটে যায় বউ। ছবির ভেজা রং শুকিয়ে শুকিয়ে পাথরের মতো হয়ে গেলেও খদ্দের জোটে না।

বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়া শুরু হয়েছে। গলার মাফলারটি আর এক প্যাঁচ জড়িয়ে হালকাভাবে চক্কর কাটতে লাগলুম। কখন যে আবার যিশুর কাছাকাছি চলে এসেছি খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখি, প্যাকিং বাক্সের ওপর আমার দিকে পিছন ফিরে বসে যিশুখৃষ্ট সিগারেট ধরাচ্ছে। পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। সিগারেট ধরিয়েই উঠে পড়ল। দেখতে পেল আমায়। চাপা খুশি মুখে বলল,

—"এই যে, ইণ্ডিয়ান! ফিরে এসেছো তাহলে! নাও সিগারেট খাও। বসে পড়োনি তো কোথাও—" বলেই সিগারেট এগিয়ে দিল। হেসে বললুম,—"না।"

হালকা নীল প্যাকেটটি হাতে নিয়ে একটি সিগারেট বের করে ধরালুম। 'গোলওয়াজ' সিগারেট। আমাদের চার-মিনারের মত কড়া। সাদা ফিল্টার লাগানো। জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি রকম দাম এগুলির?"

ও হা-হা করে হাসল। বলল,

—"ফ্রান্সের সবচেয়ে সস্তা আর বহুলপ্রচারিত ধোঁয়ার নাম 'গোলওয়াজ'।"

তারপর ড্রয়িং বোর্ড বাঁ হাতে তুলে নিয়ে বলল,

—"এবারে বসছ তো?"

বলে, ভাজ করা চেয়ারটি মেলে ধরল। পেতে দিল আমার সামনে।—"বসছি।" বলে, প্যাকিং বাক্সটির ওপরে গিয়ে বসে পড়লুম। হাঁ হাঁ করে উঠল যিশু,

—"ওখানে নয়—ওখানে নয়—চেয়ারে বোসো।"

আমি এক বিন্দুও না নড়ে বললুম,—"পঞ্চাশ ফ্রাঁ দিলে আমার মুখ এঁকে দেবে তো তুমি?"

—"ঠিক আছে, পঞ্চাশই সই।"

হাত বাড়িয়ে বললুম,

—"দাও তো। বোর্ডটা দাও। দেখি।"

সিগারেটে একটা টান দিয়ে খেলাচ্ছলে বোর্ডটা এগিয়ে দিল। বোর্ড বাগিয়ে কোলের ওপর ধরে বললুম,

—"চুপ করে চেয়ারটায় বোসো দিকি।"

—"তার মানে?" এবার একটু অবাক গলা যিশুর, "তুমি ছবি আঁকবে নাকি? কি ছবি?"

—"তুমি আমাকে পঞ্চাশের থেকে দশ ফ্রাঁ কম অর্থাৎ চল্লিশ দিও, তোমার রঙিন মুখ বানিয়ে দিচ্ছি।"

যেটুকু বসেছিল চেয়ারে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমার হাত থেকে কেড়ে নিল বোর্ডটা। বেশ ভারী গলায় বলল যিশু,

—"তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করছিলে ইণ্ডিয়ান। তুমি ছবি আঁকো। পেশাদার শিল্পী?"

হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালুম। বললুম,

—"পেশাদার 'পোর্ট্রেট-পেইন্টার' নই। তবে, মোটামুটি ভালো 'পোর্ট্রেট' তোমার একটা করে দিতে পারি, যদি বল।"

—"আমার সময় নিয়ে এতক্ষণ ছেলেখেলা করছিলে ইণ্ডিয়ান?" খুব রাগ রাগ গলায় কথাক'টি বলেই চেয়ারে বোর্ডটি নামিয়ে রাখল। হোহো করে হেসে উঠল হঠাৎ,—"খুব বোকা বানালে যা হোক!"

হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আমরা দু'জনে দু'জনার দু' হাত চেপে ধরলুম। আমার নাম বললুম। ও মুখ খুলতে যাচ্ছিল,

—"আমার নাম—"

বাধা দিয়ে বললুম,

—"দরকার নেই। তোমার নাম আমি আমার ইচ্ছে মতোন রেখেছি।"

ছেলেমানুষি কৌতূহল নিয়ে যুবক যিশু জিজ্ঞেস করলে,

—"কি শুনি?"

—"তোমার চুল-দাড়ি-গোঁফ, মুখের গড়ন মিলিয়ে তোমাকে খুব পরিচিত ভগবানের মতো দেখায়। যিশুখৃষ্ট।"

—"ও লর্ড।" বলেই হেসে ফেলল। তারপর বললে,

—"তোমাকে দিয়ে আমার পোর্ট্রেট করাতুম আজকেই। কিন্তু কি জানো, একটিও খদ্দের জোটে নি আমার এখন পর্যন্ত। অথচ, হাতে মাত্র আড়াই ঘণ্টা বাকি।"

—"কিসের?"

—"আমার 'ফিঁয়াসের' সঙ্গে ডেট আছে আজকে। যে করে হোক একটা সাদা-কালো খদ্দের ধরতেই হবে এর মধ্যে, কি বল!"

মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। বললুম,

—"আমার কাছে বিশেষ পয়সা নেই। গরিব দেশের হাংরী পেইন্টার।

তা না হলে আমার একটা সাদা-কালো মুখ করিয়ে নিতুম তোমার হাতে।”

রোজমারীকে নিয়ে মোঁমাত্র্-এ যাবো। আলাপ করিয়ে দেব যিশুর সঙ্গে। ওকে বলব রোজমারীর হাসি বাদ দিয়ে একটি রঙিন মুখ করে দিতে, যাতে ওর গালের ভাজটা দেখা না যায়। এখন, রোজমারী গেলাস উঁচু করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার স্বাস্থ্যপান করার কথা বলছে,

—“আ ভোত্র্ সাঁতে।”

কখন যে ওয়েটার মদ রেখে গেছে আমাদের টেবিলে খেয়াল করি নি। তাড়াতাড়ি আমার গেলাস হাতে তুলে নিলুম। বললুম,

—“আ ভোত্র্ সাঁতে।’

চুমুক দিয়ে গেলাস টেবিলে নামাতে নামাতে রোজমারী বলল,

—“ক’ পেগ পেটে গেছে? কখন থেকে গেলাস তুলে তাকিয়ে আছি কোনো খেয়ালই নেই তোমার। অনেকক্ষণ ধরে খাচ্ছো নাকি?”

হেসে বললুম,

—“না, না! এই তো সবে কলির সন্ধ্যে!”
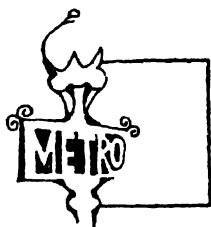
ছোটখাটো একটি ঝুঁকে-পড়া ল্যাম্পপোস্টের মতো চেহারা। জেরীর বর্ণনা এর চেয়ে ভালো আমি আর কিছু ভাবতে পারলুম না, বউ। রোজমারী জিজ্ঞেস করছিল, আমি এখানে কি করে এলুম। কোনো স্কলারশিপ-টিপ কিছু? ওর কথার জবাবে জেরীর কথা বলতেই হয়। জেরী ওট্‌ল-এর কথা।

সেই আড়াই বছর আগেকার বোম্বাই-এর গ্যালারীর কথা। হোটেল সংলগ্ন ঠাণ্ডা আর্ট গ্যালারী। বোম্বাইতে আমার প্রথম প্রদর্শনী। সতেরোটি ছবি। শহরের বড় বড় সব ক’টি পত্র-পত্রিকাতেই বাছা বাছা প্রশংসার কথা বেরিয়েছে ছাপার অক্ষরে। দু’দিনের মধ্যেই তিনটে ছবি বিক্রিও হয়ে গেছে। প্রদর্শনীর তৃতীয় দিন, দুপুর নাগাদ কাঠির মতো হাত-পা, পায়রার মতো বুক নিয়ে, কম

করে মাটি থেকে সাড়ে ছ' ফুট উঁচুতে একটি রোগা অথচ উজ্জ্বল মুখ এসে হাজির। টকটকে গায়ের রং। লাল ঢিলে ঢালা গেঞ্জি আর নীলচে প্যাণ্ট পরা জেরীকে দেখে আমি বা আমার বন্ধুরা কেউ গ্রাহ্যই করি নি। গ্যালারীতে বিদেশী বা বিদেশিনী ঢুকলে আমরা মনে মনে আশা করি—এঁরা খদ্দের হলেও হতে পারেন। কিন্তু, জেরীকে দেখে 'হিপি' ছাড়া কিছুই মনে হয় নি। বম্বেতে, বিশেষ করে পাঁচ-তারকাওয়ালা হোটেলগুলির কাছেপিঠে বিভিন্ন গ্যালারীতে তখন জোড়ে-বেজোড়ে হিপিদের ঘোরাঘুরি।

প্রায় মিনিট পনেরো বাদে জেরী আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। চোখে পণ্ডিতমশাই গোছের নিকেলের চশমা। নিকেলের কিংবা রূপোর। চশমাটি ঠিক করে নাকের ওপরে বসালো। আমাদের তিন জনের দিকে পর পর তাকিয়ে জানতে চাইল,

"হু ইজ দ্যা পেইন্টার ?"

সাগ্রহে বললুম,

—"আমি।"

স্থির চোখে আমার দিকে কয়েকদণ্ড দেখে নিল জেরী। বলল,

—"মাফ করবেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?"

—"বলুন।"

চারপাশের দেওয়ালে ছবিগুলির দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল,

—"আপনি যন্ত্রণার ছবি আঁকেন কেন ?"

অল্প চুপ করে থেকে হাসলুম। বললুম,

—"যন্ত্রণাবিলাস বলতে পারেন।"

জেরী হাসল না। এই প্রসঙ্গে আর কোনো কথাও বলল না। দুটি ছবির দাম আগাম দিয়ে দিল। বলল,

—"আপনার প্রদর্শনী আরো চারদিন চলবে দেখছি। এই দুটি ছবির ক্যানভাস ফ্রেম থেকে খুলে আমাকে দিয়ে আসতে পারবেন ?"

—"নিশ্চয়ই। আপনি কি এই হোটেলেই উঠেছেন ?"

—হ্যাঁ। এক টুকরো কাগজ চাই যে।"

দিলুম। পকেট থেকে কলম বের করে জেরী লিখল,

জেরী-ও'টুল

স্যুট নম্বর : ৩১৭

কাগজটি আমার হাতে দিতে দিতে বলল,

—"প্রদর্শনীর শেষ দিন অনুগ্রহ করে দিয়ে যাবেন। আমি সন্ধ্যে সাতটার পর আর ঘর থেকে বেরোই না।"

রোজমারী চুপ করে শুনছিল। একটু থেমে হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিলুম। ও কথা বলল এতক্ষণে। জিজ্ঞেস করল,

—"জেরী? কোন্ দিশী লোক। আমেরিকান নাকি? বয়েস কত?"

লা দোম রেস্তোর্ঁার তিনটে ভাগ। ভিতরে অর্ধবৃত্তাকার ঘেরা কাউণ্টারের চারপাশে দাঁড়িয়ে বা উঁচু টুলে বসে যারা পানাহার করে তাদের অনেক কম পয়সা দিতে হয়। 'সার্ভিস চাজ' বা 'টিপস' যৎসামান্য দিলেও চলে, না দিলেও কেউ গলায় গামছা দিয়ে ধরবে না। কিন্তু, টেবিল চেয়ারে বসলেই মদ বা খাবারের সঙ্গে সার্ভিস চার্জ জুড়ে যায়। কোনো রেস্তোর্ঁায় গোটা বিলের শতকরা বারো ভাগ, কোথাও পনেরো। আমাদের দেশে ভালো হোটেলে বা রেস্তোর্ঁায় গুচ্ছের খেয়ে ইচ্ছেমতন আনা-সিকিটা ওয়েটারের থালায় বখশিশ হিসেবে ছুঁড়ে দেওয়া চলে ওয়েটারের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে, এখানে বখশিশের নাম সার্ভিস চার্জ। কড়ায় গণ্ডায় দিতে হবে। ভেতরে যেমন টেবিল-চেয়ারে বসবারও ব্যবস্থা আছে, বাইরেও তেমনি। বাইরে মানে রাস্তার গায়ে এই লম্বা বারান্দায়। রাস্তার দিকের দেওয়ালটা পুরোপুরি কাচের। আপাদমস্তক। দু'সারি সাদা সাদা গোল টেবিল ঘিরে বেতের চেয়ার পাতা। ভেতরে বাইরে সব চেয়ারেই এখন গমগম করছে লোক।

রোজমারীকে জানালুম, জেরীর বয়েস ঠিকমত ধরতে পারি নি প্রথমে। সেদিন, আমার প্রদর্শনীর শেষ দিন, ছবির ক্যানভাস দুটি শীতল পাটির মতো গোল করে হাতে নিয়ে পাঁচ তারকাওয়ালা হোটেলের তিনশ সতেরো নম্বরে গেলুম। মাথার ওপরে অর্ধেকটাই কপাল হয়ে গেছে ওর। পেছনের বাকী অংশে পাতলা বাদামী চুল। সবে স্নান করে বেরিয়েছে। বলল,

—"বসুন, বসুন।"

তারপর ছবি দুটি খুলে খাটের ওপরে বিছিয়ে ফেলল,

—"এ দুটি দারুণ ভালো লেগেছে আমার। এইটিকে আমার আপিসে টাঙাবো আর এটি আমার বসবার ঘরে।"

কথায় কথায় জানতে চাইলুম,

—"আপনার দেশ কোথায়?"

—"আদি নিবাস মার্কিন রাজ্যে। তবে ইদানীং সুইডেনে আমার আস্তানা করেছি ব্যবসার তাগিদে।"

—"কিসের ব্যবসা করেন জানতে পারি কি?"

হেসে ফেলল জেরী,

—"চোরা কারবার নয় যখন জানতে নিশ্চয়ই পারেন। আপনাদের দেশের তাঁতের কাপড় নিয়ে গিয়ে নিত্যনতুন ডিজাইনের জামা-প্যান্ট ইত্যাদি তৈরি করে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করি।"

—"ও। আমি ভেবেছিলুম—"

বাধা দিল জেরী,

—"ছবি-টবির ব্যবসা করি? একেবারে ভুল। দর্জি বলতে পারেন।" বলেই হাসতে লাগল। হাসি থামলে ঘরের এ-পাশে ও-পাশে চোখ ফিরিয়ে হতাশভঙ্গিতে বলল,

—"কিছুই তো নেই সঙ্গে। আপনাকে কি অফার করি বলুন তো?"

আমি কিছু বলবার আগেই আবার বলে উঠল,

—"ও হ্যাঁ। কিছু আম আছে।" আর হুইস্কি। কি খাবেন?"

নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"স্কচ্?"

আসলে আমার ভেতরে ভেতরে সোডার বোতল খোলার মতো খুশি। শুকনো বোম্বাইতে তখন লুকিয়ে চুরিয়ে চোলাই-টোলাই বা দিশী খেয়েই সন্ধ্যে কাটাই আমরা। হুইস্কি, তার ওপার স্কচ্ শুনে বুকের ভেতরে সোডার বোতল আপনা থেকেই খুলে গেল।

জেরী ততক্ষণে আলমারি থেকে বোতলটি বের করে আনছে। ঘরে দুটি খাট। একটায় কিছু কাগজপত্র ছড়ানো। অন্যটায়, পাট করে পাতা বিছানায় আমি বসেছি। তাছাড়া, একটা সোফার ওপরে হাঁ করে খোলা মাঝারি আকারের স্যুটকেশ। তার ভেতরে জামা-কাপড় অবিন্যস্ত। ড্রেসিং টেবিলের ওপরে একটা দোমড়ানো কলারওয়ালা গেঞ্জি।

দুই খাটের মাঝখানে রাখা ছোট্ট টেবিলে বোতলটি এনে রাখল জেরী। আমার দেশী ফল পরম তৃপ্তিতে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে খেতে লাগল ও। আমি অল্প সময়ের মধ্যেই আধ বোতল বিলিতি পানীয় শেষ করেছিলুম মনে আছে।

রোজমারী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল,

—"বয়েস কতো জেরীর তা তো বললে না।"

—"ও হ্যাঁ। টাক দেখে, চশমা দেখে মনে হয় পঞ্চাশ। দৈর্ঘ্য দেখে চল্লিশ। মুখ দেখে, কথা শুনে পঁচিশ। আসলে ওর বয়েস বত্রিশ তখন। আমার থেকে আট মাসের ছোট।"

রেস্তোরাঁর কাচের দরজা ঠেলে একটি যুবকের প্রবেশ। বর্ষাতি এবং টুপি খুলে ফেলতেই টকটকে চেহারা ঝকঝকে দেখাল। ধোপ-দুরস্ত স্যুট-নেকটাই। দরজার কাছে দাঁড়িয়েই হাতের বড় বাক্সটি খুলে বের করল 'অ্যাকর্ডিয়ান'। দু' কাঁধে ফিতে জড়িয়ে কোমরের কাছে বাগিয়ে ধরল বাদ্যযন্ত্রটি। সকলের দিকে ঘুরে ঘুরে বাজাতে আরম্ভ করল। ঝমঝমে আওয়াজে কোনো গানের সুর।

রোজমারী সেদিকে একটু তাকিয়ে বলল,

—"জানো গানটা ?"

—"না তো।"

—"খুব জনপ্রিয় প্রেমের গান। জ তেম্—মোয়া নো প্লু—"

রোজমারী আমাদের দেশ দেখে এসেছে। সেই সূত্রে ধরে বললে,

—"তোমাদের দেশে এমন রাজপুত্রের মতো ভিখিরি পাওয়া যায় না।"

—"ভিখিরি ? কে ?" আমি তো অবাক।

আঙুল তুলে না দেখিয়ে চাপা গলায় বলল রোজমারী,

—"যে আমাদের বাজিয়ে শোনাচ্ছে—'আমি তোমায় ভালোবাসি, এর বেশী কিছু চাই না'—।"

আবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম। সত্যিই বউ, একেবারে পোটোপাড়ার কার্তিকের মতোন চেহারা। স্যুট-টুট পরিয়ে, তীর-ধনুকের বদলে অ্যাকর্ডিয়ান হাতে ধরিয়ে দিলে আমাদের কার্তিককে ওর মতই দেখাবে।

—"ভিখিরি কে বললে ?" একটু অবিশ্বাস নিয়েই জানতে চাইলুম।

রোজমারী হাসল। বলল,

—"কেউ বলে নি। বাজনা শেষ হলেই দেখবে, টুপি উল্টে হাতে ধরে প্রত্যেকটি টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে।"

চৌরঙ্গীতে 'ফিরপো' হোটেলের নিচে ঠিক এমনিধারা একজনকে দেখেছিলুম, মনে পড়ল। হাতে ছিল ব্যাঞ্জো। শার্ট, প্যান্ট আর মলিন নেকটাই পরে মোটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। ব্যাঞ্জোর সঙ্গে গলা মিলিয়ে ইংরিজী গান গাইত লোকটি। রোগা, মধ্যবয়সী সেই অন্ধ ভিখিরির মুখটা আর আমার

মনে পড়ছে না আজ। এমনি কত অজস্র মুখ হারিয়ে গেছে, বউ। স্মৃতির মধ্যে যতই ফিরিয়ে আনতে চাই, পাই না। চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে ওরা। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর মোড়ে সেই অন্ধ ভিখিরি, যার শুধু সাদা চোখ দুটি মনে আছে। হাঁটু অবধি আধময়লা ধুতি, হাফ শার্ট, আর হাত শুধু মনে আছে। মুখের ড্রয়িং হারিয়ে গেছে কবে! অথচ, ওর মুখ কি ভালো ক'রে দেখি নি? ট্রাম স্টপে থামলেই শুনতে পেতুম অদ্ভুত একঘেয়ে করুণ স্বরে বল'ছে,

—"অন্ধকে—দয়া করুন—"

কতবার তাকিয়ে দেখেছি, আজ চাইলেই আর মুখটি মনে করতে পারছি না। শুধু দুটি সাদা ঘোলাটে চোখ স্মৃতির মধ্যে টিকে আছে। এমন হয়, কথা বলতে বলতেও এই রকম শব্দ হারিয়ে যায়। প্রতিশব্দ হয়তো মনে আসে, কিন্তু বিশেষ কোনো শব্দ, যেটি তখন খুব দরকার, কিছুতেই মাথায় আসে না। চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে তখন। ঈশ, এই আসছে, এই আসছে করেও পিছলে যায় শব্দটা। তোমারও নিশ্চয়ই কখনো কখনো এই রকম হয় বউ! তখন, আমরা অভিধান দেখে খুঁজে বের করলে তবে সোয়াস্তি। কিন্তু মানুষের মুখের আকার বা ড্রয়িংয়ের তো কোনো অভিধান নেই। একটি মুখ, যথেষ্ট চেনা মুখ সময়ের ঘষায় ঘষায় একবার হারিয়ে গেলে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। অথচ, ট্রেনে বা ট্রামে দেখা উটকো, অপ্রয়োজনীয়, অপরিচিত মুখ এক আধটা ছিটকে এসে চোখের সামনে অকারণে দাঁড়িয়ে পড়ে।

রোজমারীকে জেরীর কথা বলতে বলতে এক্ষুনি দেখ ওর মুখটা ভাবার চেষ্টা করলুম। গোল চশমা, টাক চোখের সামনে স্পষ্ট। কিন্তু নাক-চোখ-চোয়াল মিলিয়ে গোটা মুখটি এখন মনে পড়ছে না। একটু বাদে বা অন্য কোনো সময়ে ঠিক চোখের সামনে ভেসে উঠবে পুরো ছবিটা। ওর সঙ্গে যতক্ষণ যতদিন যোগাযোগ আছে, ততক্ষণ ততদিন এবং তার চেয়েও অনেক বেশী দিন জেরীর মুখ আমার স্মৃতির মধ্যে টিকে থাকবে। তবু, এ এক খেলা। স্মৃতির সঙ্গে আমাদের ইচ্ছের লুকোচুরি খেলা বলতে পারো।

রোজমারীর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই এই সব ভাবছিলুম। জেরীর সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার দেখা হওয়ার কথা বলছিলুম ওকে। গেল বছর আমার প্রদর্শনী উৎরে যাবার মাসখানেক বাদে বোম্বাইতে আবার এল জেরী। গ্যালারী থেকে ঠিকানা যোগাড় করে আমার ঘরে এসে হাজির। সতেরোটির মধ্যে

অর্ধেকের বেশী বিক্রি হয়ে গেছে ছবি। বাকি যে ক'টি ছিল, তাই দেখে জেরী একেবারে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলল,

—"ইউরোপ যাওয়া উচিত তোমার। যাও না কেন ?"

—"কি করে যাব !" বললাম।

—"না, না ! তোমার চিন্তা এবং ছবি ওদেশের লোককে স্তম্ভিত করে দেবে। পৃথিবীর শিল্পীদের স্বর্গ যে প্যারিস, আজকাল সেখানেও কল্পনা বা চিন্তাশক্তি কমে গেছে। বছরে দু' তিন বার যাই আমি প্যারিসে। কিছু ফর্ম, কিছু প্যাটার্ন, কিছু আশ্চর্য ভালো রং দেখে চোখ ভরাই। আধুনিক শিল্পীরা আমার মত হাজার হাজার মানুষের শুধু চোখ জুড়োতে বা ঝলসাতেই ব্যস্ত, মন ভরাতে তেমন করে আর কেউ পারে না আজকাল।"

বেশ উত্তেজিত দ্রুত গলায় কথাগুলি বলেই জেরী আবার আমার ছবিগুলো দেখতে লাগল। দুটি ছবি ও কিনে নিল। একটি আমি ওকে উপহার দিলুম। পরের দিন আমায় রাত্তিরে খাবার নেমন্তন্ন করল জেরী। সেই 'ডিনার' টেবিলে বসেই আমার ইউরোপ সফরের ছক কাটা হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে গোটা ইউরোপ ঘুরে আবার দেশে ফিরে যাবার মতো একটি 'এয়ার ইণ্ডিয়া'র টিকিট জেরী আমাকে উপহার পাঠাবে সুইডেনে গিয়েই। ইতিমধ্যে আমি পাসপোর্ট ইত্যাদি তৈরি করে ফেলব। বলেছিলুম,

—"কিন্তু তোমাকে আমি কি দিয়ে শোধ দেব, কি করে ?"

—"প্যারিসে বসে ছবি আঁকো। প্রদর্শনী কর। ছবি বিক্রির টাকা থেকে দরকার হয় আমাকে শোধ দিতে পারো, না দিলেও ক্ষতি নেই। কারণ তোমার শিল্পীসত্তার প্রতি শ্রদ্ধার উপহার হিসেবেই আমি টিকিটটি তোমায় পাঠাব।"

আমার মন সেদিন স্বপ্নের মেঘের মধ্যে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। তবু বলেছিলুম,

—"যদি আমার ছবি বিক্রি না হয় ?"

—"তাহলেও, ভাবনার কিছু নেই। তোমার ইচ্ছে মতন দু'একটি ছবি আমাকে উপহার দিয়ে দিও।"

রোজমারী সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেছে, বউ। রীতিমত অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে আমায়। মুখ দিয়ে অস্ফুট একটি ফরাসী শব্দ বেরুল, যার তর্জমা দাঁড়ায়,

—"বাহ্।"

তারপর গেলাস তুলে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বলল,

—"জেরী তো একটি 'গ্রেট ক্যারেকটার'! আর, তোমার কপালেরও জবাব নেই।"

গল্পে গল্পে আরো দু পাত্র হুইস্কি আর ব্র্যাণ্ডি খাওয়া হয়ে গেছে আমাদের। রোজমারীর কথাই ঠিক। সেই ফরাসী কার্তিক তখন টেবিলে টেবিলে টুপি ঘোরাচ্ছে। আধ ফ্রাঁ, এক ফ্রাঁ করে দিচ্ছে সকলেই। আমাদের টেবিলে আসতে আমার সঙ্গিনী দুটো চকচকে ফ্রাঁ দিয়ে দিল। বুকের মধ্যে কেমন যেন মুচড়ে উঠল আমার। দু' ফ্রাঁ মানে প্রায় তিন টাকা। আমাদের দেশের একটা গোটা ভিখিরি ফ্যামিলির দো-বেলার উৎসবের খরচ প্রায়।

রোজমারীর দিকে তাকালুম। ও মৃদু মৃদু হাসছে। নতুন ভরা গেলাসে চুমুক দিয়ে বলল,

—"আমি তো ইণ্ডিয়ায় ছিলুম কিছুদিন। আমি জানি তুমি কি ভাবছ। এ দেশে দুটো ফ্রাঁ কিছুই নয়।"

ঠোঁটে লিপস্টিক মাখে নি ও। মাখলেও বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেছে। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর ঠোঁট দুটি নানান ফর্ম, প্যাটার্ন সৃষ্টি করছে। গোলাপী ফর্মের মধ্যে ঝকঝকে দাঁত। ওর গলার গঠন এবং স্বর দুই-ই চমৎকার। শুধু বুক ছাড়া রোজমারীর সমস্ত শরীর মেয়েলী। ছোট্ট গোল টেবিলের ওপাশে আমি ওর কোমর অবধি দেখতে পাচ্ছি। ভারি সুন্দর কোমর। সব মিলিয়ে, আমার ঝাপসা চোখের বাঁ দিকে কাচের দেওয়াল। কাচ পেরিয়ে বৃষ্টি এবং কোনো স্বপ্নের দৃশ্যের মতো রাস্তা, ফুটপাথ। ডানপাশে গুঞ্জন ছাপিয়ে মেয়েলী হাসির শব্দ। পেছনে কি আছে, এখন আর ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে না। সামনে স্বল্প পরিচিতা এক বিলিতি সুন্দরী। ভাই নোয়েল, তোমার কথা মনে পড়েছে। কিন্তু নোয়েল রড্রিক্স, তোমার মুখটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। তুমি এখন হাজার মাইল দূরে বসে কি করছ, আমি জানি না। তোমার বিলিতি প্রণয়িনী আমার সামনে সশরীরে বসে। মনে আমার কোনো পাপ নেই। পাপ নেই, পুণ্য নেই। কারণ কারুরই থাকে না। শুধু একটা গুবরে পোকা মাথার মধ্যে, মদের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।
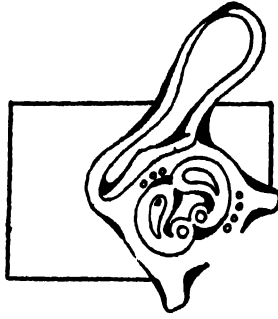
নিজের বলতে গরম জামাকাপড় যা ছিল, তা তো তুমি জানোই, বউ! যে বন্ধুটির কাছ থেকে ওভারকোট যোগাড় করতে গিয়েছিলুম সে কি বলেছিল মনে আছে? সেই যে,

—"বলেন কি মশাই! প্যারিসে যাবেন, তার আবার ওভারকোট কিসের। আপনার বাদামী রংয়ের শরীরকে সারাক্ষণ ওম্ দেবার মতো ঢেকে রাখবে প্যারিসের সুন্দরীরা।"

হাসতে হাসতে কথাগুলি বলে ধুমসো এক ওভারকোট চাপিয়ে দিয়েছিল আমার ঘাড়ে। কোটটির ভেতরে ভ্যাড়ার লোম ঠাসা, বাইরে বৃষ্টি আটকাবার 'তারপোলিন'। অর্থাৎ এক কথায় গরম-বর্ষাতি। আর দিয়েছিল ছোট্ট একটা প্যাকেটে তিনটে জিনিস। বলেছিল,

—"প্যাকেটে ঠিকানা এবং ফোন নম্বর লেখা আছে। আমি যখন ছিলুম ওখানে, এরা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। আপনার মারফৎ ওদের এগুলো পাঠাতে চাই। আপত্তি আছে?"

—"একদম না।"

—"স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই শিল্পী। আলাপ করলে আপনারও ভালো লাগবে। সহৃদয় লোক।"

প্যারিসে নামতেই আধা-পোশাক-পরা ফরাসী সুন্দরীরা চারপাশ থেকে আমাকে ঘিরে ধরে চুমোয় চুমোয় সর্বাঙ্গ ভরিয়ে দিচ্ছে—এই রকম একটি ছবি মনের অজান্তেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল। 'ওরলি' বিমানবন্দরে নেমে টের পেলুম অকূল-পাথার। ফরাসী সুন্দরীরা গট্‌গট্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বটে, তবে, কেউই আধাবস্ত্রে নয়। জানুয়ারীর শীত। সকলেরই শুভ্র ধবধবে মুখগুলি দেখা যাচ্ছে। গোটা শরীর ঢাকা। আমাকে কেউ ভ্রূক্ষেপই করছে না। সাহেব মেমসাহেবরা

প্রায় দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে। আমার অপরিপক্ক বিদ্যেয় ওদের অত দ্রুত কথা-বলা বোঝবার নয়।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মালপত্র নিয়ে টুরিস্ট-কাউন্টারের সামনে হাঁদা-গঙ্গারামের মতো দাঁড়িয়ে আছি। জেরীর দেওয়া একটি নম্বরে টেলিফোন করে কোনো সাড়াই পেলুম না। যে কোনো একটা হোটেলে গিয়ে ওঠা যায়। কিন্তু সস্তা হোটেল না হলে দু'দিন বাদেই পথে দাঁড়াতে হবে। টুরিস্ট-কাউন্টারে তালিকা দেখে সস্তা হোটেলের দরজা পেলুম, তা প্রায় আমাদের কোলকাতার 'গ্র্যাণ্ড' বা বোম্বাইয়ের 'তাজে'র মতো।

জুলির মা বলেছিল,

—"প্যারিসিয়ে"রা একেবারে গোঁয়ার। ওদের ভাষায় কথা না বললে ওরা বিদেশীদের পাত্তাই দেয় না। ইংরিজি ওদের দু'চোখের বিষ। সেই প্রাচীন জাতক্রোধ এখনো আছে কি না জানে।"

জুলিও সায় দিয়েছিল। মার্কিন মায়ে-ঝিয়ে রোম বেড়াতে এসেছে। আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বাসে। ভ্যাটিকান সিটি'র বাসে। যে কোনো বাসে চড়েই ভ্যাটিকান সিটি বা পোপের শহরে নিখরচায় চলে যেত পারো তুমি। অন্তত, এই ক'টি দিন। বড়দিন থেকে শুরু করে ইংরিজি নতুন বছর পর্যন্ত। বিনিপয়সার বাসে উঠে বসেছি। কণ্ডাক্টরের বালাই নেই। লোক ভরে গেলে ড্রাইভার আপন আসনে বসেই বোতাম টিপে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে।

প্যাচ্‌প্যাচে বৃষ্টি আর হিম-মাখানো শীত। জবড়জং গরম সেই বর্ষাতি আমার গায়ে। মাথায় অন্য এক বন্ধুর ধুমসো টুপি। কসাকদের টুপির মতো বাসের ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে একটু ওম্ ভাব। তিনজনের আসনের এক কোণে আমি। পাশে জুলির মা, জুলি। জুলির মা গোলগাল নাদুস্নুদুস বৃদ্ধা। জুলি সদ্য কিশোরী। আমার সঙ্গে জুলির মা'ই প্রথম কথা বললেন। ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলেন,

—'ভ্যাটিকান যাবে তো?"

অল্প হেসে ঘাড় নাড়লুম।

ভ্যাটিকানের সেণ্ট পিটার গীর্জা এক এলাহী ব্যাপার। ভীমাকৃতি থামের পর থাম। চওড়া চওড়া সিঁড়ির পর সিঁড়ি। দশাসই পাথরের মূর্তি-প্রতিকৃতির ছড়াছড়ি। অনেকখানি জায়গা জুড়ে শান-বাঁধানো চত্বর। তারই চারপাশ ঘিরে প্রাচীন, অতি প্রাচীন সময় পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে। এই প্রশান্ত বিশালতার মধ্যে

বড়দিনের নানান রঙীন সাজপোশাক-পরা আধুনিক মানুষ-মানুষীদের কেমন পুতুল-পুতুল মনে হচ্ছিল। গীর্জার ডানপাশে মাথার নিচে ঘড়ি। ঘড়ির নিচে বিরাট ঘণ্টা দুলছে। প্রার্থনার সময় তখন। ঘণ্টার গম্ভীর শব্দ এই পুরাতন ভগবানের শহরে প্রতিধ্বনি তুলে ঘুরছে। গম্বুজ থেকে থেকে সিঁড়িতে, সিঁড়ি থেকে পাথরের মূর্তিদের গায়ে গায়ে। এই গম্‌গম্ শব্দ, এই প্রতিধ্বনি যেন আজকের পুতুলদের জন্যে নয়। এ যেন অনেক গভীরে গভীরে কথা। "ওঁ"-এর মতো কোনো শুদ্ধ শব্দের ধ্বনি প্রতিধ্বনি। জুলি, জুলির মায়ের সঙ্গে গীর্জায় ঢোকার আগে একটি থামের পাশে দাঁড়িয়েছিলুম। হঠাৎ খেয়াল হল, জুলির মা বেশ শক্ত করে হাত ধরে আছেন আমার। অন্য হাতে চেপে ধরেছেন জুলিকে। চোখে চোখ পড়তেই হাত সামান্য আল্‌গা করলেন, তবে একেবারে ছেড়ে দিলেন না। বললেন,

—"কেমন যেন ভয়-ভয় করে। তাই না ?"

মা'কে একটু নাড়া দিয়ে জুলি যেন কি বলল। আমরা চত্বরে নেমে পড়ে গীর্জার সিঁড়ির দিকে হাঁটতে লাগলুম।

ওরলি বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে ভ্যাটিকান সিটি, সেণ্ট পিটার মনে পড়ল কেন, বউ ? রঙ-চঙা পোশাকের লোকজনদের দেখে বোধহয়! ভারী পুরুষ কণ্ঠ মাইকে বলে যাচ্ছে ফ্লাইট্ নম্বর, গেট নম্বর, উড়োজাহাজের নামধাম। আবদ্ধ বিমানবন্দর গম্‌গম্ করছে। কীট-পতঙ্গদের মতো গুঞ্জনের শব্দ চারপাশে। এখানে সবাইকে ভীষণ মানুষ-মানুষ মনে হচ্ছে। ওরলিতে দাঁড়িয়ে সেণ্ট পিটারের সেই দৃশ্যটি, সেই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি মনে পড়তেই খেয়াল হল, অকারণেই আমি হাসছি।

কাউণ্টারের মাদামকে ফরাসী-ইংরিজি মিলিয়ে বললুম,

—"আমার এই স্যুটকেস দুটি যদি একটু দেখেন তো একটা টেলিফোন করে আসি। মালদুটিকে এক পলক দেখে নিয়ে আবার কাজে মন দিলেন মাদাম। মুখে বললেন,

—"দেরি করবেন না বেশী।"

শেষ আশা নিয়ে টেলিফোন বুথের কাছ গেলুম। বন্ধুর দেওয়া প্যাকেটটির ওপরে লেখা ছিল :

"জর্জ বোয়াগুনতিয়ে, জানী ও ফিলিপ—"

তারপর ঠিকানা এবং সাত সংখ্যার টেলিফোন নম্বর।

ভারী মজার আধো-আধো মিষ্টি উচ্চারণে ইংরিজিতে কথা বললেন জর্জ। বললেন,

—"কোনো চিন্তা করবেন না। সস্তা হোটেলের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। এক কাজ করুন, ওরলি থেকে এক্সপ্রেস বাস চলে আসে 'আঁভ্যালিদ'-এ। ওরই একটায় উঠে পড়ুন। বাস সেখানে এসে আর এগুবে না, সেখানেই নেমে পড়বেন। স্টপের গায়েই আঁভ্যালিদের টার্মিনাস বিল্ডিং। আমরা ভেতরে অপেক্ষা করব আপনার জন্যে।"

—"অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাকে চিনব কি করে?"

—"গোঁফ দেখে।"

জবাব শুনে হেসে ফেললুম। সুকুমার রায়ের ছড়া মনে পড়ল। ওপার থেকে উনি বললেন,

"না দেখেই হাসছেন! দেখলে তো আরো হাসতে হবে। স্টালিনের মতো গোঁফ। তার চেয়েও ঝোলা এবং বড়। মাথায় আমার কালো টুপি থাকবে। আচ্ছা ছাড়ছি—"

—"কিন্তু, বলি, আমায় চিনবেন কি করে?"

ওপারে হাসির শব্দ হল। বললেন,

—"খুব বেশী ইণ্ডিয়ান আঁভ্যালিদে ঘুরে বেড়ায় না। এমন কন্‌কনে শীতের সন্ধ্যায় তো নয়ই।"

প্যারিসের রাত শুরু হয়ে গেছে বাইরে। দু'পাশে দুটি স্যুটকেস রেখে নির্দিষ্ট বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার আগে জনা পনেরো সাহেব-মেমসাহেব লাইন দিয়েছে।

জুলি ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল,

—"ওপরে উঠবেন? চলুন যাই!"

এখানে, এই সেণ্ট পিটার গীর্জায় জোরে কথা বলা যায় না। বারণ নেই, তবু বলা যায় না। সবাই ঘুরে তাকাবে তোমার দিকে। ভুরু কুঁচকে, চোখ পাকিয়ে। মানুষ-মানুষি বা খেলনা পুতুলেরা, সাবেক কালের মূর্তিরা, সিংহাসনের শূন্যতা—সব্বাই তোমার দিকে বকুনি দেবার মতো তাকাবে। বেশী শব্দ করে হেসে ফেললে হয়তো গোটা সেণ্ট পিটার গীর্জা, সমস্ত ইতিহাস, বিশ্বাস এবং সৌন্দর্য নিয়ে ভেঙে পড়বে তোমার ওপর।

জুলির মা তেমনি মৃদু গলায় বললেন,

—"তোমরা দুজন যাও। ঘুরে দেখে এসো। আমি আর এত উঁচুতে উঠতে পারব না। খুব বুড়িয়ে গেছি। আমি বরং এইখানে নতজানু হয়ে ততক্ষণ উপাসনা করি।"

সিঁড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ্য করলুম, মেঝেতে দাগ দিয়ে দিয়ে পৃথিবীর নানান গীর্জার নাম খোদাই করা রয়েছে। অর্থাৎ সেন্ট পিটারের শেষ প্রান্ত থেকে এই অবধি অমুক গীর্জার আয়তন। আর একটু এগিয়ে আবার দাগ কাটা। পাশে লেখা অপর একটি বিখ্যাত গীর্জার নাম। এমনি করে, পৃথিবীর অন্তত সাত আটটি প্রাচীন গীর্জার থেকে সেন্ট পিটার কত বড় তা দেখানো হয়েছে। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলুম দুজনে। জুলিকে খুব উত্তেজিত পাখির মতো দেখাচ্ছে। ওর শরীর আমি আগেই দেখে নিয়েছিলুম অভ্যেস মতো। তাজা কচকচে কচি পাতার ওপর এক ফোঁটা জল টলটল করছে। তীর্থযাত্রীর মতো সার বেঁধে অনেক লোক উঠছে আমাদের আগে, পেছনে। শুধু উঠছে। নামার পথ ভিন্ন। মাটি থেকে একেবারে মাথার ওপরে ক্রশ পর্যন্ত উচ্চতা একশো সাড়ে বত্রিশ মিটার। অত্যন্ত, একশো মিটার তো ঠেলে উঠতেই হলো। শ' চার পাঁচেক সিঁড়ি। বয়েস হয়ে গেছে বুঝতে পারি বউ। নেশা-ভাং আর অত্যাচারে অত্যাচারে যৌবন কাহিল হয়ে পড়েছে। এইসব সময়, শালা, ছেলেবেলা মনে খেলা করে। বুকে ধরে হাঁফ, টান ধরে পায়ের শিরায় শিরায়। একশো সিঁড়িও ভাঙি নি, পিছিয়ে পড়েছি। জুলি আমাকে ছাড়িয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে আগে আগে। ঘুরে ঘুরে পাথর বাঁধানো চওড়া সিঁড়ি। বহু যুগ ধরে শিল্পীদের হাতে হাতে এর ভোল পাল্টেছে। নকশা বদলেছে। অনেক শিল্পীর স্পর্শ দেওয়ালে দেওয়ালে। অনেক সময়ের। "কুপোলা" তৈরীর ব্যাপারে চিত্রশিল্পী র‍্যাফেলকে ডাকা হয়েছিল। তিনি নানা কারণে-অকারণে প্রায় তিরিশটি বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। হাত দেন নি কাজে। তারপর এসেছেন মাইকেল অ্যাঞ্জেলো। ১৫৪৬ সালে। এখনকার সেন্ট পিটারের "কুপোলা" বা গম্বুজটি তাঁর প্ল্যান অনুযায়ী তৈরী হয়েছে।

মাঝামাঝি পথ ওঠবার পরে গম্বুজের ভেতরের ঘেরা বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিচে চোখ যেতেই টের পেলুম অনেক উঁচুতে উঠে এসেছি। ওপরে তাকালুম এবার। খুব ছোট ছোট চৌকো মার্বেল পাথর গায়ে গায়ে একের পর এক লাগিয়ে বিরাট আকারের ছবি সারা দেওয়াল জুড়ে। বড়জোর দেশলাইয়ের বাক্সের মতো মার্বেল পাথর। পাশাপাশি দু'টি টুকরোয় রঙের অথবা আলোছায়ার

প্রভেদ এতো সামান্য যে চট করে চোখেই পড়ে না। গোটা ছবিটি দেখলে মনে হয় তুলির টানে আঁকা। হাল্কা রং, গাঢ় রং, উজ্জ্বল আলো, গভীর ছায়া সুন্দরভাবে মিলে গেছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এইসব লক্ষ্য করছি, আস্তে আস্তে রেলিং ঘেরা বারান্দায় গম্বুজের গায়ে গায়ে ঘুরছি। অস্থির,

—"কই, ওপরে যাবেন না?"

—"আবার ওপর কিসের?"

জুলি অবাক,

—"ওমা! আরো ওপরে সিঁড়ি আছে। এক্কেবারে ছাত অবধি। চলুন, চলুন!"

উঠতে ইচ্ছে যে করছে না তা নয়, কিন্তু, আবার সেই হাঁপাতে হাঁপাতে জিব বেরিয়ে যাবে ভাবতেই দমে যাচ্ছিলুম। অথচ, জুলি কিশোরী। কচি পাতার ওপরে টল্‌টলে জলের মতো কিশোরী। না, না! বউ, এখানে আমাকে উল্টো বুঝো না! ওর শরীরটিকে আমি একেবারে বাদ দিতে বলছি না। কারণ, এক্কেবারে শরীর বাদ দিয়ে কিশোরী হয় না। কিশোরী, যুবতী কিংবা বয়েস হয়ে গেছে—এইসব স্তরভেদ যখন করা হয়, তখন মেয়েদের শরীর সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ার জন্যেই করা হয়ে থাকে, আমার ধারণা। কিন্তু, এখানে জুলির ব্যাপারে আমার কেমন যেন অন্য একটা আকর্ষণ। ঠিক 'ছুঁয়ে দেখা বা খাদ্য-সামগ্রী ভেবে নিয়ে খেতে ইচ্ছা করা' গোছের নয়—অন্য রকম। মানে, ধরো, একসঙ্গে উঠবো। ও কিছু কথা বলবে। হয়তো জোরে জোরে শ্বাস নেবে। আমি হাসব। আমার হাঁপানো লুকিয়ে জবাব দেব—এইসব আর কি? ছেলেমানুষি বলতে পারো। কোনো উদ্দেশ্যবিহীন ছেলেমানুষি।

আগের মতোই ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে জুলি হারিয়ে গেল। পাথরের পর এখন সরু লোহার সিঁড়ি। ঘুরছে, ঘুরছে। যখন ছাতে পৌঁছলুম, দমশূন্য বুক নিয়ে কোথাও বসতে পারলে বাঁচি। ঝড়ের মতো বাতাস বইছে। দম্‌কা নয়, একটানা। ধুলো নেই, বিশুদ্ধ রোমের প্রাচীন বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। ছাত, মানে, গম্বুজের একেবারে মাথার চারপাশে গোল বারান্দা। মনুমেণ্টের মতো। এখন, ওপরে খুব কাছাকাছি গীর্জার ক্রুশচিহ্ন। সিঁড়ি শেষ হবার মুখেই বেদী গোছের একটা পাথর। মনে হয়, আমার মতো দম্-ফুরোনো মানুষজনের জিরোবার জন্যেই রাখা হয়েছে ওটি। কিন্তু জুলি কোথায়!

সেই ধুমসো গরম বর্ষাতির ভেতর কুলকুল করে ঘামছে আমার গোটা শরীর।

গলার মাফলারটি আলগা করে দিলুম। এই হু-হু হাওয়ার লোভে বর্ষাতির বোতাম খুলতে যাব, জুলি কোত্থেকে উড়ে এল,

—"করছেন কি? নিউমোনিয়া লেগে যাবে। চলুন!"

একটু জিরোতে পারলুম না। একটা সিগারেট খেতে পারলুম না! উঠে দাঁড়িয়ে এক পলক রোম দেখলুম। বিশাল স্তম্ভগুলো দেশলাইয়ের কাঠির মতো দেখাচ্ছে। নতুন, পুরোনো, লালচে পোড়া পোড়া রঙের বাড়িঘর দেখতে দেখতে মনে হল আগুন জলছে। নিচে, চারপাশ ঘিরে দাউদাউ আগুন। অনেক দূর থেকে হাজার হাজার মানুষের আর্তনাদ ছাপিয়ে এক অজানা বাদ্যযন্ত্র টুংটাং শব্দে বাজছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার থেকে ঠিক একশো তিরিশ মিটার নিচে পেড্রোর শরীর পড়ে আছে। সেন্ট পিটারের মৃতদেহ।

জুলির মা আমাদের টেনে নিয়ে গেলেন পিটারের ব্রোঞ্জের মূর্তির কাছে। টান হয়ে বসে আছেন সিংহাসনে। ডান হাত বাড়িয়ে আছেন আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। কোঁকড়া চুল-দাড়ি আর মাথায় 'হেলো' নিয়ে সেন্ট পিটার ডান পা'টি এগিয়ে রেখেছেন বেদীর সামান্য বাইরে। ভক্তজনেরা হাত দিয়ে স্পর্শ করে. চুমু খেয়ে খেয়ে পা'টিকে একেবারে মসৃণ করে দিয়েছে। বাঁ পায়ের আঙুলে শির-উপশিরা স্পষ্ট। ডান পা'টি জীবন্ত মানুষের হাতে হাতে, ঠোঁটে ঠোঁটে ক্ষয়ে মোলায়েম হয়ে গেছে।

গীর্জা থেকে বেরোবার মুখে আমাকে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছে "পিয়েতা"র সামনে। মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর বিশ্ববিখ্যাত 'পিয়েতা'। ভগবানের মৃতদেহ মায়ের কোলে এমনভাবে এলিয়ে পড়ে আছে—দেখলে ভীষণ কষ্ট হয় বউ। ধবধবে সাদা মার্বেলে ষোড়শ শতাব্দীর কাজ আমাকে থম্‌কে দাঁড় করিয়ে রেখেছে বহুক্ষণ! ভগবান যিশু যুবক! তাঁর মায়ের অমন সুন্দর, যৌবনময়ী, করুণ মুখ ভাবতে পারা যায় না। বাঁ হাতের আঙুলগুলির এমন অসহায় বিষাদময় ভঙ্গি অনেক অনেক কথা বলে। মায়ের বস্ত্রের ভাঁজের দিকে তাকিয়ে মনেই হয় না মার্বেল পাথর দেখছি। অথচ, পরে, প্যারিসে বসে শুনেছিলুম, হাঙ্গেরিয়ান এক পাগল, লাজ্‌লো টথ হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে এই এমন মায়ের শরীর ভেঙে দিয়েছে। ফেটে গিয়েছে মেরী মায়ের মুখ, খসে পড়েছে ঘোমটা। পাগলটি এখন গারদে। কিন্তু, শিল্পজগতের এত বড় ক্ষতি পুনরুদ্ধার করা গেলেও অ্যাঞ্জেলোর হাতের স্পর্শ তাতে থাকবে না। 'পিয়েতার' প্রতিটি ইঞ্চির আলাদা আলাদা ফোটো তোলা আছে যদিও; যদিও, সেইসব ফোটো সংখ্যায় সোয়া

লক্ষ, তাহলেও মাইকেল্যাঞ্জেলোর 'পিয়েতা' ভেঙে গিয়েছে। পাগলটা নাকি বলেছিল,—"ভগবানের মা হয় না। তাই, আমি এই মেয়েটিকে ভেঙে দিলুম।"

প্রায় মিনিট দশেক বাদে আঁভ্যালিদের বাসে উঠলুম। বিমান বন্দর থেকে প্যারিসের অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছুটে চললুম শহরের কেন্দ্রের দিকে। জুলি এবং জুলির মা'র সঙ্গে রোমেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সেণ্ট পিটার গীর্জা থেকে বেরোবার পরেই। এখনো, এই মুহূর্তেও ওদের দু'জনের মুখ স্পষ্ট মনে আছে। আমি জানি, ক্যালিডোস্কোপের নল ঘুর্‌ঘুর্ ঘুরে যাবে। কাঁচের কুচিরা নকশা বদল করবে। ওদের আর স্মৃতির মধ্যে খুঁজে পাব না, যদি না আবার দেখা হয়। স্ট্যালিনের গোঁফ আস্তে আস্তে চোখের সামনে দুলছে। গোঁফ ভাবলেই ওঁর মুখের আকার-আকৃতি চারপাশ থেকে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। অন্য মুখ কল্পনা করা যায় না। আঁভ্যালিদে এতক্ষণে স্ট্যালিনের গোঁফ এবং স্ত্রী-পুত্র নিয়ে জর্জ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।
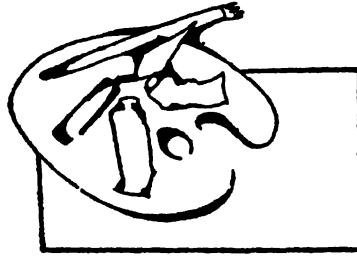
দেখেছো বউ, একটা কথা ভাবতে ভাবতে আমি অন্যটায় চলে যাচ্ছি। এই রকমই হয়। আগের কথা পরে, পরের কথা আগে মাথায় চলে আসে। তোমাকে সব কথা খুলে বলতে গিয়ে সময়ের খেই হারিয়ে ফেলছি বারবার। কি বলছিলাম? রোজমারীর কথা। ওর কথা বলতে বলতে রোম কোত্থেকে এসে জুটলো কে জানে! সেদিন তো খুব নেশা হয়ে গিয়েছিল। 'লা দোম' রেস্তোরাঁয় সেই সন্ধ্যে। রোজমারী ওর গেলাস সামনে রেখে বসে আছে। সেই রাজপুত্র ভিখিরী গান গেয়ে চলে গেল। কাচ পেরিয়ে বাইরের ঝাপসা বৃষ্টির মতো হালকা একটা পর্দা পড়ে গেছে আমার চোখে। সত্যি সত্যিই সেই পর্দার ওপাশে সব কিছু অর্থহীন অস্পষ্ট মনে হয়। মনোবিজ্ঞানীরা হয়তো বলবেন, 'এই তোমার আসল রূপ'। অ্যালকোহল পেটে গেলে নাকি মানুষের আসল রূপ ধরা পড়ে। আসল-নকল, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, ন্যায়-অন্যায়, সত্যি-মিথ্যে সবই আপেক্ষিক বোধ হয়।

এর যে কোনো দুটি শব্দের ভেতরকার হাইফেনটি আসলে সমাজ বসিয়ে দিয়েছে। সমাজের ভয়ে আমরা মেনে নিয়েছি। বন্ধনের প্রয়োজনে। কাজে কাজেই অ্যালকোহল পেটে না ঢেলে, রং-চং মেখে আমাদের ভণ্ডামি করতে হয়। নিজের সঙ্গে, সমাজের বাধ্যবাধকতার সঙ্গে, দিনের আলোয় ভদ্র জগৎ সংসারের সঙ্গে ভণ্ডামি। এক্ষুনি, এই মুহূর্তে আমি ভণ্ডামি করছি না তা আমি জানি এবং এখন আমার মনের কথা ঢুম করে বলে ফেললেই দুনিয়াসুদ্ধ সমাজের ভদ্রমহোদয়-গণ একবাক্যে মেনে নেবেন যে, না, 'এই চরিত্রহীন ব্যক্তিটি ভণ্ডামি করছে না'। কোনো বাক্-বিতণ্ডারও প্রশ্ন উঠবে না, কারণ, মোটামুটি প্রত্যেকেরই সুবিধে হবে। এরপর যখন তখন আমাকে 'দুষ্ট-চরিত্র' আখ্যা দিয়ে চুটিয়ে গালাগাল দিতে পারবেন। কারণ, সত্যি বলছি বউ, তোমার মুখ আমার একদম মনে নেই। তুমি কি বস্তু আমি এখন ঠিক গুছিয়ে বুঝতেই পারছি না। তুমি আমার স্ত্রী—ভালো কথা। আমার বউ—খুব ভালো কথা। তুমি সুখে থাকো, আমিও সুখে আছি। নোয়েল, তুমি আমার মোটামুটি পরিচিত। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বন্ধু। কিন্তু, নোয়েল রড্রিগস্, ভাই আমার, তোমার এই বান্ধবীটিকে আমার এখন বেশ লাগছে। এই 'বেশ লাগা' ব্যাপারটি নিয়ে আমি এখন কী করতে পারি বল! ওর হাসিমুখে সামান্য বয়সের রেখাগুলিও মোটেই বিরক্ত করছে না আমায়। ওর মিষ্টি গলা শুনতে পাচ্ছি। একই ভাবে তাকিয়ে আছি ওর দিকে। মাথার ভিতরে গুবরে পোকাটার গায়ে মদের ফোঁটা পড়ে পড়ে ও এখন নড়েচড়ে বসেছে। কলেজে থাকতে 'বিসর্জন' করেছিলুম আমরা। জয়সিংহ সেজেছিলুম আমি। সমীর চৌধুরী রঘুপতি। সমীর কিংবা রঘুপতির গলায় গুবরে পোকাটা কানের কাছে বিড়বিড় করছে, 'পাপ-পুণ্য কিছু নাই। কে বা ভ্রাতা, কে বা আত্মপর—'

—"আর ইউ ইন্ লাভ্ উইথ্ এনিবডি?" কথাটা যেন ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলেই মানায়। কারণ, 'আপনি কি কাউকে ভালোবাসেন' বা 'আপনার সঙ্গে কি কারুর ভালোবাসা আছে' কেমন যেন একটু শুকনো শোনায়।

—"উঁহু!"

—"কারুর সঙ্গেই ভাব-ভালোবাসা হয় নি কখনো?"

—"হুঁ।" মনে আছে, আমার চোখে চোখ রেখে হাসি হাসি মুখেই বলেছিলে তুমি।

বোম্বাইয়ের 'ঘোড়ার ক্ষুর' রেস্তোরাঁ। আমাদের আলাপের দ্বিতীয় দিন।

—"তার মানে আপনি তাহলে এখন বাগ্‌দত্তা বলুন ?"

—"উঁহু।"

—"তবে ?"

—"এখন আর যোগাযোগ নেই।"

—"সে কি ? কেন, কি হল ?"

—"বিয়ে হয়ে গেছে ভদ্রলোকের।"

—"তার মানে, এখন আপনি মোটামুটি 'মুক্ত মহিলা' বলা যায়, কি বলেন !"

মনে আছে বউ, আমরা দু'জনেই খুব হেসেছিলুম। হাসতে হাসতেই বলেছিলুম,

—"আমিও ধোয়া-তুলসী পাতা হয়ে বসে নেই বত্রিরিশটা বছর। তবে, এখন 'মুক্ত-পুরুষ'।"

পকেটে ছোট্ট 'রাম'-এর বোতল ছিল। ওল্ড্ মংক্ রাম। মদ্যপানের ব্যাপারটি লুকিয়ে-চুরিয়ে করতে হয় আমাদের। কোনো মেয়েকে আদর-টাদর করতে হলে আমরা যেমন আড়াল-আবডাল খুঁজি, তেমনি সমাজের পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে আমরা বন্ধু-বান্ধবরা মদ খেতুম। কলকাতার মতো খোলাখুলি যে কোনো 'বার'-এ ঢুকে দু-পাত্তর চড়াবার উপায় ছিল না। 'ঘোড়ার ক্ষুর' একটু উঁচু দরের শুকনো রেস্তোরাঁ। কোকাকোলার গেলাস নিচে নামিয়ে রাম্ মিশিয়ে নিচ্ছিলুম। চুমুক দিচ্ছিলুম পরম তৃপ্তিতে। দু'জনের চোখেই তখন একটু সংসার করার ইচ্ছে চিক্‌চিক্ করছিল। কথায় কথায় দু'জনেই আমরা পরস্পরের কাছে কথাও দিয়ে ফেললুম। ফিরতি পথে ট্যাক্সিতে তোমায় জিজ্ঞেস করলুম,

—"সেই ভদ্রলোকের নাম কি ?"

—"কোন্ ভদ্রলোক ?"

—"যার সঙ্গে তোমার প্রেম-ট্রেম ছিল !"

'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে কিংবা উঠে এসেছিলুম আমরা।

—"তীর্থ।"

—"বাহ্! বেশ নাম। তা তিনি এখন কোন্ তীর্থে আছেন ?"

—"মাদ্রাজ।"

—"কতদিনের ভালোবাসা ?" দন্ত্য 'স'টি ইচ্ছে করেই ইংরিজি 'এস্'-এর মতো করে উচ্চারণ করলুম। তুমি হেসে ফেললে,

—"বেশ কিছুদিনের।"

—"তবু?"

—"কলেজে ও আমার প্রফেসর ছিল। কলেজ ছেড়েছে বছর পাঁচেক।"

কি কারণে প্রেম ছুটে গেছে, তা আর জানতে ইচ্ছে করছিল না। কেমন একটা খচ্‌খচে ভাব মনের মধ্যে। এতদিনকার গভীর প্রেম ফেটে যাবার পিছনে গভীরতর কোনো রহস্য নিশ্চয়ই আছে। তুমিই আবার বললে,—"গত বছর দুয়েক কোনো যোগাযোগ নেই। ওর বিয়ের পর থেকেই আমরা একেবারে আলাদা হয়ে গেছি।"

বাইরে মেরিন ড্রাইভের ফুরফুরে হাওয়া। জানলার কাঁচ তুলে দিলুম। মনের মধ্যে খচখচে শব্দটা খোঁচাচ্ছে। কুইন্‌স্‌ নেক্‌লেসের এক একটি আলো ছিটকে ছিটকে পিছনে সরে যাচ্ছে। দূর সমুদ্রের অন্ধকারে অজানা কতগুলি লাল নীল বাতি। আমার ফেলে-আসা এক-একটি প্রেম চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে—সরে যাচ্ছে ছায়াছবির মতো। অল্পক্ষণ এক একটি মুখ। অনুরূপা, সুভদ্রা, ঊর্ণা। সুভদ্রা-ঊর্ণা-অনুরূপা। পার্বতী, শিখা, সর্বাণী। সর্বাণী-শিখা-পার্বতী। ঊর্ণার সঙ্গে সেই মদির দুপুর। শেষে প্রেম-প্রেম খেলা। মেট্রো সিনেমা থেকে ওকে তুলে শেষবারের মতো নিয়ে গিয়েছিলাম চক্রবর্তীর হোটেলে। হোটেলের আসল নামটা মনে নেই। ম্যানেজারের নাম চক্কোত্তি। আমরা বন্ধুরা, যারা একটু ফুর্তি-টুর্তি করি তাদের কাছে ওটা ছিল চক্কোত্তির হোটেল। কিছু মদ, একটি স্বাস্থ্যবতী প্রেমিকা এবং হোটেলের গদিওয়ালা বিছানা। এই সব চক্কোত্তিদের হোটেলে বড় একটা থাকার জন্যে কেউ যায় না। এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা বড় জোর। প্রেমিকার যতক্ষণ বাইরে থাকার অনুমতি, ততক্ষণ সময়। পৃথিবীর সব শহরের মতোই বম্বেতেও চক্কোত্তির হোটেল প্রচুর। মনের মধ্যে খচ্‌খচে শব্দটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। দুম্‌ করে তোমার দিকে ঘুরে বলে বসলুম,

—"তা, ওর সঙ্গে চুমু-টুমু শোয়া-বসা হয়েছে নিশ্চয়ই!"

তুমি আমার দিকে তাকিয়েই ছিলে। অন্য কিছু ভাবছিলে বোধ হয়। চমকে উঠলে একটু। তারপর আমার চোখে চোখ রেখেই মাথা নেড়ে জানালে —হ্যাঁ। ইচ্ছে করলেই মিথ্যে বলতে পারতে। বললে না বলে কয়েকটা পয়েন্ট এগিয়ে রইলে।

বউ, তোমাকে দেখলেই আদর-টাদর করে শুতে ইচ্ছে করবে এমন আঁটোসাঁটো

যৌবনবতী শরীর তোমার নয়। রাগ কোরো না। যে সব মেয়েদের, তুমি তো আর মেয়ে নও, মহিলাই বলা যায়, তবু গৌরবে বহুবচনের মতো মেয়েই বলছি, হ্যাঁ, যে সব মেয়েদের দিকে তাকালে যৌবনোচ্ছল পুরুষদের ভেতরে ঝিমতাক ভাব খেলে না অথবা মাথার মধ্যে সনাতন গুবরে পোকাটা নাচে না, তুমি হচ্ছো সেইসব মেয়েদের মতন। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, গোলগাল মা'-মা' ভাবের মেয়ে।

এতক্ষণে বুঝলাম খচ্‌খচে শব্দটা কিসের। বন্ধুরা আমায় বলত 'কলির কেষ্ট'। যতই যাই বল, চেহারাটা তো নেহাত অখাদ্য নয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই নিজের প্রশংসা করেছি বহুবার। মেয়েরাও করে থাকেন। আড়ালে-আবডালে অথবা একেবারে মুখোমুখি—যখন প্রেমের শরীর খুব ঘন হয়ে আসে, যখন চুমু-টুমু ছাড়িয়ে ঘটনা এগোতে থাকে। সেই সব দুষ্টুমির সময় আমি কান ভরে শুনে নিই—"তোমার চোখের দিকে বেশীক্ষণ তাকানো যায় না", অথবা "তোমার ঠোঁটদুটি কি গ্রীস থেকে বানিয়ে এনেছো," "শিল্পী, তুমি তোমার নিজের ছবি কবে আঁকবে"—এইসব। এ হেন কলির কেষ্ট যাকে বিয়ে করবে ঠিক করে ফেলেছে, তার শরীর নিয়ে ইতিমধ্যেই ছানাছানি হয়ে গেছে, অথচ, আমিই জানি না শরীরটি কেমন,—ভাবতেই খচ্‌খচ্‌ করছে ভেতরে।

এত সব কথা সেদিন কিছুই বলি নি তোমাকে। সব কথা তো সব সময় বলাও যায় না, মুখ দিয়ে বেরোবেই না। শুধু বলেছিলুম,—"আমি এখন যেখানে নিয়ে যাব, আমার সঙ্গে যাবে?"

মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে গেলে, আমি জানি, তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারাটাই সবচেয়ে বড় কথা। আমি তা, কোন্‌ উপায়ে কে জানে পারতুম। সামান্য ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেলে একটি মেয়ের বিশ্বাস অর্জন করার ক্ষমতা বোধ হয় আমার চোখেমুখে ফুটে ওঠে। তুমিও করেছিলে যথারীতি। যেমন, কারো বিশ্বাসেই কোনোদিন আমি আঘাত দিই নি, তোমার বিশ্বাসেরও মর্যাদা তুমি পেয়েছো। কথা দিয়ে কথার খেলাপ আমি করি নি। সেই রাত্রির পর আমাদের বিয়ে হয়েছে। এই মুহূর্তে তুমি আমার সন্তান বহন করে আমার স্মৃতি গর্ভে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো। এখন তো ভারতবর্ষে সকাল। এখানে আমি প্যারিসের এক নারীর সামনে বসে সন্ধ্যে কাটাচ্ছি। ঠিক প্যারিসের নয়, প্যারিসের বাসিন্দা। আসলে রোজমারী তো বৃটিশ।

রেস্তোরাঁর মধ্যে কফি হাউসের মতো গুঞ্জন। কথা, হাসি, টিপ্পনী, আড্ডা।

তারই মধ্যে মেয়েপুরুষেরা দুমদাম একে অপরকে চুমু খাচ্ছে, আদর করছে আমাদের দেশে চুমু-টুমু খাবার দৃশ্য দেখলে আমরা উৎসুক হয়ে উঠি—নায়ক-নায়িকারা লজ্জা পেয়ে যায়। কলকাতার লেকে সন্ধ্যেবেলায় ঘুরে ঘুরে আমরা খোঁজ নিতুম আড়ালে-আবডালে কপোত-কপোতীরা কদ্দুর কি করছে। চান্স পেলে টিট্‌কিরি বা ধমকধামক দিতুম। লজ্জায় বা আতঙ্কে ওরা উঠে সরে যেত। অথবা জড়সড় হয়ে বসে থাকত। এখানে ঠিক উল্টো। ট্রেনে, বাসে, রাস্তাঘাট, রেস্তোরাঁয় এত চুমুর ছড়াছড়ি যে কেউ ভ্রূক্ষেপই করে না। আমিই উল্টে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে যাই। আসলে আমার মনে হয়, শীত-বৃষ্টির দেশে শরীর গরম রাখবার জন্যেই বোধ হয় মদ এবং চুমু যুগপৎ চলে। রোজমারীকে জিজ্ঞেস করব নাকি? কিন্তু, ও যেভাবে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, সোজাসুজি দুম্ করে এ ধরনের কথা জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে না। আমার খেয়াল হল, ও আমার দিকে তাকিয়েই আছে। আমিও চেয়ে রইলাম। গুবরে পোকাটি হেঁটে চলে বেড়াতে লাগল মাথার মধ্যে। মদের মাত্রাও কম হয় নি। ওর মুখে আস্তে আস্তে হাসি ফুটছে। সেই গালের ভাঁজটিও। খুব দূর থেকে যেন ও বলল,

—"কি ভাবছ অতো?"

আমি নাক দিয়ে শব্দ করলুম,

—"উঁ"

—"বাড়ির কথা মনে পড়ছে? দেশের কথা?"

বলতে ইচ্ছে করল, 'না গো, তোমার কথাই ভাবছি। তোমাকে নিয়ে কি করব তাই ভাবছি, কি করে এগোবো সেইটেই গুবরে পোকাটার সঙ্গে আলোচনা করে দেখছি মনে মনে'। বললুম,—"না, তেমন কিছু না।"

—"আর এক পাত্র চলবে নাকি?"

—"অমৃতে অরুচি আমার নেই রোজমারী," হাসিহাসি মুখ করে বললুম।

যে হোটেলে এসে উঠেছি তার নাম "হোটেল দ্যুজে কোল"। এ "কোল" শব্দের অর্থ ইস্কুল। সন্ধি-টন্ধি হয়ে গিয়ে অমন দাঁড়িয়েছে নামটি। এলাকা 'মোঁপানাস্'। এই লা দোম রেস্তোরাঁর পেছনের রাস্তায়। তিনতলায় একখানি নিরিবিলি ঘর। দুটো বিছানা। হোটেলটি আমি ইচ্ছে করলেই চক্কোত্তির হোটেল মনে করতে পারি। শেষ পাত্রে শেষ চুমুক দিয়ে উঠতে উঠতে বললুম,

—"চল, বেরোনো যাক।"

—"কোথায় যাবে ?"

—"তোমার যেখানে ইচ্ছে।"

রোজমারীর পেছনে দাঁড়িয়ে ওকে ওর কোট পরতে সাহায্য করলুম। কোটের হাতায় হাত ঢুকিয়ে ও বললে,

—"আমি তো বাড়ি যাবো।"

নিজেকে যথেষ্ট সামলে রেখে বললুম,

—"দূর-দূর! এত সকাল-সকাল বাড়ি কিসের!"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও বললে,

—"সকাল কোথায়? রাত পৌনে দশটা বাজে। ও বাবা!"

দু'পাশের চেয়ার টেবিলের মধ্যে সরু পথ ধরে ওর পেছন পেছন হেঁটে কাচের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালুম। দু'জনেই টুপি চড়িয়ে নিলুম মাথায়। আমার ধুমসো কোটটি গায়ে নিয়ে নিয়েছি। বললুম—"প্যারিসে আবার পৌনে দশটা কোনো রাত নাকি? দেশে থাকতে শুনেছি এখানে সারা রাত্তিরই নাকি দিন!"

—"ওসব হল যারা ফুর্তি-টুর্তি করে, সারা রাত জেগে মদ খেয়ে হুল্লোড় করে তাদের জন্যে।"

আমি রাস্তা পেয়ে গেলুম। বললুম,

—"তুমি ফুর্তি-টুর্তি করো না?"

সামান্য হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল,

—"কার সঙ্গে করব? এখানে সবকিছু, সবাই বড় ফাঁপা।" শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বর কেমন দূরে চলে গেল। নিঃসঙ্গ, উদাসীন স্বর। উদ্দাম প্যারিসের মদির সন্ধ্যায় একেবারেই খাপ খায় না।

আমি, তবু, রেস্তোরাঁর ভেতরে দরজার সামনে দাঁড়িয়েই আমার মনের মতন রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলুম। মস্করা করার ধরনে বললুম,

—"আমি তো রয়েছি সুন্দরী!"

ও হাসতে লাগল।
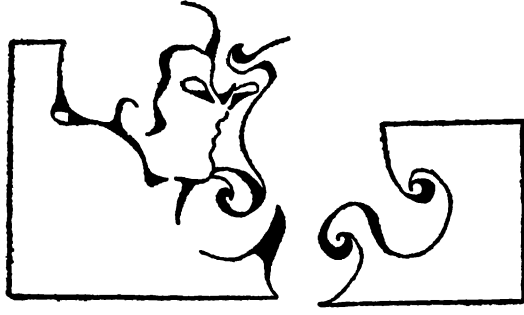
সন্ধ্যে উতরে গেছে অনেকক্ষণ। জানুয়ারীর গোড়ার শীত। আমার হাতে দস্তানা নেই। আঙুলগুলো সিঁটিয়ে যাচ্ছে। গালে, কপালে মনে হচ্ছে বরফ চেপে ধরেছে কেউ। আঁভ্যালিদের বাসে উঠে পড়েছি। ভিতরে নরম উষ্ণতা। ড্রাইভারের পাশে স্যুটকেস দুটি রেখে পেছনে চলে এলুম। দেখি, অনেকেই সিগারেট ধরালো। উড়োজাহাজে এক কার্টন বিলিতী সিগারেট কিনেছি। একটা ধরিয়ে ফেললুম। সত্যিই, বাইরের শীত ভেতরে বসে বোঝাই যাচ্ছে না। বাসগুলো সব 'সেন্ট্রালি হিটেড'। ধুমসো কোট গায়ে এখন একটু যেন গরমই লাগছে।

আমার চারপাশে এখন প্যারিস। এরা বলে 'পারী'। 'র' অক্ষরটিকে 'খ' আর 'র'য়ের মাঝামাঝি উচ্চারণ করে এরা। প্যারিসের কোনো শব্দও বিশেষ ভেতরে ঢুকছে না। শুধু ঝাপসা আলোর বিন্দুরা রাস্তায় ছুটছে। উল্টো দিকের অন্ধকার থেকে এদিকে ছুটে আসছে। বাসের বাঁ পাশ দিয়ে লাল বিন্দুরা দৌড়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

সত্যি সত্যিই স্ট্যালিনের গোঁফ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জর্জ। মাথায় কালো নেপালী টুপি। ছোট্ট কুতকুতে খয়েরী চোখ। লম্বায় ছ' ফুটের এক ইঞ্চিও কম নয়। বয়েস চল্লিশ-টল্লিশ। একটু ঝুঁকে হাঁটে। সঙ্গে ওর বউ ও ছেলে। জানী আর ফিলিপ। জানীকে দেখতে বেশ সুন্দরী বলা চলে। প্রায় জর্জের সমান বয়েস। ছিপছিপে লম্বা। টকটকে রঙ। হাসি হাসি মুখটি। ফিলিপের চেহারাও লম্বাটে। দশ বারো বছরের ফিলিপ। মেয়েলী ধরনের মুখ। অ্যাঁভালিদের টার্মিনাসে ঢুকতেই তিনজনে এগিয়ে এলো। গোঁফের ফাঁকে হেসে হাত মেলালো জর্জ। দারুণ দুষ্টু ছেলের মতো হাসি। বলল,—'শিল্পী।'

হেসে বললুম,

—"হ্যাঁ। জর্জ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। এমন গোঁফ কোথায় আর পাবে? এর মালিক গত হয়েছেন বহুকাল আগে।"

জানী একগাল হেসে বলল,

—"খুব কষ্ট হয় নি তো আঁভ্যালিদ খুঁজতে?"

—"একেবারে নয়। বাসে চেপে বসলুম। সোজা একেবারে এইখানে।"

জর্জ বললে,

—"চল, একটু গরম কিছু খাওয়া যাক আগে। আজ বেশ শীত পড়েছে।"

আঁভ্যালিদের ভেতরে কোণের দিকে টেবিল-চেয়ার পাতা রেস্তোরাঁ। কফি খেতে খেতে জর্জ জিজ্ঞেস করল,

—"নবীন কেমন আছে?"

—"ভালো। উনি তোমাদের জন্যে কিছু জিনিস আমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। স্যুটকেসের মধ্যে আছে। বের করে দিই?"

বলে উঠতে যাচ্ছিলুম, জানী হেসে বললে,

—"অত তাড়ার কি আছে? পরের প্লেনেই তো আবার ভারতবর্ষে ফিরে যাচ্ছো না।"

তিনজনেই হেসে ফেললুম। ফিলিপ মনে হল ইংরিজি ভালো বোঝে না। চুপচাপ কফিতে চুমুক দিচ্ছে। জর্জ জিজ্ঞেস করল,

—"ক'দিন থাকবে প্যারিসে কিছু ঠিক করে এসেছো?"

—"না। তবে মাস ছয়েক তো বটেই। প্রদর্শনী না করে যাব না।"

জানী আর জর্জ দু'জনেই একটু অবাক চোখে পরস্পরকে দেখল। জর্জ বলল,

—"ভালো। ভালো কথা। তুমি খুব আশাবাদী শিল্পী দেখছি।"

জানী বলল,

—"আহা! ওকে একটু সুস্থ হয়ে বসতে দাও আগে। এতখানি লম্বা আকাশ ডিঙিয়ে এসেছে, কয়েক দিন জিরোতে দাও! ও-সব কথা পরে আলোচনা করা যাবে।"

বিষয়টা ঠিক বুঝলুম না। জিজ্ঞেস করলুম,

—"তোমাদের কথার ভেতরে কোনো ব্যাপার আছে। ঠিক ধরতে পারছি না। কি বলো দেখি?"

জর্জ মিটিমিটি হেসে মাথা দোলাল। বলল,

—"ধীরে, শিল্পী, ধীরে। সব টের পেয়ে যাবে আপনা-আপনি।"

বলেই উঠে দাঁড়াল। কাউন্টারে বিল মিটিয়ে আমার দশাসই স্যুটকেসটি হাতে তুলে নিল। বলল,

—"চলো। আগে তোমাকে একটা সস্তা হোটেলে তোলার বন্দোবস্ত করি।"

আবার হু-হু হাওয়া আর শীতের মধ্যে বেরিয়ে পড়লুম চারজনে। ফুটপাথ ধরে বেশ খানিকটা হেটে গাড়ি পার্কিং-এর জায়গায় এসে দাঁড়ালুম। জর্জের 'ভক্স-ওয়াগন'টি একেবারে টকটকে লাল। রাতের আলোয় গাড়ির গায়ে পাতলা ধুলোর আস্তরণ চিকচিক করছে। পেছনের দিকে মালপত্র রাখবার অনেকখানি জায়গা। আমার স্যুটকেস দুটো রাখতে রাখতে জর্জ বললে,

—"অনেক দিন ঝাড়পোছ হয় নি। ধুলো জমে গেছে। আমার স্কাল্পচার এইখেনে বসে বসেই নানান জায়গায় ছোটাছুটি করে। কখনো বিক্রি হয়। কখনো ধরের ছেলে ধরে ফিরে আসে। পড়ে থাকে কিছুদিন। আবার নিয়ে বেরোই খদ্দের খুঁজতে।"

নবীন প্যাটেল বলেছিল স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই শিল্পী। জানীকে জিজ্ঞেস করলুম,

—"তুমিও তো শিল্পী। কি করো তুমি? কত্তার সঙ্গে সঙ্গে স্কাল্পচার না পেইন্টিং?

হাসতে হাসতে বলল জানী,

—"না বাবা! জর্জের মতো ছেনি হাতুড়ি নিয়ে ঠোকাঠুকি করার শক্তি আমার নেই। ও প্রচণ্ড খাটতে পারে। আমি ক্যানভাসে তুলি বুলিয়েই ক্লান্ত।"

ওরা দু'জনে সামনে বসেছে। আমি আর ফিলিপ পেছনে। ফিলিপকে ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলুম,

—"তুমিও কি ছবি আঁকতে শুরু করেছো?"

ও আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। সামনে থেকে জবাব দিল ওর মা,

—"ইংরিজি এখনো ও ভালো করে বুঝতে পারে না। দেখছ না, আমরাই কেমন আধো-আধো ইংরিজি বলছি।"

বললুম,

—"কেন, তোমাদের ইংরিজি তো বেশ ভালোই!"

জানী হাসতে লাগল। জর্জ ওর সঙ্গে গলা মিশিয়ে কাশির শব্দ করল ইয়াকির ধরনে। আমি বললুম,

—"না, না। ঠাট্টা করছি না! আমার ইংরিজিও তো এমন কিছু আহামরি নয়।"

জর্জ গাড়ি চালাতে চালাতে বলল,

—"আরে দূর্দুর, যেতে দাও ইণ্ডিয়ান! ও ভাষায় কাজ তো চালিয়ে নিচ্ছি, এই যথেষ্ট! ওটা না আমার ভাষা, না তোমার।"

ফিলিপ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। জানী ওকে দেখিয়ে বলল,

—"ও ক্লাস সেভেনে পড়ে। ওকে আমরা ইঞ্জিনীয়ার বা ডাক্তার বানাব ঠিক করেছি। ছবি-আঁকিয়েদের দুর্দশার দিন ঝড়ের মতো ছুটে আসছে!"

তিন চারটে সস্তা হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল জর্জ। লম্বা লম্বা পা ফেলে গিয়ে খবর নিয়ে এল। বলল,

—"নো চান্স। খালি নেই।"

বলেই আবার স্টার্ট দিচ্ছে গাড়িতে। একটু ঠাট্টার গলায় জানতে চাইলাম,

—"এখানে সবচেয়ে সস্তা হোটেলের কি রকম দর? হাংরী ইণ্ডিয়ান পেইন্টারকে জিইয়ে রাখার মতো সস্তা?"

—কুড়ি-বাইশ ফ্রাঁর মধ্যেই পাওয়া যাবে।"

—"কুড়ি ফ্রাঁতে একদিন?"

—"তবে না তো কি এক হপ্তা!" বলেই হাসতে লাগল জর্জ।

শুনলে তো বউ, কুড়ি ফ্রাঁ! তার মানে প্রায় তিরিশটি টাকা। বললুম,

—"কলকাতায় কুড়ি ফ্রাঁতে তো প্রায় রাজার হালে থাকা যায়!"

বেশ অবাক গলাতেই জিজ্ঞেস করল জর্জ,

—"রাজার হালে মানে? আলাদা ঘর, খাট-বিছানা, ব্রেকফাস্ট—সব দেবে।"

কথার ধরনে আমার হাসি পেয়ে গেল। বললুম,

—"খাট-বিছানা ব্রেকফাস্ট তো কিছুই না। চাও তো দুবেলা তোমায় জামাই আদরে ভরপেট লাঞ্চ-ডিনার খাইয়ে দেবে ওই পয়সায়, এমন সস্তা হোটেলও অজস্র আছে আমাদের দেশে।"

ট্রাফিক আলোতে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। জর্জ জানীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল,

"চল গো! আমরা ওখানে গিয়েই সেটল্ করি।"

জানী হাসতে লাগল। বলল,

—"ইয়ার্কি নয় জর্জ! অমন ঐতিহাসিক, অত সস্তা দেশে কিছুদিন না কাটিয়ে মরে যাওয়া চলবে না।"

আর একটা হোটেল। জায়গা নেই। কোনো রাস্তার নাম জানি না।

হোটেলের কোনো রং-চঙা সাইন বোর্ডও নেই বাইরে। সুতরাং ওদের নামও জানা গেল না। বললুম,

—"আচ্ছা জর্জ, এখানে ধর্মশালা জাতীয় কিছু নেই?"

—"সে আবার কি?"

—"ফ্রী রুমস ফর ট্যুরিস্টস।" ধর্মশালার ব্যাখ্যা করে দিলুম।

—"আছে।" বলেই জানীর দিকে তাকাল। দু'জনেই হোহো করে হেসে উঠল। জর্জ বললে,

—"যাবে সেখানে?"

জানী তাড়াতাড়ি বলল,

—"দূর, কি যে বল না তুমি—"

তারপর পিছনে তাকিয়ে আমাকে বলল,

—"বেচারা!"

ওরা দু'জনেই আমার থেকে বয়সে বড়। কি রসিকতা হল ঠিক বুঝলুম না। চুপ করে আছি। জর্জ বললে,

—"এখানে 'স্যালভেশন আর্মি ক্যাম্প' আছে। বিরাট হলঘর। একেবারে ফোকোটে থাকার জায়গা। তবে—"

একটু উৎসাহের গলায় জিজ্ঞেস করলুম,

—"তবে কি?"

—"তবে ওখানে হোমো আর চোর আছে কিছু।"

—"তার মানে?"

—"একটাই হলঘর তো? যে যার বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছে সারি সারি। মাঝ রাত্তিরে অন্ধকারে হঠাৎ টের পেলে, তুমি আর একলাটি নও। কোনো দশাসই জোয়ান হিপি তোমার পিঠের সঙ্গে লেপটে শুয়ে আছে। সকালে উঠে তুমি তোমার থলে বা স্যুটকেসটি নাও পেতে পার।'

—"যদি চেঁচামেচি করি?"

—"খুব ভালো কথা। সব্বাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনবে। মুখ টিপে হাসতেও পারে—"

জানী বাইরের দিকেই তাকিয়েছিল। বলল,

—"চুপ কর তো! ইয়ার্কি করতে হবে না। অসভ্য কোথাকার!"

জর্জ যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, বলল,

—"আমি আবার কি করলুম। ওখানে কি হতে পারে তাই জানিয়ে দিলুম শিল্পীকে।"

বললুম,

—"যদি পুলিসে কমপ্লেন করি?"

আরো গম্ভীর গলায় মাথা দুলিয়ে জর্জ বললে,

—"খুব ভালো কথা। পুলিস শুনবে। খুব যত্ন করে ডায়েরী করে নেবে।"

—"তারপর?"

গাড়িতে ব্রেক কষে আমার দিকে ঘুরে তাকাল। কপট ধমকের গলায় বলল,

—"তারপর আবার কি হে ছোক্‌রা? ডায়েরী করে নেবার পর আর কি বাকি থাকে, অ্যাঁ।"

জানী হাসতে হাসতে ভেতরে মুখ ঘুরিয়ে আমায় বলল,

—"না, না, ও-সব জায়গায় তোমাকে যেতে হবে না!"

হোটেল দ্যজে কোল। বাইরে নিয়ন আলোয় জলজ্বলে নাম। ছাব্বিশ ফ্রাঁ। লিফটে চেপে তিন তলায় উঠে মালপত্র রাখলুম। জর্জ বলল,

—"সুন্দর ঘর। কি বল?

বললুম,

—"একটু কম সুন্দর হলেই সুবিধে হত। কয়েকটা ফ্রাঁ কমে যেত!"

—"হবে হে, হবে। আজকের রাতটা তো এখানে বিশ্রাম কর। কাল এর থেকে সস্তা একটা বন্দোবস্ত করতে হবে।"

আমাকে শুভরাত্রি জানিয়ে ওরা চলে গেল। কাল সস্তা হোটেলের খবর নিয়ে আসবে।

গরম জল দিয়ে চান করলে ভালো লাগত। তিনতলার বারান্দায় কমন বাথরুম। টেনে-টুনে খোলে না। ধাক্কা দিয়ে লাভ হল না। ভেতরে কেউ আছে। উড়োজাহাজে কেনা সস্তা স্কচের বোতলটি খুলে বসলুম। খাটে বসে বাথরুমের দরজা দেখা যায়। এক পেগ দু' পেগ। প্রায় কুড়ি পঁচিশ মিনিট পার। দরজাটি তেমনি বন্ধ। এতক্ষণ ধরে করে কি রে বাবা! আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমের দরজায় গিয়ে কান পাতলুম কোনো শব্দ নেই। সিঁড়ি বেয়ে কে উঠে আসছে। তাড়াতাড়ি সরে এসে গম্ভীর মুখে সিগারেট টানতে লাগলুম। লাল টকটকে বাঘের মতো মুখ ভদ্রলোকের। কুতকুতে চোখও রক্তাভ। আধো-অন্ধকারে দেখলে বুকটা ধড়াস করে উঠত। ভাগ্যিস লম্বা করিডোরে

ঝকঝকে আলো। আমার পাশ দিয়ে দুলে দুলে হেঁটে করিডোরের শেষ প্রান্তে চলে গেল লোকটি। দরজা খুলে ঘরে ঢুকে গেল। আবার সব চুপচাপ থমথমে। আর একবার বাথরুমের দরজায় কান পাতব কিনা ভাবছি, হঠাৎ ছাঁৎ করে উঠল বুকটা। বিদেশ বিভুঁই। এদের ভাষা অর্ধেক বুঝি কি-না-বুঝি। হোটেলটি বেশ খালি খালি মনে হচ্ছে। রাত এখন প্রায় ন'টা সাড়ে ন'টা। হিচককের কোন্ ছবিতে যেন বাথরুমে হত্যাকাণ্ড দেখেছিলুম ? বউ, কোনো কালেই আমি দুঃসাহসী যুবক নই, তুমি জানো। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে খানিকটা স্কচ গলায় ঢেলে দিলুম। কি করা যায় ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। রোমের "হোটেল ছেস্ত্রো" মনে পড়ল। নতুন বছরের আগের দিন সন্ধ্যে। সিসটিন চ্যাপেল দেখে ফিরে আসছি হোটেলে। মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর নেশায় বুঁদ। কাউণ্টারে সুদর্শন রিসেপসনিস্ট। চারদিন ধরে আছি এখানে। মোটামুটি সস্তা। তবে, প্রথমে জিনিসপত্র, বাস ভাড়া বা চায়ের দাম দিতে গিয়ে ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে কথাবার্তা। কয়েক শো লিরা দিয়ে হয়তো এক কাপ চা খেলে তুমি! হাজারখানেক লিরার কমে হয়তো তোমার দুপুরের খাবারই হল না! এমনি সব ব্যাপার! আসলে আমাদের নয়া পয়সার থেকেও লিরার দাম অনেক কম।

রিসেপসনিস্ট আমায় দেখে মৃদু হেসে মাথা দোলাল। বললে,

—"দেখলেন সিসটিন চ্যাপেল ?"

—"হ্যাঁ, অসাধারণ! দেখে দেখেও শখ মেটে না। কাল হয়তো আবার যাব।"

বলতে বলতে মনে পড়ল, আজ তো 'নিউ ইয়ারস্ ঈভ্'। গোটা ইউরোপে আজ সারারাত ধরে হই-চই! বললুম,

—"বছরের শেষ রাত। একটু হই-চই করতে ইচ্ছে করছে। ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।" একবার ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি রকম হই-চই ?"

—"আপনাদের হোটেলে তো কিছুই নেই দেখছি।"

—"না! তা নেই। তবে, বলেন তো অন্য হোটেলে টেবিল বুক করে দিচ্ছি। কি রকম হোটেল চান বলুন ?"

—"মোটামুটি সস্তায় একটু সুন্দরী-টুন্দরীদের সঙ্গে নাচানাচির ব্যবস্থা হয় কি ?"

—"কেন হবে না। অবশ্যই হবে।" একটু থেমে পকেট থেকে সিগারেট বের করে আমায় দিল, নিজেও একটি ধরিয়ে আবার বলল,

—"একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না আশা করি।"

আমি সিগারেটে টান দিয়ে বললুম,

—"কি বলুন?"

কাউণ্টারে হাতের ভর রেখে সামান্য ঝুঁকে মুখটি এগিয়ে আনল। বলল,

—"ট্যুরিস্টদের ব্যাপারে এ শহরের খুব একটা সুনাম নেই, তা নিশ্চয়ই জানেন!"

জেরীই আমাকে একদিন বলেছিল, মনে আছে, 'সাধারণ রোমানদের মধ্যে আজকাল বেশ কিছু ছিঁচকে চোর বা ঠগ্‌ আছে। রোমে খুব সতর্ক হয়ে চলাফেরা কোরো।' অল্প হেসে মাথা নাড়লুম। বললুম,

—"হ্যাঁ, তা একটু শুনেছি বইকি?"

মাথা দুলিয়ে লোকটি বলল.

—"আর বলবেন না! সব দেশেই কিছু বাজে লোক থাকে, যারা সুযোগ পেলেই পরদেশীদের ঠকায়। বদনাম হয় খালি আমাদের। হয়তো সংখ্যায় এখানে সামান্য বেশী চোর আছে। তার জন্যে গোটা শহরের কেন দুর্নাম রটবে সারা দুনিয়ায়, আপনিই বলুন?"

কি আর বলব। চুপ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। ও আবার শুরু করল,

—"যাক্ গে, যা বলছিলুম। আজকের রাতটা একটা বিশেষ হুল্লোড়ের রাত। একটু আধটু হাঙ্গামাও হবে। আপনি বিদেশী মানুষ, আমাদের দুর্নাম হবার আরো একটু বেশী সুযোগ না হয় না-ই দিলেন। মানে, বলছিলুম যে, বেশী হুল্লোড়, মেয়েছেলে, দালাল—এ সব যেখানে পাবেন, চুরিচামারি, ছিনতাই হবার সম্ভাবনা সেখানেই আজ বেশি। যদি আমার কথা অপছন্দ না হয় তো একটি মোটামুটি ঠাণ্ডা হোটেলে আপনার ব্যবস্থা করে দিই। শান্ত পরিবেশ। ভদ্র, বিশিষ্ট লোকেরাই আসেন। নাচটাচ হয়। আর, বেশ সস্তাও বটে।"

যদিও একটু উদ্দাম হই-চই করার ইচ্ছেটা ভেতরে আনচান করছিল, তবু, ঠিক ভরসা পেলুম না, বউ। দিশী লোকেই যখন সন্ত্রস্ত, তখন কয়েক হাজার মাইল দূরের আমি আর সাহসটা পাই কোথা থেকে বল? বললুম,

—"ঠিক আছে, আপনার কথামতো শান্ত পরিবেশেই এ বছরটি শেষ হোক!"

হলও তাই। পঞ্চাশ-ষাটের বুড়ো-বুড়িদের চোপসানো ভিড়ে ভামের মতো বসে মাল খেলুম, উত্তেজনায় বেলুন ফাটালুম কয়েকটা, কাগজের গুলি ছুঁড়লুম—। শেষ রাতে, কে জানে কোন্ বুড়িকে জাপটে চুমু খেয়ে 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' জানিয়ে হোটেলে ফিরে এসেছিলুম।

কিন্তু, এখনো যে খোলে না এই বাথরুমের দরজা! আবার কান পেতে এলুম! এতটুকু প্রাণের লক্ষণ নেই! সভয়ে বার কয়েক ঠেলাঠেলি করে সোজা নেমে গেলুম কাউণ্টারে। সামনে বসে মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা। দ্রুত গলায় বললুম,

—"কেমন যেন গোলমাল ঠেকছে!

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন উনি। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন,

—"কি ? কি হয়েছে মঁসিয়ে ?"

তেমনি উত্তেজিত গলায় বললুম,

—"প্রায় এক ঘণ্টা হতে চলল। আমি লক্ষ্য রেখেছি। বাথরুমের দরজা বন্ধ। ভেতরে কোনো টুঁ শব্দটি নেই। একবার চলুন তো ওপরে!"

চট্ করে পেছনে টাঙানো সারি সারি চাবিগুলোর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন ভদ্রমহিলা। হাত বাড়িয়ে একটি চাবি এনে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। বললেন,

—"ভেতর থেকে বন্ধ নয়। বাইরে থেকে। স্নানের দাম এক ফ্রাঁ কিনা! এই নিন, আপনার স্নান হয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে চাবিটি আবার আমায় ফেরত দিয়ে যাবেন, কেমন ?"

এর পর বেশ কয়েক দিন আর স্নান করি নি বউ!
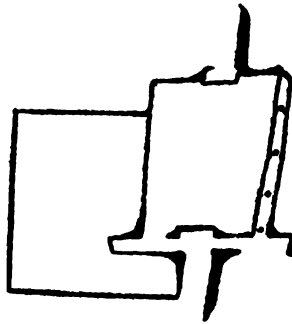
লা দোমের কাচের দরজা টেনে খুললো রোজমারী। জিজ্ঞেস করল,—"এসে উঠেছো কোন্ হোটেলে ?"

—"এই তো, হোটেল দ্যজেকোল, পেছনের রাস্তায়। চল দেখাচ্ছি।"

তিরতির করে বৃষ্টি চলছে এক নাগাড়ে। মোঁপানাস বিঁয়েভিনিউ, বেশী ধুলো নেই বলেই বোধ হয় কাদায় প্যাচ-প্যাচ করছে না। সামান্য পিছল। দু'জনে পাশাপাশি হাঁটছি। কয়েক পা হেঁটেই রোজমারী জিজ্ঞেস করল,—"খাবে কোথায় ?"

—"ঠিক নেই কিছু।" তাড়াতাড়ি জুড়ে দিলুম, "সে দেখা যাবে'খন। দশটাও তো বাজে নি এখনো।"

—"আমার বেশ খিদে পেয়েছে।"

মাথার মধ্যে পোকাটা নেচে বেড়াচ্ছে। মদে ভিজে জবজবে। বললুম,— "তোমার জন্যে একটা স্কার্ফ নিয়ে এসেছি। নেবে না ? চল।"

—"বাঃ, বেশ তো ! চল, আগে কোথাও খেয়ে নিই। তারপর—"

একটু থেমে খুব উৎসাহের গলায় বললে রোজমারী,

—"চল। তোমাকে মাংস-ভাত খাওয়াব। একেবারে ইণ্ডিয়ান মাংস-ভাত।"

খিদে খিদে আমারও পাচ্ছিল। গত ক'দিন বিলিতি শুকনো খাবার পিৎজা, পাঁউরুটি, স্যাণ্ডউইচ খেয়ে খেয়ে মাংস-ভাতের কথায় খিদে বেড়ে গেল। প্যারিসে বসে দিশী মাংস-ভাত খাব ! জিজ্ঞেস করলুম,

—"কোথায় পাওয়া যায় ?"

—"ওদের এলাকায়। একেবারে খাঁটি ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁ। চল যাই।"

মাটির নিচে ভভ্যাঁ রেল স্টেশন। সিঁড়ি বেয়ে নেমে দুটি টিকিট কেটে নিল রোজমারী। এখানে একটা মজার সুবিধে দেখলুম বউ। যে কোনো স্টেশনে নেমে এক ফ্রাঁর একটি টিকিট কেটে নাও। ওই একই টিকিটে তুমি যে কোনো রেলগাড়িতে চেপে সারা প্যারিসের যে কোনো জায়গায় ঘুরতে পার। অর্থাৎ, তোমার মাথার ওপরে প্যারিস শহরটি থাকবে আর তুমি তলায় তলায় নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু, যেই তুমি কোনো একটা স্টেশনের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলে প্যারিসের খোলা হওয়ায়, অমনি তোমার সেই টিকিটটি বাতিল হয়ে গেল। আবার ট্রেনে চাপতে গেলে, নতুন টিকিট কেটে স্টেশনের প্ল্যাটফরমে নামতে পারবে।

ঝম্‌ঝম্ শব্দে রেলগাড়ি এসে গেল। স্টেশনে থামার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই সব ক'টি কামরার সব ক'টি দরজা খুলে হাট। রোজমারীকে বললুম, —এই খুল-যা-সিম্-সিম-এর কলকাঠিটি কে নাড়ে ?"

হেসে ফেলল ও। বলল,

—"ওপন্ সিসামই বটে।"

একদল যাত্রী সামনের দরজা দিয়ে নেমে এল। উঠে পড়লুম আমরা। ঘড়ঘড় করে সব দরজা বন্ধ হয়ে গেল। রাজমারী বলল,

—"একেবারে সামনের কামরায় কণ্ডাক্টরের হাতের কাছে থাকে ছুটি বোতাম। একটি টিপলে সব দরজা একসঙ্গে খলে যায়। দ্বিতীয়টি বন্ধ করবার কলকাঠি।"

অন্ধকারের মধ্যে একটা, ছুটো, তিনটে স্টেশন পেরিয়ে ওদিয়ঁতে নামলুম। অল্প হেঁটে সিনেমা হলের ভিড় ছাড়িয়ে সরু গলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁ। ছোট্ট খাবার দোকান। জনা কুড়ি লোক একসঙ্গে বসে খেতে পারে। পার্টিশনের দু' পাশে ছুটি ভাগ। সামনের দিকে চারটে টেবিল। পেছনে বড় বড় ছুটি। বেশী ভিড় নেই এখন। গোঁফ-দাড়ি-পাগড়ি নিয়ে দু'জন রীতিমতন পাঞ্জাবী একটি বিদেশিনীর সঙ্গে বসে রুটি দিয়ে মাংস চিবোচ্ছে। কথা বলা, খাওয়ার ধরন-ধারণ এক পলক দেখতেই বহু মাইল দূরের অতি পরিচিত ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। অন্যদিকে এক বুড়ো মতন সাহেব বসে সিগারেট টানছে। টেবিলে শুধু রক্ত-রং ওয়াইনের গেলাস। খাওয়া হয়ে গিয়েছে বোধ হয়।

ভেতরের দিকে টেবিলে সামনাসামনি বসলুম দু'জনে। রান্না মাংসের ভুরভুরে গন্ধ। মুখের ভেতরে আমার লালা সরছে। কাউণ্টার থেকে দিশী লোকটি এগিয়ে এল। বলল,

—"ইয়েস!"

আমি হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলুম,

—"কোন্ প্রদেশ থেকে এখানে? পাঞ্জাব, বিহার না ইউ-পি?"

খুব মিষ্টি করে হাসল লোকটি। বলল,

—"এখন শুধু ইণ্ডিয়ান। ভারতবর্ষ ছেড়ে এসে প্রদেশগুলো একসঙ্গে মিলে-মিশে এখন একটা গোটা ইণ্ডিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি হয় মহারাষ্ট্র কিংবা ক্যালকাটা। ঠিক ধরেছি?"

এই জন্যেই আমার মনে হল, বউ, আমাদের দেশের লোকদের একবার দেশ ছেড়ে এসে কিছুদিন এই সব জায়গায় থাকা উচিত। যেখানে শুধু 'জনগণমন' গানটির গায়ক হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। যেখানে হাতের কাছে পরিচয় শুধু 'ইণ্ডিয়ান'।

—"হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। আমি ক্যালকাটা। আপনার নামটি কি ভাই ?"

—"কিরপাল।"

মুর্গির মাংস আর ভাত নিয়ে বসা গেল। সঙ্গে বোর্দো ওয়াইন। ছুরি-কাঁটা সরিয়ে রেখে ছ'হাত দিয়ে মুর্গি চিবোলুম। রোজমারী হাসতে হাসতে বলল,

—"দেখে মনে হচ্ছে তুমি বেশ, 'হোমালী ফীল' করছো।"

বললুম,

—"সস্তা একটা ঘর পেলে আরো 'হোমলী ফীল' করতুম। এখানে হোটেলের যা দাম, দিন কয়েক পরে নিজের হাত পা চিবোতে হবে।"

রোজমারী ছুরি-কাঁটা দিয়ে আলতো হাতে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে দিচ্ছে। কিরপালের কাছ থেকে একটা কাঁচা লঙ্কা চেয়ে নিলুম। রোজমারী বলল—, "এখানে সস্তা ঘর পাওয়া খুব মুশকিল। তুমি এক কাজ করতে পারো। ইণ্ডিয়ান এমব্যাসিতে গিয়ে একটু খোঁজখবর করতে পারো।"

—"গিয়েছিলুম। আজকেই গিয়েছিলুম। ছপুরে।"

—"স্থবিধে হল কিছু ?"

একটু ঝোল আরো একটা লঙ্কা চেয়ে নিলুম। মনে হচ্ছে, কত যুগ পরে যেন ঝালমসলা খাচ্ছি। উহ-আহ্ করছি আর লঙ্কা চিবোচ্ছি। বেশ ঝাল লঙ্কা। চোখ দিয়ে প্রায় জল বেরিয়ে যাচ্ছে। রোজমারী বলল,

—"অমন ঝাল খাবার মানে হয় কিছু ? কষ্ট করে এই খাওয়ার মধ্যে তোমরা যে কি পাও বুঝি না।"

ও প্রায় সাদা ভাত দিয়েই মাংস চিবোচ্ছে। ঝোলের ধারকাছ দিয়েও যাচ্ছে না। বললুম,

—"এর মজা তোমরা কি বুঝবে! এই উহ-আহ্ করার মধ্যে যে কী ফুর্তি তা বলে বোঝানো যাবে না। যা বলছিলুম, মিস্টার সিবাল—"

—"সে কে ?"

—"আমাদের দূতাবাসে কালচারাল অ্যাটাচে। ওঁর সঙ্গেই গিয়ে দেখা করে এলুম।"

খুব তৃপ্তি করে খেয়েছি। হাত ধুয়ে ফিরে এসে ছপুরের ঘটনা বলতে লাগলুম রোজমারীকে।

বেশ নওজোয়ান গোছের চেহারা এই সিবাল মশাইয়ের। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

—"কবে এলেন ?"

—"গতকাল।"

—"বেড়াতে এসেছেন ?"

—"না, ঠিক বেড়াতে নয়। প্রদর্শনী করতে। দেশে গুটিকয়েক সফল প্রদর্শনীর পর এখানে আসার সুযোগ পেয়েছি—চলে এলুম।"

স্রিবাল খুব উৎসাহ দেখালেন,

—"বাঃ। খুব ভালো কথা।"

—"খুব একটা ভালো কথা নয় মিস্টার সিবাল। কারণ এখানে হোটেলের যা খরচ দেখছি তাতে বেশী দিন থাকা চলবে না। আমাকে একটা সস্তা ঘরের বন্দোবস্ত করে দিন না ?"

—"ওভাবে চট্ করে এখানে সস্তা অ্যাকমডেশন পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবু চেষ্টা তো করতেই হবে !"

একটা সিগারেট এগিয়ে দিলুম ওঁকে। খান না। বললেন,

—"তা আপনি ছবিটবি সব সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ?"

—"না। এখানে বসেই নতুন ছবি আঁকার ইচ্ছে।"

—"তার মানে তো বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।"

—হ্যাঁ। তা প্রায় মাস ছয়েক তো লাগবেই।"

সিবাল একটু ভেবে নিয়ে বললেন,

—"আমার মনে হয় আপনি 'সিতে ইউনিভার্সিত্যার'এ চলে যান। ওখানে সারা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের ছাত্রাবাস আছে। বোধহয় বিয়াল্লিশটা দেশের। থাকা-খাওয়া বেশ সস্তা।"

—"ছাত্রাবাসে আমায় ঢুকতে দেবে কেন ? আমি তো কোনো স্কলারশিপ-টিপ কিছু নিয়ে আসি নি ! এমনিই চলে এসেছি। ছাত্র ছাড়া অন্য কেউ থাকতে পারে ওখানে ?"

—"পারে। 'পাসাজে' হিসেবে কয়েকটা মাস থেকে যেতে পারে। অবশ্যই যদি ঘর খালি থাকে !"

সিবালকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। বললুম,

—"থাকার আস্তানা যোগাড় হয়ে গেলে মোটামুটি একটা ভালো গ্যালারীর সন্ধান দিতে হবে। আর প্রদর্শনীর সময় যতটা সাহায্য করতে পারেন ততই মঙ্গল। আশা রাখতে পারি তো ?"

সিবাল প্রায় সব রকম সাহায্যের আশা দিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন আমাকে।
রোজমারীর খাওয়া হয়ে গেছে। ওয়াইনে চুমুক দিতে দিতে সিবালের কথা শুনছিল। বলল,

—"বাঃ। এ তো খুব সুখবর!"

—"দাঁড়াও! অত উত্তেজিত হয়ো না, প্রিয়া। যেখানে, সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়—সেখানে বেশী কিছু আশা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবু, কাল একবার ওই সিটি ইউনিভার্সিটিতে যাব।"

—"হ্যাঁ, ওখানে মেজোঁ ন্দ্যল্যান্দ'-এ খোঁজ নাও। ওখানে ঘর পেলে তোমার সস্তায় থাকা-খাওয়ার ব্যাপারটি হয়ে যাবে।

মেজোঁ ল' অ্যান্দ। কিছু বুঝলে বউ! মেজোঁ হল গিয়ে তোমার, আবাস। আর 'অ্যান্দ' শব্দটি আমার মোটেই পছন্দ নয়, কারণ ওটি হল ভারতবর্ষের ফরাসী নাম। ফরাসী খুব মিষ্ট ভাষা সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের দেশের নামের চেহারাটা একটু কেমন যেন, তাই না। শুধু ভারতবর্ষই নয়, কলকাতার অবস্থাটাও জেনে রাখো বউ। এখানে একটি ফরাসী ব্যালে-নাটক প্রায় সহস্র রজনী চলছে। নাম হল গিয়ে, "আহ্! ক্যালকাতা।" যদিও নামটি নিয়ে নানা মুনির নানা অভিমত, নানান ব্যাখ্যা, তবে প্রায় সব ফরাসী দর্শকদের মতে নামের মধ্যে 'কোলকাতা' এসে যাবার কারণ হল—"কেল কো তোয়া।" একটু ভেঙে ফরাসী মতে সন্ধি-টন্ধি হয়ে 'ক্যালকাতা'। মানে হল গিয়ে "আহ্! কী দারুণ তোর পাছা"!

বিল মিটিয়ে দিল রোজমারী। কিরপাল বলল,

—আসবেন আবার!

বললুম,

—"যদি থাকি তো আসতেই হবে। কাঁচা লঙ্কা আর কোথায় পাব!"
হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলুম আমরা শীতের মধ্যে। রোজমারীকে বললুম,

—"দু'এক পাত্তর হুইস্কি হলে জমত। কি বল?"

এ রাজ্যে ডিনারের পরই মদ খাওয়াটা রেওয়াজ। আমরা তো বউ, খালি পেট গদগদ করে যতটা পারি দিশী দু'নম্বর গিলে নিই আগে। তারপর নেশায় ভাম হয়ে খেতে বসে যাই। ভাত-টাত খাওয়ার কথা উঠলেই অনেকের বমি পেত, মনে আছে। ইউরোপে, প্রায় সব দেশেই এক আধ পেগ 'অ্যাপারেতিফ' খেয়ে খিদে চাঙ্গা করে নেয় লোকে। তারপর ওয়াইন বা বীয়ারের সঙ্গে চলে

ডিনার। সবশেষে, যারা নেশা করতে চায়, তারা শুরু করে দেয় পেগের পর পেগ।

রোজমারী বলল,

—"নেশা করবে ?"

ভাত-টাত খেয়ে ঝিম ভাবটুকু উবে গেছে আমার। সিনেমা হলের সামনে এখন আর ভিড় নেই। বড় রাস্তায় দু'জন চারজন মেয়েপুরুষ জড়াজড়ি করে হাঁটছে। হুসহুস শব্দে মোটরগাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। চারদিকে নিয়ন আলোর জেল্লা বৃষ্টির জলে ঝাপসা দেখাচ্ছে। বললুম,

—'এই বৃষ্টির নাম করে এক পেগ আর এই শীতের নাম করে এক পেগ, ব্যস!"

পাশাপাশি হাঁটছি। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে রোজমারী হাসল। বলল,

—"তোমরা সব মাতাল। যেমন তুমি, তেমনি নোয়েল, তেমনি তোমাদের সব বন্ধুবান্ধব!"

বলেই হাসতে লাগল। আমিও হোহো করে হাসতে হাসতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিলুম প্রায়, সামলে নিলুম। রোজমারী লক্ষ্য করে নি। বলল, 'ঠিক আছে, চলো! কোনো বার-এ ঢুকে পড়া যাক!"

বললুম,

—"দ্যাখো সুন্দরী। এখন আর কোনো কথা শুনব না। হতে পারে তুমি ভালো মাইনে পাও। কিন্তু সেই সন্ধ্যে থেকে তুমিই বিল দিয়ে যাচ্ছো, এ আর আমার সহ্য হচ্ছে না। এবার, আমি খাওয়াব।"

—"বেশ তো, চলো।"

—"বার-এ খাওয়াবার পয়সা নেই বাবা। ঘরে আমার ভালো স্কচ আছে, তাই খাওয়াব তোমায়।"

ও দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল,

—"এত রাত্তিরে আবার তোমার হোটেলে যাব ?"

—"তাতে কি হয়েছে ? চলোই না।"

—"আজকে বরং থাক।"

—"বা রে! তোমার জন্যে যে স্কার্ফটা এনেছি—সেটা নেবে না ?"

একটু ভেবে নিল রোজমারী। ঘুরে আমার দিকে কয়েক পলক দেখল।

সারা মুখে অল্প হাসি মেখে দাঁড়িয়ে আছি। গুবরে পোকাটি দুলে দুলে বলছে,
—"নিয়ে চল, নিয়ে চল তো দেখি!"

রোজমারীর নীল চোখ আধো-অন্ধকারে অস্পষ্ট। মুখের ডান পাশে হালকা সবুজ আলো। আমার মুখে কি দেখছে কে জানে! গুবরেটা ধরা পড়ে গেল না তো? অসম্ভব। আমার চোখে, ঠোঁটের কোলে হাসি। মুখময় এখন আমার যে কোমল সরলতা ছড়িয়ে দিয়েছি তা আমি নিজেই যেন দেখতে পাচ্ছি।

ও বলল,

—"আচ্ছা বেশ, চলো। কিন্তু বেশীক্ষণ বসতে পারব না!"

বলতে বলতে ওদিয়ঁ স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল,

—"তোমার আর কি! আমায় তো আবার কাল ভোরবেলা উঠেই চাকরি করতে দৌড়তে হবে!"

নিঝুম হোটেল। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলুম। আলো জ্বালিয়ে ওকে বললুম,

—"বোসো!"

স্কচের বোতলটা টেবিলেই রাখা ছিল। গেলাস মোটে একটাই ঘরে। তাতেই খানিকটা ঢেলে দিলুম। হাঁ হাঁ করে উঠল রোজমারী,

—"করছো কি! ব্যস ব্যস—এনাফ! তুমি কি আমাকে ঠিকমতো বাড়ি পৌছুতে দেবে না আজকে।"

ওর পাশে বসতে বসতে চট্ করে জবাব দিলুম,

—"না পারলে যাবে না! দুটো খাট তো আছেই!" ঢক ঢক করে বোতল থেকেই খানিকটা কাঁচা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিলুম। রোজমারী আলগোছে একটু সরে বসল। তার মানে, এখনো সময় হয় নি।

গেলাসে ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলল,

—"নোয়েল কি তোমায় সী-অফ করতে এসেছিল?"

উফ, এর মধ্যে আবার নোয়েল কেন সুন্দরী।

—"না তো!"

সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে কথা ঘুরিয়ে দিলুম। স্যুটকেস খুলতে খুলতে বললুম,
—"দেখ তো! স্কার্ফটা পছন্দ হয় কিনা?"

খয়েরী আর কমলা রংয়ের নকশাওয়ালা স্কার্ফটি ওর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে ভাবলুম, দরজাটা হাট করে খোলা। দু'পা হেঁটে ওটাকে এক্ষুনি বন্ধ করে

দিতে পারি। কিন্তু ওকে এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না। চোখে কোনো স্পষ্ট খেলার ছবিও পাচ্ছি না খুঁজে। যদি হঠাৎ বেঁকে বসে তো বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে যাবে। অথচ, গুবরে পোকা—হারামজাদা মাথাময় নেচে বেড়াচ্ছে, 'কতক্ষণ আর। কতক্ষণ আর?"

রোজমারী বললে,

—"বাহ্! ভারী সুন্দর তো। থ্যাংক ইউ সো মাচ!"
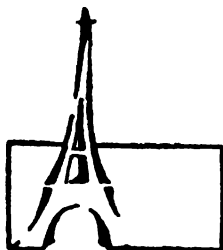
সকালবেলায় জর্জ এসে হাজির। বললে,

—"কাল আসতে পারি নি ভাই। ভীষণ দুঃখিত। সন্ধ্যের পর হোটেলে টেলিফোন করেছিলুম। ছিলে না তুমি। যাক গে, তোমার জন্যে এর চেয়ে সস্তা হোটেলে ঘর খুঁজে বের করেছি। বুক করে এসেছি আজ থেকে। চল।"

—"কত করে?"

—"কুড়ি ফ্রাঁ!"

—"বলি, এই তোমার সস্তা হল?"

জর্জ হেসে দু'হাত নেড়ে বলল,

—"এর থেকে সস্তা হোটেল বাপু প্যারিসে পাবে না।"

—"কোথাও পেয়িং গেস্ট থাকার বন্দোবস্ত করে দাও না!"

—"সময় লাগবে শিল্পী। হুট্ বললেই তো পেয়িং গেস্ট হিসেবে তোমাকে কেউ কোলে টেনে নেবে না। খোঁজ করতে হবে আমাদের। নাও, এখন চলো।"

হোটেল ডি ওরিয়েণ্ট। সস্তা কেন তাও বুঝলুম উঠতে উঠতে। সাততলায় ঘর। লিফ্‌ট নেই। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে জর্জ বললে,

—"নিউ ইয়র্কের সেই গল্পটা জানো তো?"

—"কোন্‌টা?"

—"সেই দুই বন্ধুর গল্প। বেড়াতে এসেছে নিউ ইয়র্কে। অনেক খুঁজে পেতে

মাঝ রাত্তিরে একটা সস্তা হোটেল পাওয়া গেছে। আটাশতলায়। লিফ্‌ট নেই। সারা দিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে ছ'জনেই ক্লান্ত। প্রথম বন্ধু এক বুদ্ধি বের করলে। বললে, 'চল্‌, এক কাজ করা যাক। দোতলায় পৌঁছে আমি তোকে একটা জোক শোনাব। তিনতলায় উঠে, তুই শোনাবি একটা। চারতলায় আবার আমার পালা। এমনি করতে করতে হেসেখেলে আটাশতলায় পৌঁছে যাব। নইলে, অতদুর সিঁড়ি ভেঙে উঠতেই পারব না।' রাজী হয়ে, পালা করে জোক শোনাতে শোনাতে সাতাশতলা অবধি পৌঁছে গেছে ওরা। দম ফুরিয়ে ছ'জনেই ভোঁস্‌ ভোঁস্‌ করে হাঁপাচ্ছে। শেষ ক'টি সিঁড়ি বাকি। প্রথম বন্ধুটির জোক বলার পালা এবার। দ্বিতীয় বন্ধু বললে, 'কি হল বল!' প্রথম জন বললে, 'হ্যাঁ—বলছি। আমরা না—আমরা আমাদের ঘরের চাবিটি নিচের কাউন্টারেই ফেলে এসেছি—'।"

জর্জের গল্প শুনে হাসব কি, আমার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। হাঁফাতে হাঁফাতে জিজ্ঞেস করলাম,

—"তুমি চাবি ফেলে আসো নি তো?"

একটু দাঁড়িয়ে দম নিলুম ছ'জনে। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জর্জ, বললে,—"না।"

—"এটা কোন্‌ তলা?"

—"ছয়। আর একটা বাকি।"

ছাতের সিঁড়ির সঙ্গে লাগানো ঘর। আকারে বেশ ছোট। একটি বিছানাপাতা খাট। মালপত্র রেখে ছ'জনেই বসে পড়লাম খাটে। একটু জিরিয়ে নিয়ে মেজোঁন্দাল্যান্দের কথা বললুম জর্জকে! সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ও। বলল,

—"শিগগির চল তাহলে। ওখানে জায়গা পেলে খুব সস্তায় হয়ে যাবে। দশ বারো ফ্রাঁর মধ্যে।"

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম ছ'জনে। গাড়ি চালাতে চালাতে জর্জ বলল,

—"জানী বলে দিয়েছে আজ রাত্রের খাবার আমরা একসঙ্গে খাব। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ এসে নিয়ে যাব তোমায়। হোটেলে থেকো।"

জর্জের ডানপাশে বসে আছি। সকাল থেকে বৃষ্টি ধরেছে। পথঘাট এখনো ভেজা-ভেজা। মেঘ জমে আছে আকাশ কালো করে। গাড়ির কাঁচের বাইরে হুহু হাওয়ায় মানুষজনের কোট-ওভারকোট উড়ছে। মেয়েরা রঙীন গরম জামা গায়ে হেঁটে চলেছে ফুটপাথ দিয়ে। এক একটি মেয়ের মুখের দিকে চোখ পড়ছে,

নকশা বদলে রোজমারীর মুখ। ওর নীল চোখ থরথর কাঁপছে। দমকা হাওয়ায় গাছপালা যেমন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে নড়ে ওঠে, আমার ভিতরে তেমনি এক ঝোড়ো ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে রোজমারী।

—"কি ভাবছ অত, চুপচাপ?" জর্জ জিজ্ঞেস করল পাশ থেকে। বললাম,

—"না। তেমন কিছু না।"

জর্জ বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে ডান হাতে আমার পিঠ চাপড়ে বলল,

—"আরে বাবা। হয়ে যাবে। ঘরের যোগাড় হয়েই যাবে একটা। ঘাবড়াবার কি আছে ইয়াংম্যান।"

হেসে বললুম,

—"না, না, আমি ঘাবড়াচ্ছি না মোটেই।"

ডান হাতের মধ্যমা তর্জনীর ওপর তুলে দিয়ে জর্জ বলল,

—"কিপ ইয়োর ফিঙ্গার্স ক্রস্‌ড্। হয়তো মেজোঁন্দাল্যান্দেই ঘর পেয়ে যাবে।"

সিতে ইউনিভারসিত্যার এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়লুম। বাঁদিকে তিনটে বাড়ি ছাড়িয়ে চতুর্থ বাড়িটির গায়ে লেখা MAISON LE L'INDE। সামনে ভেজা ঘাসের কার্পেট। কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলুম। চার পাশে কাঁচের দেওয়াল। সোজা সামনে রিসেপশন কাউণ্টার। ভেতরে বসে টেলিফোনে কথা বলছে একজন। বাঁ দিকে কয়েকটি সোফা সেট। ছড়িয়ে ছিটিয়ে তিনজন লোক বসে খবরের কাগজ পড়ছে। আমাদের দিকে একবার দেখে নিয়ে কাগজে মন দিল আবার। দেখেই বোঝা যায় দেশী মানুষ। কোট-পাতলুন-পরা ইউ-পি, বিহার কিংবা দক্ষিণ ভারত।

লম্বা লম্বা পায়ে কাউণ্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল জর্জ। ইঙ্গিতে আমাকে বলল,

—"দাঁড়াও। আমি আগে কথা বলে দেখি।"

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে ফরাসী ভদ্রলোক জর্জের দিকে তাকালেন। জর্জ বলল,

—"আমার নাম জর্জ বোয়াগুনতিয়ে। এই ভারতীয় বন্ধুটি ক'দিন হল প্যারিসে এসেছে। থাকার জায়গা নেই। হোটেলে থাকবার মতো অত খরচ করবার পয়সাও নেই। শিল্পী মানুষ। মাস ছয়েক থেকে প্রদর্শনী করতে চায়। আপনি কি অনুগ্রহ করে ওঁকে এখানে কয়েক মাস রাখার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?"

আমার দিকে একবার অপাঙ্গে দেখে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন,

—"ঘর খালি হলে প্যাসাজে হিসেবে ছ'মাস থাকতে পারেন। কিন্তু, এখন তো ঘর খালি নেই।"

—"শিগ্‌গির ঘর খালি হবার কোনো সম্ভাবনা আছে?" জর্জ জানতে চাইল।

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। মুখ কাঁচুমাচু করে আমার ভয়ঙ্কর ফরাসীতে বলে ফেললুম,

—"যে কোনো ঘর—সী ভু প্লে!"

আমাকে আর একবার দেখে নিল লোকটা। যেন কোনো পাত্তাই দেবার লোক নই আমি। মনে মনে বললুম—শালা! জর্জকে বললে,

—"দিন সাতেকের মধ্যে একটি ঘর খালি হবে বোধ হয়। চব্বিশ নম্বর। পাকা খবর পরশু এসে জেনে যেতে পারেন।"

জর্জ একেবারে গদগদ গলায় বলে উঠল,

—"মের্‌সী! মের্‌সী বোকু! আর কাউকে দিয়ে দেবেন না যেন। পরশুই আমরা আবার আসব। মের্‌সী বোকু!"

ধন্যবাদ দিতে দিতে মাথা নাড়তে লাগল জর্জ। আমি মাথা নুইয়ে ধন্যবাদ জানালুম। কুতকুতে চোখ, চোয়াড়ে মুখে লোকটাকে মোটেই পছন্দ হয় নি আমার। কাঠখোট্টা কোথাকার! তবু, ধন্যবাদ জানিয়ে দু'জনে বেরিয়ে আসছি, জর্জ আবার ফিরে গেল। গিয়ে, আমার নাম বলে ওর নামটাও জেনে এল। আন্দ্রে চাজাল। ফরাসীরা বলে 'শাজাল'। মনে মনে বললুম ব্যাটা চাঁড়াল।

—"অ'ভোয়া মঁসিয় অ'ভোয়া।" চাঁড়ালকে বিদায় জানিয়ে গাড়িতে এসে বসলুম।

খুশিতে দু'জনেই ডগমগ। জর্জ সিগারেট খায় না। আমি উত্তেজনায় সিগারেট ধরিয়ে বললুম,

—"জর্জ! হয়ে গেলে চাঁড়ালকে আমি একটা চুমু খাবো।"

ও হাসতে হাসতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল,

—"ঐ যাঃ। কত করে ঘরভাড়া জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলুম। যাব আবার?"

—"সেটা কি ভালো দেখাবে?"

"না থাক।" বলে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে নিজের মনেই আবার বলল,

—"কত আর হবে ? দশ-বারো ফ্রাঁর বেশী কিছুতেই নয়। ছাত্ররা থাকে যখন। কি বল ?"

—"তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ভাই।" পরিষ্কার বাংলায় বললুম।

—"সেটা আবার কি ?"

—"আমার বাংলা ভাষায় একটা প্রভার্ব। অর্থাৎ তোমার কথাই যেন সত্যি হয়।"

"অফ কোর্স!"

শহরের দক্ষিণ প্রান্তে সিতে ছাড়িয়ে উত্তর দিকে ছুটল গাড়ি। জর্জ জিজ্ঞেস করল,

—"তোমাকে কোথায় নামাব ?"

—"কোথায় যাওয়া যায় বল দেখি ?" একটু ভেবে জর্জ বললে,

—"তুমি ভিন্‌সেণ্ট ভ্যানগগের ছবি ভালোবাসো ?"

বউ, তুমি তো জানোই ভ্যানগগ আমার কাছে প্রাণ। ওর ছবি, ওর জীবন, ওর রং—সব মিলিয়ে ও একটা ভীষণ দামাল ব্যাপার। আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলুম,

—"ওর আমি প্রচণ্ড ভক্ত। কেন, হঠাৎ ?"

—"এক কাজ করো। তোমাকে লুভ্র্-এ নামিয়ে দিচ্ছি। ওখানে, একটি গ্যালারীতে ভ্যানগগের প্রায় সমস্ত ছবির একক প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। সরকার ব্যবস্থা করেছেন। তুমি দুপুরটা ওখানে কাটাতে পার।"

লুভ্র্-এ আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল জর্জ।

বিরাট লম্বা লাইন গ্যালারীটির সামনে। এত মানুষ-মানুষী ভ্যানগগের ছবি দেখতে এসেছে আজ! পাঁচ ফ্রাঁর টিকিট কিনে এক একজন ঢুকছে। বিংশ শতাব্দী শেষ হতে চলল, তাই! ওর সময়ের কথা কল্পনা কর বউ! ওর ছবি দেখে পাগলামী বলত সবাই। বেঁচে থাকতে ভিন্‌সেণ্ট ভ্যানগগ ছবি বিক্রি করে দিন গুজরান করতে পারে নি। আজ ওর ছবি শুধু দেখবার দাম পাঁচ ফ্রাঁ! লক্ষ লক্ষ ফ্রাঁ উপার্জন করছেন ফরাসী সরকার শুধু ওর ছবি দেখিয়ে। ভাবতে ভাবতে আমার কেমন মনে হল, ভিন্‌সেণ্টের অতৃপ্ত আত্মা কাছাকাছিই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার পেছনেই হয়তো দাঁড়িয়ে পড়েছে এসে। কানের কাছে ফিসফিস করে বলছে,

—যাও, দেখে এসো। ভালো করে দেখে এসো গিয়ে। মনে রেখো,

তোমার গ্রেট গ্র্যাণ্ড ফাদার হয়তো ইচ্ছে করলে আমার একটি ছবি কিনতে পারত। কেনে নি। এ লাইনে যত লোক দেখছো, তাদের সবার গ্র্যাণ্ড ফাদার, গ্রেট গ্র্যাণ্ড ফাদাররা আমার প্রতি অবিচার করেছে। আমায় পাগল বলে হেসে হেসে আমাকে পাগল করে দিয়েছে। খেতে-পরতে দেয় নি। যাও, দেখে এসো। আর এখন, তুমি ইচ্ছে করলেও, একটি ছবিও ছুঁয়ে দেখতে পারবে না। আমার এক একটি অযত্নে বেঁচে থাকা সন্তানকে আজ ফরাসী পুলিস গার্ড দিচ্ছে। ওদের বেশী কাছে গেলেই পুলিস ধমকে দেবে তোমাকে, বলবে, 'অত কাছে যেও না, তোমার গরম নিঃশ্বাস লাগলে ছবির ক্ষতি হবে'। কত খাতির আজ ওদের! দেখো গিয়ে, যাও।" -

ভেতরে ভেতরে ভীষণ রোমাঞ্চ আমার। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে লাইন। ডান দিকে লুভ্র্-এর বিশাল বাড়ি। সামান্য দূরে বাঁদিকে ইম্প্রেশনিস্ট গ্যালারী। পেছনের চওড়া রাস্তা দিয়ে বুলেটের মতো গাড়িগুলি ছোটাছুটি করছে। পায়ের নিচে নরম সবুজ ঘাস। ঘাসের জমির ওপর দিয়ে দূর থেকে হেঁটে-হেঁটে আসছে মানুষ-মানুষীরা, এসে, লাইনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এক একটি রঙিন মেয়ের মুখের ওপর চোখ পড়ছে আর মনে হচ্ছে রোজমারী। চোখ সরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকাচ্ছি, রোজমারী। থমথমে কালো আকাশে তাকাচ্ছি, রোজমারীর নীল চোখ ধূসর হয়ে ভেসে উঠছে।...

রঙিন স্কার্ফটি ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে খাটে এসে বসলুম আবার। সরাসরি বোতল থেকে আরো খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিলুম। চারিদিকে পৃথিবীর সমস্ত অস্তিত্ব নিচের দিকে নেমে গেল। রোজমারীর পাশে এসে বসলুম গা ঘেঁষে। ও সামান্য সরে বসে আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাল। শব্দ করে হেসে উঠলুম। বললুম,

—"কি হল? ঘাবড়ে গেলে নাকি?"

চোখে চোখ রেখেই ও বলল,

—"না। আমি ঘাবড়াব কেন। ঘাবড়াবার কথা তো তোমার। কারণ, আমার মনে হচ্ছে, তোমার নেশা চড়ে গেছে।"

কথা বলার সময় ওর ঠোঁটের নকশা বদলে যায়। খুব সুন্দর লাগে দেখতে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলুম,

—"নেশা তো একটু হবেই। নেশা করার জন্যেই তো মদ খাওয়া! না কি বলো?"

ও কিছু বলবার আগেই আবার বললুম, খুব গভীর গলায়, খুব নরম চোখ মেলে,

—"তোমার অমন গোলাপী ঠোঁটের দিকে আমি তাকিয়ে থাকতে পারছি না।" বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে দরজাটায় ধাক্কা দিলুম একটা। অল্প শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল। গাঢ় গলায় ডাকলুম,

—"রোজমারী!"

আমার ডান হাত আলতোভাবে ওর কোমর জড়িয়ে ধরতেই সাপের ফণার মতো সোজা উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। সমস্ত শরীর ওর ডাইনে-বাঁয়ে দুলছে। দূরে সরে গেল না। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল আমার চোখের দিকে। ওর নীল চোখ আমার দৃষ্টিতে লাল হয়ে উঠল। চোখের নীল ছড়িয়ে গেছে সারা গায়ে। মেয়েটির হলুদ সোনালী চুল একেবারে কালো এখন। একে আমি চিনি না একদম। এ আমার রাজ্যে এই গভীর রাত্রে কোথা থেকে উঠে এসে দাঁড়াল! আমার একলার গোটা রাজ্যপাট টলোমলো। ইতিহাস তলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পেছনের দেওয়ালে হেলান দিয়ে কে যেন শব্দ করে হেসে উঠল। চমকে চোখ ফেরালুম। কেউ নেই। সামলে নেবার জন্যে বললুম,

—"কি হল রোজমারী! বোসো।"

মেয়েটি তেমনি তাকিয়ে আছে আমার চোখের মধ্যে। আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে বলল,

—"ছিঃ! তুমি আমাকে কি ভেবেছো, তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু, তোমাকে আমি এরকম ভাবি নি!"

জড়িয়ে জড়িয়ে বললুম,

—"আমি আবার কি করেছি?"

মেয়েটি দু' পা হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল,

—"তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। নোয়েলের বন্ধু হিসেবে যদি কিছু সাহায্য করতে পারি সেই জন্যেই এসেছিলুম। তোমার মতো নোয়েলের বন্ধু আছে জেনে আমার এখন কষ্ট হচ্ছে।"

তীব্র সাপের বিষ ছড়িয়ে গেছে আমার রক্তের মধ্যে। দপদপ করছে নীল শিরা-উপশিরা। নিজের মুখ নিজেই দেখতে পাচ্ছি এখন। ঠোঁটের দু পাশ ঝুলে পড়েছে। সাদা সাদা কষ গড়াচ্ছে থুতনি বেয়ে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ভীষণ জ্বালা। ঝনঝন করে বিশাল এক কাঁচের দেওয়াল ভেঙে গেল অনেক দূরে কোথায়!

দরজা খুলে ছোট্ট করে বলল রোজমারী,

—"চলি।"

সিঁড়ি দিয়ে ওর পায়ের শব্দ নিচে নেমে যাচ্ছে। মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। কি হয়ে গেল ঠিক যেন বুঝতেই পারছি না। এমন তো হওয়ার কথা নয়। এমন তো হয় নি কখনো। এলোমেলো পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম। রিসেপশন হলের শেষ প্রান্তে কাঁচের দরজার সামনে পৌছে গেছে ও। আড়ষ্ট গলায় ডাকলুম,

—"রোজমারী। শোনো, একটা কথা শুনে যাও—"

ফিরে তাকাল না মেয়েটি। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। শীত আর বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল আমার জীবনের সম্পূর্ণ অচেনা এক ভদ্রমহিলা। বলে গেল, আমাকে চিনে গেল। কাউণ্টারের মাদাম উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কি যেন জিজ্ঞেস করলেন। জড়ানো গলায় বললুম,

—"ও কিছু নয়।"

শুনে, আমার চারপাশের দেওয়াল লজ্জায় লাল হয়ে গেল। দেওয়ালে হেলান দিয়ে কে যেন হা হা করে হাসতে লাগল। ফিরে দেখি, নোয়েল। ভারতবর্ষের নোয়েল রড্রিগ্স্।

মবিল'র ঘিঞ্জি অলিগলিতে ঘুরছি। দু'পাশে আলোকিত দোকানপাট। বড়-বাজারের মতোই ভিড় প্রায়। সন্ধ্যের তরল অন্ধকার আর কুয়াশা বাড়িগুলির কোণা-ঘুপ্চিতে আটকে আছে। শব্দহীন ফিরফির বৃষ্টিকে কেউ গ্রাহ্যই করছে না। ওরই মধ্যে মানুষজন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, আড্ডা দিচ্ছে জটলা পাকিয়ে। ফুটপাথের যেখানে সেখানে কপোত-কপোতিরা একে অপরের কোমর জাপটে ধরে মুখোমুখি কথা বলছে, আদর করছে। দু'পাশে আলো থাকা সত্ত্বেও পথের গোটা চেহারাটি ধূসর। কালো, ময়লা অথবা বিবর্ণ কোট, ওভারকোট এবং বর্ষাতি নিয়ে চারপাশের মানুষ-মানুষী। উজ্জ্বল রং-চঙা প্যারিসের যে সব খবর দেশে থাকতে

পত্র-পত্রিকায় পড়েছি, শুনেছি, তার সঙ্গে এই ছোট্ট এলাকাটির কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না। শীত, বৃষ্টি, কুয়াশায় কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে মবিলঁ অঞ্চল।

গলির গলি তস্য গলির মুখে এসে থামলুম। একটি যুবক সামনের বাড়ির দেওয়ালের দিকে মুখ করে পেচ্ছাব করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। রুক্ষ একমাথা ঝাঁকড়া চুল ঘাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভিজছে। ভেজা চুলে উল্টো ফুটের আলো হাই-লাইটের মতো পিছলে যাচ্ছে। একটু কাছে এগিয়ে দেখি, না, ছেলেটি একা নয়। পেচ্ছাবও করছে না। আপন ওভারকোট দিয়ে একটি তন্বী তরুণীকে আঁকড়ে ধরে আছে নিজের শরীরের সঙ্গে। সঙ্গিনীটিকে প্রায় দেখাই যায় না। প্রেমিকটি আমার চেয়ে বেশ লম্বাও বটে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে সামান্য উঁচু হতে মেয়েটির ফর্সা মুখের একাংশ এবং বাঁ চোখটি দেখতে পেলুম। পেছনে, দু'পাশে অন্ধকার ছেলেটির কালচে চুল, গাঢ় রঙের কোটের কলার, পিঠ এবং কাঁধের পটভূমির ভিতর অত ধবধবে ছোট্ট মুখটি জ্যোৎস্নায় কোনো সাদা ফুলকে মনে করিয়ে দিল। এক পলক তাকিয়েই বোঝা গেল, দেওয়ালে হেলান দিয়ে আছে মেয়েটি। আধো-অন্ধকারে ফিসফিস কথা। প্যারিসের সব রাস্তার নামই মোড়ে মোড়ে দেওয়ালে লাগানো থাকে। আবছা অন্ধকারে এই গলির নামটি খুঁজে পাচ্ছি না। হঠাৎ মনে হল, ওরা দু'জনে মিলে গলির নামটার ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রেম করছে না তো! তা হলেই তো চিত্তির! ওরা যে অবস্থায় আছে, এখন ওদের,—"দেখুন, একটু সরবেন, এক মিনিট—গলির নামটা দেখে নিতুম," বললে ধোলাই খাওয়াও বিচিত্র নয়।

যিশুর বাড়ি খুঁজছি। মোঁমার্ত্রের যিশুখৃষ্ট। দুপুরে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম শিল্পীদের বাজারে। ব্যস্ত ছিল খুব। একটার পর একটা পোর্ট্রেট করছিল। ওরই ফাঁকে ফাঁকে বললুম,

—"তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

—"কি ব্যাপারে? বলে ফ্যালো!" মুখ তুলে এক পলক আমায় দেখে নিয়ে বলল যিশু। তারপরেই আবার ফিরে তাকাল। বলল,

—"কি গো ইণ্ডিয়ান পেইণ্টার! কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে। এক মাসও তো হয় নি এসেছো। বলি, এরই মধ্যে ফরাসী হাওয়ায় শুকিয়ে গেলে, অ্যাঁ!" বলেই, মুখ নামিয়ে আবার ক্রেয়ন ঘষতে লাগল কাগজে। আমি হেসে ফেললুম। বললুম,

—"না ভাই, ফরাসী হাওয়ায় নয়, ফরাসী খাওয়ায় শরীর একটু বেগতিক হয়েছিল। এখন ঠিক আছে।"

—"যাক, কি ব্যাপার? আমার সঙ্গে কি কথা ছিল বল দিকি!"

চার পাশে দেখে নিয়ে বললুম,

—"এই ভিড়ের মধ্যে হবে না ভাই। একটু নির্জনে তোমার সঙ্গে একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চাই।"

আবার আমার দিকে এক পলক চোখ তুলে বলল,

—"গুরুতর কিছু?"

—"না, না। তেমন গুরুতর নয়। তোমার কাজ সেরে নাও, তারপরে হবে'খন।"

কিন্তু, অল্প সময় বসে থেকেই টের পেলুম, কাজ সারা হতে ওর সময় লাগবে আজ। একটি মুখ শেষ হতেই আরেকটি মুখ ধরে ফেলল যিশু। রঙিন মুখ চাই ভদ্রমহিলার। রঙিন মানেই সাদা-কালোর থেকে প্রায় তিন গুণ বেশী সময়। আবার বসে পড়ল শিল্পী। আমি বললুম,

—"আজ বরং চলি ভাই। কাল আবার আসব।"

ভদ্রমহিলাকে চেয়ারে বসিয়ে আমাকে একটু পাশে টেনে নিয়ে এল যিশু। বললে,

—"বুঝতেই তো পারছো। রোজ তো এমন কপাল হয় না। আজ এইটে নিয়ে পাঁচটা পোত্রে হবে।—"

ওকে থামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বললুম,

—"গুড লাক! চালিয়ে যাও।"

হঠাৎ আমার কাঁধে হাত রাখল যিশু। রেখে, অদ্ভুত নরম এবং গাঢ় গলায় জিজ্ঞেস করল,

—"কি হয়েছে তোমার? কোনো বিপদে পড়েছো?"

এতটা আশা করি নি, বউ। সদ্য পরিচয়ে এক বিদেশীর কাছ থেকে এতটা আশা করি নি। এমন স্বর, এমন স্পর্শ। খানিকটা অভিভূত হয়ে নিজেরই গলার স্বর কেমন পালটে গেল। বললুম,

—"না, না। তেমন কিছু নয়।"

আমার মুখের কাছে আরো একটু এগিয়ে এল যিশু। আরো নরম আরো কাছের, যেন কোনো প্রাণের মানুষের গলায় বলল,

—"টাকা-পয়সার টানাটানি চলছে বুঝি।"

চোখে হঠাৎ ধুলো ঢুকে গেলে যেমন হয়, তেমনি করকর করছে আমার চোখ দুটি। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলুম না। দূরে, গীর্জার চূড়ায় কি একটা পাখি উড়ে এসে বসল। ডান দিকের রেস্তোরাঁয় দুই বুড়োবুড়ি মাতাল গলায় গান গাইছে। সামনা-সামনি বসে, দুলে দুলে। যিশুর পেছনে ওর খদ্দের সেই ভদ্রমহিলা চেয়ারে বসে উশখুশ করছিলেন। আমার চোখে চোখ পড়তেই গলায় কাশির শব্দ করে তাঁর শিল্পীকে দেখলেন।

হেসে যিশুর দিকে তাকিয়ে বললুম,

—"সে সব কথা কাল বলব। তুমি যাও তো এখন ওঁর কাছে। কাজে বসে পড়।"

ভদ্রমহিলার দিকে এক পা এগিয়েই ঘুরে দাঁড়াল ও। বলল,—"এই ইণ্ডিয়ান! এক কাজ করো না।"

—"কি?"

—"বলি, সন্ধ্যেবেলা কোনো মেয়েটেয়ের সঙ্গে রঁদেভু নেই তো?" বলেই চোখ টিপল যিশু।

বউ, রঁদেভু হল গিয়ে আমরা বিলিতিতে যাকে বলি অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট বা মিটিং। হেসে বললুম,

—"দূর! কোথায় কে!"

—"তাহলে এক কাজ করো! সন্ধ্যের পর আমার ঘরে চলে এসো। এক সঙ্গে খাব।"

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে ড্রয়িং পেন্সিল দিয়ে ঠিকানাটা লিখে দিল। বলল,

—"নাও ধরো।"

তারপর বাঁ পকেট হাতড়ে বের করল দোমড়ানো কতগুলো দশ ফ্রাঁর নোট। মাথা দুলিয়ে মুচকি হেসে বলল,

—"দেখেছো, আজকে একেবারে রাজা ব্যক্তি। কিং অফ মোঁমার্ত্র্।"

চট করে একটা নোট আমার পকেটে গুঁজতে যেতেই আমি দু পা পিছিয়ে গিয়ে বললুম,

—"না হে, দরকার নেই!" আপন পকেটে হাত ছুঁয়ে হাসলুম, "আছে!"

আমার চোখে চোখ রাখল যিশু। স্থির চোখে কয়েক মুহূর্ত। বোধ হয় বোঝবার চেষ্টা করল আমি মিথ্যে বলছি কিনা। বলল,

—"ঠিক ?"

—"আজ্ঞে, হ্যাঁ মঁসিয় ! ঠিক ! পরে দরকার হলে চেয়ে নেবো।"

হা হা করে হেসে উঠল যিশু। বলল,

—"তোমার যখন দরকার হবে, তখনই যে আমার কাছে টাকা থাকবে—এমন আশা কোরো না বন্ধু।" তারপর ভদ্রমহিলার দিকে চোখের কোলে দেখে নিয়ে বলেছিল,

—"বুড়ি খচে যাচ্ছে। আমি যাই। ওর তোবড়ানো রঙিন থোবড়া বানিয়ে পঁচাত্তর, নিদেন পক্ষে পঞ্চাশ ফ্রঁা খসিয়ে নিচ্ছি। সন্ধ্যের পর চলে এসো তুমি। অপেক্ষা করব—" শেষের দিকে গলা তুলে বলতে বলতে তোবড়ানো মুখের দিকে চলে গিয়েছিল।

যিশুর চিরকুটটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হতভম্বের মতো তাকিয়ে দেখছি কপোতের পিঠ এবং কপোতির ধবধবে মুখের সামান্য অংশ। ওদের থেকে হাত দুয়েক পেছনে আমি। "আমিও জলের ঘটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, পড়ে গেল"—বন্ধ পায়খানার বাইরে দাঁড়িয়ে অ্যাতোগুলো কথা বোঝাতে গেলে যে ধরনের কাশির শব্দ করতে হয়, তাও করলুম দু'বার। কিসের কি। না রাম, না গঙ্গা। ওদের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। হাতের খুব কাছে আর কাউকে না পেয়ে মরিয়া হয়ে বলে ফেললুম,

—"মাফ করবেন। এটাই কি অমুক রাস্তা ?"

যুবকটি নট্-নড়ন্-চড়ন্-নট্-কিচ্ছু। ঘাড় ফিরিয়েও দেখলে না। শুধু গলা চড়িয়ে বিরক্তির শব্দ করে বললে,

—"না হে বাপু, এটা নরকের রাস্তা নয়!"

তার মানে বুঝলে তো, বউ! ঘুরিয়ে আমাকে নরকে যেতে বলছে। কচি গলায় মেয়েটির খিলখিল হাসি বাজল। ওর বাঁ চোখ দেখতে পাচ্ছি। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই বোধহয় মুখটি উঁচু করল। হাসতে হাসতেই চকচক করে দুটো চুমু খেল যুবকটির অদৃশ্য গালে। আমি তাকিয়েই ছিলুম। কি করব! ওদের যখন লজ্জাশরম নেই, তখন আমারও নেই। দৃশ্যমান সেই একটি চোখ আমার চোখে ফেলে মেয়েটি ভারি মিষ্টি গলায় বলল,

—"হ্যাঁ মঁসিয়। এটাই আপনার দরকারী গলি। ঢুকে যান।"

গলিটি বেশ অন্ধকার। কোনো দোকানপাট নেই। বড়জোর চারজন লোক পাশাপাশি হাঁটতে পারে। তিন চারটে বাড়ির পর আধো অন্ধকারে একটি প্রশস্ত

চত্বর। এখন আমার চারপাশেই বাড়ি। ডানদিকের কোলাপসিবল গেট দিয়ে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। ওঁকে যিশুর নাম বলে জানতে চাইলুম কোন্ বাড়ি।

—"পীয়ের ভ্যালমী!" একটু ভেবে বললেন, "শিল্পী তো। উঠে যান। এই বাড়িরই তিন তলায়।"

একেবারে লোড-শেডিংয়ের অন্ধকার কাঠের সিঁড়ি। হাতড়ে হাতড়ে তিন তলায় উঠে এলুম। তু'দিকে তুটি দরজাই বন্ধ। 'যা থাকে কপালে' করে বাঁদিকের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালুম। দেশলাই জেলে দেখলুম—না আছে নেমপ্লেট, না কলিং বেল। টোকা দিলুম আস্তে আস্তে। সাড়া নেই। আবার একটু জোরে দিলুম টোকা। খুট করে দরজাটি খুলল। ভেতরে খুব ঝাপসা আলোর আভাস। একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। গলা দিয়ে শব্দ বেরোতেই বুঝলুম মেয়ে। জিজ্ঞেস করলে,

—"উঈ!"

বললুম,

—"পীয়ের ভ্যালমী।"

অল্প পেছনে সরে গিয়ে পাশ হয়ে দাঁড়াল মেয়েটি। বললে,

—"ইণ্ডিয়ান পেইণ্টার? আসুন, ভেতরে আসুন।"

ছোট্ট প্যাসেজটি পেরিয়ে মৃত্ব আলোয় মাঝারি আকারের একটি ঘর। আসবাব বলতে একটি গদিওয়ালা মোড়া। মেঝে ঢাকা বিবর্ণ কার্পেটে। এত অল্প আলোয় রং বোঝা যাচ্ছে না। তু'পাশে দেওয়াল ঘেঁষে তুটি বিছানা পাতা। এলোমেলো কম্বল, চাদর, বালিশ। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বাঁদিকের বিছানায় যিশু বসে আছে। সেই লাল গলাবন্ধ সোয়েটার গায়ে। ওর মাথার কাছে কোণ ঘেঁষে খুব কম ওয়াটের বাল্‌ব্‌ ঝুলছে। গোলাপী রঙের কাগজ দিয়ে মোড়া। আমাকে দেখে একগাল হাসল যিশু। বলল,

—"এসো, এসো।"

ডান হাতে নিজের পাশের জায়গা চাপড়ে দেখাল,

—"বসে পড়ো।"

অন্য বিছানায় মেয়েটি বসেছে। যিশু আলাপ করিয়ে দিল,

—"অ্যানী! অ্যানব্রীট ওলসেন। মেয়েদের ফ্যান্সী পোশাকের ডিজাইন বানায়।"

অ্যানব্রীটের রুক্ষ চুল ঘাড় বেয়ে নেমেছে বুক অবধি। টলটলে গড়নের মুখে

কেমন একটু ফ্যাকাসে ভাব। কটা চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। পরনে ময়লা বাদামী কোট। কোমরে বেল্ট্। ফুল প্যাণ্টের পায়ের কাছে ছেঁড়া ছেঁড়া সুতো ঝুলছে। কুড়ি-বাইশ বছরের লম্বাটে চেহারায় ভরপুর যৌবন। তবে, উগ্র নয়। পা ছড়িয়ে বসে আছে। ডান হাতে সিগারেট। জলন্ত সিগারেটটি দেখিয়ে বলল,

—"চলবে নাকি ?"

ঘরে ফায়ার-প্লেস বা হীটার নেই। বাইরের মতো কন্‌কনে না হলেও শীতভাব জমে আছে চার দেওয়ালের মধ্যে। একটা উগ্র গন্ধ পাচ্ছি তখন থেকে। অনেকটা গাঁজার গন্ধের মতো। জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি আছে ওতে ?"

যিশু জবাব দিল,

—"হাশ্‌হিশ্‌। নাও, দম মারো !"

ওর হাত থেকে সিগারেটটি নিয়ে টানলুম। গোলওয়াজ সিগারেটের তামাক বের করে, হাশ্‌হিশ্‌ ভরে নিয়েছে। একটানেই কোলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে পৌঁছে গেলুম। সুদীপ্তর চোয়াড়ে মুখ ভেসে উঠল। নাটক-টাটক করতুম তখন। রিহার্সাল দিয়ে ফেরার পথে সুদীপ্তই সব যোগাড়-যন্তর করত। কল্‌কে, ভেজা ন্যাকড়া, গাঁজার পুরিয়া। তপন, সুদীপ্ত, করুণাময় আর আমি দেশপ্রিয় পার্কের ঘাসে বসে ঘুরে ঘুরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কল্‌কে ফাটাতুম আমরা। বহুকাল পরে, প্যারিসের এক ঘুপ্‌চি ঘরে বসে ওদের কথা মনে পড়ল। তিন-তিনটে নাটকীয় মুখ। ওরা কে কোথায় আছে, কি করছে কিছুই জানি না ! সময় ছিঁড়ে ছিঁড়ে এতগুলো বছরের পার ! শুধু মুখ তিনটি লালচে হয়ে টিকে আছে জলন্ত গাঁজার কল্‌কে ঘিরে।

—"আগে খেয়েছো কখনো ?"

যিশুর জিজ্ঞাসার জবাব দেবার আগেই অ্যানব্রীট হেসে ফেলল,

—"পীয়ের, তোমার নেশা হয়েছে ! কি বলছো যা তা। ইণ্ডিয়ার লোককে জিজ্ঞেস করছো হাশ্‌হিশ্‌ খেয়েছে কি না ?"

আমিও হেসে ফেললুম। বললুম,

—"তোমাদের ধারণায় কি সব ইণ্ডিয়ানই গাঁজাখোর ? আমার তো মনে হচ্ছে তোমারই নেশা হয়েছে অ্যানব্রীট !"

তিনজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলুম। যিশু বললে,

—"বল শিল্পী! কি যেন আলোচনা ছিল বলছিলে আমার সঙ্গে—বলে ফ্যালো।"

—"বলছি।" বলে আড়চোখে একবার অ্যানব্রীটকে দেখে নিলুম।

যিশু বললে,

"অ্যানের সামনে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কিছু নেই। আমার খুব পুরোনো বন্ধু। নিশ্চিন্তে বলে যাও।"

কি রকম পুরোনো বন্ধু জানো, বউ! একেবারে সেই ছোটবেলার। ওরা তখন লিয়ঁতে। ফ্রান্সের পশ্চিম সমুদ্রতীরে লিয়ঁ। যিশুর বাবা মারা যাবার পর মা আবার বিয়ে করলেন। যিশুর হাত সেই ছোটবেলা থেকেই ভালো। ইস্কুল শেষ হয়েছে তখন। বাড়িতে মন টিকতো না। চলে এলো প্যারিসে। প্রায় ন' বছর আগেকার কথা। এ:কোল দ্য বুজার্টে ড্রয়িং শিখে গত বছর চারেক মোঁমার্ত্রে আড্ডা জমিয়েছে।

যিশু হাসতে হাসতে বলল,

—"জানো শিল্পী, অ্যানী আমার থেকে কত ছোট? ওকে আমি কোলে তুলে ক্ষেতে, মাঠে ঘুরতুম।"

অ্যানী কপট ধমক দিল যিশুকে,

—"অ্যাই, মিথ্যুক কোথাকার! বাজে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি!"

তারপরেই আমার দিকে ফিরে হেসে বললে,

—"ওর কথা মোটে বিশ্বাসই করবে না। একে তো প্রচণ্ড গুল মারে, তার ওপর গাঁজা খাচ্ছে! ও ভীষণ পেটরোগা লিকলিকে ছিল ছোটবেলা। আমি ছিলুম নাদুস-নুদুস। আমার ছবি তোমায় দেখাবো'খন। ও যদি আমায় কোলে তোলার চেষ্টা করতো না, নিজেই লটৃপটিয়ে পড়ে যেত।"

যিশু হাসতে হাসতে বলল,

—"তা ঠিক, ওর তখনকার ছবির ওজনই ছিল কত, বাপ্‌স্!"

অ্যানী রাগ-রাগ মুখ করতে গিয়েও হেসে ফেলল। আমি জিজ্ঞেস করলুম,

—"তা, তুমি প্যারিসে এসেছো কদ্দিন?"

—"বছর চারেক।"

যিশু নতুন সিগারেটের তামাক বের করছিল দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে। অ্যানী যে বিছানায় বসে ছিল সেইটে দেখিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলুম,

—"ওটাতে কে থাকে?"

অবাক চোখে আমায় দেখল যিশু। বলল,

—"কে আবার। অ্যানী থাকে।"

—"অ!"

কেমন বোকার মতোন দিশী মতে জিজ্ঞেস করে ফেললুম,

—"তোমাদের দু'জনের বিয়ে হয়ে গেছে নাকি!"

আর যাবে কোথায়। হাসতে হাসতে যিশু প্রায় বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। হাসির ফাঁকে ফাঁকে শব্দ-অক্ষর বসিয়ে বলল,

—"শুনছো! শুনছো অ্যান্! গেঁইয়াটার কথার ধরন শুনছো!"

অ্যানীও হাসিতে যোগ দিয়েছে। তবে, অতটা সোচ্চার নয়। বোধ হয় চোখের ভুল আমার, ওর হাসির ধরন কেমন যেন একটু লজ্জা-লজ্জা!

যিশুর হাসি থামলে বললুম,

—"একেবারে গাঁজাখোরের মতো হাসলে দেখি! শেষ হল?"

আবার হোহো করে উঠল যিশু। বলল,

—"তোমার কথা শুনে হাসবো না তো কি অ্যানীর কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে বসব! পাগল কোথাকার!"

বুঝলে তো বউ, এই হচ্ছে ব্যাপার! স্বামী-স্ত্রী ছাড়া এক এক ঘরে যুবক-যুবতী রাত কাটাচ্ছে শুনলেই আমাদের মা-ঠাকুমাদের, শুধু মা-ঠাকুমা কেন, যে কোনো ভারতীয়েরই বোধ হয় চক্ষু কপালে উঠে যাবে। ঘেন্নায় ঘিনঘিনে গলায় 'ছ্যা-ছ্যা' করবে।

নতুন সিগারেটে হাশ্‌হিশ্‌ ভরে আমার দিকে এগিয়ে দিল যিশু। বলল,

—"তুমি ধরাও। অতিথি ব্যক্তি! পেস্‌সাদ করে দাও।"

ঠিক গাঁজার কলকে ধরার মতো করে ডান হাতের পাঁচ আঙুলে সিগারেটটি ধরলুম। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের মুঠি পেঁচিয়ে মোক্ষম টান দিলুম। চিড়িক চিড়িক করে আগুনের ফুলকি ছড়াল। যিশু, অ্যানী দু'জনেই হাততালি দিয়ে উঠল একসঙ্গে। যিশু বললে,

—"বা-বা! বাঃ! দারুণ তো!"

বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কনুই স্পর্শ করে সিগারেটটি ওর দিকে এগিয়ে দিলুম। গল্‌গল্‌ করে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললুম,

—"গাঁজা আমাদের দেশে এইভাবে খায়।"

যিশু বললে,

—"শিখিয়ে দাও, দোস্ত্। মোঁমার্ত্রের বন্ধুদের তাক্ লাগিয়ে দেব।"

অ্যানও আমার ডান পাশটিতে এসে বসল। খুব উৎসাহের গলায় বেশ খানিকটা আবদার মাখিয়ে বললে,

—"হ্যাঁ, শিল্পী! শিখিয়ে দাও তো আমাদের! প্লীজ!"
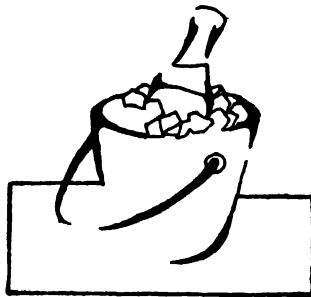
যিশুকে বললুম,

—"এক মাস হতে চলল এসেছি। যা পয়সাকড়ি এনেছিলুম তাও ফুরিয়ে এল প্রায়। একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতে হবে, না কি বলো?"

আমাদের দিশী মতে গাঁজা খাওয়া শিখতে গিয়ে হাত-ক্যাত পুড়িয়ে রান্নাঘরে চলে গেছে অ্যানী। রান্নাঘর বলতে তিন ফুট বাই তিন ফুট। রোগা প্যাসেজের লাগোয়া এক চিলতে বাক্স। তারই মধ্যে সরু টেবিলে হীটার। এখান থেকে অ্যানীকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ছ্যাঁক-ছোঁক ভাজাভুজির শব্দ আসছে।

যিশু বললে,

—"তা করতে হবে বৈকি! কি করতে চাও বলো?"

বললুম,

—"সেই পরামর্শই তো তোমার কাছে নিতে এসেছি।"

হাশ্‌হিশ্‌ বোধহয় ফুরিয়ে গেছে। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে যিশু জিজ্ঞেস করল,

—"একটু সাদা রাম আছে। খাবে?"

বললুম—"কেন খাবো না! অবশ্যই খাবো। তাছাড়া, ভাই যিশু, সাদা রাম খাওয়া তো দূরের কথা, জীবনে চোখেও দেখি নি।"

—"সে কী! ইণ্ডিয়ায় সাদা রাম পাওয়া যায় না?"

—"পাওয়া যায় কিনা জানি না। আমি অন্তত দেখি নি। হোয়াইট জিন খেয়েছি আর হোয়াইট বেঙ্গল খেয়েছি আমরা।"

দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো তিনটে থাক্। ওপরের থাক্ থেকে বোতল নামাতে নামাতে যিশু ঘুরে তাকাল আমার দিকে। জিজ্ঞেস করল,

—"হোয়াইট্ বেঙ্গলটা কি জিনিস?"

সাদা বাংলা দিশীর ব্যাপারটি বলতেই ও হাসতে লাগল। বলল,—"তাই বলো! আমি ভাবলুম বুঝি ওটা মদের নাম!"

—"মদের নামই তো। আমাদের মুখে মুখে ওই নাম দিকে দিকে প্রচারিত। গন্ধে গন্ধে দিক্‌দিগন্ত ভুর্‌ভুর্! বাংলা নম্বর এক এবং বাংলা নম্বর দুই।"

বোতলটি নামিয়ে এনে কার্পেটের ওপরে রাখল। তারপর, রান্নাঘর থেকে তিনটি কাঁচের গেলাস নিয়ে এসে বসে পড়ল যিশু। বলল,

—"তোমাদের মুখে মুখে প্রচারিত! তার মানে, অথরাইজ্‌ড্ নাম নয়। আমি ভাবলুম, আমাদের দেশে যেমন জায়গার নাম থেকে মদের নাম, তোমাদের হোয়াইট বেঙ্গলও বোধহয় তেমনি কিছু।"

জানো তো বউ, ফ্রান্সের একটি জায়গার নাম 'শ্যাম্পেন'।

দেশে থাকতে 'শ্যাম্পেন' বললেই বুঝতুম মদ। দামী মদ। তুমি হয়তো কাউকে জিজ্ঞেস করলে,

—"আপনি থাকেন কোথায়?"

ফরাসী ভদ্রলোক খুব বিনীত গলায় জানালেন,—"আজ্ঞে, আমি শ্যাম্পেনে থাকি!"

কি বুঝবে বলো! দারুণ সুন্দর সবুজ বোতলের তরল পদার্থের মধ্যে থাকি! চোখ কপালে উঠে যাবে না তোমার? আসলে শ্যাম্পেন নামক অঞ্চলে ওই ওয়াইনটি তৈরি হয় বলে ওর নামে নাম। বোর্দো ওয়াইনেরও একই ব্যাপার। বোর্দো শহরে তৈরি বলেই শহরের নামে নাম।

যিশু ডাক দিল—"অ্যানী!"

—"জরিভ!" রান্নাঘর থেকে অ্যানী জানাল আসছে।

বড় বোতলের মধ্যে আধ বোতলটাক সাদা রাম। আন্দাজে তিনটে গেলাসে ভাগ করে ঢেলে দিল যিশু। বলল, —"চাকরি করবে?"

চাকরি-বাকরি আমার পোষায় না সে তো তুমি জানোই, বউ। এখানে তিন মাস ওখানে আড়াই, সেখানে দশ দিন—এই হচ্ছে আমার চাকরির তেতো অভিজ্ঞতা। তাছাড়া আমাদের সেই বাউণ্ডুলে মহলে "চাকর-বাকর ক্লাস" একটা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের গালাগাল। তবু জিজ্ঞেস করলুম,—"কি চাকরি?"

—"অথরাইজ্‌ড্‌ কোনো চাকরি নয় কারণ, বিদেশীদের এখানে হুট করে পয়সা উপার্জনের উপায় নেই। চাকরি করতে গেলে সরকার তথা পুলিশের অনুমতি চাই। কাজ করার একটি কার্ড তোমাকে যোগাড় করতে হবে। সে অনেক হাঙ্গামের ব্যাপার। তোমার পাস্‌পোর্ট-ভিসায় তো নিশ্চয়ই 'ট্যুরিস্ট' ছাপ মারা, তাই না?"

—"হ্যাঁ!"

—"সেই জন্যেই শুধু খাওয়ার খরচ তোলার মতো একটা সাদামাটা কাজ জোটাতে হবে তোমার জন্যে। যেমন ধরো, রেস্তোরাঁর ভেতরে কাপ ডিশ ধোয়া মোছার কাজ। রোজকার পয়সা রোজ পেয়ে যাবে।"

গেলাসে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলুম। কাশতে কাশতে চোখে জল এসে গেল। ঝাপসা চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি গুরুগম্ভীর মুখ। কীর্তনখোলা নদীর গায়ে মফঃস্বল শহর। সেই শহরের ডাক্তারবাবুর মুখ। চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা। পরিষ্কার করে গোঁফ-দাড়ি কামানো মুখে বয়েসের দু' একটি রেখা।

স্যুট্ টাই পরে ফিটন গাড়িতে উঠছেন। কোচোয়ান সেলাম জানানোর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। পেছনে ব্যাগ হাতে কালীপদ। চাকর কালীপদর মুখটা স্পষ্ট মনে নেই আজ। শুধু ফতুয়া গায়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়ানো বা হাঁটার ভঙ্গিটুকু বেঁচে আছে। ফিটনের সাদা তেজী ঘোড়া সামনের পায়ে সিমেন্টের রাস্তা ঠুকছে। ঠক্‌ঠক্ শব্দ হচ্ছে ক্ষুরের। লেজের ঝাপটা মারছে নিজের শরীরে। সাদা ঘোড়ার গায়ে বাদামী ছোপ।

ডাক্তারবাবু 'কলে' বেরুচ্ছেন। তুমি তাঁকে দেখো নি, বউ। গ্রুপ ছবিতে দেখে থাকবে হয়তো। তখনকার আমলে পূব বাংলার সেই মফঃস্বল শহরে একটি মাত্র মোটরগাড়ি। উকিল মাখনবাবুর জগদ্দল। ঝর্‌ঝর্ শব্দ তুলে সদর রাস্তা দিয়ে যখন যেত, আমরা ছেলেরা পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় লাফাতুম। দু' একজন গাড়ির পেছন-পেছন ছুটত খানিক দূর। উকিলবাবুর হাওয়া গাড়ি আর ডাক্তারবাবুর ফিটন। দু'টিই খুব বিখ্যাত আর সম্ভ্রান্ত ব্যাপার ছিল তখন। ডাক্তারবাবু ফিটনে উঠতে উঠতে ভুরু কুঁচকে যেন ফিরে তাকালেন। তাকিয়ে বললেন,—"কি বললে! আমার ছেলে রেস্টুরেন্টে কাপডিশ ধুচ্ছে!! ও যেন এ বাড়িতে আর ফিরে না আসে।" বলে খুব গম্ভীর মুখে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন।

তারপর, আমার দাদু। আমি তাঁকে চোখে দেখি নি। বেঁটে-খাটো মানুষটির জাঁদরেল গোঁফওয়ালা ছবি দেখেছি। নদীর পারে গ্রাম। সেই গ্রামের জমিদার। দেশ-ভাগের পর একটা সময় ছিল যখন প্রায় সব বাস্তুহারারাই নাকি বলে বেড়াত, তাদের বাপ-ঠাকুর্দারা জমিদার। কলকাতার লোকে হাসতো। আমার দাদু সত্যি-সত্যি জমিদার হওয়া সত্ত্বেও মুখ ফুটে কলকাতার ইস্কুলের বন্ধুদের বলি নি। ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেবে বলেই বলি নি। অথচ, সেই গ্রামে আমি বার তিনেক গিয়েছি। বিশেষ কিছুই মনে নেই। শুধু কালীপূজোর সময় মোষ বলি দেখেছিলুম মনে আছে। ছাতে উঠে দিদিমার কোলে চেপে দেখেছিলুম, দড়িতে বাঁধা মোষটা লাফাচ্ছে। দশাসই মোষ। তারপর হঠাৎ কে যেন রামদা দিয়ে এক কোপে তার মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলাদা করে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছড়াচ্ছিল। দিদিমা কার্নিস থেকে সরে এসেছিলেন আমাকে নিয়ে। অনেকগুলি ঢাকের শব্দ, হুলুধ্বনি আর মা কালীর জয়জয়কার ভেসে আসছিল। খারাপ লোকেরা বলত, দাদু নাকি মাঝে-মধ্যে আশে-পাশের গ্রামে ডাকাতি করতেন রাত্তিরে। গুম্ খুন করতেন। হতে পারে, আমি জানি না বউ। আমি যা জানি তা হল আমার দাদুর বিছানার শিয়রে দু'পাশে দু'টি হাঁড়ি থাকতো নিত্যদিন। বাঁ পাশের হাঁড়িতে থাকতো রসগোল্লা, ডান পাশে চম্‌চম্। ঘুম ভাঙলে, ভালো করে চোখ খোলবার আগেই যে পাশ ফিরে শোয়া অবস্থায় থাকতেন সেই পাশের হাঁড়ি থেকে মিষ্টি তুলে মুখে দিতেন। চিৎ হয়ে ঘুম ভাঙলে রসগোল্লা চম্‌চম্ দুটোই খেয়ে ফেলতেন। এক দলা মাখন মিশিয়ে পাথরের বাটিতে খেতেন চা। সকাল এগারোটায় বেরোতেন মর্নিং ওয়াকে। সেই দাদু চম্‌চম্ চিবোতে চিবোতে দিদিমাকে বললেন, —"কি কইলা! আমার নাতি হোটেলে থালাবাসন ধোয়। গোঁসাইরে কইয়া গ্যাও, শঙ্কর মাছের চাবুকটায় য্যান্ ত্যাল মাখাইয়া রাখে। যাইবে কোথায় হারামজাদা—পূজোয় আইথে হইবে না!" বলে গোঁফের তলা দিয়ে একটা রসগোল্লা মুখে পুরে দিলেন।

যিশু বলল,—"এক ঢোক গিলে ফেলো, কাশি থেমে যাবে।"

গেলাসে চুমুক দিয়ে বললুম,—"ঠিক আছে! কাপডিশ ধোবার চাকরিই সই। কোন্ রেস্তোরাঁয়?"

—"খোঁজ নিতে হবে দোস্ত্! দু'একদিনের মধ্যেই কোথাও লাগিয়ে দেব তোমায়।"

অ্যানী এসে বসে পড়ল। যিশু ওর হাতে গেলাস ধরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল,

—"অতিথি সৎকারের কি ব্যবস্থা হল ?"

অ্যান্ আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, "হিচকক্ !"

একেবারে বলদের মতো মুখ করে যিশুর দিকে তাকালুম। ও হাসছে। অ্যানের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলুম—"হিচকক্ মানে ?"

—"আলফ্রেড হিচকক্।" গেলাসে চুমুক দিয়ে তেমনি গম্ভীর গলায় অ্যানের জবাব।

যিশু হাসছে! হিচকক্ মানে যে আলফ্রেড হিচকক্ সে তো জানা কথা। গূঢ় ব্যাপারটি ধরতে পারছি না। এটা নিশ্চয়ই ওদের দু'জনের মধ্যে কোনো কোড্ ল্যাংগোয়েজ। বিখ্যাত চিত্র পরিচালকের নামটিকে এরা হয়তো কোনো খাদ্য বস্তুর নাম হিসেবে ব্যবহার করে। হিচককের গোবদা লালচে মুখটি একটি প্লেটে কল্পনা করে আমিও হেসে ফেললুম!

যিশু হাসতে হাসতে বলল,—"কোনো কিছু 'সাসপেন্স' রাখতে গেলে আমরা বলি হিচ্কক্।"

বোতলের তলানিটুকু আমার গেলাসে ঢেলে দিল যিশু। মাথার মধ্যে একটা কথা তখন থেকে ঘুরছিল। দুম্ করে বলতে গেলুম,—"আচ্ছা যিশু! একটা কথা বলি—

আচমকা অ্যানের হাসি শুনে থেমে গেলুম। ও একেবারে দুলে দুলে গলা ছেড়ে হাসছে। হাসতে হাসতেই যিশুর দিকে তর্জনী তুলে বলল,—"শিল্পী বলে কি পীয়ের? ও কি তোমাকে জিসাস বলে ডাকে নাকি ?" আবার হাসি।

যিশুও মিটিমিটি হাসছে। আমি বললুম,

—"হ্যাঁ মাদ্মোয়াজেল! জিসাস বলেই ডাকি। কারণ, ওর চুল-দাড়ি মুখের গড়ন অনেকটা যিশুখৃষ্টের মতো।"

হাসতে হাসতে হঠাৎ থেমে একেবারে গম্ভীর হয়ে গেল অ্যানী। বিছানার ওপর যিশুর দিকে মুখ করে হাঁটু মুড়ে বসল। নিজের কপালে, বুকের মধ্যিখানে এবং দু' পাশে ডান হাত স্পর্শ করে ক্রশ করল। মুখে বলতে লাগল—"ও নম দু প্যার—এ দ্যু ফিল্—এ দ্যু সাঁতেস্পিরি—অঁ সী—সোয়াৎ-ইল্—"

আমিও উঠে ওর পাশে চলে এলুম। হাঁটু মুড়ে বসে ইংরিজিতে ওর সঙ্গে গলা মেলালুম,—"ইন্ দ্য নেম অফ দ্য ফাদার—অ্যাণ্ড্ অফ্ দ্য সান্—অ্যাণ্ড্ অফ্ দ্য হোলি স্পিরিট—আমেন!"

যিশুর মাথার ওপরে গোলাপী আলো। ডান পাশের চুলে, কপালে, গালে

ছেঁড়া কাগজের মতো গোলাপী আলো লেগে রয়েছে। ও বসে বসেই ডান হাত তুলে রেখেছে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। ফরাসী-ইংরিজিতে আমাদের দু'জনের কণ্ঠস্বর মিলেমিশে প্রার্থনার শব্দগুলি ঝন্‌ঝন্‌ করে দেওয়ালে দেওয়ালে ঘুরতে লাগল। আমরা দু'জনে থামতেই ও বলল,

—"আমেন।"

বলেই গলা ছেড়ে হেসে উঠল। কেমন একটা ঝিম ধরে গিয়েছিল ভেতরে। অ্যানীও দু'এক মুহূর্ত আচ্ছন্নের মতো বসে ছিল। তারপর, একে একে আমরা দু'জনেও হেসে উঠলুম। আবার পা ছড়িয়ে যে যার জায়গায় বসে পড়লুম। তিনজনে গেলাস হাতে তুলে বললুম, চীয়ার্স। এক ঢোকে তলানিটুকু শেষ করে অ্যানী প্রথম কথা বলল,—"পীয়ের, তোমাকে কিন্তু সত্যিই কেমন যেন জিসাস্-জিসাস্ মনে হচ্ছিল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল।"

যিশু হাত তুলে থামিয়ে দিল ওকে। বলল,—"ঠিক আছে, বুঝেছি! হাশ্‌হিশের ওপর রাম পড়লে অমন অনেক কিছুই মনে হয়!" তারপর আমার দিকে ফিরে বলল,—"হ্যাঁ শিল্পী! বলো, তুমি কি বলছিলে?"

অ্যানী তড়াক করে লাফিয়ে উঠল,

—"ঐ যাঃ! স্যুপটা বোধহয় শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল—" বলতে বলতে ছুটল রান্নাঘরে। ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলুম। তারপর, মুখ ঘুরিয়ে যিশুকে বললুম,—"বলছিলুম কি, তোমাদের মোঁমার্ত্রের বাজারে ঢুকে পড়লে কেমন হয়?"

—"তার মানে?"

—"একটা ড্রয়িং বোর্ড, ক্রেয়ন পেন্সিল আর কিছু প্যাস্টেল রং নিয়ে আমিও যদি তোমাদের সঙ্গে ভিড়ে যাই তো কেমন হয়?"

চুপ করে একটু সময় আমার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ও বলল,

—"খুব রিস্কি ব্যাপার!"

—"কি রকম?"

—"পুলিশ আছে, মিউনিসিপালিটির চর আছে। ঝপ্‌ করে ওদের কেউ এসে যদি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করে?"

—"কি চ্যালেঞ্জ করবে?"

—"তোমার কাজ করার পারমিট!"

—"অতগুলো লোকের মধ্যে হঠাৎ আমাকেই বা চ্যালেঞ্জ করতে যাবে কেন?"

—"ওখানে সকলেই মোটামুটি পরিচিত মুখ। পুলিশের লোকজনও মাঝে মধ্যে টহল দেয়। তাছাড়া, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো, তোমার মতো ব্রাউন চেহারার কোনো শিল্পী ওখানে নেই।"

"না, ব্রাউন চেহারার শিল্পী নেই বটে। তবে, জাপানী শিল্পী তো রয়েছে দেখলুম!"

—"ওরা এখানকারই বাসিন্দা। গল্‌গল্‌ করে ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারে। ওদের কাজ করার পারমিটও রয়েছে।"

নাছোড়বান্দার মতো বললুম,—"আমার ফরাসী কি একেবারে অখাদ্য বলছো?"

হেসে ফেলল যিশু। গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে একটা গোলওয়াজ ধরাল। বলল,

—"তোমার উচ্চারণ খারাপ নয়। তবে, বেমক্কা উল্টোপাল্টা শব্দ ব্যবহার করে ফ্যালো। মাঝেমধ্যে আবার ইংরিজিতে!"

—"তার মানে কাজ চলবে না বলছো?"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব ভারিক্কি চালে মাথা দোলালো যিশু। বলল,

—"চলবে। চলবে না কেন? শুধু ওই পুলিশ আর কাজ করার পারমিট আমায় চিন্তায় ফেলেছে একটু।"

ওর চোখ দেখে বুঝলুম আমার প্রস্তাবটি নিয়ে ভাবছে। এক ঢোকে আমিও গেলাসের তলানিটুকু শেষ করে ফেললুম। রান্নাঘর থেকে অ্যানের গলা শুনতে পেলুম,

—"মঁসিয় জিসাস! ওয়াইনের বোতল, গেলাস এবং প্লেট সাজিয়ে ফ্যালো। আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

—"হ্যাঁ, ডার্লিং! আমার আশীর্বাদে তুমি পরজন্মে প্যারিসের সবচেয়ে সেরা হোটেল ম্যাক্সিমের সবচেয়ে ভালো রাধুঁনি হও—এদিকে আমি সব যোগাড়-যন্তর করছি।"

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে যিশু আমায় বলল,—"দাঁড়াও শিল্পী, তোমার ব্যাপারটি আমি একটু ভেবে বলছি।"

তাক্ থেকে তিনটে প্লেট, তিন জোড়া ছুরি-কাঁটা নামিয়ে হাতে হাতে আমরা দু'জনে মিলে কার্পেটের ওপরে সাজিয়ে ফেললুম। এতক্ষণ খেয়াল করি নি, ঘরের বিপরীত কোণে প্যাকিং বাক্সের ওপর দুটি বোতল রাখা ছিল। ওখান থেকে ওদের

তুলে এনে কার্পেটে বসিয়ে দিল যিশু, প্লেট তিনটির কাছাকাছি। রেড ওয়াইনের বোতল। বোর্দো ওয়াইন। এখানে জল বড় একটা কেউ খায় না। বউ, তুমি তো জানো, সকালে খালি পেটে এক গেলাস জল না খেলে আমার পেট সাফ হয় না। আশেপাশে জলের বন্দোবস্ত নেই দেখে, হোটেলের বেসিন থেকে জল খেয়েছিলাম দিন দুয়েক। খেয়ে পেটের গোলমাল। দিশী বড়ির প্যাকেট হাতে রেস্তোরাঁয় জল চাইতে, বেয়ারা প্রথম তো বুঝতেই পারে না। শেষে তিন চার টুকরো বরফ এনে দিয়েছিল গেলাসে। বলেছিল—"বিদেশীমশায়, এইগুলো গলে গেলে জল হিসেবে খেয়ে ফেলো।" জানুয়ারীর জমপেশ শীতে তিন টুকরো বরফ গলে জল হতেও যথেষ্ট সময় লেগেছিল। এখানে খাবারের সঙ্গে বীয়ারও বড় একটা কেউ খায় না। ওয়াইন। নানান রকম ওয়াইনের সঙ্গে খাবারদাবার চলতে থাকে। সাদা ওয়াইন, লাল ওয়াইন। শ্যাম্পেন, গ্রাঁ এশেস। মুতঁ রথশীল, রীশবো।

যিশু ট্রেতে করে তিনটে চীনে মাটির রেকাবী ও একটা বড় পাত্রে স্যুপ নিয়ে এসে হাজির। গন্ধে গন্ধেই টের পেলুম এখানকার প্রচলিত পেঁয়াজের স্যুপ। ধোঁয়া উঠছে পাত্র থেকে। কার্পেটে ওগুলো সাজাতে সাজাতে যিশু বলল, —"কোৎ দ্য বিউফ্ স্তেক হচ্ছে আজকের আসল ডিশ। তোমার জন্যেই অ্যান বানিয়েছে—স্পেশাল।"

বউ, ওই স্পেশাল ব্যাপারটি হল গিয়ে গরুর পাঁজর ভাজা। বাবা নিজে নামী-দামী ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বাড়ির অসুখ-বিসুখ তাড়ানোর দায়িত্ব ছিল যদু ডাক্তারের ওপর। নেহাত প্রয়োজন না হলে বাবা তাঁর জীবিত অবস্থায় আমাদের কারো নাড়ি দেখেছিলেন বলে জানা নেই। তখন সদ্য টাইফয়েড থেকে উঠেছি। যদু ডাক্তারের ওষুধ আর দুধ-বার্লি খেয়ে খেয়ে হয়রান। বাবা নিয়মমাফিক যখনই হোক দিনে একবার জিজ্ঞেস করে যেতেন কেমন আছি। সেদিন, যদুবাবুর নির্দেশে কালীপদ একজোড়া মুর্গীর ডিম আধসেদ্ধ করে আমার বিছানার পাশে রেখে গেছে। তখনও খোলস ছাড়ানো হয় নি। আমি উঠে বসে খাবো-খাবো করছি, ফিটনগাড়ি থেকে ডাক্তারবাবু নেমে এসে ঘরে ঢুকলেন। কোটের পকেটে স্টেথিস্কোপ। বললেন,

—"কেমন আছ?"

উঠে বসে বললুম,—"ঠিক আছি।"

বাবা হেঁটে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। পেছনে ব্যাগ হাতে কালীপদ। এক পা

এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। ডাক্তারবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল। কালো মোটা ফ্রেমের চশমা চোখ থেকে নামিয়ে হাতে নিলেন। আমার টেবিলের সামান্য কাছে এসে কালীপদর দিকে ঘুরে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন,

—"এত ছোট ডিম কোত্থেকে এল?" কালীপদ বলল,—"আজ্ঞে, মুর্গীর ডিম।" ডাক্তারবাবু বললেন,—"কে বলেছে দিতে? যদু ডাক্তার?" মাথা চুলকে কালীপদ বললে,—"আজ্ঞে!" বাবা হেঁটে যেতে যেতে বললেন,—"কালী, ওগুলো বাড়ির বাইরে ফেলে দে। আমাদের হাঁস যা ডিম পেড়েছে, তার থেকে ওকে হাফ বয়েল করে দে।"

এক পলক ঘুরে তাকিয়ে আমাকে বললেন,—"হাঁসের ডিমের হাফ বয়েল খাও তুমি। আমাদের বংশে মুর্গী বা মুর্গীর ডিম কেউ ছোঁয় নি! ওগুলো খেও না, কেমন!" বলে চলে গেলেন।

আমি কি বলব! বাবার আমলে আমিষ বলতে পাঁঠার মাংস, মাছ এবং হাঁসের ডিম। মুর্গীর ডিম, হাঁসের ডিমে তফাতটা কোথায় কে জানে! আস্তে ঘাড় নেড়ে বাবাকে সায় দিলুম বটে। মনে মনে ঠিক করে নিলুম, চান্স পেলে উটপাখির ডিমও আমি খেয়ে দেখব বড় হয়ে!

গরদ পরে দু'-বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক করতেন বাবা। কখনো খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে ওঁর গম্ভীর গলায় গীতাপাঠ শুনতে পেতাম, "ত্বমাদি দেব পুরুষপুরাণ, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরমনিধান—" এহেন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের ঘরে মুর্গীর ডিম ঢুকে পড়ায় সমস্ত বাড়ি সেদিন শুদ্ধজল দিয়ে ধোয়া হয়েছিল মনে আছে। ডাক্তারবাবু গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে গোময় খেয়েছিলেন কিনা জানা নেই। তবে, ওঁর মৃত্যুর পর এই কুলাঙ্গার সন্তান হাঁস-মুর্গী-ঘটিত বহু প্রশ্নের জবাব খুঁজে না পেয়ে কলকাতার ইস্কুলে শেষ ক্লাসে উঠে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে 'নিজামে' গিয়ে ওদের বিখ্যাত বীফ রোল খেয়েছিল। খেতে যে খুব আহামরি কিছু, তা নয়। তবু, নিষিদ্ধ খাদ্য যখন, খেয়ে তো দেখতেই হয়, কি বলো বউ। দেখো আবার, তুমিও তো সৎব্রাহ্মণ কন্যা, এসব শুনে ভিরমী খেও না যেন!

যাক্, যা বলছিলুম, সেই নিষিদ্ধ খাদ্য এতো বছর বাদে আবার আমার সামনে এসে হাজির। বেশ বড়সড় এক চাকা মাংস ভাজা। ছুরি দিয়ে কাটতেই ভেতরে চিন্‌চিনে রক্তের আভাস। অ্যানকে বললুম,—"ভালো করে ভাজা হয় নি মনে হচ্ছে।"

একগাল হেসে ও জানিয়ে দিলে,—"না মশাই, এটা আমাদের একটা ফেবারিট ডিশ। হাফ ফ্রায়েড।"

প্যারিসিয়েঁদের ফেবারিট ডিশ যখন, কি আর করব, অঢেল মাস্টার্ড ঢেলে স্যালাড মিশিয়ে সেই আধ-ভাজা গরুর পাঁজর চিবোতে লাগলুম। চোদ্দ পুরুষের মুখগুলির চেহারা আমার জানা নেই। অজানা, অনাত্মীয় সেইসব মুখ আমাকে বিরক্ত করে না। চোখের সামনে যিশুর মুখ আমার দিকে চেয়ে হাসছে। অ্যানের পোর্ট্রেটে জিজ্ঞাসা,—"কেমন লাগছে শিল্পী ?"

এক ঢোক ওয়াইন খেয়ে খুব উৎসাহের গলায় বললুম,—"খাসা রান্না হয়েছে অ্যান! এমন জিনিস সত্যিই আমি জীবনে খাই নি।"
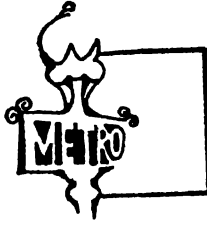
যিশুর প্যাকিং বাক্সটির ওপরে বসে আছি। হাতে ড্রয়িং বোর্ড। কাঁধের শান্তি-নিকেতনী থলের ভেতরে প্যারিসে কেনা প্যাস্টেলের বাক্স, ক্রেয়ন, পেন্সিল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে তিনটি লোকের সঙ্গে কথা বলছে যিশু। ওরা কথার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখছে। আমি যথাসম্ভব একটি গোবেচারা মুখ বানিয়ে চারপাশে তাকাচ্ছি। মোঁমার্ত্রের বাজার এখনো ভালো করে শুরু হয় নি। সকাল সকাল এসে পড়েছি আমরা। গত তিন দিন বৃষ্টি ছিল না বলে বাজার বসেছিল। আজও বৃষ্টি হবে না এই আশায় এক এক করে শিল্পীরা এসে জুটছে খোলা চত্বরে। সূর্যের পাত্তা নেই। ছোটাছুটি নেই মেঘের। অনড় এক ধূসর আচ্ছাদনে সারা আকাশ গম্ভীর। বাতাসও বইছে না তেমন। তবু, নাক-কান-কপাল ঠাণ্ডায় হিম হয়ে যাচ্ছে। হাতে হাত ঘষে আঙুলগুলি গরম রাখার চেষ্টা করছি। খোলা চত্বরের চতুর্দিকে তিন-তলা, চার-তলা বাড়ির দু-একটি ছাড়া সবই প্রায় পুরোনো আমলের। কোণের দিকের একটি বাড়ির নিচের তলায় রেস্তোরাঁ। তার পাশে তাজা আলু ভাজার দোকানটি। সব সময় আলু ভাজা হয় না এখানে। আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর। ভাজাভুজির খবর মুহূর্তের মধ্যে সারা বাজারে ছড়িয়ে যায়। ছোট্ট দোকানটির সামনে লম্বা লাইন লেগে যায় তখন। গরম

গরম আলুভাজা দশ-পনেরো মিনিটে শেষ। শীতের সকালে ও জিনিস একেবারে 'হট্-কেকে'র মতো চলে এ রাজ্যে।

ছোট্ট দোকানটিতে বসবার জায়গা নেই। অনেকটা কলকাতার তেলে ভাজার দোকানের মতো। হাতে-হাতে কাগজে মুড়ে নিয়ে নাও। হাতে-হাতে ঘুরতে ঘুরতেই শেষ। তিন চারজন দাঁড়িয়ে আছে দোকানটির সামনে। তার মানে, আলুর টুকরো তেলের কড়াইতে ছাড়া হয়েছে। এক্ষুনি লম্বা লাইন লাগল বলে। পাশের রেস্তোরাঁয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে কয়েকটি শিল্পী। কাজে লাগবার আগে গরম কালো কফি খেয়ে নিচ্ছে। এখানে চায়ের বড় একটা কদর নেই, বউ। শুধু কফির ছড়াছড়ি। দুধ দিয়ে কফি, ক্রীম দিয়ে কফি, কালো বড় কিংবা ছোট কফি। প্যারিসিয়েঁরা চা যে একেবারেই খায় না তা নয়, তবে সংখ্যায় তারা নিতান্তই অল্প।

শেষ চা খেয়েছিলুম প্রায় মাসখানেক আগে। জর্জের বাড়িতে। স্টালিনের গোঁফওয়ালা জর্জ বোয়াগুনতিয়ে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে জর্জ বলেছিল, মনে আছে।

—"চা আমি ছেঁকে খাই না।"

গোঁফের চা রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে আবার বলেছিল,

—"এই পেল্লায় গোঁফই আমার ছাঁকনির কাজ করে দেয়।"

ও সেদিন ঠিক সন্ধ্যে সাতটায় এসেছিল হোটেল দ্য ওরিয়েণ্টে। গাড়ি চালিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে আমাকে নিয়ে পৌঁছেছিল ওর বাসায়। প্যারিস শহরের সীমানা ছাড়িয়ে ম্যালমেজোঁ। কানাগলির শেষ বাড়িটি জর্জের। একতলায় তিনটি ঘর। বাইরের ঘরে আলো জ্বলছিল। গাড়ির শব্দ পেয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল জানী। ঝকঝকে হাসিমুখে জর্জের বউ। কালো বেল-বটম্ ট্রাউজার এবং ঘন বেগুনী রঙের পুরো হাতা সোয়েটার পরনে। ডান হাত এগিয়ে দিল আমার দিকে, বলল,

—"এসো, এসো ইণ্ডিয়ান পেইণ্টার। ভ্যানগগের ছবি কেমন দেখলে বল?"

হাত মিলিয়ে অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলুম,

—"তুমি জানলে কি করে? জর্জ কি বিকেলে আবার বাসায় ফিরে এসেছিল নাকি!"

—"আরে বাপু! সাদামাটা একটা টেলিফোন তো গরীবের ঘরে আছে এখনো!"

জর্জ গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে ফিরে এল। দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল,

—"জানী! এই গরম দেশের লোকটি বরফ হয়ে যাবার আগেই ঘরে ঢুকিয়ে নিলে হত না?"

সত্যিই, শীতের সন্ধ্যায় আমার প্রায় জমে যাবার দশা। কুয়াশা এবং শীতকে বাইরে রেখে ঘরে ঢুকে পড়লুম আমরা। ইস্কুলে পড়া 'বিশপ্‌স্ ক্যাণ্ডল্‌ষ্টিক্‌স্' মনে পড়ল। তোমাদের পাঠ্য ছিল কিনা জানি না বউ। আমার যেটুকু, যেভাবে মনে আছে, বলছি। বাইরের ঠাণ্ডায়, বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপতে কাঁপতে এসে ঘরে ঢুকলেন বিশপ। কে যেন বসেছিল ঘরে। তাকে বললেন,

—"অ্যাঃ। কি আরাম। এই শীতকালের বৃষ্টি-বাদলায় বাইরে যাবার একটাই আনন্দ। ঘরে ফিরে এলেই গরম ঘরটি আরো বেশী করে ভালো লাগে।"

বসবার ঘরে ঢুকলেই মনে হয় এদের বেশ সচ্ছল অবস্থা। আমার এই মনে-হওয়া যে কতখানি ভুল তখন বুঝি নি। কারণ, মেঝেয় দামী কার্পেট বিছানো। সারা ঘরের একটি দেওয়াল ঘেঁযে লম্বা, নরম গদিওয়ালা সোফা। তার খানিকটা জায়গা আবার হরিণের চামড়া দিয়ে মোড়া। এই দেওয়ালের উল্টো দিকে ফায়ার প্লেস। গম্‌গম্ করছে আগুন। তার পাশের দেওয়ালে বেশ বড়-সড় কাচের আলমারিতে দামী দামী বইপত্র এবং অজস্র শৌখীন জিনিস সাজানো। মোট কথা, ভারতবর্ষে এমন শিল্পী খুব বেশী নেই যার বসবার ঘরের চেহারায় এমন সম্ভ্রান্ত ছাপ ফুটে আছে। তার ওপরে জর্জ বা জানী বোয়া-গুনতিয়ে সস্তা কমার্শিয়াল শিল্পী নয় অথবা এদের নাম 'দিকে দিকে প্রচারিত' এমন কথাও বলা যাবে না। তবু, এরা শিল্পী। ফরাসী রাজ্যের ফাইন আর্টিস্ট। শিল্পই যাদের সাধনা, শিল্পই যাদের রোজগারের পথ। গাড়ি আছে, গাড়ি রাখার গ্যারেজ আছে। টেলিফোন এবং হরিণের চামড়ায় মোড়া সোফা আছে বাড়িতে। ঈর্ষা ঠিক বলা যাবে না, বউ, তবু এমন একটা মনের ভাব এলো যা তোমার কাছে চেপে রাখতে ইচ্ছে করছে না। মনে হল, ইস! এমনি দু' একটা ঘর, একটি ছবি আঁকার স্টুডিও, চার চাকার মোটর গাড়ি আর সাদামাটা টেলিফোন যদি আমার নামের পেছনে থাকত, তাহলে আমি দেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হিসেবে গ্যাঁট হয়ে বসে ইচ্ছে মতন ছবি আঁকতে পারতাম। 'অন্ন ভক্ষ ধনুর্গুণ' অবস্থায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হত না।

জানী বলল,

—"হাঁ করে দেখছো কি! কোটটা খুলে দাও, টাঙিয়ে রাখি।"

ওর হাতে কোটটা দিতে দিতে বললুম,

—"দেখো, যাবার সময় যেন আবার ভুলে ফেলে না যাই!"

জর্জ পাশের ঘরে গিয়েছিল। ওখান থেকেই গলা তুলে বলল,

—"না হে, তোমার ভুলে যাবার উপায় নেই! সে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি! যাবার সময় দরজা খুলে বেরোলেই কোটের কথা তোমার মনে পড়তে বাধ্য। দু' এক ঘণ্টার মধ্যেই প্যারিসে বসন্ত আসবে বলে তো বোধ হচ্ছে না।"

আমরা দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠলুম। ফিলিপ এসে ঢুকল ঘরে। কপালের ওপরে চুল, গায়ে সাদা সোয়েটার। আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে শুভ-সন্ধ্যা জানাল,

—"বঁ সোয়া, মঁসিয়!"

সরল, বোবা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। হরিণের চামড়ার ওপরে গিয়ে বসলুম। ওকে বললুম,

—"এসো! আমার পাশে এসে বোসো।"

ও গুটি গুটি পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল। বসল না। জিজ্ঞেস করলুম,

—"তোমার পড়া হয়ে গেছে?"

মুখ খুলল না। ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে জানী বলল,

—"তোমরা কথা বল, আমি হুইস্কি নিয়ে আসছি।" তারপরেই ঘুরে আবার জিজ্ঞেস করল,

—"শিল্পী, তুমি অ্যাপারেতিফ কী পছন্দ করো? হুইস্কি না রাম?"

হেসে জবাব দিলুম,

—"অ্যালকোহল হলেই হল! লেবেল দিয়ে কি হবে? পেটে পড়লেই একটু ঝিম ধরবে—সেইটেই বড় কথা!"

জানী হাসতে হাসতে চলে গেল।

ফিলিপ মায়ের চলে যাওয়া দেখল। আমার আরো একটু কাছে এগিয়ে এসে নীচু গম্ভীর গলায় বলল,

—"মঁসিয়, মাপ করবেন! একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

—"হ্যাঁ নিশ্চয়ই! কি বলো তো?"

এক মুহূর্ত আমার চোখে চোখ ফেলে চেয়ে থাকল। তারপর, হঠাৎ জিজ্ঞেস করল,

"আপনিও তো ছবি আঁকেন মা বলছিল। আচ্ছা, মঁসিয়, ছবি আঁকা কি দোষের ?"

বউ, এমন প্রশ্ন আমার জীবনে আজ অবধি কেউ করে নি, এক ওই সনাতন ছাড়া। আর্ট কলেজের সনাতন ঘোষাল। একই ক্লাসে পড়তুম আমরা। গোলগাল সংসারী চেহারা। খুব পরিশ্রম করত। ছবি আঁকা শিখতে যথেষ্ট পরিশ্রম করত। একদিন একটি ট্রামের টিকিট হুবহু নকল করে দেখিয়েছিল। ও ছিল কমার্শিয়াল আর্টে। আমরা সবাই ঠাট্টা করে বলেছিলুম ওকে, "পাস করে তুই জাল নোট বানাতে লেগে যা—একমাসে কোটিপতি— !" আসলে, সত্যিই আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম ওর ফিনিশিংয়ের ক্ষমতা দেখে। এমন কি মাস্টারমশাইরা পর্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন। সেকেণ্ড ক্লাস টিকিটের হলদে রঙের ওপর অত ছোট ছোট হরফ আমাদের তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছিল। সেই সনাতনের সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা। কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসার প্রায় বছর চারেক বাদে, সরস্বতী পুজোর সময়। কথায় কথায় বুঝলুম একটি ছোট বিজ্ঞাপন আপিসে কাজ করছে। গপ্পো করতে করতে বললুম,

—"হ্যাঁ রে সনাতন! চাকরি-বাকরি করছিস—বে'-থা' করে ফ্যাল!"

সনাতন তার গোলগাল মুখটি তুলে আমার দিকে তাকাল।

জিজ্ঞেস করল,

—"কেন ?"

—হাসতে হাসতে বললুম,

—"কেন আবার কিরে শালা! জীবনে তো প্রেম-ট্রেম করলি না! টুকটুকে একটা মাল ধরে বে' করে ফ্যাল।"

নিরীহ শান্ত গলায় ও বললে,

—"তুই বিয়ে করেছিস ?"

—"দুদ্দুর—রোজগারপাতি নেই—বউ সামলাব কোত্থেকে ?"

সনাতন গম্ভীর গলায় ঠিক এই ছোট্ট ফিলিপের মতোই প্রশ্ন করেছিল,

—"হ্যাঁরে, ছবি আঁকা শেখা কি দোষের ?"

যদিও এই গোবেচারা সনাতনকে আমরা শুধু ঠাট্টা-ইয়ার্কির পাত্র হিসেবেই দেখে এসেছি বরাবর, তবু একটু অবাক না হয়ে পারলুম না। বললুম,

—"কেন রে, কি হল হঠাৎ ?"

ও তেমনি গম্ভীর এবং হতাশার স্বরে বলল,

—"প্রায় দু' বছর ধরে বাবা, মা, জ্যাঠামশাই আমার বিয়ের চেষ্টা করছেন, তিন চার জায়গায় ওঁদের পছন্দসই পাত্রীও পেয়েছেন—" বলে, চুপ করে গেল সনাতন।

সুযোগ পেয়ে গলায় একটু রসিকতা এনে বললুম,

—"তারপর কি হল ? তোর পছন্দ হল না ?"

ও একটু বাঁকা করে হাসল। বলল,

—"আমার পছন্দের কোনো ব্যাপার নেই রে। বাবা-মার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে। পাত্রীপক্ষই বেঁকে বসল। আর্টিস্ট জামাই আজকাল নাকি ভীষণ ইনসিকিওরড্। মেয়ের জীবনে কোনো সিকিউরিটি থাকে না।"

সনাতন রসিকতা করে নি। ও রসিকতা করতে জানত না। ওকে নিয়ে আমরাই হাসি-ঠাট্টা করতুম। পাঁচ বছরের কলেজ জীবনে সনাতন ঘোষাল রসিকতা করে নি। ওর কথা শুনে হোহো করে হেসে উঠেছিলুম আমি। সনাতনও হাসবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বউ, আজকে তোমায় বলছি, সেদিন ওর সেই হাসির চেষ্টার মধ্যে শিল্পী হিসেবে ওর ভেতরকার যে আত্মগ্লানি, তা আমি ধরতে পারি নি। গোলগাল সনাতনকে চিরকাল আমরা বোকাই জেনে এসেছি· সিরিয়াসলি নিতে পারি নি কখনো। এত বছর পর সনাতনের মুখ আমাকে কোথায় যেন একটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল। এক ধাক্কায় সরিয়ে দিলুম ওকে। ফিলিপ আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ওর প্রশ্নের জবাব এখনো পায় নি।

হাত ধরে আমার পাশে বসালুম ছেলেটিকে। পিঠে হাত রেখে সস্নেহে বললুম,

—"কেন ফিলিপ ? ছবি আঁকা দোষের কেন হবে ?"

ও তেমনি সরল সোজা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল,

—"বাপী, মা দু'জনেই আমাকে বারণ করেছেন ছবি আঁকতে।"

ভেতরের ব্যাপার কিছুই জানি না। ছেলে ভুলোনো গলায় বললুম,

—"তুমি নিশ্চয়ই ইস্কুলের পড়াশুনায় ফাঁকি দিচ্ছ—তাই বলেছেন।"

জোরে জোরে দু' পাশে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,

—"না মঁসিয়, আমি বরাবর আমার ক্লাসের ফার্স্ট বয়। অথচ বাপী আমাকে কোনোদিন রঙের বাক্স কিনে দেন নি। পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকতে দেখলে ছিঁড়ে ফেলে বকুনি দিয়েছেন। গেল বছর স্কুলের প্রাইজে একটা পেইন্ট বক্স পেলুম—"

বলতে বলতে ফিলিপ উঠে গেল কাচের আলমারিটির কাছে। কাচের এক-জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখাল। বলল,

—"এই যে, দেখুন মঁসিয়, এই যে আমার পেইন্ট বক্স! বাপী চাবি বন্ধ করে রেখে দিয়েছেন!"

ব্যাপারটি খুব ছেলেমোনুষী মনে হলেও কোথাও যেন একটা খটকা লেগে গেল আমার। একমাত্র ছেলের প্রতি জর্জের মতো অত হাসিখুশি মানুষ—না, ঠিক থই পেলুম না বউ। অন্তত, সেদিন সেই সন্ধ্যায়, ফিলিপের প্রতি ওর বাবা-মা'য়ের ব্যবহারের কোনো গভীরতর কারণ খুঁজে পাই নি। পরে বোধ হয় পেয়েছিলুম, বেশ কয়েকদিন পর।

জানী ট্রেতে করে স্কচের বোতল, তিনটে গেলাস নিয়ে ফিরে এলো। চুপ করে দাঁড়িয়েছিল ফিলিপ। কাচের ওপারে, আয়ত্তের বাইরে পুরস্কার পাওয়া তার নিজের রঙের বাক্সটির দিকে তাকিয়েছিল, নিশ্চয়ই সেই সরল, নির্বাক চোখে যে চোখ এইখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি না।

ওভারকোট খুলে হাত-মুখ ধুয়ে জর্জও এসে ঘরে ঢুকল। সোফা টেনে ওরা স্বামী-স্ত্রী আমার মুখোমুখি বসল। মধ্যিখানে গোল টেবিলে হুইস্কির বোতল, গেলাস। আলমারির সামনে থেকে ছোট ছোট পায়ে দরজা দিয়ে পাশের ঘরে চলে যাচ্ছিল ফিলিপ।

ডাকলুম,

—"ফিলিপ।"

দাঁড়িয়ে পড়ল থমকে। মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখল না। অভিমানী ছেলের মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। বললুম,

—"শোনো!"

ফিরে তাকিয়ে আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। বন্ধুর দেওয়া সেই প্যাকেটটি হাতে করে নিয়ে এসেছিলুম। মাঝারি আকারের কাগজের প্যাকেট। ফিলিপের দিকে এগিয়ে দিলুম। বললুম,

—"নাও, ধরো।"

হাতে নিয়ে বাবা-মার দিকে একবার দেখে নিল ফিলিপ। ওরা হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। জর্জ জিজ্ঞেস করল,

—"কি আছে ওতে?"

আমি হেসে হেসেই বলে ফেললুম,

—"রঙের বাক্স নয় বোধ হয়!"

জর্জের হাসি দপ করে নিবে গেল। ফিলিপকে দেখল, তারপর আমাকে। একেবারে অচেনা হয়ে গেল মুখের চেহারা। কেমন অবাক চোখে ক্লান্তি নিয়ে অনেক দূর থেকে যেন আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। স্তালিনের গোঁফের তলায় ঠোঁটটি সামান্য ঝুলে পড়েছে। এক মুহূর্তের জন্যেও জর্জের দুষ্টুমিভরা মুখ চোখ এমন অনুজ্জ্বল বিষণ্ণ হয়ে যেতে পারে এই ক'দিনের আলাপে আমি কল্পনাও করতে পারি নি। ওর ঠিক কোথায় আঘাত করে ফেললুম নিজের অজান্তে, বুঝতে না পারলেও তাড়াতাড়ি সামলে নিলুম। বললুম,

—"নবীন প্যাটেলের পাঠানো উপহার! তোমাদের জন্যে!" আরো হালকা সুরে বললুম,

—"বলি বাপু, আমি কি করে জানব, ভেতরে কি আছে!"

জানীর মুখও অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে চোখাচেখি হতেই গাল কুঁকড়ে হাসল। ফিলিপকে বলল,

—"দেখি সোনা! খোলো তো দেখি, কি পাঠিয়েছেন ইণ্ডিয়ান আংকল!"

বাবা-মায়ের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলেছি বলেই বোধহয় ফিলিপ কিছু বুঝতে পারে নি ওদের দু'জনের মুখের অনেকগুলি রেখা হঠাৎ পাল্টে যাবার খবর পায় নি। আমার পাশে এসে বসে সুতোয় বাঁধা প্যাকেটটি খুলতে লাগল।
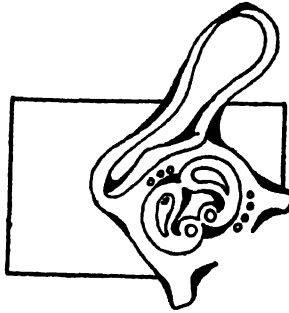
খুব সামান্য তিনটি জিনিস। এমন কিছু দামী উপহার নয়। দুটি নেপালী টুপি। বড়টি কালো, জর্জের, ছোটটি লাল, ফিলিপের জন্যে। জানীর জন্যে নবীন পাঠিয়েছে সাদা পুঁতির মালা। জর্জ তার টুপিটি সঙ্গে সঙ্গে মাথায় দিয়ে খুশিতে ডগমগ। কয়েক মুহূর্ত আগের সেই বিষণ্ণ মুখটি সামান্য একটি উপহার

মাথায় দিয়ে আবার যে-কে সেই। চোখ তুলে পিটপিট করে আমায় দেখল, সেই দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল,

—"কি রকম দেখাচ্ছে আমাকে বলো তো?"

তারপরেই জানীর দিকে ফিরে আবার বলল,

—"দেখেছো, নবীন আমাদের আলাদা আলাদা করে মনে রেখেছে। আমার মাথার সাইজ পর্যন্ত মনে আছে ওর।"

পুঁতির মালাটি গলায় পরে একেবারে শিশুর মতো হাসল জানী। বলল,

—"কি দারুণ মালা, দেখেছো শিল্পী?" উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল,

—"এক মিনিট, আয়নায় দেখে আসি কেমন লাগছে—"

ফিলিপ তার লাল টুপিটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। জর্জ খুশি গলায় ওকে বলল,

—"পরো তো দেখি, কি রকম দেখায়!"

গম্ভীর মুখে একবার আমায় দেখে নিয়ে টুপিটি মাথায় দিল ফিলিপ। আমি হাত বাড়িয়ে ওটিকে মাথার সামান্য ডানপাশে বেঁকিয়ে দিলুম। ওর সরল বোবা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ধন্যবাদ জানাল,

—"মেরসী মঁসিয়!" তারপর, আস্তে আস্তে হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গেলাসে হুইস্কি ঢেলে ডাক দিল জর্জ,

—"জানী—"

—"ভারী সুন্দর মালা, এমন উপহার অনেক দিন কেউ দেয় নি আমাকে—" উজ্জ্বল ঝলমলে গলায় বলতে বলতে ফিরে এলো জানী। আমার এবং জানীর হাতে গেলাস ধরিয়ে দিয়ে নিজের গেলাসটি তুলে নিল জর্জ। হাতটি সামান্য উঁচুতে তুলে বলল,

—"এগুলো বয়ে আনবার জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চীয়ার্স! এসো, আমরা হাজার হাজার মাইল দূরের বন্ধু নবীন প্যাটেলের স্বাস্থ্যপান করি।"

বলেই, এক চুমুকে জল-বরফ ছাড়াই কাঁচা মদটুকু খেয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বিষম খেয়ে কাশি। জানী হাসতে হাসতে আমায় বলল,

—"অই রকমই করে। কড়া জিনিস খেতে পারে না। মুডের মাথায় ঢক্ ঢক্ করে নীট গিলে গণ্ডগোল পাকায়।" জর্জের দিকে ফিরে বলল,

—"তোমার ওই বীয়ার-ওয়াইনই ভালো বাপু!"

জর্জ তখনো কাশছে। কাশতে কাশতে হাসির চেষ্টা করে থেমে থেমে বলল,

—"ও কিছু নয় জানী! টেলিপ্যাথী! আমরা নবীনের কথা ভাবছি, ও-ও নিশ্চয়ই আমাদের কথা স্মরণে এনে ফেলেছে—"

একটু থেমে দু'চারবার গলাখাঁকারি দিয়ে বলল,

—"দ্যাখো গে যাও, নবীনও জল খেতে গিয়ে বিষম খেয়েছে!"

হাসতে হাসতে আমরা দু'জনে গেলাসে চুমুক দিলুম। কথায় কথায় আরো এক-এক পাত্তর গলা বেয়ে নেমে গেল। মুখে ওদের দু'জনের সঙ্গে খেজুরে আলাপ চালিয়ে যাচ্ছি, ভেতরে সারাক্ষণ ফিলিপের মুখটি, ওর কথা ঘুরপাক খাচ্ছে। মঁসিয়, ছবি আঁকা কি দোষের!

জানী জিজ্ঞেস করলে,

—"শীত কি রকম বুঝছো বিদেশী?"

বললুম,

—"জম্‌পেশ।"

ফিলিপের মাথায় কোনো রকম গণ্ডগোল নেই তো! অসংলগ্ন কথাবার্তা। নবীনের উপহার নিয়ে দু'-দুটো বয়স্ক মানুষ-মানুষী কি রকম ছেলেমানুষের মতো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কয়েক মুহূর্ত আগেও জর্জের যে অস্বাভাবিক বিষণ্ণ মুখ ছিল, ছোট্ট একটি কালো টুপি মাথায় দেবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ কেমন চক্‌চক্ করে উঠল। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের এক ভদ্রমহিলা সামান্য একটি পুঁতির মালা গলায় দিয়ে দৌড়ে চলে গেল আয়নায় নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে দেখবে বলে। অথচ, ওইটুকু ছেলের মুখ কেমন পাহাড়ের মতো গম্ভীর।

জর্জের গলায় প্রশ্ন,

—"তুমি কি ধরনের ছবি আঁকো?"

—"মানুষ। মানুষের ছবি। ফিগারেটিভ্ বলতে পারো।"

—"রিয়েলিস্টিক না অ্যাবস্ট্রাক্ট?"

—"ডিস্টর্টেড বা ভাঙাচোরা মানুষ-মানুষী।"

জানী কি যেন বলতে লাগলো।

ফিলিপকে এখনো পর্যন্ত আমি হাসতে দেখেছি বলে মনে করতে পারলুম না। লাল টুপিটি কেমন ভাবলেশহীন মুখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, যেন, আর কোনো রকম উপহারেই কিছু যায় আসে না। কিছু ছবি আঁকা, একটি রঙের বাক্স একটি বালকের জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে কি এমন হয়, বউ?

সরল, নিষ্পাপ মুখের নক্‌শা থেকে পৃথিবীর সমস্ত আনন্দের রং মুছে যেতে পারে ? হয়তো পারে। আমি জানি না। দেশে, আমাদের ঘরে ঘরে ছোট ছোট শিশুরা দেওয়ালে, মেঝেয়, যে কোনো কাগজে, যে কোনো রকম খড়ি, পেন্সিল, কলম অথবা তুলি দিয়ে যা-ইচ্ছে-তাই আঁকিবুকি কেটে বেড়ায়। যে কোনো ধরনের নক্‌শাই তৃপ্ত করে ওদের। প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র বা দেওয়াল নোংরা করার জন্যে গুরুজনদের হাতের দু'চার ঘা যে খায় না, এমন কথাও নয়। বড় হয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, চোর, ডাকাত যাই হোক না কেন, শৈশবে শিল্পী প্রায় সবাই। সারা বিশ্বের সমস্ত শিল্পীদের স্বর্গ এই প্যারিসের ছোট্ট একটি শিল্পীর সংসারের কোথায় যে ছন্দপতন ঘটে গেছে তাই খুঁজে পাচ্ছিলুম না। বাবা-মা দু'জনেই যেখানে শিল্পী, ফিলিপের পক্ষে ছবি আঁকার দিকে ঝোঁকটা থাকা তো একান্তই স্বাভাবিক। কোথায় যে গণ্ডগোল কে জানে! এদিকে আবার, এদের দু'জনকেও চট্ করে কিছু জিজ্ঞাসা করা যাচ্ছে না! 'রঙের বাক্স নয় নিশ্চয়ই'—এমন একটি নিতান্তই নিরীহ কথায় জর্জের হাসিখুশি মুখের অমন নক্‌শাবদল আমাকে চমকে দিয়েছিল। হেসে উড়িয়ে দেবার মতো সাদামাটা ছেলেমানুষি কোনো ব্যাপারের থেকেও ঘটনাটি জটিল। রঙের একটি বাক্স একমাত্র ছেলের ছবি আঁকার মতো সাধারণ এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক ইচ্ছাকে ঘিরে পারিবারিক কী এমন গভীর অ-সুখ বা অস্বাচ্ছন্দ্য জড়িয়ে থাকতে পারে, বাইরে থেকে বোঝা বড় মুশকিল।

শুনতে পেলুম, আমাকে উদ্দেশ্য করে জর্জ জানীকে বলছে,

—"বেচারা, দেশের কথা ভাবছে হয়তো!"

ওর চোখে চোখ পড়তেই গেলাস দেখিয়ে হাসিমুখে বললে,

—"ঝট্ করে মেরে দাও ভায়া, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

গেলাসটি শেষ করে ফেললুম এক চুমুকে। বোতল থেকে আরো এক পেগ ঢেলে দিল জর্জ। জানী কত্তাকে বলল,

—"হ্যাঁ, তোমার মতো ঢক্‌ঢক্ করে খাওয়াতে হবে না ওকে! বিষম খেলে আবার টেলিপ্যাথীর ব্যাপার!" হাসতে হাসতে আমার দিকে ফিরে বলল,

—"কে কে আছে দেশে ? বিয়ে করেছো ?"

—"কাকে ?" অন্যমনস্ক হয়ে বলে ফেলতেই খেয়াল হল কি বললুম। কেন যে বললুম, তাও গুছিয়ে বলতে পারব না, বউ! এই হয় মুশকিল। মনের কোন কোণে যে কি জিজ্ঞাসা আধা-চেতনার আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকে, টেরই

পাই না। অসতর্ক মুহূর্তে সেই আড়াল ডিঙিয়ে বেরিয়ে এলে নিজেই চমকে যাই। জিজ্ঞাসাটি কোথায় ছিল, কেন ছিল, এসব প্রশ্নের, অঙ্কের মতো কোনো ঠিক ঠিক জবাব খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

জানী শব্দ করে হাসছে। বলছে,

—"কাকে আবার! কোনো সুন্দরী ইণ্ডিয়ান রমণীকে নিশ্চয়ই!"

ক্যালিডোস্কোপের অন্য প্রান্তে রঙীন কাচের কুচিগুলি ঘুরে ঘুরে তোমার গোলগাল মুখের নকশাটি ফুটিয়ে তুলল। এখন তুমি হাসছো না। এখন তুমি কাঁদছো না। কেমন ভীত চোখে আমার দিকেই তাকিয়ে আছো। আমার জন্যেই বুঝি তোমার ভয়ডর। তোমার এই ভয়টিকে আমার খুব পছন্দ। কিন্তু তুমি কি সুন্দরী কোনো ইণ্ডিয়ান রমণী? কালিডোস্কোপের পর নল থেকে চোখ সরিয়ে তোমার চেয়ে যথেষ্ট বয়সে বড় এই মহিলাটিকে দেখলুম। ইচ্ছে করলেই, জানীকে পঁচিশের সুন্দরী বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। ওর মুখের গড়ন অনেকটা পানপাতার মতো। তিনপাশে কালো অন্ধকার চুল বেশ লম্বা। ঢলঢল এই মুখটির পাশে তোমার মুখ মোটেই মানায় না। না বউ, দেখতে তোমার মুখ এই সব সুন্দরীদের দলে পড়ে না। হঠাৎ কোত্থেকে ফিলিপ এসে পড়ল। ফিলিপের মুখ। চুলে ঢাকা কপাল। জানীর পাশাপাশি দাঁড় করালুম। দু'জনের মুখে কোনো মিল নেই। আবার কি মনে হতেই জর্জের দিকে ফিরে তাকালুম। ফিলিপকে নিয়ে এলুম ওর পাশে। না, বাবার সঙ্গেও ওর মুখের অমিল। এ কি ব্যাপার! বাবা, মা, কারুর সঙ্গেই কোনো মিল নেই মুখের আদলে। যদিও, পৃথিবীর সব ছেলেমেয়েদের মুখই তাদের বাবা-মায়ের মুখের সঙ্গে মিলবে, এমন কোনো কথা নেই। তবু এক্ষেত্রে চেহারায় এই অমিল হঠাৎ আমাকে ভাবতে বাধ্য করল, ফিলিপ ওদের আপন ছেলে তো!

সুধীর বিশ্বাসের মুখটা কোত্থেকে এসে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। লম্বাটে মুখ! উজ্জ্বল চোখের নিচে ধারালো নাক। খুব পুরু ঠোঁট ছিল সুধীরের। ঠোঁট পুরু হলে নাকি ভীষণ সেক্সী হয় মানুষ, অথবা মানুষী। সুধীর আমাদের ছোট্ট দলের মধ্যে ছিল। এক গেলাসের, এক চায়ের ভাঁড়ের বন্ধু। এক কাপ চা নিয়ে কতদিন যে ভাগাভাগি করে খেয়েছি! আমাদের বাউণ্ডুলে দলের মধ্যে থেকে হঠাৎ একদিন ওর চাকরি হয়ে গেল। তারপর সম্বন্ধ করে বিয়ে। ওর বিয়েতে আমরা যা-খুশি-তাই করেছি। বরযাত্রী হয়ে

যাবার দিন আমাদের প্রত্যেকের পকেটে ছোট ছোট বোতল ছিল। সুদীপ্তর পকেটে গাঁজার পুরিয়া। এমন হুল্লোড় তারপরে আর কবে করেছি মনে নেই। সেই সুধীর সংসারী হয়ে গিয়েছিল। ঘোর সংসারী। চাকরি আর বউ নিয়ে মেতে ছিল বলে দেখাই হতো না প্রায়। আলাদা বাসা নিয়ে চলে গিয়েছিল আড্ডার, পাড়ার থেকে অনেক দূরে। অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে ওর মাঝে-মাঝে দেখা হলেও, বহুদিন পর, প্রায় বছর ছয়েক বাদে আমার সঙ্গে দেখা। মেয়ে নিয়ে, মেয়েদের সঙ্গে শোয়া-বসা নিয়ে নিজেদের মধ্যে এককালে খুব রসিকতা চলত। যার সঙ্গে বিয়ে হয়, সেও তো মেয়ে। অথচ, তাকে নিয়ে রসিকতা কেমন যেন জিভে আটকে যায়। বিশেষ করে এতো বছর পর। কেমন আছিস, কি খবর, বউয়ের সঙ্গে কিরকম জমিয়েছিস এইসব কথায় কথায় হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলুম, সুধীরের সেক্সী ঠোঁটে চোখ রেখে,

—"তা বাপধন। কটি পয়দা দিলি এর মধ্যে ?"

সঙ্গে সেদিন করুণাময় ছিল। আপিসের দৌলতে ওদের দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ একেবারে ছিঁড়ে যেতে যেতে যায় নি। আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল করুণাময়। বাঁ পায়ের ওপর মৃদু একটা লাথি মেরে হঠাৎ বলে উঠল,

—"চল স্‌সালা, আজ একটু বাংলা খাব। অনেকদিন বাদে, তিনজনে একসঙ্গে। খালাসীটোলায়—থাক্, তার চেয়ে চল বারদুয়ারী যাই—"

দম না ফেলে প্রায় এক মিনিট কথা বলেছিল করুণাময়। আমার চোখের ভুল হয়তো, সুধীরের মুখটা কেমন অ্যাবস্ট্রাক্ট দেখাচ্ছিল। ভাঙাচোরা সেই মুখের সমস্ত উজ্জ্বলতা কেমন যেন নীল মনে হয়েছিল আমার। মদ খেতে সেদিন কোথাও যাওয়া হয় নি আমাদের। পরে, করুণাময় বলেছিল,

—"তুই স্‌সালা পাষণ্ড! ছ বছরে ওর কোনো ইস্যু নেই। কার খামতি ঠিক করে কোনো ডাক্তার বলতেও পারছে না। লেডী ডাক্তাররা বলছে ওর বউয়ের কোনো গণ্ডগোল নেই। সুধীরের ডাক্তাররা টেস্ট ফেস্ট করেও ওর কোনো ঝামেলা খুঁজে পাচ্ছে না।"

একটু চুপ থেকে খুব আদরের গলায় বলেছিল করুণাময়।

—"মনেপ্রাণে সংসারী হয়ে গেছে তো! বেচারা খুব কষ্টে আছে। কাকাবাবু-কাকীমা ওর দিকে চেয়ে আছেন—একমাত্র ছেলে তো। শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও কেমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে আজকাল।"

বউ, তুমিই বলো, নিজেকে এতখানি লজ্জিত বানিয়ে ফেলবার পর কোন্

সাহসে, কোন্ মুখে আমি ফরাসী দম্পতিকে জিগ্যেস করি, ফিলিপ তোমাদের আপন ছেলে তো ?

জানী বললে,

"তার মানে, তোমার বিয়ে হয় নি ! "

সঙ্গে সঙ্গে জর্জ কথা যুগিয়ে দেবার ধরনে বললে,

—"প্রেম-পীরিত চলছে, মনে হচ্ছে।"

হাসতে হল। বললুম,

—"না মঁসিয়। ওসব চুকে গেছে প্রায় দেড় বছর। এখন আমি একটি নির্ভেজাল বিবাহিত পুরুষ বলতে পারো !"

জর্জ বললে,

—"তাহলে জবাব দিতে অত দেরি করছিলে কেন ?"

—"এমনিই !"

জানী জিগ্যেস করলে,

—"ছেলেপুলে ?"

—"হয় নি। হবে।"

অবাক চোখে আমাকে একটু দেখে নিল জানী। বললে,

—"ঠিক বুঝলুম না।"

খুব সীরিয়াস মুখ করে চোখ বুজে বললুম,

—"আমার গৃহিণী আপাতত একটি সন্তান বহন করছেন, তোমাদের রাজ্যে আসবার আগে খবরটি পেয়েছি।"

জর্জ এক গোঁফ হেসে বললে,

—"বাহ্-বাহ্ ! এসো, শিশুটির নামে আর এক পাত্তর হয়ে যাক্ !"

জানী বললে,

—"ভারী সুখবর।" তারপর ভুরু কাঁপিয়ে জিগ্যেস করলে,

—"কি চাও তুমি, ছেলে না মেয়ে ?"

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তুমি বাচ্চা চাই জানিয়ে আমাকে বিরক্ত করতে শুরু করলে, বউ। তখন আমি তোমাকে আমার ভয়ের কথা বলেছিলুম। বন্ধুদের সঙ্গে মাতাল হয়ে কলকাতা-বোম্বাইয়ের পাখিপাড়ায় অনেক ঘুরেছি আমি। সোনাগাছি থেকে আরম্ভ করে বম্বে সেন্ট্রালের ফাক্ল্যাণ্ড রোড। বাছবিচার ছিল না আমাদের। মত্ত মানুষের আবার বাছাবাছি কিসের। একটি শরীর, অন্ত

জাতের শরীর হলেই রাতটুকু ভোর হয়ে যেত। বন্ধুদের প্রত্যেকেই একবার না একবার সেই বিচ্ছিরি অসুখে পড়েছে। আমার হয়েছিল দু'-দু'বার। ইঞ্জেকশন ওষুধ-পত্তরে সেরে উঠেছি দু'বারই। বিয়ের কথা পাকা হয়ে যেতেই ডাক্তারকে দিয়ে সব রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়েছিলুম। ওই নোংরা অসুখ কোনো চিহ্ন রেখে যায় নি শরীরে, শুধু একটা ভয় ফেলে রেখে গিয়েছিল গোপন গভীরে। জানীর প্রশ্নে আবার সেই ভয়টি দুটি পাণ্ডুটে চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে থাকল। বাচ্চাটি যদি বিকলাঙ্গ হয়! যদি কানা হয় একটি চোখ! কিংবা ধরো যদি 'হঞ্চব্যাক অব্ নোৎরদামের' মতো সেই বীভৎস কুঁজ, ফোলা-ঝোলা মুখ নিয়ে আমাদের শিশুটি পৃথিবীতে আসে? তুমি আমার ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলেছিলে,

—"ওসব কথা বলতে নেই। অলুক্ষুণে কথা। ভয় পেয়ো না তুমি—কিছু হবে না।"

আমি জানি, তুমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলে। তবু আমরা দু'জনে সংসার করার শপথ নিয়েছিলুম। তিরিশ পেরিয়ে চল্লিশের দিকে হাঁটতে শুরু করলে হৃদয়ের সংসারে ছোট্ট একটি আপন শিশু হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়।
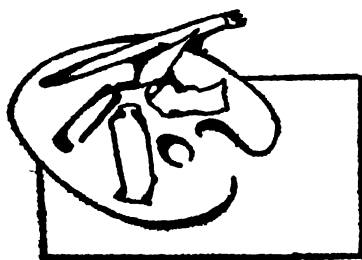
হাসিমুখে জানীকে বললুম,

—"ছেলে হোক, মেয়ে হোক, বাড়ির সামনে হিজড়ে নাচ হলেই হল।"

জর্জ ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলে,

—"কে নাচবে?"

—"হিজড়েরা।"

স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে দেখে নিয়ে অবাক গলায় জিগ্যেস করলে,

—"কেন, ওরা নাচবে কেন?"

বউ, দেশে আমরা যেমন ওদের একেবারে আলাদা শ্রেণী করে রেখে দিয়েছি,

এখানে তা ভাবাই যায় না। সাধারণ পুরুষমানুষের মতোই ওরা বড় হয়। লেখাপড়া, চাকরি-বাকরি করে একই সমাজের মধ্যে জায়গা পেয়ে যায়। অবিবাহিত পুরুষের মতোই প্রায় ওদের জীবনযাপন। আমাদের দেশের কথা বললুম জর্জকে। বললুম,

—"মন্ত্রবলে ওরা খবর পেয়ে যায় কোন্ বাড়িতে বাচ্চা হয়েছে, কোন্ বাড়িতে বিয়ে।"

সব শুনে জানী বললে,

—"আহা, বেচারী।"

বললুম,

—"শুধু তাই নয়। ওরা জানে, আমরা ওদের দেখে হাসি। সেইজন্যেই হয়তো, সমাজের পুরুষ বা মেয়েদের আরো হাসাবার চেষ্টা করে—অঙ্গভঙ্গি ক'রে, তালি বাজিয়ে, গান গেয়ে।"

জানী জিগ্যেস করলে,

—"ওরা কি জোকার ?"

সত্যিই তো বউ, একথাটা মাথায় আসে নি কখনো। আমাদের দেশের নপুংসকেরা কি সার্কাসের জোকারের মতো। জোকারদের রং-চং মেখে কিম্ভূত সেজে লোক হাসাতে হয়। এদের জন্যই এমন, কোনো মেক-আপ নিতে হয় না। রাস্তা দিয়ে একটু তালি বাজিয়ে হেঁটে গেলেই আমরা হেসে ফেলি। কাছাকাছি এসে পয়সা চাইলেই ভয়ে ভয়ে দিয়ে দিই—এক্ষুনি হয়তো কাপড় তুলে দেখিয়ে একটা বিশ্রী অসামাজিক দৃশ্য তৈরি করবে। দূর থেকে বাচ্চারা ঢিল ছুঁড়ে গালি খায়। এরা মানুষ-মানুষীর বাইরে। জোকাররা মানুষের মধ্যে, সমাজের মধ্যে গণ্য হয়, আমাদের দেশের এরা শুধুই নপুংসক। হাত, পা, মুখ, চোখ সব মানুষের মতো, অথচ এরা মানুষ নয়! জন্তু-জানোয়ারও নয়! কি আশ্চর্য সব কাণ্ড আমাদের দেশে!

জানীকে বললুম,

—"না, ওরা জোকার নয়। মানুষই নয় বোধ হয়।"

—"তবে কি ?"

—"জীবিত এক জাতের প্রাণী।"

পেটের ভেতরে কয়েক পাত্তর গিয়ে সহসা ওদের জন্যে মনটা ভার-ভার ঠেকল। 'আহা রে, কি কষ্ট' গোছের অনুভূতি। অথচ এক্ষুনি সামনে ছুটি

হিজড়ে গলা বিকৃত করে হেলেদুলে গান গাইলেই হয়তো হেসে ফেলব। জর্জ বললে,

—"তোমার বিয়েতেও ওরা এসেছিল হাততালি দিতে?"

—"হুঁ! শুধু হাততালি নয়, ঢোল বাজিয়ে ছ'সাত জন একসঙ্গে গান গেয়েছিল!"

—"কি রকম গান? কোনো স্পেশাল কিছু?"

—"না, ঠিক স্পেশাল নয়। সাধারণ বাংলা ভাষায় গান, অথচ ওদের ভাঙা গলায় সামান্য বিকৃত উচ্চারণে যখন ওরা গান গায়, তখন খুব স্পেশাল কিছু মনে হয়। স্পেশাল সব হাসি-ঠাট্টার গান।"

একটু ঝুঁকে পড়ে আগ্রহের গলায় জর্জ বললে,

—"কি রকম? শুনি, শুনি!"

আমি হেসে ফেললুম,

—"তোমরা তো কিছু বুঝবে না ওই সব গানের!"

খুব উৎসাহের সঙ্গে জর্জ বললে,

—"তুমি বুঝিয়ে দেবে!"

আচ্ছা বউ, বলো! হিজড়েদের গানের ফরাসী তর্জমা কি করে সম্ভব!

জানী বললে,

—"সুরটা তো শুনি! গাও না।"

জানী বেশী খাচ্ছে না মদ। দ্বিতীয় পেগেই আটকে আছে। আমার কিন্তু বেশ ঝিমঝিম ভাব। জর্জের বোধ হয় একই ব্যাপার। আহা, সেই বাসী বিয়ের দিন সকালে, তোমাদের উঠোনে ওরা যে গানটা গেয়েছিল তোমার মনে পড়ছে, বউ? আমার তো সব মনে আছে, আমি তো কিছুই ভুলি না! সেই যে, ঢ্যাঙা মতন হিজড়েটি ঢোল বাজাচ্ছিল কোমর দুলিয়ে। পোড়া তামা রং চোয়াড়ে মুখের হাড় ঠেলে বেরিয়ে আসছে। গালের হাড়ে, কপালে বসন্তের দাগ। নাকে রূপোর নাকছাবি। দাঁতে পানের ছোপ। বাকি সবাই তালি দিয়ে গান গেয়েছিল। যতটা সম্ভব গলা বিকৃত করে শুরু করলুম,

"দিদিলা তুই কি করিলি! সোনার ডালে কাক বসালি!! গেঁথে ও মতির্ মালা ক'ন বাঁদরের গলায় দিলি'—

বলে, আমার থুতনি ছুঁয়ে আবার গাইল,

"বাঁদর ক্যানো এই বাসরে, তুলে দে'না যাক সদরে—হে—"

তারপর সবাই একসঙ্গে তালি বাজিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে তোমায় দেখাল, গাইল,

"ধর ধর ধর, পড়ল ঢলে বরের গায়েতে, বরের গায়েতে লো, ও নয় মন মজাতে—"

জর্জ গানের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে পপ্ নাচের ভঙ্গিতে দুলতে লাগল, তালি বাজিয়ে বাজিয়ে। মুড্ এসে গেছে। হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালুম।

বললুম,

—"না—না! ওরকম নয়! এই রকম—"

হাত উল্টে কোমরে রেখে দুলে দুলে দেখালুম। জর্জও আমার দেখাদেখি চেষ্টা করল। বলল,

—"গাও, গাও, পুরোটা শেষ করো—"

দীর্ঘদেহ এই ফরাসীটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বেশ মজা পেলুম। এত দূর দেশের একটি শ্বেতাঙ্গ শিল্পী ট্রাউজার, শার্ট, সোয়েটার পরে ভারতীয় হিজড়ে-নাচ চেষ্টা করছে। আমি এক ভেতো বাঙালী প্যারিসের নির্জন শহরতলি ম্যালমেজোঁর নিঝুম পরিবেশে হিজড়েদের গান গেয়ে শোনাচ্ছি। কি রকম অদ্ভুত লাগছিল। গানটি আবার শুরু করতেই লাল, নীল সবুজ কাচের কুচিগুলি ঘুরে ঘুরে জায়গা বদল করল। সব রং একসঙ্গে হয়ে গিয়ে কেমন একটা পোড়া তামার মতো লাগছে। সেই পোড়া তামা রঙের চামড়ায় বড় বড় বসন্তের দাগ। চোয়াড়ে মুখে গালের হাড় ঠেলে বেরিয়ে আসছে। নাকে রূপোর নাকছাবি। ঠোঁট নড়ছে না। ও এখন গান গাইছে না। কেমন বিচ্ছিরি ঘোলাটে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বিড়বিড় করে যেন বলল,

—"বাবুজী! আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করছো! আমরা কিন্তু তোমার অমঙ্গল কামনা করি নি। দোরে দোরে ঘুরে সব্বার মঙ্গল কামনা করি আমরা।"

মনে মনে আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলুম,

—"সরে যা! সরে যা, হিজড়ে কোথাকার!"

জর্জ বলছে,

—"কি হল, গাও না! থেমে গেলে কেন?"

হেসে ওর দিকে তাকিয়ে ফিরে এলুম। হরিণের চামড়ায় বসতে বসতে বললুম,

—"আরো একটু মদ খেয়ে নিই তারপর।"

জানী চুপচাপ বসে আমাদের নাচানাচি দেখছিল। করুণ মুখ করে কি যেন ভাবছে। হাতদুটি কোলের কাছে জড়ো করা। সামান্য বাঁদিকে হেলে রয়েছে মাথাটি। ডান হাতের মধ্যম আঙুলে বড়সড় একটি আংটি। কালো ট্রাউজার, হালকা নীল রঙের পুলওভার পরে টানটান বসে আছে সোফায়। খুব শান্ত গলায় আস্তে আস্তে বলল,

—"ওদের নিয়ে এমন হাসিঠাট্টা করা বোধহয় তোমাদের উচিত নয়।"

ফিকে হেসে গেলাসে চুমুক দিলুম। বললুম,

—"সেটা বুঝি ঠিকই। কিন্তু কি করব বলো, ছোটবেলা থেকেই ওরা আমাদের চোখে হাসির খোরাক হয়ে বেঁচে থাকে। যখন বুঝতে শিখি, তখনো সেই নির্মম হাসির আবরণটি ভেঙে ফেলতে পারি না।"

—"খুবই লজ্জার কথা শিল্পী! তোমাদের দেশের সব কিছু সম্পর্কেই আমাদের কল্পনার এক আশ্চর্য বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা জড়িয়ে আছে। সে বিরাট দেশের সূর্যের অমলিন উষ্ণতায়, শুদ্ধ বাতাসে বড় বড় সব কবি, মনীষী, শিল্পী-সাহিত্যিকদের মতো বিদগ্ধজন জন্মেছেন সেখানে এই ধরনের অমানুষিক রুচি কি করে বেঁচে আছে বুঝতে পারছি না।"

বেশ লজ্জা-লজ্জা করছিল, বউ। ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা এই স্নিগ্ধ বিদেশিনীর মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলুম। তবু ভালো, আমাদের ঐতিহাসিক দেশের অনেক অশুদ্ধ বাতাস আর অমানুষিক রুচির খবর সমুদ্র পেরিয়ে এ রাজ্যে পৌঁছোয় না। কিন্তু, আমার মনে হয় সব খোলাখুলি বিশ্বময় বলে দেওয়া ভালো যে আমরা আর অত ভালো নেই। আমাদের আপাতমসৃণ ত্বকের ভিতরে ভিতরে অজস্র ফোড়ায় পুঁজ জমে গেছে, জমছে। তোমরা, পৃথিবীর আধুনিক মানুষেরা, আমাদের আর অত শ্রদ্ধা জানিয়ে লজ্জিত কোরো না। রামায়ণ-মহাভারত, গীতা, সংহিতার দেশের আমরা আজ এই হয়ে গেছি। সূর্যকে শিয়রে রেখে গরীব হয়ে গেছি বড়। বুক ফুলিয়ে বোমা ফাটাচ্ছি, চামড়ার ভেতরের ফোড়াগুলি পেকে টস্‌টস্, আলপিন লাগিয়ে ফাটাতে পারছি না। তেমন কোনো বিশুদ্ধ আলপিন কোনো কারখানায় তৈরি হচ্ছে না এখন। দেশের অর্ধেকের বেশী লোক বোধহয় অন্যায় করছে, বাকি যাঁরা তাঁরা সে অন্যায় সহ্য করছেন।

আমাদের দু'জনের খালি গেলাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে জর্জ বলল,

—"তোমার কি হল, জানী? শেষ করে ফেল ওটুকু!"

আমি জুড়ে দিলুম,

—"সেই দ্বিতীয় পেগটি নিয়ে বসে আছো তখন থেকে, খেয়ে নাও!"

বোতলটি ডান হাতে নিয়ে ওর গেলাসে ঢালবার জন্যে অপেক্ষা করছে জর্জ। ও বলল,

—"আমি আর খাব না কিন্তু, ভালো লাগছে না—"

—"ইস্, ভালো না লাগলেই হল। আমাদের তো ভালো লাগছে—"

বলে, জর্জ বাঁ হাতে জানীর গেলাসটি ওর প্রায় মুখের কাছে তুলে ধরল। জানী বললে,

—"তোমাদের ভালো লাগছে, তোমরা খাও না কে বারণ করেছে?—"

—লক্ষ্মী সোনা, তোমার এই বুড়ো বর তোমাকে আদর করে একটু খেতে বলছে—" আদুরে গলায় বলতে বলতে জর্জ গেলাসটি জানীর ঠোঁটের সঙ্গে ছুঁইয়ে দিল। লিপস্টিক ছাড়াই আপন রঙে গোলাপী ঠোঁট দুটি কুঁকড়ে গেল। মাথাটি পিছিয়ে নিয়ে সোফার গায়ে হেলান দিল জানী। জর্জের বাঁ হাতটি চেপে ধরে হেসে বলল,

—"এই, এই, করছো কি? উফ, খাচ্ছি বাবা, খাচ্ছি—"

ওর মুখে পানীয়টুকু ঢেলে দিয়ে জর্জ বলল,

—"মেরসী মাদাম! মেরসী বোকু!"

আমি হাসছিলুম। বাঁ হাতে ছোট্ট রুমাল দিয়ে আলতো করে ঠোঁট মুছল জানী। বলল,

—"বুড়ো হয়ে গেল লোকটা, দুষ্টুমি গেল না—"

ওর গেলাস ভর্তি করতে করতে জর্জ বললে,

—"হুঁহুম্‌বাবা! ওই দুষ্টুমিটুকু যদ্দিন আছে, তদ্দিন জানবে জর্জ বোয়া-গুনতিয়ে জীবিত আছেন!"

জানী আবার বোতলসমেত জর্জের হাতটি চেপে ধরে বলল,

—"করো কি—করো কি—অতখানি আমি খেতে পারব না—"

—"পারবে! নিশ্চয়ই পারবে সোনা। বরফ মিশিয়ে পাতলা করে দিচ্ছি!"

বলে, চারটে চৌকো বরফের টুকরো গেলাসে ফেলে দিল জর্জ। মদ লাফিয়ে উঠল গেলাসের মধ্যে। দু'এক ফোঁটা ছিটকে বাইরে পড়ল, টেবিলে। জর্জ আঙুল দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলল,

—"ছাখো ছাখো! দেখলে তো—যা চাইলে তাই হল। কমে গেল অমৃতের চার চারটি ফোঁটা!"

বোতলটি টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে ফিরে বলল,—"আসছি।"

জিগ্যেস করলুম,

—"কোথায় চললে ?"

বাইরের দরজার দিকে হাঁটতে হাঁটতে ফায়ার প্লেস দেখিয়ে বলল,—"কাঠ নিয়ে আসি!"

ফায়ার প্লেসের ভেতরের ইটগুলি কালচে। আগুন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কায়িক পরিশ্রম করে কাঠ জ্বেলে আগুন তৈরি করার যুগ প্যারিসে নেই বললেই চলে। এখন সামান্য সচ্ছলতা মানেই সেণ্ট্রালী হীটেড ঘর। মোটা নল বেয়ে সারাক্ষণ গরম জল ঘরের মধ্যে আসতে থাকবে। পাশাপাশি রাখা চার-পাঁচটা নল ঘুরে ঘুরে ফিরে যেতে থাকবে সারাক্ষণ। এদের তো বেশ সচ্ছল অবস্থা, ঘরে গরম জলের নল নেই কেন? ফায়ার প্লেস থেকে চোখ সরিয়ে জানীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটি জিগ্যেস করতে যাব, মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরুলো না। জানী ওর বড় বড় চোখ দুটি আমার মুখের ওপর ফেলে চেয়ে আছে। আগের মতোই কোলে রাখা হাত দুটি। তবে শরীরে এখন আর সেই টানটান ভঙ্গি নেই। ঢেউ তোলা গোটা শরীরটি হলুদ সোফার গায়ে বিশ্রাম করছে যেন। নীল পুলওভারের ওপর পুঁতির মালা আলাদা একটি চেহারা নিয়ে স্থির। জানীর উদ্ধত বুক, না, ঠিক উদ্ধত বলা যাবে না, উন্নত, অপরিচিত বুক দুটিকে যেন আলতো করে ছুঁয়ে আছে। গলায় আর কোনো অলঙ্কার নেই জানীর। পানের গড়ন মুখের সরু চিবুকে ওপর থেকে নিয়ন আলোর হাইলাইট। হাইলাইটের কোনো চলিত বাংলা আছে কি? উঁচু আলো, উজ্জ্বলতম আলো? দূর! শুনলেই হাসি পায়। অমুকের পোর্ট্রেটে হাইলাইট এই জায়গায়—এইটুকু বললেই বুঝে ফেলা যায় মুখটির অবস্থান মোটামুটি কি রকম। অবশ্যই আলোর সূত্রের সঠিক অবস্থানও জানা থাকা চাই। কারণ, নানা জাতের, ধরনের আলো-অন্ধকার মিলেমিশে অথবা ঝগড়া করে একটি মুখের উপস্থিতি জানিয়ে দেয়। আলোর উজ্জ্বলতা, অন্ধকারের গভীরতার স্তরভেদ এক-একটি মুখ নির্মাণ করে। কিন্তু হাইলাইটের জায়গা থেকে যায় সারা মুখে একটি। পৃথিবীর এমন কোনো ভালো পোর্ট্রেট বা মুখের খবর আমার জানা নেই, যেখানে একটির বেশী হাইলাইট বর্তমান। জানীর চিবুকে এখন হালকা নীল রঙের হাইলাইট। দুটি গোলাপী ঠোঁটের মধ্যে এত অল্প ব্যবধান য়ে ভিতরের সাদা দাঁত অন্ধকারে ডুবে আছে। নিচের ঠোঁটটি সামান্য

পুরু। ওপরেরটি টানটান ছিলায় ধনুকের আকার। ঠোঁট বেয়ে, ডান পাশের গাল, যেখানে আলো পড়েছে, সেই গালের উজ্জ্বল মসৃণ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আমার চোখ ওর চোখের সঙ্গে আটকে গেল। আমি জানি, আমার চোখের সাদা অংশটুকু এখন ফিকে গোলাপী। মাথার ভিতরে কোন অন্ধকার কোণে সেই প্রাগৈতিহাসিক গুবরে পোকাটির গায়ে নেশার জল পড়ে পড়ে জবজবে এখন! চিৎ হয়ে শুয়েছিল। উঠে দাঁড়িয়ে কুৎসিত এক বিচিত্র ভঙ্গিতে দুলে দুলে হেঁটে বেড়াতে লাগল। আমার দিকে সোজাসুজি তাকানো জানীর অপলক চোখের ভাষা বোঝবার চেষ্টা করছি। কিন্তু ও তো আমার চেয়ে বয়সে বড়! গুবরে পোকাটা বললে,

—"বয়েসে বড় তো কি হয়েছে! দেখতে সুন্দরী কিনা? কি সুন্দর মুখ, গোলাপ ফুলের মতো ঠোঁট দুটি, ভয়ঙ্কর বুক আর কোমর নিয়ে তোকে ডাকছে, দেখতে পাচ্ছিস না!"

কিন্তু ও তো জর্জের বউ! জানী বোয়াগুনতিয়ে। ও আমাকে চাইবে কেন?

—"দূর বোকা! তোকে এখন না চাইবার কি আছে! তুই তো জর্জের মতো বুড়িয়ে যাস নি। একটা সুন্দর যুবক পুরুষ তো তুই!"

জর্জ মোটেই বুড়িয়ে যায় নি। তাছাড়া, ওদের ছেলে ফিলিপ আছে!

—"ফিলিপ যে ওদেরই ছেলে কে বললে?"

ক্রমশ পোকাটার কাছে হেরে যেতে লাগলুম। ও বলে চলেছে,—"তোর বাদামী রং ওকে খুব টানছে। ভুলে যাস না ওর মাথার মধ্যেও ঠিক আমার মতো একটা প্রাগৈতিহাসিক পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে! জর্জ তো বেরিয়ে গেল কাঠ আনতে!"

কি যেন গানটা? সেই যে কাঠুরিয়াকে নিয়ে! পল্লীগীতি টাইপের! জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেছে কাঠুরিয়া। তার বউটি দেওরকে শুনিয়ে গান গাইছে "ভাতার গ্যাছে কাঠ আনতে—তারে বাঘে ধইর‍্যা খাউক! আমার দেওরা বাইচ্যা থাউক—"

আমি কি জানীর দেওর? গুবরেটা বললে,

—"মোটেই না! কোনো সম্পর্কই নেই!"

কিন্তু রোজমারী? রোজমারী যে আমার সব সাহস, আমার সমস্ত পাকা অভিজ্ঞতার কাগজগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে!

—"দূদ্দূর শালা! দুনিয়ার সবাই কি রোজমারী? ওরকম লাখে একটা

মেলে—তাছাড়া, ও তখন ওর ভারতীয় প্রেমিকের বিরহে কাতর ছিল। তুই বড্ডো তাড়াহুড়ো করেছিলি। আর একটু সবুর করলে—"

জানীর চোখে চোখ ছিলই। সামান্য হাসলুম। যতখানি মিষ্টি করে সম্ভব। আমি জানি, অন্য সময় আমার এইসব হাসি দেখে মেয়েরা বলতো,

—"তোমার ওই মিলিয়ন ডলার হাসি দিও না—মরে যাব!"

জানীর মুখে কোনো পরিবর্তন নেই। বোধহয় ওর পোকাটির সঙ্গে তর্ক করে চলেছে। গলায় মধু ঢেলে খুব আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলুম,

—"ইণ্ডিয়ানরা তো রোদে-পোড়া বাদামী! আমার এই বাদামী চামড়া তোমার কেমন লাগে?"

জানী শুনতেই পায় নি যেন। নাকি, সত্যি সত্যিই শোনে নি। আমার চোখে চোখ রেখেই জিগ্যেস করলে,

—"উঃ?"

সামান্য হতাশ হলুম। মনে মনে পিছিয়ে এলুম একটু। ও যদি আমার প্রশ্নটি শুনেও না শোনার ভান করে থাকে, তো, অসুবিধে নেই। কিন্তু, যদি সত্যি সত্যিই না শুনে থাকে তাহলে একটু সতর্ক হয়েই আশেপাশের ঝোপ পেটানো উচিত। নিজেকে একলা না রেখে দলবল সমেত প্রশ্নটি করলুম আবার,

—"আমাদের এই বাদামী রং কেমন লাগে তোমার?"

ও একেবারে ঘুম ভেঙে উঠল। অন্য কোনো জগৎ থেকে ফিরে এসে বলল,

—"ভালো। দারুণ ইন্টরেস্টিং! চামড়া ট্যান করার কত কসরৎ করি আমরা এখানে। গরমকালে সমুদ্রের বালিতে উপুড় হয়ে খালি গায়ে শুয়ে থাকি। দিনের পর দিন চামড়ায় রোদ লাগিয়ে গায়ের এই ক্যাকাসে ভাবের

ওপর একটু রং চড়াতে চেষ্টা করি। আর, তোমাদের কোনো ব্যাপারই নেই, এমনিতেই অ্যাতো সুন্দর ট্যানড্ রং—চোখ জুড়িয়ে যায়।"

ওর কথার ধরনে কোনো কিছুর আভাস নেই। গুবরে পোকার সামান্যতম গন্ধও নেই ওর চাউনিতে। সোজা অম্লান চোখে তাকিয়ে আমাদের দেশের গাঢ় চামড়ার প্রশংসা করল। নিজেকে পুরোপুরি সামলে নিলুম। মুহূর্তের মধ্যে ওকে নিয়ে আমার শারীরিক চিন্তা উবে গেল। ভালো করে অন্য চোখে ওকে দেখলুম আবার। সোজা সরল অভিব্যক্তি ছড়িয়ে আছে সারা মুখে। কোনো গ্লানি নেই, কোনো অন্যায়বোধ নেই, সাদাসিধে মনের চেহারাটি স্নিগ্ধ মুখের ওপর ফুটে উঠেছে। ও বোধহয় অন্য কিছু ভাবছিল তখন। একেবারেই অন্য কোনো কথা। যার ত্রিসীমানাতেও আমি ছিলুম না, ছিল না কোনো শারীরিক ইচ্ছার বীজ।

কিন্তু, ভেবে দেখলুম, আমিও তো কোনো অন্যায় করি নি। মানুষের মুখের মতোই প্রত্যেকটি শরীর অন্য শরীর থেকে আলাদা। জগৎ সংসারের প্রতিটি নারী ভিন্ন ভিন্ন। গণনায় নির্ভুল হয়তো সকলেরই দুটি হাত, দুটি পা, দুই বুক, দুটি চোখ সমান সমান। কিন্তু, তুলনার দাঁড়িপাল্লায় প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা। শিপ্রার সঙ্গে বীথিকার শরীরের কোনো তুলনা চলে না। উর্মি বা মধুমিতায় কোনো মিল নেই। অর্চনার শরীরের গন্ধ জানীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তুমি যেমন পৃথিবীর একা একটি নারী, রোজমারীও তেমন। সকলেই হয়তো সুন্দর। নানা রূপে, নানা ভাবে। তাছাড়া, তোমাদের স্বর্গীয় ভাষায় সেই, 'একনিষ্ঠ প্রেম কাহাকে বলে' জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিতে পারিব না। পরীক্ষা পাশের আশায় হয়তো বলিয়া বসিব, 'সোনার পাথর বাটি জাতীয় কোনো ভারী পদার্থ।' সেক্ষেত্রে, আমার হৃদয় যদি শরীরে ভর করে জানীর শরীরের গন্ধ কি রকম জানতে চায়, খুঁজতে চায় অপরিচিত, ভিন্নতর অনুভূতি ওর দেহের ভিতরে —তাতে আমি তো কোনো দোষ খুঁজে পাই না। কারণ, এইরকম খোঁজাখুঁজির ইচ্ছা কমবেশী প্রায় সকলেরই আছে—সেই সঙ্গে আছে ভয়, অন্য প্রাণীর ভয়, সমাজের ভয়, লজ্জাজনিত ধিক্কার বা পরাজিত হবার আতঙ্ক। এইসব ইচ্ছা কারো কারো আপন অজ্ঞাত মস্তিষ্কের কোষে সুপ্ত, কারো দৃপ্ত, কারো ভীত, কারো বা নির্ভীক। অনেক মানুষ-মানুষী এই খোঁজাখুঁজি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যেমন তুমি অথবা রোজমারী,—ইচ্ছা মরে যায় তখন। অনেকে আবার একটি মাত্র শরীরেই খুঁজে পায় সহস্র সুবাস, ইচ্ছার ছোটাছুটির দরকার হয় না আর।

তখনই কি তাকে বলে একনিষ্ঠ প্রেম? কে জানে! আমি তো জানি না। কারণ, আজ অবধি কোনো মানুষীর মধ্যেই আমি অন্য কোনো দ্বিতীয়ার গন্ধ খুঁজে পাই নি। আমার কাছে, প্রত্যেকটি মুখই আলাদা আলাদা। অদ্বিতীয়া সবাই।

জর্জের বাইরে অন্য কিছু খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন হয়তো নেই জানীর। অন্তত, এই মুহূর্তে আমাকে খুঁজে দেখার কোনো ইচ্ছাই ওর নেই। নিজেকে গুটিয়ে নিলুম। শরীরের সব কোষ, গ্রন্থিগুলি আলগা করে দিয়ে দম ফেললুম যেন। মনে হল, ভাগ্যিস ধড়ফড় করে এগিয়ে যাই নি। তাহলেই, যে নারী এক নরের মধ্যে সহস্র সুবাস খুঁজে পেয়েছে ভেবে তৃপ্ত, তার চোখে বড় ছোট হয়ে যেতুম। কারণ, আমার অন্বেষণের সুপ্ত ইচ্ছার খবর পেয়ে গিয়ে ও হয়তো আমাকে ঘৃণা করত, করুণা করত। সময় দিয়ে ঘষে ঘষে হেরে যাবার গ্লানি আমাকে ধুতে হত।

গেলাসে চুমুক দিয়ে হাসতে হাসতে বললুম.

—"ভাখো জানী, কি মজার ব্যাপার! তোমরা চাও আমাদের মতো গায়ের রং হোক তোমাদের। আমাদের চামড়ায় সাবানের পর সাবান ফুরিয়ে যায় আর ভাবি, ইস্ তোমরা কি ফরসা!"

জানীও গেলাস হাতে তুলে বলল,

—"দূর। ফরসা না ছাই! এটা কি একটা রং—" বলে নিজের বাঁ হাতের ধবধবে উল্টোপিঠ দেখাল, "এ তো একেবারে সাদা ক্যানভাস, কোনো রংই নেই।"

দু'জনেই হেসে ফেললুম! বললুম,

—"তবু দেখ, দুনিয়ার কয়েক লক্ষ সাদা চামড়া এখনো আমাদের ডার্টি নিগার বলে। কালো চামড়াকে ঘেন্না করে, নোংরা মনে করে।"

—"সেটা পুরোপুরি পলিটিকাল ব্যাপার। বহুকাল ধরে প্রভু-ক্রীতদাসের সম্পর্ক থেকে ওই ধরনের নোংরা ভাবনা কিছু নোংরা লোকের মধ্যে জমা হয়ে আছে।"

—"কে নোংরা, কি নোংরা—" বলতে বলতে জর্জ ঢুকে পড়ল ঘরে। দু'হাত দিয়ে বুকের কাছে চেপে রেখেছে ছোট ছোট কাঠের গুঁড়ি।

জানী হাসতে হাসতে বলল,

—"নোংরা আবার কে, তুমি ছাড়া! সারা ফ্রান্সে তোমার মতো নোংরা লোক দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

ফায়ার প্লেসের দিকে হাঁটতে হাঁটতে গিন্নীর ঠাট্টার জবাব দিল জর্জ,

—"কেন ডার্লিং, আমি আবার নোংরা হতে গেলাম কেন! হপ্তায় কম-সে-কম চার দিন চান করি—নোংরা বললেই হল!"

এ রাজ্যে স্নানের ব্যাপার-স্যাপার এইরকমই, বউ! সপ্তাহে চারদিন চানও সকলে করতে চায় না বা পারে না। একে তো এই শীতকালের চামড়াছেঁড়া ঠাণ্ডায় স্নানের ইচ্ছেই কমে যায়, তার ওপর সকলের ঘরে ঘরে স্নানের সুবিধেও নেই। স্নান বলতে, মাথা থেকে পা অবধি সর্বত্র জল ঢালতে গেলে পয়সা লাগে। ফলে, বেশির ভাগ লোকই বেসিনে মুখহাত ধুয়ে খুশি। যাদের বেসিনে সুবিধেও নেই, তারা হয়তো সপ্তাহে একদিন পাবলিক বাথে গিয়ে পরিষ্কার হয়। অনেকে আবার তাও করে না বা পারে না। গায়ে-গতরে এসেন্স মেখে ঘুরে বেড়ায়। স্নানের ঘটনা তাদের কাছে বিলাসিতার সমান। দেশে বসে ভাবলেই কেমন গা ঘিনঘিন করে। তবে, এখানে একটা বিরাট সুবিধে, ঘাম ব্যাপারটি প্রায় নেই বললেই চলে। হাত তুলে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরলে বিতিকিচ্ছিরি ভেজা বগলের জন্যে কলকাতার অনেক সুন্দরীই আমাদের যুবক চোখে নাকচ হয়ে যেত, এখানে সে ঝামেলা নেই।

—"না, না! তোমার স্নানের কথা বলছি না—" বলে, হাসিমুখে আমার দিকে ফিরে জানী কথা শেষ করলে,

—"ও যখন ছেনি, হাতুড়ি, কাঠের গুঁড়ো, প্লাস্টারের মধ্যে বসে কাজ করে তখন দেখলে মনে হয় মিস্তিরি-মজুরের সঙ্গে ঘর করছি!"

ফায়ার প্লেসের সামনে উবু হয়ে বসেছে জর্জ। ধিকিধিকি আগুন তখনো জ্বলছে। তার ওপরে এবং চারপাশে বৃত্তাকারে কাঠ সাজিয়ে দেওয়া হল। কয়েকবার ফুঁ দিতেই নতুন কাঠগুলি পটাপট শব্দে কিছু ফুলকি এবং ধোঁয়া ছড়িয়ে দিল। উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত ঝাড়তে ঝাড়তে জর্জ ঘোষণা করল,

—"এইবার জ্বলবে। সেই কবে কিনে রেখেছি, এখনো শুকোয় নি ডালগুলো।'

জানীকে বললুম,

—"কই তোমার পেইন্টিং দেখাবে না?"

জর্জ বললে,

—"ঠিক আছে, চলো শিল্পী! তোমাকে আমাদের আতেলিয়ে দেখাই।"

বাইরের দরজার দিকে এগোতেই আমার আতঙ্ক হল। বললুম,

—"বাইরে যেতে হবে?"

দরজার হাতলে হাত রেখে জানী বললে,

—"বাইরে, মানে, সামনে উঠোনটুকু পেরোতে হবে।"

বললুম,

—"কোটটা দাও তাহলে, পরে নিই। ঠাণ্ডা লাগে যদি।"

জর্জ এবং জানী দু'জনের গায়েই পুরোহাতা সোয়েটার। আমার হাতকাটা সোয়েটারটির পেটের কাছে একটু ছেঁড়া বলে জামার ভেতরেই পরে নিই।

জর্জ হাসতে হাসতে বলল,

—"উঠোন পেরোতে ঠাণ্ডা লাগলে আগামী কালই দেশের টিকিট কেটে ফেল।"

লজ্জা পেয়ে বললুম,

—"না, না, আসলে এখানকার এই শীতে শরীর তো ঠিক অভ্যস্ত নয়—"

জানী বললে,

—"দাঁড়াও, কোটটা এনেই দিই। কী দরকার? পট করে ঠাণ্ডা লেগে গেলে বিপদে পড়ে যাবে বেচারা—"

বলে ও ভেতরের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই বললুম,

—"জামার তলায় অবশ্য আমার একটা গরম সোয়েটার আছে।"

জর্জ আমার পিঠ চাপড়ে বললে,

—"তবে আবার কি, রাগী যুবক। চলো!"

বলতে বলতে সোফার ওপরে রাখা ওর মাফলারটি আমার গলায় জড়িয়ে দিল। ব্যস্তভাবে বলে উঠলুম,

—"ব্যস্, ব্যস্। এখন আর শীতের বাপের সাধ্য নেই আমায় ধরে।"

দরজা খুলতেই শীত এসে নাকে-মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তির্‌তির্ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এই বৃষ্টি প্রায় হিম পড়ার মতো। আকাশে ঘন অন্ধকার। বিদ্যুৎ-টিদ্যুৎ চমকানোর ব্যাপার নেই। থিয়েটারের পর্দার মতো নিকষ কালো আকাশ। ওপরে মুখ তুলে তাকাতেই মনে হল, কোনো বিরাটাকার শিল্পী ফ্ল্যাট বুরুশে ল্যাম্প ব্ল্যাক নিয়ে আকাশময় লেপে দিয়েছে। সিমেন্টে বাঁধানো ছোট্ট উঠোনের বাঁদিকে রাস্তায় বেরিয়ে যাবার গেট। সামনে দেওয়াল। ডানদিকে দশ কদম হাঁটলে লম্বাটে একতলা দু'খানি ঘর পাশাপাশি। উজ্জ্বল আলো নেই কোথাও। বসবার ঘরের ঝাপসা আলো এসে পড়েছে উঠোনে। এই এলাকায় পৃথিবী মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা পাখি ডাকছে না, কুকুরের গলাও শোনা যাচ্ছে না,

জীবনের সাড়া নেই কাছেপিঠে কোথাও। দেওয়াল ঘেঁষে একটা অচেনা গাছ কাঙালের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে। পাতা নেই, ফুল-ফল সব ঝরে গেছে কঠিন শীতে, বর্ষায়। আগে জানী, পেছনে জর্জ। দু'জনে যেন সামনে পেছনে পাহারা দিয়ে আমাকে শীতটুকু পার করে দিল। ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে সুইচ টিপে বাতি জ্বালল জানী। তিনজনে ঢুকে পড়লুম ঘরে। জর্জ পেছনের দরজাটি বন্ধ করে দিল আবার। লম্বাটে ঘর। বাঁদিকে অর্থাৎ উঠোনের দিকের দেওয়ালটি পুরো কাচের। বাইরের অন্ধকার লেগে আছে কাচের গায়ে। ভেতরের আলোয় আমাদের চেহারা দেখাচ্ছে কাচে. কালো আয়নার মতো। সিমেন্টের দেওয়ালে কোনো ছবি টাঙানো নেই। অথচ, কয়েকটি পেরেক ঠোকা রয়েছে। তার মানে একটাই দাঁড়ায়, ওগুলিতে ছবি ঝোলানো থাকে, এখন নেই। লম্বা ঘরটির অপর প্রান্তে ছোট্ট একটি সস্তা কার্পেট। চটের তৈরি বিবর্ণ কার্পেট। না, ঠিক বিবর্ণ বলা যাবে না, রং পড়েছে যেখানে সেখানে। কার্পেটের ওপর তিন পায়ার ঈজেল। ঈজেলে একটি বড় আকারের ছবি। ছবিটির দিকেই প্রথম নজর চলে গেল। বেশ সুখীসুখী ভাবের ছবি। ঝোড়ো, উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে একটি গোলাপী নৌকো। ধূসর আকাশ। নৌকোয় একটি সুখী পরিবার গ্রুপ ফোটো তোলার ধরনে বসে আছে। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। বাবা, মা। রঙীন, সুখী একটি সংসার উদ্দাম সমাজের মধ্যে ভেসে চলেছে যেন। বলছে, দ্যাখো, আমরা এই সমুদ্র, এই আকাশকে ভয় পাই না। আমাদের রঙীন নৌকোই আমাদের জীবন। আশে-পাশে যা হবার হয়ে যাক্, আমরা দুলে দুলে সুখে আছি।

সামান্য ডিসটর্টেড চেহারাগুলি। অনেকটা পুতুল-পুতুল ভাব। কোনো ছবিরই কোনো মানে হয় না। নিজের মধ্যে, মনে মনে যা অনুভূত হয়, তাই ছবি। ছবির অর্থ খুঁজতে গেলেই একটি কবিতাকে লণ্ডভণ্ড করা হয়। জিজ্ঞাসার জবাবের খোঁজে কোনো কবিতা বা কোনো শিশুকে যেন মর্গে নিয়ে যাওয়া হল। পোস্ট-মর্টেম হবে। ছবি, কবিতার পোস্ট মর্টেম করবেন সমালোচকরা। আমি ওসব বুঝিটুঝি না। একটি ভালো ছবি দেখলেই অনুভূতি আসবে ভেতরে। ব্যাকরণ তো ছবি নয়। অনুভব ছবি অথবা কবিতা। সূর্য ডোবা, সূর্যোদয় দেখতে কেন ভালো লাগে বলতে পারো, বউ! একটি শিশু তার চেয়েও ছোট শিশুকে কোলে শুইয়ে ভিক্ষে করছে দেখলে একটি ছবি দেখা হয়ে যায়। কারণ, তখন সেই দেখার মধ্যে যে কষ্টের বা অসোয়াস্তির অনুভব—তাই ছবি। ছবি কোথাও

কবিতা, কোথাও গল্প, উপন্যাস কখনো কখনো। পেইন্টিংয়ের বা ক্যানভাসে আঁকা শিল্পসৃষ্টির নিজস্ব ভাষা আছে। সেই ভাষায় ক-অক্ষর গোমাংস হলে ছবি শুধু দেওয়ালেই থেকে যায়, হৃদয়ে আসে না। আধুনিককালের ভালো ছবি দেখেও, অশিক্ষিতদের বাদ দিচ্ছি, অনেক শিক্ষিত গুণীজন আঁতকে ওঠেন,

—"ও বাবা। এটা কি ? কিছুই তো বুঝি না আপনাদের মডার্ন আর্ট্-ফার্ট্।"

যেহেতু শিক্ষিত, যেহেতু গুণীজন এবং যেহেতু ঘর সাজাবার জন্যে তিনি ঠিক-ঠাক ফুলের মতো দেখতে ফুলের ছবি বা সীনসীনারি কখনো-সখনো কিনে থাকেন, তাই, হেঁ হেঁ করতে হয়। বলা যায় না যে, স্যার, দয়া করে আরো বেশী বেশী ছবি দেখুন। উনিশ শো পঁচাত্তরের হতভাগ্য শিল্পীদের আর জুতো মারবেন না! কারণ, এ বড় আজব ভাষা, হুজুর! পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু পাঠ্য-পুস্তক পড়ে এ ভাষা শেখা ভারী মুশকিল। দেখে দেখে চোখ মন তৈরি হয়। একটি ভালো ছবির রস নিতে গেলে, কবিতার মতোই শিল্পজগতের নিজস্ব ভাষায় সেই রস গ্রহণ করতে হবে আপনাকে, আপন বোধ এবং অনুভূতি দিয়ে। একজন বাঙালী হয়তো মারাঠী ভাষা বোঝে না। মারাঠী ভদ্রলোক হয়তো চীনা বা জাপানী ভাষায় একেবারে অজ্ঞ। অথচ, বাঙালীটির আঁকা ছবি মারাঠী, চীনা এবং জাপানীটির কাছে হয়তো অনেক কথা বলতে পারে। আবার জাপানী বা চীনা লোকটির আঁকা কোনো ছবির ব্যথা, বেদনা সুখ, দুঃখ বাঙালী বা মারাঠী লোকটির হৃদয়ের বোধের আয়নায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। সেই জন্যেই বউ, শিল্পী হচ্ছে গোটা জগৎসংসারের ভাষা! প্রদেশ, দেশ বা মহাদেশের গণ্ডিতে যে ভাষা আবদ্ধ হয়ে নেই, ছিল না।

তোমাকে নিয়েও কি আমার কম ঝামেলা গেছে, বাপু! সেই যে, 'এই ছবিটার মানে কি!' 'ওটার মধ্যে অত বড় একটা গোল চক্র কিসের ?' তোমাকে ছবি বোঝানো আমার পিতৃপুরুষের সাধ্যের বাইরে ছিল। তবু, বলতে হবে বউ, আমার সঙ্গে গ্যালারীগুলোতে ঘুরে ঘুরে শেষের দিকে তুমি একটু একটু রস নিতে পারছিলে।

ডান পাশের দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা কয়েকটি ছবি। মোটামুটি বেশ পাকা হাতের ছবি, দেখলেই বোঝা যায়। ইমপ্রেশনিজমের ছায়ায় আঁকা ফিগারেটিভ ছবি। জানীকে বললুম,

—"খুব ভালো ছবি। কিন্তু, আর কই ? মোটে এই কটি ছবি রয়েছে, স্টুডিওতে ?"

জানী জর্জের দিকে তাকাল। জর্জ সেই দুষ্টুমির হাসি মাখিয়ে বললে,

'হুঁহুম্ বাবা! বড় বড় শিল্পীদের ব্যাপারই এই রকম। আঁকা হতে না হতেই পটাপট বিক্রি!"

জানীকে জিজ্ঞেস করলুম,

—"মোটামুটি কি রকম দাম করো তোমার এই সব ছবিগুলির?"

জানী বললে,

—"সাত-আটশো থেকে হাজার-বারোশো ফ্রাঁ!"

—"বাঃ, মন্দ কি, ভালোই তো!"

জর্জ বললে,

—"খদ্দের পেলে তো ভালোই। নিয়মিত খদ্দের জোটানো যে কী মুশকিল—" বলে, জানীর দিকে ফিরে একটু হাসল। হাসিটি যেন কেমন-কেমন। মানে বোঝা ভার।

ছবি আঁকার পক্ষে ঘরটির আলো কম মনে হল। জানীকে সে কথা বলতেই ও হেসে উঠল,

—"রাত্তিরে কে ছবি আঁকবে! দিনের বেলায় কাচের দেওয়াল পেরিয়ে আলো আসবে, তবে তো ছবি! তুমি বুঝি রাত্তিরে আঁকো?"

বললুম,

—"হ্যাঁ, ঘরের মধ্যে আলো জেলে। দিনের বেলাতেও আমার ঘরটিতে প্রচুর আলো ঢোকে না।"

জর্জ বললে,

—"ও। তার মানে, তুমি ন্যাচারাল আলোয় পেইণ্ট করো না। আর্টিফিশিয়াল আলোয়!"

—"হ্যাঁ।"

—"তাতে রং বুঝতে অসুবিধে হয় না?"

—"হয় বইকি! তবে, একটা জিনিস ভেবে দেখলে, কৃত্রিম আলোতেই ছবি আঁকা উচিত।"

দু'জনে একসঙ্গেই জিজ্ঞেস করলে,

—"কেন, কেন?"

—"তার কারণ, যে সব বাড়িতে তোমার আঁকা ছবি টাঙানো থাকবে, সবখানেই প্রায় কৃত্রিম আলো। শহরে আজকাল এমন বাড়ি খুব কমই পাওয়া

যায় যাদের দেওয়ালে ছবি দেখার মতো দিনের আলো প্রচুর। সুতরাং যে বা যারা তোমার ছবি দেখবে, তারা বলতে গেলে আর্টিফিশিয়াল আলোতেই দেখবে। সেখানে ন্যাচারাল আলোয় তোমার আঁকা রঙের ফারাক হয়ে যাবে অনেক। কিন্তু, তুমি বাতি জেলে নিজের যে রঙ দিয়ে ছবিটি আঁকলে, গ্যালারী বা ক্রেতার দেওয়ালে তার মোটেই হেরফের হবে না।"

জর্জ গম্ভীর মুখে মাথা দুলিয়ে আমায় সমর্থন করল। জানী বললে,

—"ঘরের মধ্যে বাতি জেলে ছবি আঁকতে মন কেমন খুঁতখুঁত করে। নীল রঙ সব্জে দেখায়, লেমন হলুদ সাদা—"

হাসতে হাসতে বললুম,

—"ভেবে দেখো, দিনের আলোয় তুমি নীল লাগালে, দর্শকরা গ্যালারীতে ছবিটি দেখে ওই জায়গাটি সবুজ মনে করল—খারাপ লাগবে না তখন ?"

জর্জের কাজের জায়গা জানীর পাশের লাগোয়া ঘরটি। একেবারে খালি পড়ে আছে এখন। কিছু কাঠের গুঁড়ো, যত্রতত্র কিছু প্লাস্টার ছাড়া বাকি সব ফাঁকা। জর্জ দু'পাশে দু'হাত ছড়িয়ে যেন কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল,

—"সব বিক্রি হয়ে গেছে—সব !"

বলার ধরনটি স্পষ্ট লাগল না। অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলুম,

—"তার মানে ?"

জানী চুপচাপ দাঁড়িয়ে। জর্জ, মনে হল, কথা ঘুরিয়ে দিল। বলল,

—"আবার নতুন কাজে বসতে হবে।"

উঠোন পেরিয়ে ফিরে আসতে আসতে বললুম,

—"তোমাদের টেলিফোনটা কোথায়—একটা ফোন করব।"

জর্জ বললে,

—"কাকে ?"

—"একজন বাঙালীকে।"

জর্জ যেন একটু আঁতকে উঠল,

—"ট্রাঙ্ক কল !"

—"না। প্যারিসেই।"

ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে দিগেনদার টেলিফোন নম্বর চেয়েছিলুম। কলকাতার দিগেন্দ্রনাথ পাল। আমার চেয়ে বয়সে অন্তত আট বছরের বড়। কবিতা লিখতেন কলকাতায়। ছোটখাটো পত্র-পত্রিকায় লিখতেন কলা-সমালোচনা।

বসবার ঘরের পাশে ছোট্ট কুঠুরিতে টেবিলে রাখা টেলিফোন। পকেট থেকে কাগজটি বের করে সাত সংখ্যার নম্বর ডায়াল করতে লাগলুম। রাত প্রায় দশটা। বাড়িতে পাব কিনা কে জানে! এক যুগ বাদে কথা বলব, একেবারে ভিন্ন পরিবেশে—চিনতে পারলে হয়!
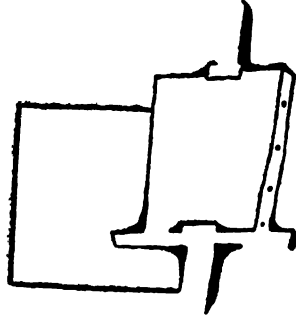
আর্ট গ্যালারীর মধ্যে যেন একটি রেল-স্টেশন। লুভ্র্-এ নেমে ঠিক তাই মনে হল প্রথম। এই পাতাল রেল-স্টেশনটির নাম এখানকার বিখ্যাত জাদুঘরের নামেই রাখা হয়েছে। ঘটাং ঘটঘট্ শব্দ তুলে রেলগাড়িটি চলে যেতেই দু'দিকের প্ল্যাটফর্ম দুটি ভালো করে দেখলুম। অন্যান্য সব স্টেশনের মতো দেওয়াল-জোড়া বিজ্ঞাপন নেই এখানে। কয়েক ফুটের ব্যবধানে দেওয়ালে কাচে-মোড়া এক একটি শো-কেস। তার মধ্যে সযত্নে সাজিয়ে রাখা ছবি। কোনোটায় তেলরঙে বিমূর্ত ছবি, কোনোটিতে নিসর্গ চিত্র। একটায় কাঠ খোদাই, অন্যটায় পাথরের ভাস্কর্য। পৃথিবীর আর কোন্ রাজ্যে এরকম অসাধারণ রেল-স্টেশন আছে আমার জানা নেই, বউ। যদিও, এইসব কোনো ঐতিহাসিক বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী বা ভাস্করের কাজ নয়, তবুও শিল্প তো! জনসাধারণ তথা রেলযাত্রীদের শিল্পবোধ উন্নত করবার জন্যেই বোধহয় সযত্নে সাজানো অল্পখ্যাত শিল্পীদের শিল্পকর্ম। আর্ট গ্যালারীর মতো একটি রেল-স্টেশন। চোখের সামনে ভেসে উঠল দিশী দেওয়াল। প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালময় পানের পিক থেকে শুরু করে "দম্-দম্-দিকা-দিকা" ছবির জঘন্য পোস্টার। ঋতুবন্ধ বা নিরোধের বিজ্ঞাপন, চুন-আলকাতরায় 'জাগো বাঙালী'। লুভ্র্-এ দাঁড়িয়ে যদি বা কাঁচড়াপাড়া বা লিলুয়া স্টেশনের দৃশ্য ভাবা যায়, ভারতবর্ষের কোনো রেল-স্টেশনেই সুস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে লুভ্র্-এর এই ছিমছাম, সযত্নে রক্ষিত আর্ট গ্যালারীর মতো একটি স্টেশন কল্পনায় আনা মুশকিল।

হাঁটতে হাঁটতে স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠে এলুম। লুভ্র্ জাদুঘরের উল্টোদিকে রাস্তার ওপারে একটি শূন্য বেদী। দেড় দু'ফুট উঁচু। বিখ্যাত মানুষের প্রতিমূর্তি যে ধরনের বেদীর ওপরে বসানো হয়, সেই রকম শান বাঁধানো চৌকো একটি বেদী। শূন্য পড়ে আছে। দশ ফুট বাই দশ ফুট মতো হবে। যথারীতি মেঘলা আকাশ। মোটরগাড়িগুলো সাঁ-সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। দূরে আইফেল টাওয়ারের চূড়া। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটছি। রাস্তা পেরিয়ে বেদীটির কাছাকাছি পৌঁছে গেলুম। হঠাৎ মনে হল, এই বেদীটির ওপরে, ইচ্ছে করলেই, সরকার যে কোনো শিল্পীর মূর্তি বসাতে পারে। শিল্পীর প্রতিকৃতি : পাথর কেটে ভ্যান গগ্, গগ্যাঁ, অথবা তুলুস্ লোত্রেক-কে এখানে দাঁড় করালেই পারে। ভাবতে ভাবতে আশে-পাশে চোখ ঘুরিয়ে দেখলুম। এই সকালে আমাকে কেউ লক্ষ্য করছে না। সকলেরই কাজে যাবার তাড়া। পায়ে হাঁটার মানুষ এ রাস্তায় এখন নেই বললেই চলে। পুলিস-টুলিসও চোখে পড়ল না। বেদীর ওপরে উঠে ঠিক মধ্যিখানে এসে দাঁড়ালুম। শীতে হিম হয়ে যাচ্ছে সমস্ত শরীর। হু-হু করে বাতাস বইছে। লুভ্র্-এর দিকে ফিরে সোজা হয়ে দাঁড়ালুম। এখন কি ইচ্ছে করছে জানো বউ? আমি যেন পাথর হয়ে যাই। বোমা ফাটিয়ে যে পাথর সরানো যায় না। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ লুভ্র্ দেখতে আসছে। বিদেশীরা ভারত সরকারের অতিথি হলেই যেমন রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীকে মালা দিতে যায়, এখানেও, জাদুঘর দেখে বেরিয়ে দলে দলে লোক ফুল মালা নিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে আমার গায়ে। অবাক চোখে দেখছে আমাকে। পৃথিবীবিখ্যাত ভারতীয় এক শিল্পীর পাথুরে প্রতিকৃতি দেখে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে অজস্র মানুষ-মানুষী! গগ্যাঁ, লোত্রেক, সেজান, দেগা ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে আছেন। বলছেন, 'কে হে বিদেশী ছোকরা! উড়ে এসে জুড়ে বসেছো—নেমে এসো শিগ্গীর।' গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল, পথ চলতি মোটরগাড়ির হর্নে চমকে তাকালুম, তাড়াতাড়ি নেমে এলুম বেদী থেকে সাধারণ মানুষের রাস্তায়। পেছন ফিরে আর তাকালুম না। কি জানি, আবার যদি ওখানে উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে না তো বউ! দ্রুত পায়ে রাস্তা পেরিয়ে চলে এলুম লুভ্র্-এর গায়ের ফুটপাথে। আর একবার ঘুরে তাকাতেই দেখি, বেদীর ওপরে প্রচণ্ড ভিড়। দেলাক্রোয়া, গ্যারীকোর্ণট থেকে শুরু করে ম্যানে, দেগা এমন কি মোদিগ্লিয়ানী, পিকাসো পর্যন্ত ওই দশ ফুট বাই দশ ফুট বেদীর ওপরে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করছেন। আর বেদীটা ঠিক ঝড়ের সমুদ্রের মধ্যে নৌকোর মতো দুলছে—কাউকে

দাঁড়াতে দেবে না। মনে মনে হাসি পেয়ে যেতেই খেয়াল হল, আমার হাসি পাচ্ছে। বোধহয় হেসেও ফেলেছি, কে জানে, পাশে চোখ পড়তেই দেখি ওভারকোট গায়ে এক ফরাসী পুলিস। সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আমায় দেখছিল, চোখে চোখ পড়তেই দু'পা এগিয়ে এসে ভারী মিষ্টি করে হাসল। অত্যন্ত বিনীত গলায় জিজ্ঞেস করল,

—"মঁসিয়, আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি কি ?"

দেশে জানতুম, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিসে ছুঁলে ছত্রিশ। বেশ আতঙ্ক হল ভেতরে ভেতরে। নিশ্চয়ই লোকটি আমাকে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য রেখেছে। গত কয়েক মিনিট আমি কি করেছি, গুছিয়ে খেয়াল করতে পারছি না। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললাম,

—"মেরসী মঁসিয়। দরকার নেই কিছু। আমি লুভ্র্ দেখতে এসেছি।"

কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে জাদুঘরের বিশাল এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়লুম, অনেক আগে এসে পড়েছি। দিগেনদা বলেছিলেন সাড়ে এগারোটা নাগাদ। টেলিফোন করতেই ফরাসীতে জবাব দিলেন এক ভদ্রমহিলা। জিজ্ঞেস করলুম,

—"দিগেন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে কথা বলতে পারি কি ?"

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন,

—"কে কথা বলছেন ?"

—"আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি।"

মোটামুটি নিরুৎসুক গলায় ও-প্রান্ত থেকে জবাব,

—"দিগেঁ এখনো ফেরে নি।"

চটাং করে কানে লাগল। বলেন কি ভদ্রমহিলা! দিগেনদা এখানে এসে দিগেঁ হয়েছেন। দন্ত্য ন উবে গিয়ে চন্দ্রবিন্দু হয়েছে। জিজ্ঞেস করলুম,

—"কখন ফিরবেন ঠিক আছে কিছু ?"

—"ঠিক নেই।"

—আপনি কে কথা বলছেন জানতে পারি কি ?"

—"দিগেঁর স্ত্রী।"

কি করব, কি বলব ভাবছি। দিগেনদার ফরাসী স্ত্রী। জানতুম না উনি বিয়ে করেছেন। তার মানে, ফরাসী রাজ্যে এখন উনি পুরোপুরি সংসারী। ওপার থেকে অধৈর্য স্বর,

—"আর কিছু বলবেন ?"

জর্জের নম্বর দিয়ে বললুম,

—"ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরে এলে অনুগ্রহ করে এই নম্বরে আমাকে টেলিফোন করতে বলবেন।"

—"আচ্ছা, বলে দেব।"

—"ধন্যবাদ।"

আমার ধন্যবাদের অপেক্ষা না রেখেই ওপারে রিসিভার নামিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা। নিজের হাতের রিসিভারটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললুম, ব্যাপারটা কি? দিগেনদার বউ কি একটু খিটখিটে! না কি কথা বলার ধরনই ওই রকম। অনেকের থাকে। যেমন, বম্বের শ্রীতপন রায়। সপ্তাহে এক-আধ দিন ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতই। দেখা হলে, সাধারণত যেভাবে আমরা কথা আরম্ভ করি, বলেছিলুম একদিন,

—"এই যে, নমস্কার, কি খবর?"

আর যাবে কোথায়! মুখ তুলে তাকিয়ে একেবারে খ্যাকখ্যাক করে উঠলেন,

—"খবর? খবর আবার কি? কিসের খবর! রোজ রোজ কি খবর জানতে চান!"

আচ্ছা, বল তো বউ, এ রকম জবাবের পর আর কথা কোত্থেকে এগোবে! সেই যে আমি চুপসে গেলুম, তারপরে আর বিশেষ কাছাকাছি ঘেঁষি নি। অথচ ভদ্রলোক পাগল নন। সরকারী কি একটা খেতাবও পেয়েছেন কাজকম্ম করে। প্রচুর লোকের উপকারও করেছেন, জানি। কিন্তু কথাবার্তার ধরনই ওই রকম!

অবশ্য, টেলিফোনে দু'মিনিট কথা বলেই কোনো অপরিচিতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু ধারণা করা মুশকিল। হয়তো দাম্পত্য কলহ হয়েছে। হয়তো আমি টেলিফোন করার আগের মুহূর্তেই শাশুড়ীর কাছে বকুনি খেয়েছেন—ভাবতে ভাবতেই মনে হল, তা কি করে হবে। দিগেনদার স্ত্রীর শাশুড়ী, মানে দিগেনদার মা'ও কি এখানে আছেন? বাবা গত হয়েছেন ওঁর বালক বয়সে। বিধবা মা এবং দিগেনদা'রা তিন ভাই একসঙ্গে থাকতেন যদ্দূর জানি। সেই বৃদ্ধা মা কি এখন প্যারিসে ওভারকোট পরে আগুন পোয়াচ্ছেন? অসম্ভব। কালীঘাট রোডের সেই ইট-পাঁজর বেরুনো বাড়িটির একতলায় গিয়েছিলুম। দিগেনদার সঙ্গে প্রথম বার, পরের বার আমার পেইন্টিংয়ের ফোটোগ্রাফ নিয়ে। ভাইদের মধ্যে দিগেনদাই ছোট। বাকি দু'ভাই ছোটোখাটো চাকুরে। বড় ভাই বিবাহিত

এবং একটি মেয়ে ছিল তখনই। ভাইদের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। মা এবং বড়দার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তখন, দিগেনদার বয়েস আর কত হবে! বড়জোর আটাশ। ওঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ অ্যাকাডেমীর গ্যালারীতে, আমার প্রদর্শনীর সময়। খুব দ্রুত সংক্ষিপ্ত স্রোতের মতো প্রথম দিনের আলাপের কথা মনে পড়ছে। ছিপছিপে রোগা লম্বা দিগেনদা। চৌকো মতন মুখের হাড় বেশ সজাগ। কয়েকদিনের না-কামানো পাতলা দাড়ি। তীক্ষ্ণ নাক, রুক্ষ লম্বা চুল, পুরু চশমার আড়ালে দুটি উজ্জ্বল চোখ এবং দৃঢ় চিবুকের দিগেনদা আমাকে প্রথম আলাপেই আকৃষ্ট করেছিলেন। কবিতা লিখতেন দিগেনদা। আমার প্রথম প্রদর্শনীর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন কোনো অখ্যাত পত্রিকায়। পেইন্টিংয়ের ছবি সমেত দীর্ঘ সমালোচনা। তারপর থেকে মাঝে-মধ্যে কফি হাউসে দেখা হত। আড্ডা, ছবি, কাব্য আলোচনায় মেতে উঠতুম। দিগেনদার রাগী কবিতা এখানে সেখানে ছাপা হত। বেশ ভালো কবিতা। তারপর, কলকাতা থেকে উধাও হয়েছি। সমস্ত-যোগাযোগ ছিঁড়ে গেছে। সব মুখ মনে থাকে, আড্ডা ছিঁড়ে যায়। দিগেনদার আর কোনো খবর রাখি নি গত এক যুগ। কোন এক বন্ধুর চিঠিতে জেনেছিলুম উনি প্রায় আট-ন' বছর ধরে প্যারিসে আছেন। বন্ধুটি কোনো ঠিকানা দিতে পারে নি। এখানকার ভারতীয় দূতাবাস আমাকে টেলিফোন নম্বর দিয়েছে। সেই দিগেনদা, যাঁর কালীঘাট রোডের বাড়িতে গুড় দিয়ে চা খেয়েছিলুম। ওঁর মা খাইয়েছিলেন। তখনই মায়ের যথেষ্ট বয়েস। সাদা থান পরে, দু'হাতে দুটি কাপ নিয়েছিলেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে বলেছিলেন,

—"বেঁচে থাকো বাবা! বড় হও।"

হাতমুখ ধুতে ভেতরে গিয়েছিলেন দিগেনদা। পেছনে, দরজার দিকে এক পলক দেখে নিয়ে মা জিজ্ঞেস করেছিলেন,

—"কি করো বাবা তুমি, পড়ো?"

—"না, মাসীমা। পড়াশুনোয় ইতি করেছি। ছবি আঁকি আমি। প্রদর্শনী করেছি।"

'বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ধারদেনা করে—' এ কথাটা আর বললুম না।

—"রোজগারপাতি হয় ওতে?"

একটি ছবিও বিক্রি হয় নি, কি বলব! একটু হেসে বললুম,

—"না মাসীমা। তেমন ব্যবসা ঠিক নয়!"

বাবা-মা কেউ নেই শুনে একটু কষ্ট পেলেন মাসীমা। বললেন,

—"তা বাবা, চাকরি-বাকরি করবে না?"

দুম্ করে মিথ্যে কথা বেরিয়ে গেল,

—"চেষ্টা তো করছি।"

মাসীমা আর একবার পেছনের দরজার দিকে দেখে নিয়ে বললেন,

—"তবু তো বাবা তুমি চেষ্টা করছো। বাচ্চু, মানে তোমাদের দিগেনদা তো কিছুই করে না। এম-এটা পাস দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলে, কবিতা লিখব।"

তারপর, একটু থেমে, খুব আগ্রহের গলায় জানতে চাইলেন,

—"চাকরি-বাকরির কথা তোমাদের কিছু বলে-টলে?"

দিগেনদা ঘরে ঢুকতেই একবার ওঁকে দেখে নিয়ে আমায় বললেন,

—"বোসো বাবা, তোমরা গল্প করো, আমার উনুন খালি যাচ্ছে—"

সেই মাসীমা এতদিনে কি সুখী হয়েছেন! তাঁর নিষ্কর্মা বাচ্চু এখন প্যারিসের মতো জায়গায় জাঁকিয়ে বসেছে, কেউকেটা হয়ে ফরাসীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবন ছুটিয়ে চলেছে। মাসীমা আরও দশ-বারো বছর পেরিয়ে এসে সাদা থানের ওপরে ওভারকোট পরে ফায়ার প্লেসের কাছে বসে। আরাম চেয়ারে বসা সেই বৃদ্ধার শরীরে-মনে কি আজ ওম্ ভাব। অসম্ভব মনে হলেও, ভাবতে ভালো লাগছে। ওঁর সঙ্গে দেখা হলেই কালীঘাটের বাসার মতো টিপ্ করে প্রণাম করব। এখানে তো নিশ্চয়ই কেউ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না, এক ওই দিগেনদা ছাড়া। আমিও এতদূর পরবাসে এক বাঙালী মাকে প্রণাম করতে পারব। এই সব ভাবতে ভাবতে খাবার টেবিলে এসেছিলুম। আমাদের তিনজনের খাওয়া শেষ হতে না হতেই দিগেনদার টেলিফোন এসেছিল।

জর্জই উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে আমায় ডাকল,

—"তোমার টেলিফোন।"

আমি সাড়া দিতেই ওপার থেকে দিগেনদার গলা,

—"কি খবর? কবে এসেছো?"

জবাব দেব কি আমি! সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত তখন। কলকাতা থেকে হারিয়ে যাবার মতো দূরত্বে বসে বারো বছর আগে হারিয়ে যাওয়া সেই দিগেনদার গলা। একটু ভারিক্কি, একটু যেন অন্যরকম বাংলা। তবু দিগেনদা তো আমাদের কফি হাউসের উজ্জ্বল কবি, সমালোচক দিগেন্দ্রনাথ পাল।

মোটামুটি ধাতস্থ হতে না হতেই টেলিফোনে কথা শেষ করতে হল। উনি বললেন,

—"লুভ্র্ চেনো তাহলে ? বেশ। এক কাজ করো। কাল সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ ইম্প্রেশনিস্ট গ্যালারীর সামনে আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্যে। দুপুরে একসঙ্গে খাবো আমরা। তখন কথা হবে। আজ ছাড়ছি। বেশ রাতও হয়ে গেছে তো !"

ভেজা ভেজা হলদে ঘাসের ওপর দিয়ে বাঁদিকে হাঁটছি। ডান পাশে সামান্য দূরে ভ্যান গগের একক প্রদর্শনীর গ্যালারীতে ছোটখাটো লাইন দাঁড়িয়ে গেছে। পাঁচিল ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে চোখের কোলে দেখে নিলুম, ফরাসী পুলিসটি রাস্তা থেকে তখনো আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছে। বয়েই গেল, তুই তোর মনে আমাকে দ্যাখ, আমি নিজের মনে হাঁটি। চুরি-ডাকাতির মতলব নিয়ে তো আর ঘুরছি না ! নিজেই নিজেকে বললুম। বলতে বলতে ইম্প্রেশনিস্ট গ্যালারীর সামনে এসে দাঁড়ালুম। পুলিসটার মুখ, দিগেনদা, মাসীমা সব একাকার হয়ে গেল। গ্যালারীর সামনে একটিও লোক নেই। ভেতরে, মনে হল, দর্শকদের অপেক্ষায় দেগা, মাতিস, ম্যানে, সীজান, গগ্যাঁ, লোত্রে—সবাই অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন। প্রত্যেকেরই প্রতীক্ষার চোখ। আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষে কোনো সমালোচক বা ক্রেতার পরোয়া নেই ওঁদের। রাস্তার অপর পারে, ওই বেদীর ওপরকার ভিড়ের একটি অংশ যেন এখানে, গ্যালারীতে চলে এসেছে। 'দেখছি-না, দেখছি-না' করেও আমার দিকে নজর। পায়চারি থামিয়ে মনে মনে ডাকছেন যেন আমাকে,

—"কি হে ছোকরা ! বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ? ভেতরে এসে দেখে যাও, তোমার চোদ্দপুরুষ যা দেখে নি !"
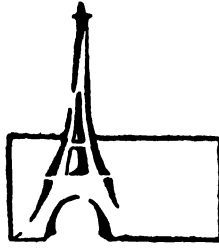
গ্যালারীর ভেতরে ঢুকতে গেলে এক্ষুনি তিনটে ফ্রাঁ খসে যাবে। পকেটের ওজন ক্রমশ হালকা হয়ে আসছে। রোজগারের পথও মোটেই আলোকিত চোখের সামনে দাঁড়িয়ে নেই, বউ। সকাল-বিকেল বাগেত চিবোচ্ছি ক'দিন ধরে। কাগজের মতো এক ফালি হ্যাম দিয়ে স্যাণ্ডউইচ। পুলিসের মোটা লাঠির মতো রুটিকে বলে বাগেত। স্পেশাল ফরাসী পাঁউরুটি। লাঠির চারপাশ টোস্টের মতো কড়া করে সেঁকা। প্রথমে ওটিকে পাঁচ ছয় টুকরো করা হয়, পরে এক একটি টুকরোকে মাঝখান দিয়ে চিরে ভেতরে হ্যাম গুঁজে হয়ে গেল স্যাণ্ডউইচ। চিবুতে চিবুতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়। শেষও হয় না। পেটও ভরে না। কালো কফিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে কোনোক্রমে গলা দিয়ে সবটুকু চালান করে দিলে নিশ্চিন্দি। মনে হয়, যাক্ শেষ হল স্যাণ্ডউইচ। দু' তিন ফ্রাঁ নির্বিঘ্নে বেরিয়ে যায় পকেট থেকে। এখানে ঢুকতে গেলেও তিনটি ফ্রাঁর ধাক্কা। ঝোঁকের মাথায় ভ্যানগগকে দেখতে গিয়ে কাল পাঁচটা ফ্রাঁ বেরিয়ে গেছে।

দিগেনদাটা একেবারে যা-তা। এই এমন জায়গায় অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করা মোটেই উচিত হয় নি। আমার নিজেরও এত আগে এখানে চলে আসাটা ঘোর অন্যায়ের পর্যায়ে পড়ে যাচ্ছে। পকেটের কথা ভেবে দমে যাচ্ছি, অথচ এখান থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে যে দাঁড়াব তেমন পায়ের জোরও খুঁজে পাচ্ছি না। এপাশে ওপাশে তাকিয়ে লোভী মনটাকে ফেরাবার চেষ্টা করলুম। একটা পাখি নেই এই শীতের সকালে। দেশের মতো গরু, মোষ বা কুকুরদেরও পাত্তা নেই পথে ঘাটে। রাস্তার দিকে দেয়াল ঘেঁষে সামান্য দূরে দূরে কলকাতার পার্কের মতো বেঞ্চি। সব ক'টি খালি খাঁ খাঁ করছে। ডান দিকে বিশাল গেটের তলা দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। হাঁটা-পথেও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। মোটর গাড়িগুলি হুসহাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুদিকে ছুটে যাচ্ছে। পুলিসটিকেও খুঁজলুম—না, টহল

দিতে দিতে তিনিও উধাও। শুধু ভ্যানগগের ওখানে একটু একটু করে লাইন বড় হচ্ছে। আকাশের দিকে তাকালুম। তেমনি মুখভার করে আছে। সেই ধূসর পটভূমিতে তিনটে হালকা নীল-রঙা মারবেল পাথরের টেবিল দেখতে পেলুম। কোণের দিকে টেবিলের ওপারে মঁসিয় দরুত্যাঁ গাঢ় রঙের টুপি পরে পাইপ খাচ্ছেন। তার পাশে বসে আছেন উনবিংশ শতকের অভিনেত্রী মাদ্‌মোয়াজেল আন্দ্রে। গায়ে হালকা গোলাপী কোট, সামনে টেবিলের ওপরে সেই যুগের দিশী ফরাসী মদ অ্যাব্‌সিন্থ্‌। চোখ সরিয়ে নিয়ে পকেট হাতড়ে দোমড়ানো গোল-ওয়াজের প্যাকেট বের করলুম। না, আর থাকা যায় না! এদ্‌গার দেগার এই ছবিটির মুদ্রিত চেহারা যে কত সংকলনে দেখেছি, কত আকারে, তার হিসেব নেই। আসল ছবিটি আমার চোখের নাগালের মধ্যে। গগাঁ বললেন,

—"আমার ভাইকমতিকে দেখবে না! তাহিতির মেয়েদের? তাদের সোনার শরীর?"

ভেবে দেখ বউ, এরা সব আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে প্রায়—শুধু তিনটে ফ্রাঁ খরচ করলেই চোখ ভরে সব আসল রং, আসল ক্যানভাস দেখে নিতে পারি, যাতে রয়েছে গগাঁ, ভ্যানগগের আপন হাতের ছোঁয়া।

সিগারেটে টান দিতেই দুম করে হিসেব এসে গেল মাথায়। দুপুরে তো দিগেনদার সঙ্গে খাওয়ার নেমন্তন্ন। স্যাণ্ডউইচ চিবুতে হবে না। উল্টে মঁসিয় দিগেঁপলের পয়সায় লজ্জার মাথা খেয়ে গাণ্ডে-পিণ্ডে গিলব। আর এক মুহূর্তও তর সইল না। লম্বা একটা টান দিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। স্যাণ্ডউইচের সেই তিনটে ফ্রাঁ ফরাসী সরকারকে দিয়ে এখন আমি অ্যাব্‌সিন্থে'র সামনে বসে আছি।

লোকে যতই বাহবা করুক, দেগার সব ছবি আবার আমার পছন্দ নয়, বউ। তবে, অ্যাব্‌সিন্থের জবাব নেই। এমন কম্পোজিশন, এমন রং, এই মুড আমার সমস্ত মস্তিষ্কে বোধের ভিতরে ঝিম ধরিয়ে দেয়। নিচের তলাকার আরো সব বিখ্যাত ছবিটবি দেখে দোতলায় চলে এলুম। গ্যালারী প্রায় ফাঁকা। এখনো লোকজন আসার সময় হয় নি। তাছাড়া, আজ তো আর ছুটির দিন নয়! দোতলায় দু'তিনটে ছোট-বড় ঘর। বাঁ দিকের প্রথম ঘরেই আমার ভ্যানগগ। ভ্যানগগের 'ওভ্যাঁর গীর্জা'। তারপরে ওঁর 'গাশের পোত্রেত', যে ছবির লাল টেবিল আমাকে পাগল করে দেয়! পাশের ঘরে ওঁর 'আর্লের শয়নকক্ষ'।

ছবিটি দেখেই চমকে উঠলুম। এ কী! এর তো এখানে থাকার কথা নয়।

কাল দুপুরেই ছবিটিকে আমি স্বচক্ষে পাশের গ্যালারীতে দেখে এসেছি—ভ্যান-গগের একক প্রদর্শনীতে। মনে মনে ভাবলুম, সকালে এখানে রাখা হয় ছবিটি, পরে দুপুরের দিকে ভিড় বাড়লে নিয়ে যাওয়া হয় পাশের দালানে। কিন্তু তাও তো অত সোজা ব্যাপার নয়! লক্ষ লক্ষ টাকার ছবি সকাল-বিকেল টানাটানিতে এ-বাড়ি ও-বাড়ি করবে, কেমন যেন ভাবনাটুকু হজম হল না। খুব স্থির মস্তিষ্কের কল্পনাও নয়। উত্তেজিত হয়ে দু'পাশে তাকালুম। দেখি, গাঢ় উর্দিপরা রক্ষীমশাই কোণের দিকে একটি টুলে বসে আছেন। শুধু বসে আছেন নয়, তীক্ষ্ণচোখে আমায় লক্ষ্য করছেন। চোখে চোখ পড়তেই কোঁচকানো ভুরু টান-টান হয়ে গেল। দ্রুত পায়ে ওঁর কাছে এগিয়ে গেলুম। রক্ষীমশাই উঠে দাঁড়ালেন। খুব বিনীত গলায় জিজ্ঞেস করলুম,

—"মাফ করবেন, মঁসিয়। আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন?"

সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝুঁকিয়ে ওঁর জবাব,

—"উঈ মঁসিয়! নিশ্চয়ই! কি বলুন?"

হাত তুলে ভ্যানগগের ছবিটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"আপনারা কি রাত্রে ওটিকে এখানে নিয়ে আসেন এবং দুপুরে আবার পাশের দালানে নিয়ে যান?"

—"তার মানে?"

প্রনাবি'র ভাষায় একেবারে 'অজভুশে'র মতো আমার দিকে চেয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন রক্ষী। একটু শান্ত গলায় বোঝাবার চেষ্টা করলুম,

—"গতকাল ওই ছবিটিকে ভ্যানগগের একক প্রদর্শনীতে দেখে এসেছি কিনা, তাই, জানতে চাইছি, কখন ওটিকে নিয়ে আসা হল এখানে?"

জবাবে যা শুনলুম, তাতে আমার মতো অজ্ঞের অবাক না হয়ে উপায় ছিল না, বউ! ভ্যানগগ তাঁর আর্লের শয়নকক্ষ তিনবার তিনটি আলাদা ক্যানভাসে এঁকেছেন। প্রায় একই কোণ থেকে। সামান্য রং এবং তুলির ঝাপটার হেরফের। তিনটিই অরিজিনাল ছবি হিসেবে পৃথিবীর তিনটি আলাদা আলাদা রাজ্যে শোভা পায়। এখানকারটি এখানেই থাকে। একক প্রদর্শনীতে যেটি কাল দেখে এসেছি, সেটি আনা হয়েছে আমস্টার্ডাম থেকে। তৃতীয়টি আছে শিকাগোতে। বোঝো বউ! একই বিষয়বস্তু নিয়ে তিন তিনটে ছবি। আমি তো বাপু, বিংশ শতকের শেষে দাঁড়িয়ে একটি বিষয় নিয়ে একই দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি ছবিই আঁকার কথা ভাবতে পারি না! মনে মনে ভাবলুম, তিনটির একটি

ছবিও ভ্যানগগকে তাঁর আপন ইচ্ছের ভিতর আনন্দ পৌছে দেয় নি বোধ হয়, কিংবা ভিন্ন ভিন্ন রূপে একই বিষয় তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, অথবা আহা রে, ভদ্রলোক বোধহয় সত্যিই পাগল ছিলেন, আজীবন।

এই ঘরের ঠিক মধ্যিখানে লম্বাটে কাচের আলমারির ভেতর গগ্যাঁর কাঠের কাজ সাজানো রয়েছে। ছোটখাটো মূর্তি থেকে শুরু করে ছুরির বাঁটের ডিজাইন পর্যন্ত করে গেছেন শিল্পী। আলমারির কাচের দেয়ালে কোণের দিকে সযত্নে হেলান দিয়ে রাখা পল গগ্যাঁর রঙের প্যালেট। প্যালেটে শুকনো নানা রঙের ভেতর খানিকটা লেমন হলুদ দলা পাকিয়ে উঁচু হয়ে আছে। সেই উজ্জ্বলতা আর নেই। বয়েসের ধূসর আস্তরণ পড়ে গেছে রংটুকুর চারপাশে। শেষ জীবনের অসুস্থ শরীর নিয়ে হয়তো ছবি আঁকতে বসেছিলেন গগ্যাঁ। টিউব টিপে হলুদটুকু বের করে রেখেছিলেন প্যালেটে। হয়তো, শেষ ছবি তাঁর শেষ হয়ে গেছে, ওই রংটুকুর আর প্রয়োজন হয় নি। গবেষকরা অনেক কিছু বলেছেন, বলবেন। কিন্তু ধরো বউ, সেই যুগের সভ্যজগৎ থেকে বহু বহু দূরে আদিম মানুষের আতুয়ানা দ্বীপে বসে রোগযন্ত্রণায় কাতর শিল্পী তাঁর শেষ ছবিটি যদি শেষ করতে না পেরে থাকেন! কোনো এক তাহিতি মেয়ের সেই আধা-শেষ ছবিটি যদি চিরকালের মতো হারিয়ে গিয়ে থাকে! হয়তো শিল্পী কোনো রমণীর সোনার শরীরে লাগাবার জন্যে ওই লেমন হলুদটুকু বের করেছিলেন টিউব টিপে। ক্যানভাসে লাগানো আর হল না। রঙের প্যালেট তো কোনো ছবি নয়— বিখ্যাত শিল্পীর ব্যবহৃত জিনিস হিসেবে জাদুঘরের কাচের আলমারিতে জায়গা পেয়েছে। পাথর হয়ে যাওয়া বিষণ্ণ হলুদটুকুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, ও আমাকে বলছে, 'জানো, আমার মালিক যদি সেই একশো বছর আগে আমার কোনো গতি করে যেতেন, যদি ক্যানভাসে বেঁচে থাকা আতুয়ানা দ্বীপের কোনো সোনার শরীরে আমাকে লাগিয়ে যেতেন, তবে আমি সার্থক হয়ে শুকিয়ে যেতুম, পূর্ণ হয়ে বেঁচে থাকতুম'।

আশেপাশের এই সব ছবি, রঙের সঙ্গে মানসিকতা মিশে গিয়ে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে আমাকে। বইয়ে পড়া এই সব অসাধারণ শিল্পীদের ঢাল-তরোয়ালবিহীন লড়াইয়ের এক-একটি দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। মনে হয়, আমরা তো কিছুই করছি না, শুধু নামের পেছনে ছোটাছুটি। আমরা, আজকের শিল্পীরা যা করছি, এঁদের সময়ের বিচারে তা লড়াই নয়, বড়জোর খণ্ডযুদ্ধ। কে ক'টা প্রদর্শনী করল, ক'টা ছবি বিক্রি হল কার,

খবরের কাগজে ক' কলম ছেপেছে—নিন্দা-প্রশংসার অক্ষরগুলি নিয়ে লোকালুকি খেলা।

কলেজের এক মাস্টারমশাইয়ের মুখ মনে পড়ছে, বউ, যিনি নিন্দা-প্রশংসার বড় একটা ধার ধারতেন না। ছোটখাটো মানুষটির নাকে চশমা ঝুলে আছে। কালো রঙের মুখে হাসি দেখি নি কোনোদিন, কাঁদতে দেখেছিলুম একবার। করুণাময়ের কাঁধে ভর দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন। খালাসীটোলা থেকে তৈরি হয়ে বেরিয়েছি। টালমাটাল পা না হলেও মোটামুটি ঝিম ধরেছে। হাঁটতে হাঁটতে ওয়েলিংটনের মোড়ে পৌঁছোবার আগেই মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। গত তিন-চার দিন কলেজে আসেন নি। সামনাসামনি পড়ে গিয়েও পাশ কাটাবার চেষ্টা করেছিল করুণাময়। যদিও, আমাদের মুখ থেকে উনি গন্ধ পাবেন এমন ভয় ছিল না। কারণ, প্রায় সারাক্ষণই মাস্টারমশাই ড্রিংক করতেন। ক্লাসে বসেও নাকি চুকচুক করে তাঁর গেলাস শেষ হয়ে যেত, শুনেছি। এখন তো রীতিমতন টলোমলো। তবু মত্ত হলেও মাস্টারমশাই তো। তার ওপর আমরা দু'জনেও পাঁচ আউন্স করে তৈরি আছি। একটু সংকোচ হচ্ছিল। মুহূর্তের ব্যাপার। মাস্টারমশাই করুণাময়ের কাঁধে হাত ফেললেন,

—"কে রে, করুণাময় না ?"

করুণা খুব প্রিয়পাত্র ছিল ওঁর। আমি পাশ কাটিয়ে সরে পড়ব কিনা ভাবছি, আমার দিকে ঘোলাটে চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলেন,

—"তোমরা আমায় দেখে সরে যাচ্ছো কেন ? আমি তো কোনো অন্যায় করি নি ! ভুল তো আমার নয়। আমার কিছু করবার ছিল না, বাছারা—"

জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলতে বলতে করুণাময়ের দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের মুখ আপন বুকে লুকোবার চেষ্টা করলেন যেন। বিড়বিড় করে বললেন,

—"কাউকে বলিস না তোরা। আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে—"

আমি আর করুণাময় চোখাচোখি করলুম। ইশারায় জানালুম যে স্যারের নেশা হয়ে গেছে। এক মাতালকে সামলাতে গিয়ে অন্যদের নেশা কেটে যাবার দুশ্চিন্তা। অন্য কোনো মাতাল হলে, নিজেরা একটু বেশি মাতলামোর ভান করে ছাড়ান পাওয়া যায়। কিন্তু একজন অধ্যাপকের সামনে ইচ্ছে করে মাতলামো করতে কোথায় যেন আটকাচ্ছিল। খুব সমবেদনার গলায় করুণা জিজ্ঞেস করলে,

—"কি হয়েছে, মাস্টারমশাই ?"

মাথা তুলে কয়েক পল করুণাকে দেখলেন। ভাঙা গলায় বললেন,

—"কাউকে বলিস না তোরা—"

বলতে বলতে ছোট্ট শরীরটি থরথর করে কাঁপতে লাগল ওঁর। কান্না সামলানোর চেষ্টা করে পারলেন না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ওরই মধ্যে অগোছালোভাবে যা বললেন, প্রথম দিকে শুনে মনে হচ্ছিল, দুঃখবিলাস। পরে জেনেছিলুম, কি ভয়ংকর সত্যি কথা বলেছিলেন উনি। সারাদিন ক্রেয়ন, প্যাস্টেল অথবা জলরঙে একটির পর একটি ছবি আঁকতেন মাস্টারমশাই। দিনের পর দিন। মাস বছরের হিসেব ছাড়িয়ে হাজার হাজার ছবি। কাগজে কাগজে মানুষ, ফুল, নিসর্গ চিত্র। সত্যিকারের ভালো ভালো স্টাডি। বাড়ির দুটি ঘরে বহু বছরের ঘাম-পরিশ্রম-কল্পনার রূপ থরে থরে জমা হয়ে গিয়েছিল। গত রোববার কি একটি ছবি খুঁজতে গিয়ে দেখেন, তালাবন্ধ প্রথম ঘরে অর্ধেকের বেশি ছবি উইপোকায় কেটে শেষ করে ফেলেছে। বউ, তুমি তো ছবি আঁকো না, সত্যিকারের শিল্পীর জীবনে এ যে কি মর্মান্তিক ঘটনা, তা বোধ হয় তোমাকে বলে বোঝানো যাবে না। মায়ের একটি সন্তান দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে গেলে, মায়ের কি অবস্থা হয় কল্পনা করো। শিল্পীর এক একটি সৃষ্টি এক একটি সন্তানের মতো। মানুষের শরীরে প্ল্যাস্টিক সার্জারি, অপারেশন চলে, কাগজে আঁকা ছবির শরীরে জোড়াতালি ভাবা যায় না বউ। শুধু কষ্ট হয়।

মাস্টারমশাইয়ের সব কথা সেদিন বিশ্বাস না করলেও মনে মনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। এমন ভয়ংকর সর্বনাশের কথা উনি ভাবছেন কেন, এই ভেবেই আঁতকে উঠেছিলুম সেদিন। ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে হেঁটে ওয়েলিংটনের মোড়ে এসেছিলুম তিনজনে। রাস্তা পেরিয়ে এসে চানাচুর কিনেছিল করুণাময়। মাস্টারমশাই ফুটপাথেই উবু হয়ে বসে পড়েছিলেন। আমাদেরও ওঁর দু'পাশে বসতে হয়েছিল। বলেছিলুম, মিছিমিছি সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলেছিলুম,

—"তাই বলে, ভেঙে পড়লে তো চলবে না মাস্টারমশাই। ছবি তো আপনাকে আঁকতেই হবে।"

করুণা কথা যুগিয়েছিল,

—"আরো ছবি, অনেক অনেক ছবি, স্যার!"

একটু পরেই ওঁর মেজাজ পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছিল। জড়ানো গলায় বলেছিলেন,

—"জানো বাছারা, পৃথিবীতে কত রং আছে? সায়েন্টিস্টরা বলে 'ভিবগিয়োর'! আমি বলি, ওর চেয়ে অনেক অনেক বেশি। সব অরিজিনাল। আমরা প্যালেটে একটার সঙ্গে আরেকটা রং মিশিয়ে তিন নম্বর রং তৈরি করি। প্রকৃতিতে সব রং এক নম্বর।"

তারপর, হঠাৎ থেমে গিয়ে ট্রাম লাইন দেখিয়েছিলেন আমাদের,

—"দেখো, চোখ মেলে দেখো, এই এক ফালি লাইনের মধ্যে কত রং খেলা করছে—"

ক্লান্ত, অনভিজ্ঞ চোখে তাকিয়ে একটাই রং দেখতে পেয়েছিলুম—উল্টো ফুটের দোকান থেকে ছিটকে আসা নিয়ন আলোর নীলচে রং।

মাস্টারমশাইয়ের মুখ এক ঝটকায় সরে গেল। দেখি, দিগেনদা অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতঘড়ির দিকে তাকালুম। প্রায় বারোটা। মিনিট পাঁচেক বাকি। দিগেনদার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাড়ে এগারোটায়। দুদ্দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম। দিগেনদা চলে গেলে সর্বনাশ। টেলিফোনে হয়তো ওঁর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করা যাবে। কিন্তু, দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন! সেই বাগেত চিবুতে গেলেও তো তিন ফ্রাঁ! ইউরোপীয়রা সময়ের ব্যাপারে একেবারে পাক্কা। এক মিনিট এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। ক'টা বাজে খেয়াল হওয়া থেকে শুরু করে নিচের তলার গ্যালারী পেরিয়ে দরজার মুখে আসতে আসতে কফি হাউস মনে পড়ল। আড্ডায় ঘড়ি ধরে সময় রাখার ব্যাপার কোনোদিনই ছিল না। হাওয়াই চটির শব্দ তুলে যে যখন খুশি এসে আড্ডায় বসে পড়তুম। কিন্তু, এখানে তো নিশ্চয়ই তা চলবে না। প্যারিস বলে কথা। দিগেন্দ্রনাথ পালমশাই এখন মঁসিয় দিগেঁ পল। কিভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করবেন কে জানে!

লোভ্রের বিরাট ছবি দুটি পেরিয়ে গ্যালারীর বাইরে এলুম। কেউ দাঁড়িয়ে নেই সামনে। দেয়াল পেরিয়ে পথে লোকজন হাঁটছে বটে. কাছেপিঠে কেউ নেই। দিগেনদা বলেছিলেন,

—"গ্যালারীর সামনে থাকব।"

হঠাৎ দেখি ভ্যানগগের প্রদর্শনীর দিকে এক ভদ্রলোক হেঁটে যাচ্ছেন। ভারিক্কি শরীরে কালো ওভারকোট। মাথায় ফেল্টের টুপি। পেছন থেকে ঘাড়ের ওপরে পড়ে থাকা পাকা লম্বা চুল দেখা যাচ্ছে। দু' পকেটে হাত ঢুকিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। দশ বারো গজ দূরে এখন। বিদেশী লোক বলেই মনে হল।

তবু, ডুবন্ত মানুষের শেষ খড় ভেবে, যা-থাকে-কপালে করে গলা তুলে ডেকে ফেললুম, সেই কফি হাউসের মেজাজে,

—“দিগেনদা !”
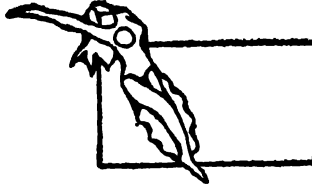
একেবারে সিনেমার নায়কের মতো ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকালেন ভদ্রলোক। গাঢ় বাদামী রঙের মাফলার গলায় জড়ানো। ঠোঁটের কোণে জলন্ত সিগারেট ঝুলছে। এ কে ? আমাদের দিগেনদা ! হ্যাতেই পারে না। মনের মধ্যে দ্রুত প্রশ্নোত্তরগুলি ছোটাছুটি করছে। আমি সেই যে ‘দিগেনদা’ হাঁক দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি, আর নড়ন-চড়ন নেই। ভদ্রলোক খুব মাপা কদমে হেঁটে আসছেন আমার দিকে। ওঁর সারা মুখে, শরীরে, চলার ধরনে কালীঘাট রোডের দিগেন্দ্রনাথ পালমশাইকে তন্নতন্ন করে খুঁজছি আমি। মাংসল মুখে চামড়ার রং কাশ্মীরী আপেলের মতো টকটকে। ফোলা ফোলা গাল দুটিতে সেই রং গাঢ়তর। পরিষ্কার করে দাড়ি-গোঁফ কামানো। চোখে চশমা নেই। অনেক কষ্টে টের পেলুম, দিগেনদা ফরাসী হয়ে গেছে। আপাদমস্তক প্যারিসিয়েঁ। ফেল্ট টুপি থেকে শুরু করে বুট জুতো অবধি মঁসিয়ে দিগেঁ পল। কাছাকাছি আসতেই খেয়াল হল, আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি। মুখ বন্ধ করে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলুম। স্বাভাবিক হব কোত্থেকে বউ ! আমার স্মৃতির খাতায় একটি মুখের হিসেবে সাংঘাতিক গরমিল ধরা পড়ে গেছে। সেই পুরু চশমা, খোঁচাখোঁচা দাড়িভর্তি মুখ, কলার ছেঁড়া জামা এবং ফটর্ ফটর্ হাওয়াই চটির ছবি রবার দিয়ে ঘষে ঘষে তুলতে বেশ সময় লাগল।

কাছাকাছি আসতেই মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল একটি বলদের মতো প্রশ্ন,

—“দিগেনদা, আপনার চশমা লাগে না আজকাল ?”

খুব ভারী গলায় আমাকে জানিয়ে দিলেন,

—“কনট্যাক্ট্ লেন্স্ আছে।” তার পরেই ভুরু কুঁচকে বিরক্ত মুখে জিজ্ঞেস করলেন,

—"এখানে সাড়ে এগারোটায় থাকার কথা না তোমার! এখন ক'টা বাজে?"

মুখ কাঁচুমাচু করে বললুম,

—"ভেতরেই ছিলুম। সময়ের খেয়াল ছিল না—দারুণ সব ছবি—"

আবার একই প্রশ্ন, একই স্বরে,

—"এখন ক'টা বাজে?"

—"বারোটা প্রায়।"

—"না। প্রায় নয়। বেজে গেছে।"

খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন দিগেনদা। রাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন,

—"এই জন্যেই তোমাদের, মানে, বাঙালীদের কিস্যু হয় না, হবেও না। সময়ের জ্ঞান না থাকলে জীবনে উন্নতি হওয়া অসম্ভব।"

আহা রে, দিগেনদা ফরাসী হয়ে গেছে!

দাঁত চেপে, ঠোঁটের সিগারেট ঠোঁটেই ঝুলিয়ে জ্ঞান দিতে লাগলেন। প্যারিস এবং কলকাতার ফারাক বোঝাতে লাগলেন। একটিও কথা না বলে পাশাপাশি হেঁটে চললুম। অসাব্যস্ত পা ফেলে চারজনে হাঁটছিলুম সেদিন। পাশাপাশি। আমার বাঁ দিকে কলেজের বন্ধু প্রিয়ব্রত, ডান দিকে দিগেনদা, তারপরে উঠতি কবি বিমল সেন। আকণ্ঠ না হলেও বেশ মেজাজ হয়েছে। দু নম্বর পুরো দুটি বোতল এবং একটা ফাইল শেষ। দিগেনদা খাওয়াচ্ছিলেন। সেদিনকার 'সেবক'-এ ওঁর নতুন কবিতা বেরিয়েছে। বেশ ভালো কবিতা। দিগেনদার পকেট খালি হয়ে গেল। কিন্তু, ওই যে বললুম, মেজাজ হয়েছে! ছোট্ট একটা পেঁয়াজের কুচি মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে দিগেনদা বললেন,

—"আর একটা ফাইল হলে জমত!"

আমরা তিনজনে পকেট ঝেড়েঝুড়ে সিকি-আধুলি মিলিয়ে আরেকটা ফাইল আনালুম। তারপর চারটে গেলাস-ফেরত পয়সায় আরো খানিক মদ আনিয়ে সোজা বোতলে মুখ লাগিয়ে খাওয়া হল। তাতেও হল না। দিগেনদা বললেন,

—"চ! শালা বেঁটে খচ্চরকে ধরি।"

বিমল বললে,

—"কোন্ বেঁটে খচ্চর দিগেনদা?"

খালাসীটোলা থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে পা রেখে দিগেনদা ঘুরে দাঁড়ালেন। ডান হাতের তর্জনী তুলে বললেন,

—"কবিদের পৃথিবীতে বেঁটে খচ্চর একটিই আছে। সেবকের সহ-সম্পাদক নেতাইচরণ বিদ্যাবিনোদ।"

পরে জেনেছিলুম, আসলে ভদ্রলোকের নাম নিত্যানন্দ বসু। আদরে, গৌরবে বা তাচ্ছিল্যে মোটামুটি কাঠামোটুকু রেখে দুমদাম মানুষের নাম পালটে দিতেন দিগেনদা। বিমল বলল,

—"অ! নিতাইদা। তা এত রাত্তিরে কি আর পাবেন ওঁকে?"

বিমলের কাঁধে হাত রেখে দিগেনদা খুব মজার গলায় বললেন,

—"পেতেই হবে, ভাই বিমল, না পেয়ে কি উপায় আছে!" বলেই ছড়া কাটলেন,

"খালাসীটোলার দুয়ার খোলার
চাবিকাঠি নিয়ে কাঁকে,
নিতাইচরণ বিদ্যাবিনোদ
চিরকাল বসে থাকে!"

আমি বললুম,

—"টাকা বাকি আছে নাকি?"

একগাল হেসে দিগেনদার জবাব,

—"সেই সকাল থেকে বাকি পড়ে আছে ভায়া! চল, নিয়ে আসি।" বলে হাঁটতে লাগলেন।

সেবক আপিসের পুরনো বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়ালুম। গেট পেরিয়েই বিহারী দারোয়ানজী উবু হয়ে বসে তোলা উনুনে রুটি সেঁকছে। দাড়ি-গোঁফ-মাথা চকচকে করে কামানো। সামান্য মুখ তুলে আমাদের দেখে নিল। গ্রাহ্য করল না। দালানের এক তলায় মাঝারি ঘরে জনা-পাঁচেক লোক টেবিলে বসে কাগজপত্র ঘাঁটছে, লেখালেখি করছে। কাউকে চিনি না আমি। এদের মধ্যে নিত্যানন্দবাবু কোনটি বোঝবার চেষ্টা করছি। ঘরে ঢোকার দরজার মুখোমুখি বেশ বড়-সড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দিকে সোজা হেঁটে চললেন দিগেনদা। মাথা-ভর্তি সাদা চুল আর ফর্সা গোলগাল মুখ নিয়ে বসে যে ভদ্রলোক কাজ করছিলেন, পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালেন। দিগেনদা আগে আগে, আমরা তিনজন পেছনে। টেবিলের এপাশে সাজানো তিনটি চেয়ারের কাছাকাছি পৌঁছে দিগেনদা বললেন,

—"নিতাইদা, এলুম!"

চশমার পেছনে ভুরু কুঁচকেই ছিলেন ভদ্রলোক। ঠিক সেইভাবেই বললেন,

—"তা' তো দেখতেই পাচ্ছি!"

বলার ধরনে বুঝলুম, আমাদের এই সময়ে আসাটা ওঁর পছন্দ হয় নি। আমরা তিনজনে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালুম। যতই মদ্যপান করি না কেন, এ রকম অভ্যর্থনায় একটু দমে যাওয়া স্বাভাবিক। শত হলেও দিগেনদার একটু নাম-টাম আছে বাজারে। তাঁর সঙ্গে এই ধরনের তাচ্ছিল্য জড়িয়ে কথা বলা আমাদের কারুরই পছন্দ হল না। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম আমরা। দিগেনদা কিন্তু নির্বিকার ভঙ্গিতে একটি চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। নিতাইবাবু আবার কাগজপত্রে চোখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বললেন,

—"কি ব্যাপার? অ্যাতো রাত্তিরে!"

আমরা দিগেনদার পেছনে দাঁড়িয়ে আছি। ওঁর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। মনে হল, উনি মৃদু হাসলেন এবং বললেন,

—"রাত্তির আর কোথায় নিতাইদা! আপনি তো এখনো কাজ করছেন আপিসে বসে।"

মুখ না তুলেই নিতাইবাবুর জবাব,

—"আমরা হলুম কাগজের লোক, আমাদের কি আর দিন-রাত্তির আছে!"

—"কবিদেরও নেই দাদা!" দিগেনদার গলার স্বর কি একটু জড়ানো মনে হল! নিতাইবাবু বোধহয় ধরে ফেলেছেন, সন্ধ্যের পর এখন চার মাতালের প্রবেশ। দিগেনদা মনে হয় এ রকম তৈরি অবস্থায় সেবক আপিসে এর আগেও দু-একবার এসেছেন।

'কবিদেরও দিন-রাত্তির নেই' কথাটা এমনভাবে কানে লেগে গেল, বলার ইচ্ছে হল 'শিল্পীদেরও নেই'! এবং বোধ হয় বলেও ফেলেছি, খেয়াল নেই, নইলে অমন বিচ্ছিরি চোখ করে নিতাইচরণ আমার দিকে তাকাবেন কেন!

দিগেনদা বললেন,

—"একটু দরকার ছিল নিতাইদা।"

কাগজে কলম ঘষতে ঘষতে নিতাইবাবুর গম্ভীর গলা,

—"কি দরকার?"

দু'পাশে তাকালুম। যারা টেবিলে বসে কাজ করছিল, তাদের সকলেরই চোখ আমাদের দিকে এখন। শুধু এই ঘরটি ছাড়া চারদিকের আর কোনো ঘরে

আলো নেই। কোনো মেশিনের একটানা ঘটর-ঘট্-ঘট্ শব্দ ভেসে আসছে। দিগেনদা বললেন,

—"কয়েকটা টাকা চাই নিতাইদা!"

একেবারে আকাশ থেকে পড়ার মতো চোখ করে নিতাইবাবু বললেন,

—"টাকা? কোথায় টাকা? কিসের টাকা।"

—"কেন, আমার কবিতার!"

ভুরু কুঁচকে অবাক গলায় নিতাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন,

—"কোন্ কবিতা?"

—"কোন্ কবিতা, কি বলছেন নিতাইদা? আজকের সেবকে আমার কবিতা বেরোয় নি?"

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন দিগেনদা। দু'-পাশের টেবিল ঘেঁটে আজকের কাগজ খুঁজে বের করলেন। আবার নিতাইবাবুর কাছে ফিরে এসে পাতা উল্টে দেখালেন,

—"দেখুন দাদা, এই যে! এই দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতা। আপনি না পড়ে থাকলে আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিচ্ছি—"

নিত্যানন্দ মুচকি হেসে বললেন,

—"না হে দিগেন, আবৃত্তি করতে হবে না। আমি পড়েছি।"

সঙ্গে সঙ্গে দিগেনদা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন,

—"কেমন কবিতা? বলুন আপনি! নিজেই বলুন।"

ভদ্রলোকের মুখে তেমনি মিটিমিটি হাসি। এই ধরনের হাসি দেখলেই হাড়পিত্তি জ্বলে যায় আমার। বুঝি, মাল খুব কঠিন। বললেন,

—"বেশ ভালোই তো!"

—"তবে?"

—"তবে কি?"

—"বলছিলুম, আমার সম্মানমূল্য কই?"

এইবারে হোহো করে হেসে উঠলেন নিতাইচরণ বিদ্যাবিনোদ। আশেপাশের রিপোর্টাররাও ফিক্‌ফিক্ করে হাসছেন। দিগেনদা খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন,

—"এতে হাসির কি হল দাদা! আমি সম্মানমূল্য পাব না?"

—"পাবে দিগেন, নিশ্চয়ই পাবে। সময়মতো পেয়ে যাবে।"

—"সময়মতো মানে?"

—"আগে ভাউচার তৈরি হোক, ওপরওলার স্যাংকশান হয়ে আসুক—"

দিগেনদার গলায় ঝাঁঝ মিশলো এবার,

—"অত সব ফর্মালিটি-ফিটি আমি বুঝি না। কবিতা ছাপা হলে দেন তো মোটে দশটি টাকা। তার জন্য, অত সব ফর্মালিটির দরকার নেই। কবিতা ছাপা হয়ে গেছে—এখন, সেবক কোম্পানীর দশটি টাকায় আমার ন্যায্য অধিকার।"

আমরা তিনজনে ঘরের ঠিক মাঝমধ্যিখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি। দিগেনদাকে এখন বোঝাতে যাওয়া মুশকিল যে, কবিতা ছাপা হবার সঙ্গে সঙ্গেই গরম গরম টাকা দেওয়া সেবকের পক্ষে অসম্ভব। শুধু সেবক কেন, প্রায় সব পত্রিকাওয়ালাদেরই এক ব্যাপার। নিতাইবাবু বলেছেন হক্ কথা, হিসেব-পত্তর হবে, কেরানীবাবু ভাউচার তৈরি করবেন, নানা কর্তাব্যক্তির অটোগ্রাফ পড়বে সেই ভাউচারে, তবে সেই চিরকুটটি দেখে ক্যাশবাবু তাঁর বাক্স খুলে টাকা দশটি বের করে দেবেন। একটা নিয়মকানুন বলে ব্যাপার তো থাকতেই হবে! কিন্তু, এ কথা তো নিঃসন্দেহে পরিষ্কার যে, টাকাকড়ি পেলে আমাদেরও এখন সুবিধে হয়। গালা দেওয়া বোতলগুলি চোখের সামনে নাচছে।

খুব মিষ্টি করে মাতাল কবিকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন নিতাইবাবু,

—"তোমার ন্যায্য অধিকার তো অস্বীকার করছি না ভাই! কিন্তু, আপিসের নিয়মকানুন তো আমি ভাঙতে পারি না! তা ছাড়া, অ্যাকাউন্টস সেকশন বন্ধ হয়ে গেছে পাঁচটায়। কেউ নেই এ ঘরে। ক্যাশের চাবিও তো আমার কাছে থাকে না—"

ধর্মপুত্তুরের মতো সব কথাই ভদ্রলোক নির্জলা সত্যি বলে গেলেন, তা মনে হল না। দিগেনদা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর, হঠাৎ বেশ গলা তুলে বললেন,

—"ও-সব আমি কিস্সু শুনবো না। দিগেন পালের কবিতা আপনারা ছেপেছেন। সেই কবিতার দাম দশ টাকা। আমি, শ্রীদিগেন্দ্রনাথ পাল স্বয়ং আপনার সামনে দাঁড়িয়ে—টাকাটা ছাড়ুন।" বলে নিতাইবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

—"চেঁচিও না দিগেন! কাল সকালে অ্যাকাউন্টস থেকে টাকা নিয়ে যেও—আমি ব্যবস্থা করে দেব।"

সহ-সম্পাদক খুব রাগী গলায় কথা ক'টি বলে কাজে মন দেবার ভান করলেন। যেন আজকের মতো ওঁর কথা বলা শেষ হয়ে গেল! দিগেনদাও নাছোড়বান্দা।

টেবিল ঘুরে ওঁর কাছে চলে গেলেন। দাদু-দিদিমারা যেভাবে নাতির থুঁতনি নাড়িয়ে আদর করে, ঠিক সেইভাবে নিতাইবাবুর থুঁতনি ছুঁয়ে বললেন,

—"কাল সকালে আকাউণ্টস থেকে আমার নামে টাকাটা আপনিই নিয়ে নেবেন দাদু! এখন আপনার পকেট থেকেই টাকাটা দিয়ে দিন তা হলে, আমাদের খুব দরকার।" বলে, এতক্ষণে আমাদের দিকে হেসে তাকিয়ে মাথা দোলালেন। তার আগেই নিতাইবাবুর মুণ্ডু পেছনে সরে গেছে। বেঁটে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছেন। ঘরে উপস্থিত সকলের দিকে একপলক দেখে নিয়ে চাপা গলায় ধমকে উঠলেন,

—"কি হচ্ছে কি দিগেন! এটা মাতলামোর জায়গা নয়।"

ভদ্রলোকের ফর্সা গোল মুখটি রাগের চোটে টক্‌টকে চৌকো হয়ে গেছে। তেমনি মৃদু হাসিমুখে দিগেনদা জানতে চাইলেন,

—"তা হলে নিতাইদা, এখন আমরা কি করব?"

—"কিচ্ছু করার নেই। এখন যেতে পারো।"

—"তা হলে টাকাটা দিন দাদা!"

আবার হাত বাড়িয়ে দিলেন দিগেনদা।

—"আমার কাছে কোনো টাকা নেই।"

'তাহলে' শব্দটি দিগেনদার বোধহয় খুব ভালো লেগে গেছে। একই সুরে বললেন,

—"তাহলে, আর আমরা যাব কোথায়?"

চেয়ারে বসতে বসতে নিতাইদা খুব রাশভারী গলায় বললেন,

—"ত্যাখো দিগেন, কাজের সময় এখন বিরক্ত করো না। অনেক মাতলামো হয়েছে, এখন যাও। নইলে আমি দারোয়ান ডাকতে বাধ্য হব!"

ঠিক তখনই সেই বিখ্যাত ঘটনাটি ঘটল। আমাদের দিগেনদা শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্তি ধারণ করে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। সেবক আপিসের সহ-সম্পাদক নিত্যানন্দ বসু কিছু বুঝে উঠবার আগেই কবি তাঁর বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠলেন। ঠোঁটের কোণে মধুর হাসি মেখে, ঢুলু ঢুলু চোখে দিগেনদা কীর্তনের সুরে গাইলেন,

—"তাহলে, আমি নাচ দেখাব!"

বলে, দু-হাত ওপরে তুলে কোমর দুলিয়ে নাচতে লাগলেন।

নিতাইবাবু চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ছিটকে সরে গেলেন। ওঁর মুখের এখন

যা চেহারা, তা কচিৎ কখনা মানুষের মুখে দেখা যায়। বিস্ফারিত দুটি চোখ। সাদা গোল মুখটি পুরোপুরি চৌকো। পাকা চুলগুলি খাড়া খাড়া দেখাচ্ছে। শ্বেত ভল্লুকের লোমে যেন আগুন ধরে গেছে। কি করবেন ঠিক করতে কয়েক মুহূর্ত চলে গেল। ডান পাশের রিপোর্টার দু'জন উঠে দাঁড়িয়ে চাপা উত্তেজিত গলায় বললেন,

—"এ কি কাণ্ড! এটা কি মাতলামোর জায়গা নাকি। ছিঃ ছিঃ!"

বাঁ পাশের বৃদ্ধটি তাঁর যুবক সহকর্মীকে চাপা ধমক দিলেন,

—"অলোক, তুমি হাসছো? ছ্যাঃ ছ্যাঃ! কাগজের মান-সম্মান আর রইল না।"

ঘটনাটি আচমকা হলেও আমরা তিনজনে সামলে নিয়েছি। নিয়ে, দিগেনদার নাচের তালে তালে হাততালি দিচ্ছি। নিতাইবাবু গলা কাঁপিয়ে চেঁচালেন,

—"কৈ-লা-স!"

পেছন থেকে সাড়া এল,

—"যাই হুজুর।"

পেছনের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আবার নিতাইবাবুর অসহায় চিৎকার,

—"শিগগির আয়!"

দিগেনদা ওঁর দিকেই ঘুরে ঘুরে কোমর দোলাচ্ছেন। বিচিত্র ভঙ্গিতে হাত ঘুরিয়ে টেবিলের ওপর পা ঠুকে ঠুকে তাল রাখছেন।

নিতাইবাবুর 'কৈলাস' ডাক শুনে আমাদের হাততালির আওয়াজ কমে গেছে। দিগেনদা যথারীতি নির্বিকার মুখে তুরীয় ভাব ধারণ করে নেচে চলেছেন। দরজার দিকে চোখ রেখেছি আমরা। নিত্যানন্দর মুণ্ডু মুহুর্মুহু ঘুরছে জানলা এবং দরজার দিকে। ওরই মধ্যে এক একবার হাঁ করে অপলক চোখে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করছেন।

আমার নেশা মোটামুটি কমে গেছে। বেশ বুঝতে পারছি এবার একটা হাতাহাতি হবে। নিতাইবাবুর ইজ্জতের সওয়াল। দিগেনদাও বোধহয় টাকাটি না নিয়ে এখান থেকে নড়তে চাইবেন না। আমাদের চোখে গোটা ব্যাপারটি অভিনব ঠেকছে। এমন আশ্চর্য দৃশ্য জীবনে বহুবার দেখা যায় না।

কোমরে গামছা-জড়ানো কৈলাসের গতর দেখা দিল দরজায়। সেই দারোয়ান, গেটের কাছে যে রুটি সেঁকছিল। দারোয়ানজীর থলথলে বিশাল বপু বেয়ে ঘাম ঝরছে। উনুনের সামনে বসে থাকা অথবা ছুটে আসার জন্যে সারা গায়ে কুলকুল

ঘাম। ভূত দেখার মতো দিগেনদার গৌরাঙ্গ বা নটরাজ মূর্তি দেখল এক সেকেণ্ড। কোমরের গামছা খুলে চোখ, মুখ, নেড়া মাথা মুছে আবার গোল গোল চোখে তাকিয়ে থাকল। ভাবখানা, দাড়িওয়ালা ক্যাঙ্গারুকে চশমা পরে নাচতে সে কখনো দেখে নি।

নিতাইবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন,

—"হাঁ করে দেখছিস কি হারামজাদা! গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দে!"

দিগেনদা নিতাইবাবুর দিকে চোখ রেখে নাচ দেখাচ্ছিলেন বলে, কৈলাসকে দেখতে পান নি। এবার ফিরে তাকাতেই তাঁর ভাবের পরিবর্তন হল। একেবারে নিমাই সন্ন্যাসের ধরনে কৈলাসের দিকে দু'-হাত বাড়িয়ে সুর করে গাইলেন,

—"এসো হে ভুবনমোহন—"

থপ্ থপে গুটি গুটি পায়ে কৈলাস দিগেনদার দিকে এগোচ্ছিল। দিগেনদার ভাব পাল্টাতেই একটু থমকে দাঁড়াল। জুলজুল চোখে কবিকে ভালো করে দেখে নিয়ে আর এক পা এগোতেই,

—"আর কত দূরে রাখিবি মোরে"—বলে দিগেনদা এক লাফে টেবিল থেকে নেমে কৈলাসের মুখোমুখি। কিছু বোঝবার আগেই দু'-হাত বাড়িয়ে কৈলাসকে জাপটে ধরে তার মসৃণ গালে কপালে, মাথায় মুখে চকাস্ চকাস্ শব্দে চুমু খেতে লাগলেন। লজ্জায় আতঙ্কে অথবা দিগেনদার দাড়ির খোঁচায় কৈলাসের 'ছেড়ে-দে-মা—' গোছের করুণ গলা আজো মনে আছে,

—"রাম-রাম! হেই বাবুজী, ছোড়িয়ে দিন! রাম-রাম হেই বাবুজী—"

সেই দিগেনদা আমার সামনে গম্ভীর মুখে বসে আছেন। টুপিটি খুলে টেবিলে রাখতেই মাথা-জোড়া টাক চকচক করতে লাগল। রেস্তোরাঁয় ঢোকার আগেই ঠোঁটের সিগারেট ফেলে দিয়েছিলেন। খুব মার্জিত মাপা বিলিতি কায়দায় মেনু-কার্ডের ওপর চোখ বোলাচ্ছেন এখন।

আহা রে! দিগেনদা ফরাসী হয়ে গেছেন!

মনে মনে ঠিক করলুম, কালীঘাট রোডের, কফি হাউস বা খালাসীটোলার বাঙালী কবি কতদূর ফরাসী হয়ে যেতে পারেন, জেনে যেতে হবে!
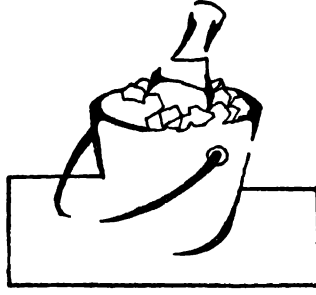
ধবধবে পোশাক পরা ওয়েটার এসে দাঁড়াল। আ লা কার্ত দেখতে দেখতে দিগেনদা জিজ্ঞেস করলেন,

—"কি খাবে?"

বললুম,

—"এদের খাবারের ভালোমন্দ আমি কিছুই বুঝি না, দিগেনদা। আপনি যা খাবেন, আমিও তাই।"

বিশুদ্ধ ফরাসী উচ্চারণে দিগেনদা ওয়েটারকে অর্ডার দিলেন—কড়াইশুঁটির স্যুপ, আলুসেদ্ধ আর শুয়োরের মাংস। ওয়েটার চলে যেতেই দিগেনদার দিকে সামান্য ঝুঁকে বললুম,

—"দাদা গো, চাট্টি ভাত পাওয়া যেত না?"

চিড়িয়াখানায় কোনো বিদ্ঘুটে জন্তুর দিকে তাকালে যেমন চোখ হয়, সেই চোখে আমায় দেখলেন দিগেনদা। সামলে নিয়ে হেঁ-হেঁ করলুম,

—"মানে, ভাত পেটে গেলে মনে হয়, যাক্, পেটটা ভরল!"

'তোমাকে দিয়ে কিস্সু হবে না' গোছের মাথা নেড়ে বললেন,

—"এখানে যখন এসেছো, ওই ভেতো অভ্যেসটি ছাড়ো। এদের মতো কর্মঠ হতে গেলে শুকনো খাবার খাওয়া প্র্যাকটিস করো।"

সত্যি বলছি বউ, ভেতরে ভেতরে আমার কেমন রাগ হচ্ছিল। যদিও যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই, তবু মনে হচ্ছিল, এত পরিচিত একটা মানুষ এমন একখানা অচেনা মুখ করে বসে আছে কি করে! লোকটা কি ভারতবর্ষ, কলকাতা, নিজের যৌবন, যৌবনের মানুষজন সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। অতীতের সেই সব শেকল-ছাড়া আগুন-মাখা দিনরাত্রিগুলোকে ধুয়ে মুছে ফেলে দিয়েছে? তা কি করে হয়! মানুষ বুড়িয়ে যায়। রাশভারি চেহারায় অভিজ্ঞতা জমে জমে

মস্তিষ্কের, হৃদয়ের ওজন বাড়ে হয়তো, কিন্তু অতীত, বিশেষ করে ছেলেবেলা থেকে যৌবন, যত তেতোই হোক, স্মৃতির মধ্যে পুড়িয়ে ফেলা অসম্ভব। পুড়িয়ে ফেলতে চাইলেও তা তো নিশ্চিহ্ন হবার নয়। তাছাড়া আমি একটা জলজ্যান্ত মানুষ দিগেনদার ফেলে আসা উদ্দাম যৌবনের স্মৃতি গায়ে মেখে বসে আছি সামনে—মনেই হচ্ছে না, এই ভদ্রলোক কোনোকালে যুবক ছিলেন, কলকাতার যুবক ছিলেন। সেই অধ্যাপকের গল্পটা মনে পড়ছে, সেই যে বউ, এক ভদ্রলোক —নামটা ধরে নাও অবনীবাবু—সেই অবনীবাবুর একদিন খুব সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে গেল। দোতলায় শোবার ঘরে খাটে শুয়েছিলেন। বারদুয়েক এ-পাশ ও-পাশ করে হাই তুলে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। শহরতলির এই বাড়ির সামনে বেশ ফাঁকা মাঠের মধ্যিখানে রাস্তা। এত ভোরে জনপ্রাণী নেই কোথাও। দূর থেকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছেন এক ভদ্রলোক। কাছাকাছি আসতেই অবনীবাবু চিনতে পারলেন, এখানকার কলেজের ফিলজফির প্রফেসর। ট্রেনে করে শহর থেকে পড়াতে আসেন এখানে। শীতের সকালে ঝকঝকে স্যুট-টাই পরে, হাতে ব্রীফকেস নিয়ে গম্ভীর মুখে হেঁটে আসছেন। ধবধবে সাদা চুল পরিপাটি, চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। বেশ রাশভারী চেহারা। অবনীবাবুর বাড়ির কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালেন। বাড়ির সামনের জমিটুকুতে বাগান। ফুল-টুল ফুটে আছে। পেয়ারা গাছের ডালে বাড়ির ছেলেছোকরারা দড়ি বেঁধে দোলনা মতো বানিয়েছে। অধ্যাপক এদিক ওদিক দেখে নিয়ে খুব সাবধানে বেড়া টপকে বাগানে ঢুকে পড়লেন। অবনীবাবু জানলা থেকে সামান্য সরে এসে লক্ষ্য রাখলেন, কি ব্যাপার! ফুল-টুল চুরি করবার তাল বোধ হয়। মনে মনে ভাবলেন, তা যাকগে, সম্ভ্রান্ত অধ্যাপকমশাই—যদি এক-আধটা ফুল নেবার ইচ্ছে হয় নিন, তাই নিয়ে চেঁচামেচি করে ওঁকে লজ্জা দেবার দরকার নেই। ও মা, অধ্যাপক ফুলের ধারেকাছেও গেলেন না। গম্ভীরমুখে ব্রীফকেসটি পেয়ারা গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে রাখলেন। আর একবার চারপাশ দেখে নিলেন ভালো করে। তারপর, দড়ির দোলনায় বসে মাটিতে পায়ের ধাক্কা দিয়ে দিয়ে দুলতে লাগলেন। দোলনাটি একদিকে অনেক উঁচুতে উঠে, মাটি ছুঁয়ে আবার অন্য দিকে উঠে যেতে লাগল। রীতিমত দোদুল দুলছেন ভদ্রলোক। গলার দামী টাই এবং মাথাভর্তি সাদা লম্বা চুল উস্কোখুস্কো হয়ে হাওয়ায় উড়ছে। বেশ কয়েক মিনিট দোলনায় দুলে অধ্যাপক নেমে পড়লেন। চশমা খুলে রুমাল দিয়ে কপাল মুখ মুছে ফেললেন। পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুল আঁচড়ে নিলেন। গলার

টাই ঠিক করে ব্রীফকেস হাতে নিয়ে পরিপাটি ফিলজফির প্রফেসর সাবধানে বেড়া টপকে গম্ভীর মুখে কলেজের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

গল্পটি ভাবতে ভাবতে দুম্ করে জিজ্ঞেস করলুম,

—"দিগেনদা, নিতাইচরণ বিদ্যাবিনোদকে আপনার মনে আছে?"

ছুঁচোলো মুখ করে চামচ দিয়ে স্থপ খাচ্ছিলেন। চোখ তুলে ভুরু কুঁচকে বললেন,

—"কে?"

স্থপের প্লেটে চামচ নাড়তে নাড়তে বললুম,

—"নিতাইচরণ বিদ্যাবিনোদ!"

—"সে কে?"

—"সেই ছড়াটা ভুলে গেছেন, 'খালাসীটোলার দুয়ার খোলা চাবিকাঠি নিয়ে কাঁকে, নিতাইচরণ বিদ্যাবিনোদ চিরকাল বসে থাকে?"

এতক্ষণ পরে এই প্রথম দিগেনদার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল দেখলুম। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হল, রোগা হয়ে গেলেন দিগেনদা। মাথাভর্তি অবিন্যস্ত চুল, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি এবং পুরু চশমার আড়াল থেকে সেই পুরনো উজ্জ্বল চোখে আমায় দেখলেন। ঠিক কয়েক সেকেণ্ড। তারপরেই আবার যে-কে সেই। আবার মঁসিয় দিগেঁপল। চামচ থেকে স্থপ খেতে এতটুকু শব্দ হল না। বাঁ হাতে ন্যাপকিন চেপে আলতো করে ঠোঁট মুছে মাপা হাসলেন। আমাদের দিগেনদা রেগে গেলে চিৎকার করতেন, কফি হাউসের চেয়ারের ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে নতুন লেখা কবিতা আবৃত্তি করতেন, ঠা ঠা শব্দে হেসে আশেপাশের লোককে চমকে দিতেন।

বললেন,

—"সেবকের নিত্যানন্দ বস্থর কথা বলছো? মনে আছে বইকি!"

প্রাচীন আগুন আর একটু উস্কে দেবার জন্যে বললুম,

—"সেই দারোয়ানজি তো তারপর থেকে আপনাকে দেখলেই দৌড়ে পালাতো—কি চুমুটাই খেয়েছিলেন!"

আবার একটু মৃদু হাসি,

—"সব ছেলেমানুষি ব্যাপার! কাজকম্ম না থাকলে লোকে যা করে আর কি!"

সমবয়সী হলে দিগেনদার চোয়ালে একটা ঘুষি মারতুম!

খাবারের সঙ্গে সাধারণত বিয়ার বা ওয়াইন খাওয়া এখানকার প্রায় নিয়মের মধ্যে পড়ে। দিগেনদা কিছুই নেন নি। বললুম,

—"মদ্যপান কি ছেড়ে দিয়েছেন একেবারে?"

জবাবে একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিলেন ভদ্রলোক, যার সারার্থ হল, উক্ত তরলীয় পদার্থটি এড়াইয়া চলাই মঙ্গল, কারণ ইউরোপে আসিয়া ভারতীয়রা হাভাতের মতো স্কচ ইত্যাদি খাইয়া সময় নষ্ট করে। মত্ত অবস্থায় বেলেল্লাপনা করিয়া বিদেশীদের চক্ষে ছোট হইয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই করিতে পারে না।—

দিগেনদার কোনো কথাই আর কানে ঢুকছে না আমার। মাথার মধ্যে একটা ভাবনা খেলা করছে তখন। কি করে কথাটা পাড়ব? হোটেলে অতগুলো পয়সা গুনে দেবার বদলে দিন-কয়েক যদি দিগেনদার বাড়িতে মাথা গোঁজা যেত—কলকাতার বাইরে বেড়াতে গেলে, সেখানে পরিচিত বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে গিয়ে ওঠার মধ্যে অপরাধ কিছু নেই। অন্য পক্ষের সামান্য বা যথেষ্ট অসুবিধে হলেও তাঁরা বলে থাকেন,

—"আরে! কি বলছো যা-তা! অসুবিধে? আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। বরং, উল্টে তুমি যদি হোটেলে গিয়ে ওঠো তা হলে খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি! এ শহরে বেড়াতে এসেছো—আমরা এখানে রয়েছি—আর তুমি গিয়ে কিনা হোটেলে উঠবে। ছিঃ-ছিঃ, এসব কথা ভাবাও অন্যায়—চলো, চলো —এই কুলি, হাঁ করে দেখছিস কি, বাবুর বাক্স-বেডিং তোল্—"

এতক্ষণ কথাবার্তার মধ্যে দিগেনদা কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করেন নি, বউ, আমি কোথায় উঠেছি। কি করে এই দূর রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছি—জানার কোনো কৌতূহল নেই। সবচেয়ে বেশী অবাক হচ্ছি কোথায় জানো, বউ? কলকাতার বন্ধুর চিঠিতে জেনেছিলুম, দিগেনদা সপরিবারে এখানে জাঁকিয়ে বসেছেনে, অথচ আমাকে খেতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এলেন হোটেলে! বাড়িতে কি রান্নাবাড়ির পাট নেই বলছো? তা কি করে হয়!

—"দিগেনদা, বউদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন না?"

ওঁর বক্তৃতার মাঝখানেই জিজ্ঞেস করে ফেলেছি। একটু থমকে জবাব দিলেন,

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ! নিশ্চয়ই দেব। ও এখন একটু ব্যস্ত আছে বলেই—সামনেই ওর এক্স্পোজিশন, ফেব্রুআরির আট তারিখে—এখনো সব ছবি কমপ্লিট হয় নি—"

বলতে বলতে পাশের চেয়ারে রাখা ওভারকোটের পকেট থেকে একতাড়া কার্ড বের করলেন। একটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন,

—"আট তারিখ ফ্রী রেখো, অনেকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।"

—"বউদি ছবি আঁকেন বুঝি?"

—"শুধু আঁকেন নয়, এখানকার আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে ওর বেশ নাম-ডাক।"

—"ওঁর সঙ্গে কি আপনার এখানেই আলাপ হয়েছে এসে, না—"

—"ইণ্ডিয়ায়, মানে কলকাতায় ওর প্রদর্শনীর সমালোচনা করেছি—সে অনেক কাল আগের কথা—" চোখদুটি ঘোলাটে হয়ে এল দিগেনদার, মনে হল যেন একটা দমকা বাতাস চেপে কথা শেষ করলেন,

—"প্রায় আট-ন বছর হয়ে গেল।"

কার্ডটির দিকে তাকিয়ে বললুম,

—"আট তারিখ? সে তো এখনো মাসখানেক বাকি, দিগেনদা!"

—"শিল্পীর কাছে এক মাস কি একটা সময় নাকি! হুশ্ করে বেরিয়ে যাবে। ছবি কমপ্লিট করা ছাড়াও পাবলিসিটি, কার্ড বিলি—অনেক কাজ বাকি।"

এরপর খুব সাবধানে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

—"তুমি ছবি-টবি আঁকছো আজকাল?"

—"নিশ্চয়ই! সেই সুবাদেই তো আসা এখানে।"

ব্যস্, আর কোনো প্রশ্ন নেই দিগেনদার। যে সমালোচক আমার প্রথম প্রদর্শনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন, সেই ব্যক্তি এখন বোবা হয়ে রইলেন। দিব্যি এড়িয়ে গেলেন আমার ছবি-আঁকার ব্যাপারটি। বললেন,

—"তারপর কলকাতার খবর-টবর সব ভালো!"

দিগেনদার স্ত্রীর নাম কার্ডে বেশ বড় অক্ষরে ছাপা—দমিনিক। শুধু দমিনিক, কোনো পদবী-টদবীর বালাই নেই।

বললুম,

—"আপনার বাড়ি যাব দিগেনদা।"

বোধ হয় চোখের ভুল আমার, উনি কি একটু চমকে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গেই যেন সামলে নিয়ে বললেন,

—"যাবে হে! নিশ্চয়ই যাবে। দু-দিন সবুর কর। ঘর-দোরের যা অবস্থা—"

আমি একেবারে ঝুলে পড়লুম,

—"আপনার ঘরদোর দেখার বিশেষ আগ্রহ নেই আমার। আমি বউদির পেইন্টিং দেখব।"

নিমরাজি দিগেনদার সঙ্গে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলুম। ফিসফিস বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হতচ্ছাড়া বৃষ্টি। প্যারিসের এই শীতকেলে বৃষ্টিতে গত কটা দিন ভিজে ভিজে ঘেন্না ধরে গেছে। শরীর, মন, মস্তিষ্ক সব যেন প্যাচপেচে। ইউরোপের এরা সব এত 'সূর্য-সূর্য' করে কেন এই ক'দিনেই টের পেয়ে গেলুম, বউ। তুমি তো এত 'বৃষ্টি-বৃষ্টি' করে পথেঘাটে ভিজতে ভালোবাসো, এখানে এখন থাকলে তুমিও অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে।

প্যালে রয়্যাল স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে দিগেনদাকে বললুম,

—"প্যারিসের এই একঘেয়ে তিরতিরে বৃষ্টি আপনার ভালো লাগে ?'

—"ভালো লাগা-না-লাগার কোনো ব্যাপার নেই : সব সয়ে যায়। তা ছাড়া, তুমি কি বলতে চাও তোমাদের কলকাতায় একঘেয়ে বৃষ্টি হয় না !"

শুনলে তো বউ, 'তোমাদের কলকাতা' ! প্যারিস হল গিয়ে 'আমাদের পারী' আর কলকাতা হয়ে গেছে পর। 'তোমাদের' শব্দটি ছুঁড়ে দিয়ে চেনা বাঙালী কবি দিগেন পাল পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে যেন কয়েক গজ দূরে সরে গেলেন। এতক্ষণ যে অনুভূতিটাকে ঠিকমত বুঝতে পারছিলুম, না, এইবার সেটা একটা বিশ্রী মুখ করে উঁকি মারল। মনে হল, এখানকার স্যাতসেঁতে বৃষ্টির মতোই হয়ে গেছেন মঁসিয় দিগেঁ পল। আস্তে আস্তে এই দিগেঁ পলটিকে ঘৃণা করতে শুরু করলুম বোধ হয়। ঠিক ঘৃণাও নয়, একটা কষ্ট। উজ্জ্বল স্মৃতির শরীরে কেমন সূক্ষ্ম একটা বেদনাবোধ। আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না, বউ। আসলে সবকিছু মিলিয়ে সেই কথাগুলোই ঘুরে ঘুরে আসছে, আহা রে ! দিগেনদা ফরাসী হয়ে গেছেন !

জিজ্ঞেস করলুম,

"কলকাতার পত্র-পত্রিকায় আর আপনার লেখা-টেখা দেখি না। কবিতা লেখা কি ছেড়ে দিয়েছেন ?"

—"না, ছাড়ি নি। তবে, ঠিক সময় করে উঠতে পারি না। তাছাড়া, ফরাসী ভাষা অ্যাতো ইন্টরেস্টিং—একবার এর মধ্যে ঢুকে পড়লে, অন্য কিছু ভালো লাগে না—"

—"বাংলা, মানে আপনার মাতৃভাষা—"

বাধা দিলেন দিগেনদা,

—"আ মরি বাংলা ভাষা—আমি অস্বীকার করছি না, তবে সব যোগাযোগ কেমন ছিঁড়ে গেছে।"

মেট্রোর সিঁড়ি বেয়ে প্ল্যাটফরমের দিকে নামতে নামতে দিগেনদা নিজের মনেই বললেন বোধহয়,

—"বহুকাল কবিতা লিখি না।" চাপা ঝোড়ো শব্দ ক'টি দূর থেকে ভেসে এলো।

রেলগাড়িতে পাশাপাশি বসে হঠাৎ কি মনে হল, চোখের কোলে তাকিয়ে খুব আস্তে জিজ্ঞেস করলুম,

—"মাসীমার কি খবর, কেমন আছেন ?"

ঠিক যা ভেবে চোখের কোলে তাকালুম, ঠিক যা আশা করে খুব আস্তে প্রশ্নটি করলুম, তাই হল। দিগেনদার চোয়াল ঝুলে পড়ল। ভয়ংকর শূন্য চোখে তাকালেন আমার দিকে। কোথায় যেন খানিকটা তৃপ্তি পেলুম। বেশ আরাম হল ভেতরে কোথাও। তোমাকে গুছিয়ে বলতে পারব না বউ, তবু মনে হল, বুকের মধ্যে একটা অনড় পাথর জমছিল দিগেনদার এক একটি কথায়, এক একটি জবাবে। হঠাৎ যেন সেই পাথরটা নড়ে উঠল। কিংবা, ধরো, ব্যাপারটাকে শরীর দিয়ে বোঝাতে গেলে বলা যায়, শরীরে কোথাও চুলকোচ্ছিল খুব। কিছুতেই চুলকোতে পারছিলুম না, এইবার একটু চান্স পেয়ে অল্প একটু চুলকে নিলুম। চুলকুনিতে আরাম হল যেন।

পরের দণ্ডে সামলে নিলেন দিগেনদা,

—"মাসীমা, মানে ইয়ে মা'র কথা বলছো ?"

ওঁর দিকে চোখ রেখে মাথা নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ। মাসীমার মুখটি ভালো করে মনে পড়ছে না। ইট-পাঁজর বেরুনো দেওয়ালের পটভূমিতে একটি সাদা থান পরা শরীর, মাথায় ঘোমটা, দু' কাপ চা নিয়ে হাজির,

—"বাচ্চু, মানে, তোমাদের দিগেনদা তো কিছুই করে না। বলে, কবিতা লিখব। চাকরি-বাকরির কথা তোমাদের কিছু বলে-টলে ?"

গতকাল জর্জের ওখান থেকে টেলিফোন করবার সময় আমি আবার ভাবছিলুম, দিগেনদার মা প্যারিসে বসে ওভারকোট গায়ে দিয়ে আগুন পোয়াচ্ছেন। মঁসিয় দিগে পলের ভাবভঙ্গি থেকে মনেই হয় না এঁর, কি বলে গিয়ে, সেই 'গর্ভধারিণী জননী' কালীঘাটের শ্যাওলা-ধরা ঘরে দু'কাপ চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

মাসীমা যে এখনো বেঁচে, এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে গেছি। কি করে জানো

বউ ? যদি, উনি পৃথিবীতে বেঁচে না থাকতেন, তা হলে, আমার প্রশ্নের জবাবে দিগেনদা হয়তো খুব দুঃখিত গলায় সংবাদটি জানিয়ে দিতেন, অথবা মুখটি শুধু করুণ করে আমার দিকে তাকাতেন। চোয়াল ঝুলে পড়ত না মঁসিয়ের, এমন ভয়ংকর শূন্য চোখে চাইতেন না আমার দিকে। আসলে, মনে হয়, উনি নিজেই জানেন না ভালো করে—মা বেঁচে গেছেন, না, মরে আছেন।

—"ভালোই আছেন। মানে, বয়েস হয়ে গেছে তো, এই বয়েসে যত ভালো থাকা যায় আর কি—"

—"কলকাতায় গিয়েছিলেন লাস্ট কবে"

—"এখানে এসে আর যাওয়া হয় নি, মানে, সময় করে ওঠা মুশকিল, দূর তো কম নয়—"

ইত্যাদি, ইত্যাদি। '—বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে, অর্থাৎ কিনা, লাগল ঠ্যালা পঞ্চভূতের মূলেতে—' বুঝলে তো বউ, ন'দশ বছর দেশের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই ভদ্রলোকের। বলছেন,

—"তবে, যোগাযোগ তো আছে, চিঠিপত্তর—"

—"কলকাতা থেকে শেষ চিঠি পেয়েছেন কদ্দিন হল ?"

নিরীহ প্রশ্নটির জবাবে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকালেন আমার দিকে, ভুরু কুঁচকে বললেন,

—"অত জেরা করার কি হয়েছে হে ছোকরা ! নিজের মেশিনে তেল লাগাও।" মুখ ফিরিয়ে আবার বললেন, —"চলো, উঠে পড়ো। 'এতোয়াল' এসে গেছে।"

"—এটা কার মুখ হচ্ছে, ইণ্ডিয়ান ?"

ঘাড়ের কাছে যিশুর গলা শুনে চমকে উঠলুম। কি আশ্চর্য, বউ! চারপাশের সব কিছু ভুলে গিয়েছিলাম। মোঁমার্ত্রের মেলা, এই সকালের সব দৃশ্য লোপাট হয়ে গিয়েছিল চোখের সামনে থেকে। যিশু ওর বন্ধুদের সঙ্গে দূরে দাঁড়িয়ে কথা

বলছিল, কখন আমার পেছনে চলে এসেছে, জানি না। মনের খেলা এই রকম। নিজের মনের কাণ্ডকারখানায় নিজেই ভীষণ অবাক হয়ে যাই। মন তার ডালপালা মেলে অথবা তার বিশাল পাখনায় আমাকে বসিয়ে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়, খেয়াল থাকে না। যাকে বলে গিয়ে 'স্থান-কাল-পাত্র' জ্ঞান হারিয়ে দেয়। কোন্ সুতো বেয়ে কোথায় চলে যাই, ফিরে আসার ঠিক ঠিক পথ খুঁজে না পেলেও কেমন চট করে ফিরে আসি। আড্ডায় বসে এই রকম একটা খেলা খেলতুম আমরা। গল্প করতে করতে, আড্ডার নানান্ ডালপালায় ঘুরতে ঘুরতে, হঠাৎ হয়তো কেউ বলে বসতুম,—"এই, আমাদের আলোচনা কোত্থেকে শুরু হয়েছিল, বল্ তো ?"

বাস্, তারপরে ফিরে যাওয়া শুরু। হয়তো ইলিশ মাছ ভাজা অথবা কাঁচা মাছের ঝোলে এসে থেমে গিয়েছিলুম আমরা। ফিরে যেতে যেতে দেখা গেল সমারসেট মম্, অস্ট্রেলিয়ান গরু, স্ত্রীশিক্ষা, নারীদেহ, চীনে খাবার হয়ে আমরা টেবিলে বসা করুণাময়ের দাড়িতে পৌঁছে গেছি—ভায়া রবীন্দ্রনাথ! সুতরাং দেখা গেল, করুণাময় দিন পাঁচেক দাড়ি কামায় নি—বিষয় নিয়ে এই পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয়েছিল। তবে সব সময়েই যে ঠিক ঠিক রাস্তা ধরে একেবারে গোড়ায় ফিরে যেতে পারতুম, তাও নয়। গোলমাল হয়ে যেত। আগেরটা পরে, পরেরটা হয়তো আগে চলে আসতো। বিশেষ করে মদের আড্ডা হলে তো কথাই নেই। ফিরে যাবার রাস্তা খুঁজে না পেয়ে সুদীপ্ত একদিন মদের গেলাস ভেঙেছিল অ্যাম্বার বারে, দিগেনদা পাশের টেবিলে বসা এক অপরিচিত মাড়োয়ারীর প্লেট থেকে চিলি চিকেন তুলে নিয়ে দিব্যি খেয়ে ফেলেছিলেন, পরে অবশ্য গণ্ডগোল হয়েছিল যথারীতি! মনের খেলা এই রকম!

যাকগে যা বলছিলুম, কোত্থেকে কি ভাবতে ভাবতে যে জর্জ-জানী-ফিলিপ-দিগেনদায় পৌঁছে গিয়েছিলুম মনে পড়ছে না। যিশুর প্যাকিং বাক্সের ওপরে বসে আছি, রোজগারের আশায় আজ থেকে এই মোঁমার্ত্রের মেলায় আমার ছবি আঁকা শুরু হবার কথা। যিশু ভরসা দিয়ে নিয়ে এসেছে। আমার কোলে রাখা ড্রয়িং বোর্ডের ওপরে ছোট একটি কাগজ ছিল। ক্রেয়ন ঘষে ঘষে তার ওপরেই একটা মুখ তৈরি হয়ে গেছে। নিজেই ঠাহর পাচ্ছি না, কার মুখ! মনে হচ্ছে, দিগেনদার কথা ভাবতে ভাবতে ওঁর মুখই কাগজে তৈরি করছিলুম। কলকাতার দিগেনদা এবং মঁসিয় দিগেঁপল মিলেমিশে একটা কেমন অদ্ভুত, অ্যাব্স্ট্রাক্ট মুখ হয়েছে। সুকুমার রায়ের 'হাঁসজারু, মনে পড়ল। হেসে, দলা পাকিয়ে ফেলে দিলুম কাগজটা। উঠে দাঁড়িয়ে বললুম,

—"ও কিছু না! একটা কাল্পনিক মুখ।" পেছন ফিরে তাকাতেই চমকে উঠলুম। চমকে উঠলুম, না, ধাক্কা খেলুম, না, অবাক হলুম—ঠিক বুঝতে পারছি না। ধরো, বউ এক সেকেণ্ডের জন্যেও যদি চোখে ধাঁধা লেগে যায়, একেবারে দিনের আলোয় সকালবেলাকার ঝক্‌ঝকে সাদা চোখে দেখতে পাই, তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছো—এই প্যারিসে, এই মোঁমার্ত্রের মেলায় ঠিক আমার সামনাসামনি—তাহলে, আমার মনের অবস্থা যা হওয়া উচিত তাই হল। এক সেকেণ্ডের চেয়েও বোধহয় কম সময় আমার মনে হল তুমি আমার সামনে দিব্যি ওভারকোট গায়ে দাঁড়িয়ে। পরের মুহূর্তেই মনে মনে হেসে ফেললুম—দূর!

যিশু বললে,

—"হ্যাঁ, ঠিকই আছে! আমরা চার-চারটে জলজ্যান্ত পুরুষ দাঁড়িয়ে আছি, সেদিকে খেয়ালই নেই, ইণ্ডিয়ানের চোখ একেবারে খাঁটি জায়গায় আটকে গেছে—"

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল ওরা। আমিও বোকার মতো হেসে চোখ সরিয়ে যিশুকে দেখলুম। মেয়েটি যিশুকে বললে,—"ভুলে যেও না পিয়ের, ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক বলেই আগে সম্মান দিয়েছেন আমায়। লেডীজ ফার্স্ট?"

আবার একচোট হাসি সকলে মিলে! দূর! মেয়েটির চোখ, ঠোঁট, কপাল, নাক হাসি তোমার মতো নয়! কিছুই তোমার মতো নয়, বউ! ওভারকোট ঢাকা শরীরের ঢেউ-টেউ বোঝা যাচ্ছে না বটে, তবে গরম এবং পুরু পোশাকের আড়ালে থাকা সত্ত্বেও মনে হয়, বুকও তোমার মতো নয়। অথচ প্রথম ওর দিকে তাকিয়ে তোমার মুখটা মনে পড়ল কেন!

যিশু বললে,

—"এসো, আলাপ করিয়ে দিই, ইণ্ডিয়ান। এটি হলেন ঈভলীন। ঈভলীন দ্যুপোঁ। সুন্দরী হিসেবে যথেষ্ট দেমাক আছে। ছবি আঁকে না, তবে ছবি-আঁকিয়েদের সাহায্য করে থাকে বিপদে-আপদে। এর কর্তা মঁসিয় দ্যুপোঁর একটি দশাসই বিজ্ঞাপন-কোম্পানী আছে—মাঝে-মধ্যে সেখান থেকে ফ্রী-লান্স কাজ যোগাড় হয়ে যায় আমাদের। পাঁচ-ছ' বছর আগে বিয়ে হয়েছে—" বলে, ডান হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে গোপন কথা বলার ধরনে চেঁচিয়ে উঠল,—"বিয়ের আগে আরো সুন্দরী ছিলেন এবং মাটিতে পা পড়ত না।"

আমি হাত বাড়িয়ে দিলুম মেয়েটির দিকে, যিশু হাঁ হাঁ করে উঠল,

—"করো কি, করো কি ইণ্ডিয়ান! এই রকম একটা চান্স হেলায় হারাতে চাইছো—"

সামান্য চমকে হাত গুটিয়ে নিতেই আবার হাসি। বললুম,

—"কেন, কি হল?"

যিশু গম্ভীর মুখে বললে,

—"মাদাম ত্ব্যপোঁ কেতাদুরস্ত মেয়ে। সুন্দরী তো বটেই! আলাপ হবার পর শুধু হাত মেলানোর বদলে তুমি ইচ্ছে করলে কায়দামাফিক আলিঙ্গন করে ওর গণ্ডদেশে একটি চুম্বন করতে পারো, শিল্পী!"

নিজের ঢ্যামনা ভাবটি ততক্ষণে খেদিয়ে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ঈভলীনের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে চটপটে গলায় বললুম,

"কিন্তু এ সব তো ফ্রান্সে আজকাল চলে না শুনেছি—" বলতে বলতে ঈভলীনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলুম, খুব আলতো ঠোঁটে ওর গালে চুমু খেয়ে ফেললুম। ও আপত্তি করল না, হাসিমুখে আমাকে গ্রহণ করল। কি বললুম বউ, 'গ্রহণ' করল! গ্রহণ করা না-করা কিছুই বুঝি নি, ভাবি নি তখনও—মোট-মাট আপত্তি করল না! সেটা বড় কথা নয়, তোমাকে যে কথাটা এক্ষুনি না বললে হয়তো ভুলে যাব, সেটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। আমার জীবনে এক বেঢপ ঘটনা। ওকে এমনি জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে গিয়ে আমার মনের অথবা শরীরের একটি রেখা বা একটি পেশীরও ভাব পরিবর্তন হয় নি। হয়তো একলা ঘরে, বন্ধ ঘরে নিভৃতে ওকে ঠিক এমনি ধরে এমনি একটি চুমু খেলেই আমার মাথার ভিতরে গুবরে পোকাটা, সামান্য হলেও নড়েচড়ে পাশ ফিরে শুতো। স্নায়ুতে একটা টান টান ভাব দেখা দিতে পারতো। কারণ ঈভলীন মেয়ে। শুধু মেয়ে বললেই শেষ হবে না, সুন্দরী যুবতী। একবার দেখলে মনে হয় ওর সঙ্গে তোমার মুখেঁর মিল আছে। দ্বিতীয়বার দেখলে নেই, কোথাও নেই! এই ফরাসী সুন্দরীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতেও মনের ড্রয়িংয়ে কোনো পরিবর্তন নেই, গুবরে পোকাটি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। চারপাশে এত মানুষের ভিড়, সময় দুপুর-বেলা বলেই কি এমন হল! না, তা তো নয়! কারণ দমকা মনে পড়ল, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আমরা বন্ধু-বান্ধবরা সদ্য যৌবনে যে কোনো ভিড়-বাসে উঠে নারী শরীরের সামান্যতম স্পর্শেও পুলকিত হতুম। কার কনুই ক'বার কোন্ নরম শরীরে লেগেছে, বাস থেকে নেমে তাই নিয়ে ইয়ার্কি, হাসি-ঠাট্টা চলত—অথচ ভিড়ের মধ্যে থাকাকালীন নিজের মনে মনে মোটেই হাসতুম না, শুধু নারী-

দেহের স্পর্শে—এই ব্যাপারটাই, এই ভাবনাটুকুই এক অলীক সুখবোধের মধ্যে নিয়ে যেত একা একা—আমাদের প্রত্যেককে। এমনও হয়েছে, অন্য কোনো প্রয়োজনীয় ভাবনায় মশগুল, ভিড়ের বিচ্ছিরি চাপে পেছন থেকে ঠেলা খেতে খেতে বিরক্ত হয়ে ফিরে তাকিয়ে হয়তো দেখেছি, আমার ঠিক পেছনেই যে কোনো নারীদেহ (—এখানে 'নারীদেহ' বলতে গিয়ে বুড়ি কিংবা নিতান্ত শিশুদের যে বাদ দিচ্ছি, তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো।) আমার ঠিক পিঠের সঙ্গে লেপটে আছে। দেখার পরই সঙ্গে সঙ্গে আগের মুহূর্তের সেই পেছনে থেকে বিরক্তর ধাক্কা সুখস্পর্শে পাল্টে গেছে। সরে গিয়ে নারীটিকে জায়গা করে দেবার উপায় থাকলে নিশ্চয়ই দিতুম, কিন্তু উপায় নেই বলে দুঃখে কেঁদে ভাসাই নি। বরং মহিলাটির শরীরের কি কি অথবা কোন্ কোন্ অংশ আমার পিঠে ছুঁয়ে ফেলছে, তা কল্পনা করেই সুখবোধ—আর ফিরে তাকানোর দরকার নেই! যদিও নিজের চেষ্টায় বাসের ভিড়ে নরম শরীর ছোঁবার জন্যে অভদ্রের মতো উস্‌কে উঠতুম না, কিন্তু ছোঁয়া লাগলে যে ক্ষণিক সুখবোধ হত, আজকেও তা তোমার কাছে অন্তত অস্বীকার করতে পারছি না, বউ!

এক্ষেত্রে কিন্তু সে রকম কিছুই হল না। ঈভলীনের সঙ্গে হাত মেলানো বা চুমু খাওয়ায় কোনো ফারাক টের পেলুম না নিজের ভেতরে। এর কারণ কি কে জানে! সময় পরিপার্শ্ব, বয়েস না অভিজ্ঞতা? তৃপ্তি খুশি বা সুখের সংজ্ঞার হেরফের?

ঈভলীনের কথা পরে বলছি তোমায়। পরে বলতে হবে, কারণ ওর নীল সমুদ্র চোখ মেলে ও এখনো আমার দিকে তাকিয়ে আছে অথচ আমাকে চোখ ফেরাতেই হচ্ছে। যিশু তার পাশের বন্ধুটির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছে এবং তাঁর সঙ্গে আমি হাত মেলাচ্ছি।

যিশু বলছে,

—"ইনি হলেন মঁসিয় কোর্তোয়া। ল্যাণ্ডস্কেপ করেন এখানে। বয়সের গাছ-পাথর নেই। কবে থেকে যে এখানে ছবি আঁকছেন কেউ ঠিক মতো বলতে পারে না, নিজেও ভুলে গেছেন—"

দেখতে মোটেই তেমন বুড়ো নন ভদ্রলোক। পঞ্চাশের মধ্যেই বয়সে মনে হল। লালচে গোঁফ পাকতে পাকতে সাদা হয়ে গেছে। গোলগাল মানুষটি। মাথায় লাল এবং সাদা চুল মিলেমিশে কাঁধ অবধি ঝুলে আছে। মলিন কোট-প্যাণ্টের কয়েক জায়গায় শুকনো তেল রঙের দাগ।

পরের লোকটির লম্বা নাক সব কিছুর আগে চোখ পড়ে। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল। যিশুর চেয়ে বেশ লম্বা। বয়েস আমাদের মতো। গায়ে সাদা-কালো চেক ওভারকোট। হাতে ড্রয়িং বোর্ড। দাড়ি কামানোর দিকে বিশেষ নজর আছে বলে মনে হয় না। যিশু নাম বলল, লিয়ঁ। ওর হাতের বোর্ডটি দেখিয়ে বললে,

—"ও আমাদের দলে, পোর্ত্রেঁত বানায়। আর ইনি হচ্ছেন মঁসিয় দেনিস ক্যাস্তেল।"

গোলাপী রঙের ভালুককে জ্যাকেট পরে হাসতে দেখেছো কখনো! মঁসিয় ক্যাস্তেল আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে হাসছেন! প্রত্যেকটি দাঁত হলদে। টাকের ছ'পাশে হলদে চুল। গোঁফ-দাড়ি নিখুঁত কামানো। কুতকুতে খয়েরী চোখে দুষ্টুমি। দেখলেই বোঝা যায় মদের একটি চলন্ত পিপে। যিশু বললে,

"দক্ষিণ ফ্রান্সে ছ'চার গাঁয়ের পালোয়ান ছিলেন, মানে কুস্তিগীর হিসেবে বেশ নাম ডাক হয়েছিল। এখন প্রচুর মদ খেতে পারেন এবং সম্প্রতি ছবি-আঁকা শিখে মুখ বানিয়ে ছ'পয়সা কামাচ্ছেন।"

দেনিসের সঙ্গে হাত মেলাতেই টের পেলুম, গোবদা হাতের পাঞ্জার মধ্যে আমার হাতটি উধাও। কুস্তিগীর ছিল সন্দেহ নেই, মাল খেয়ে খেয়ে ভালুক সেজেছে। গোটা মানুষটিকে দেখে হাসি পেলেও আধ মিনিট ওর তাকানোর ধরন দেখলে মনে বিশ্বাস জন্মে যায়—পৃথিবীর কিছু সরল ভালো মানুষের মধ্যে দেনিস ক্যাস্তেলকে গুনে ফেললে বোধ হয় ভুল হবে না।

আলাপ পরিচয় হতে লাগল ছ'মিনিটেরও কম সময়। এরই মধ্যে বার তিনেক চোখের কোলে দেখে নিয়েছি, ঈভলীন আমার দিকে ওর সমুদ্র চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। মঁসিয় কোর্তোয়া তাঁর সরু গলায় বললেন,

—"তাহলে চলুন, সকলে মিলে এক কাপ করে কফি খাওয়া যাক।"

এক গাল হেসে দেনিস বললে,

—"কফি কেন মঁসিয় কোর্তোয়া! সকলে মিলে আমরা ইণ্ডিয়ান শিল্পীর স্বাস্থ্যপান করব!"

ঈভলীন মাথা ঝাঁকিয়ে হাসিমুখে বললে,

—"তুমি আর তোমার স্বাস্থ্যপান! পারোও বাপু!"

আমি খুব বিনীত গলায় জিজ্ঞেস করলুম,

—"মাদাম দ্যুপোঁ, আমার স্বাস্থ্য পান করতে কি আপনার আপত্তি আছে?"

চারজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। দেনিস আমার পিঠ চাপড়ে বললে,

—"সাবাস ইণ্ডিয়ান, এই তো চাই—একেবারে নাকের ওপর জবাব ছুঁড়েছেন!"

রেস্তোরাঁর দিকে হাঁটতে লাগলুম সবাই। ঈভলীন বললে,

—"বাবা, আপনিও দেখি এক দলে!"

—"দলাদলির কিছু তো দেখি না! আপনাদের শীতের দেশে, মেঘলা আকাশ থাকলে দু'এক পাত্তর দল ছাড়াই খেতে পারি আমি।"

যিশুর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ভয় পাওয়ার মতো গলা করে ঈভলীন বললে,

—"ও পিয়ের! ইনি যে কবিতাও লেখেন!"

টুকিটাকি ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে করতে আমরা রেস্তোরাঁর দিকে হাঁটছি। বেলা বেড়ে দুপুর। রোদ নেই, বৃষ্টি নেই। চারপাশে চাপা গুঞ্জন। বাজার বসে গেছে অনেকক্ষণ। শিল্পীরা যে যার কাজে ব্যস্ত। দূরে বাজারের গা' ঘেঁষে রাস্তায় জাপানী শিল্পীরা কাঁচি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিসর্গ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করলুম, যিশু প্রায় সবাইকেই মাথা ঝাঁকিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে জানাতে চলেছে,

—"বঁ ঝুর—বঁ ঝুর মঁসিয়—"

পাল্টা অভিবাদন জানাতে গিয়ে প্রায় সবাই আমাকে এক পলক দেখে নিচ্ছে, আমার হাতের বোর্ডটির দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাচ্ছে। একটু অস্বস্তি লাগছে, কেমন অপ্রতিভ লজ্জা-লজ্জা ভাব। হাঁটতে হাঁটতে বোর্ডটিকে যতটা সম্ভব ওদের চোখের আড়ালে রাখার চেষ্টা করছি ছেলেমানুষের মতো। পরমুহূর্তেই মনে মনে হেসে ফেলছি। অত বড় বোর্ড কি আর পকেটে ঢুকিয়ে ফেলা যায়!

আলুভাজার দোকান পেরিয়ে কাফে। খদ্দের নেই বললেই চলে। দু'তিনজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। একটা গোল টেবিল ঘিরে বসে পড়লুম আমরা। চারটে চেয়ার আগে থেকেই ছিল, আরো দুটো টেনে আনা হল। আমার দু'পাশে যিশু এবং দেনিস। যিশুর ওপাশে মঁসিয় কোর্তোয়া। তারপর লিয়ঁ। ঈভলীন আমার মুখোমুখি।

সাদা না লাল ওয়াইন খাওয়া হবে, তাই নিয়ে মতভেদ দেখা দিল। যিশু এবং দেনিস লাল ওয়াইন খেতে চাইছে, মঁসিয় কোর্তোয়া আর লিয়ঁ সাদা। ইভলীন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই ওদের দিকে ফিরে বলল,

—"উফ্, এই নিয়ে মারামারির কি দরকার! যার যেটা ইচ্ছে খাবে! আপনি কি বলেন?"

বলে, আমার দিকে তাকাল। ওর কালো লম্বা চুল মাঝখানে সিঁথি কেটে দু'পাশে ভাগ করা। ছোট্ট কপাল। ধবধবে গোল পোর্ট্রেটের মধ্যে গোলাপী পাতলা ঠোঁট মেলে হাসছিল। আমার দিকে তাকাতেই আস্তে আস্তে ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেল। জুড়ে গিয়ে ফুল। দুই পাপড়ির গোলাপ ফুল। আমি তোমাকে খুঁজছি ওর মুখের কোথাও। ও আমার চোখের মধ্যে দেখছে। দুই পাপড়ি আলাদা হয়ে গেলে সামান্য অন্ধকার কাটল। ঈভলীন ঠিক তোমার মতো দেখতে, বউ। সমুদ্র চোখ দুটি আয়ত মোটেই নয়। দু'পাশে অল্প সাদা ক্ষেত্রের মধ্যে বিরাট দুটো গোল সমুদ্র। না বউ, ওর মুখে কোথাও তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না। এ দেখি এক আশ্চর্য খেলা। তোমার মতো দেখতে এবং তোমার মতো দেখতে নয়। মনের খেলা এই রকম! পাপড়ি মেলে নিঃশব্দে হেসে ফেলল। জিজ্ঞেস করল,

—"কি ভাবছেন?"

সামলে নিলুম। নিয়ে, পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলুম,

—"আপনি কি ভাবছেন?"

ঈভলীনের চট জবাব,

—"ভাবছি, আপনি কোন্ দলে?"

আমি অবাক,

—"তার মানে?"

তুমি শব্দ তুলে হাসতে হাসতে বললে,

—"তার মানে, সাদা ওয়াইন, না লাল ওয়াইন!"
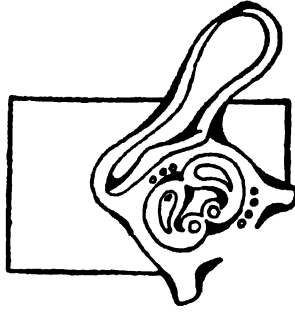
ঈভলীনের প্রশ্নটি এতই আচমকা, যে, আমার থই পেতে সময় লাগল। কারণ, ওর পলকহীন চোখ, আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়া ঠোঁটের হাসিটি আমি বেশ ভালো করেই লক্ষ্য করেছি, তা'তে এমন কোনো হালকা প্রশ্ন লুকিয়ে আছে ভাবতেই পারি না। এতগুলো বছরের অভিজ্ঞ চোখ আমাকে বলে দিয়েছে, ওর ভিতরে যদি আদৌ কোনো জিজ্ঞাসা তৈরি হয়ে থাকে তবে তা' আরো গভীরের, 'লাল কিংবা সাদা ওয়াইন খাবো কিনা,' এমন প্রশ্নের থেকে অনেক বেশি গাঢ়তর। মনে হল, যেহেতু ওরা চারজন নিজেদের মধ্যে তর্ক থামিয়ে আমাদের দু'জনের দিকে চোখ ফেলেছিল। তাই ঈভলীন ওর মনের কথা বা মনের জিজ্ঞাসা অথবা নিতান্তই মনকে একপাশে সরিয়ে রেখে অন্য প্রসঙ্গ খুঁজল। কানের কাছে যে তর্ক হচ্ছিল মনকে লুকোবার জন্যে ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে সেই তর্কের দু'চারটে শব্দ তুলে আমার দিকে ছুঁড়ে দেওয়াই বোধহয় সবচেয়ে সোজা।

হোহো করে হেসে ফেললুম। ঈভলীন তো হাসছেই। যিশু বলল,

—"অ্যাতো হাসির কি হল হে ?"

আমি হাসতে হাসতেই চোখের কোলে ঈভলীনকে দেখে নিয়ে বললুম,

—"আমি কিন্তু লাল ওয়াইনের ভক্ত।"

দেনিস আমার পিঠে থাপ্পড় মেরে বলল,

—"এই তো সাক্ষাৎ সমঝদারের কথা !"

সঙ্গে সঙ্গে যিশু কোর্তোয়ার দিকে ফিরে বলে উঠল,

—"ব্যস্, তবে তো হয়েই গেল। ভোটে তুমি হেরে গেলে ! আমরা লাল ওয়াইনের দলে তিন, তোমরা দুই—"

লিয়ঁ যিশুকে থামিয়ে দিল,

—"দাঁড়াও, দাঁড়াও—অত অস্থির হোয়ো না। এখনো মাদাম দ্যুপোঁ কি খাবেন শোনা হয় নি।" বলে, ঈভলীনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে,

—"তুমি তো সাদা ওয়াইনই পছন্দ করো ?"

কোর্তোয়া জুড়ে দিল,

—"অ্যারিস্টক্র্যাট্রা যা খেয়ে থাকেন। আর কি—"

যিশু থামিয়ে দিল ওকে,

—"আজ্ঞে না, অ্যারিস্টক্র্যাট নয়, বল বুর্জোয়া—"

আবার তর্ক বেধে যায় প্রায়। ঈভলীন দু'হাত তুল 'ওঁ শান্তি' করল। তারপর, সকলের মুখের দিকে একের পর এক দেখে নিয়ে বললে,

—"আমি এক কাপ কালো কফি খাবো।"

দুটি দলের চার জনেই একত্রে বলে উঠল,

—"না, না, সে হবে না মাদাম ! হয় লাল নয় সাদা ওয়াইন—"

আমিও বলে ফেললুম,

—"এই টেবিলে আজকে কালো রঙের কিছু চলবে না, অশুভ রং।"

যিশু বললে,

—"বেড়ে বলেছো দোস্ত, সাবাস্ !"

আলগোছে আমায় দেখে নিয়ে যিশুকে বলল ঈভলীন,

—"ঠিক আছে : তাহলে, রঙীনই খাবো—লাল রং !"

দেনিস, যিশু, আমি টেবিল চাপড়ে একসঙ্গে বলে উঠলুম,

—"ভ্যাঁ রুজ্ !"

ওয়েটার টেবিলের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। মিটিমিটি হাসছিল আমাদের ছেলেমানুষি তর্ক শুনে। মদ আনতে কাউন্টারের দিকে চলল এখন। অভিমানী গলার ঈভলীনকে তখনও বোঝাবার চেষ্টা করছেন মঁসিয় কোর্তোয়া,

—"এটা কি ঠিক হল মাদাম ? রঙিন খেতে চান তো সাদাই খাওয়া উচিত, কারণ বৈজ্ঞানিকদের মতে সব রঙের উপস্থিতি মানেই হল গিয়ে সাদা—"

দেনিস জিজ্ঞেস করলে,

—"আপনি কি বৈজ্ঞানিক ?"

সঙ্গে সঙ্গে যিশুও চেপে ধরল,

—"সব তেল রং একত্র গুলে দেখান তো প্যালেটে—দেখি কেমন সাদা হয় ?"

ওরা আবার তর্ক জুড়ে দিল, চোখ ফেরাতেই—তুমি আমায় দেখছো, বউ !

তুমি, মানে, তোমার মতো এবং তোমার মতো নয় ঈভলীন আমার মুখে চোখ পেতে বসে আছে। আছে না, ছিল, আমি তাকাতেই চোখ নামিয়ে টেবিলের ওপর থেকে লিয়ঁর সিগারেটের প্যাকেটটি তুলে নিল, যেন, আমার অলক্ষে আমার মুখ দেখতে চাইছে, অথবা, আমার মুখের ভাবের মধ্যে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। অথচ, ঠিক তা'ও নয় বোধহয়। কারণ, ওর চোখে চোখ পড়ে গেলে মনেই হয় না যে, চুরি করে চোখ সরিয়ে নিল। অন্য কিছু, অন্য কোনো গভীরতর বিষয় ওর গোল সমুদ্রে ডুবে আছে। সব্বোনাশ করেছে। মাথাসুদ্ধ বুদ্ধিশুদ্ধি নড়ে উঠল। 'পেরেম-টেরেম' না তো! তাহলেই তো গেছি। কয়েক ফোঁটা মদে গুবরে শালা ভিজে গেলেই কেলেংকারী! যিশু বা এইসব নতুন বন্ধুরা বিপদে-আপদে সব সময় ওর কাছ থেকে সাহায্য পায়। ঠাট্টা-ইয়ার্কি সত্ত্বেও এরা সবাই ওর সঙ্গে একটা সম্মানজনক ব্যবধান রেখে চলেছে। শত হলেও বিরাট বিজ্ঞাপন কোম্পানীর হোমরা-চোমরা মালিকের গিন্নি বাবা। রোজমারীকে মনে পড়ল। রোজমারীর সঙ্গে আমার সেই ভয়ঙ্কর সন্ধ্যা! ঈভলীনের যদি 'প্রেম-প্রেম' ভাব হয়ে থাকে, এবং সেখানে যদি আমার সবেধন গুবরেমণিটি ওর সেই 'ভাবের' সুযোগ নিয়ে বেচাল কিছু করে ফ্যালে, তো, সব গেল। যিশুর মতো বন্ধু গেল, মোঁমার্ত্রে রোজগার গেল, মারধোর খাওয়াও বিচিত্র নয়—সর্বনেশে ব্যাপার হয়ে যাবে। মনে মনে ঠিক করে নিলুম, ওর দিকে আর তাকাবোই না, কারণ হে সুন্দরী, 'তোমার দুচোখে দেখেছি আমার সর্বনাশ!

কিন্তু, তাকাবো না বললেই কি আর অন্ধ হয়ে থাকা যায়! সিগারেটের প্যাকেট হাতে স্থির মেয়েটি ওর সমুদ্র চোখ মেলে আছে। মুখের দিকে তাকালুম না। হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটি নিয়ে নিলুম। নিয়ে, খুলে ফেলে একটি সিগারেট টেনে সামান্য বের করে ওর দিকে এগিয়ে ধরলুম প্যাকেটটি। ও হাসল। উফ্! বউ, এই ম্লান হাসি আমার সহ্য হয় না। তোমার পুরু ঠোঁটে এমন হাসি আমি দেখি নি কখনো, কল্পনাই করতে পারছি না। তুমি হা-হা করে হাসো, কিংবা আদৌ হাসো না। পার্টিতে, খালি মদের বোতলে জলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ফেলে 'রিচ্যুয়াল' করতে গিয়ে আঙুল পুড়িয়েছি। শেষ রাতে বাড়ি ফিরতেই হলুদ বার্নল লাগানো আঙুলগুলি দেখে তুমি কেঁদে ফেলেছো। হয় তুমি কেঁদে ভাসাও, অথবা তুমি ঘর কাঁপিয়ে প্রাণ খুলে হাসো। তোমার মধ্যে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। এইজন্যেই বোধহয় তোমাকে আমার পছন্দ। কিন্তু, বউ, তুমি তো সেই, 'কলা' জানো না, মেয়েদের যে 'কলা' অথবা 'আর্ট' দিয়ে পুরুষদের মন

ভুলিয়ে রাখা যায়, যে 'কলা'র কথা শাস্ত্রে লেখা আছে। এই মেয়েটির এই ম্লান হাসি শাস্ত্রের কোন্ কলায় পড়ে, কে জানে। কিন্তু, আমার সহ্য হয় না। আদর করে এই ম্লান বিষণ্ণতাকে খুন করতে ইচ্ছে করে। মনের সবকিছু ঢেকেঢুকে এক দণ্ডে বাস্তবে ফিরে এলুম। বললুম,

—"নিন।"

এখন অন্য হাসি। যে হাসির মানে বোধহয়, 'আমি সব ধরে ফেলেছি, বন্ধু, তুমি এমন কিছু লুকোচ্ছো, যা আমার জানা প্রয়োজন, অথচ, তুমি ভাবছো, তোমার লুকিয়ে রাখার ইচ্ছের খবর আমার কাছে পৌছোয় নি'। মাথা দুলিয়ে বলল,

—"আমি সিগারেট খাই না তা নয়, মাঝে-মধ্যে ইচ্ছে হলে দুম্ করে খেয়ে ফেলি—"

—"একটি ইচ্ছে করুন।"

—"না শিল্পী, এখন ইচ্ছে করছে না। মের্সী।"

লাল ওয়াইনে চুমুক দিয়ে সবাই আমার স্বাস্থ্যপান করল। যিশু বললে, অনেকটা বক্তৃতা দেবার ধরনে,

—"ইণ্ডিয়ান, আমরা পাঁচজনে মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যে, তুমি কিছুদিন রুটি-রোজগারের জন্যে এই মোঁমার্ত্রে আমাদের ছায়ায় বসে পোর্ত্রেত্ করবে। মনে রেখো, এই পীঠস্থানে বসে তুমিই প্রথম ভারতীয় শিল্পী ছবি আঁকবে।" তারপর, সামান্য নিচু গলায় বললে,

"যদিও, ব্যাপারটি কতখানি আইনসঙ্গত, সে প্রসঙ্গে মতভেদ আছে, তবুও, আমি শ্রীপিয়ের ভ্যাল্মি ওরফে তোমার জীসাঁস এবং উপস্থিত এই চারজন বন্ধু তোমাকে বিপদ-আপদে আপ্রাণ সাহায্য করবার শপথ নিচ্ছি।"

বলে, সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে গেলাস হাতে তুলে নিল,

—"আ ভোত্র সাঁতে। ইণ্ডিয়ানের নতুন শিল্পীজীবন শুভ হোক।"

বাকি সবাই গেলাস হাতে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলে উঠল,

—"আ ভোত্র সাঁতে। শুভ হোক।"

উপনয়নের দিন যজ্ঞোপবীত ধারণের আগে যেন মন্ত্রপাঠ শুনছি। শরীরের ভিতরে সমস্ত শিরা-উপশিরায় কে যেন পবিত্র হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এই অনুভূতি বলে বোঝানো যাবে না। 'ব্রহ্মং জানাতি যঃ সঃ ব্রাহ্মণ'। আমি যেন সেই ব্রহ্মকে জানবার পথে পা বাড়াচ্ছি। শিল্পীদের স্বর্গরাজ্যের দ্বার, পাঁচটি বিশ্বস্ত

প্রহরী আমার জন্যে খুলে দিয়েছে। কোনো কথা খুঁজে পেলুম না। গলা পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করলুম,

"তোমাদের কি বলে ধন্যবাদ—"

বিহ্বল কৃতজ্ঞতায় চোখ ঝাপসা হয়ে এলে গলা কি আপনিই বুজে আসে। মঁসিয় কোর্তোয়া আমাকে বাধা দিয়ে বললেন,

—"কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, ওসবের কোনো দরকার নেই। আপনি একটা গালভরা চুমুক দিলেই আমরা আপনার সব কথা বুঝে ফেলব—"

আমিও গেলাস তুলে চুমুক দিলুম। লিয়ঁ বলতে গেলে চুপচাপই ছিল। এবার উৎসাহের গলায় জানতে চাইল,

—"আপনি কি আজই কাজে লেগে যাবেন?"

আর্ট কলেজ থেকে প্রথম যেদিন আমরা 'আউটডোর' করতে গিয়েছিলুম সেই দিনটি মনে পড়ল। গঙ্গার ধারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সহপাঠীরা বসে পড়েছি। বোর্ডে কাগজ সেঁটে পেন্সিল হাতে নিতেই একজন দু'জন করে পেছনে ভিড় জমে গেল। প্রায় ঘাড়ের ওপরে ওদের নিশ্বাস পড়ছে মনে হল। ভীষণ আড়ষ্ট হয়ে, লজ্জা জড়ানো হাতে পেন্সিল ঘষতে লাগলুম। অথচ, দর্শকদের বেশির ভাগই নিতান্ত সাধারণ মানুষ। ভ্রাম্যমান নরসুন্দর, ফিরিওয়ালা, রিকশা বা ঠেলাওয়লা। এদের মধ্যে শিল্পবোদ্ধা বা কলা সমালোচক কেউ নেই। এদের ভাষায় আমরা সব 'ফোটু' বানাচ্ছি এবং 'গোরমেণ্টকা আদমী', যারা 'ফোটু বনাকর গোরমেণ্টকো ভেজ্‌নেসে' কোম্পানীর লোক এসে গঙ্গামাঈর বুকের পলিমাটি সরিয়ে তার গভীরতা বাড়িয়ে দেবে। এদের বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় জানা সত্ত্বেও দর্শক-ঘেরা অবস্থায়, ঘাড়ের ওপর তপ্ত নিশ্বাস নিয়ে ছবি আঁকার জড়তা কাটাতে সময় লেগে-ছিল। একটি সম্পূর্ণ ছবি দেখানো এক কথা আর জোড়া জোড়া অচেনা চোখের সামনে একটির পর একটি রেখা টেনে ছবি শেষ করা একেবারে ভিন্ন অনুভূতি। ধীরে ধীরে তাও অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। নিউ মার্কেটে, শেয়ালদা স্টেশনের হাজার হাজার চোখের মধ্যে একেবারে একলা হয়ে যেতুম বিষয়বস্তু এবং ছবির সঙ্গে। সে সব অনেক কাল আগে, সেই ছাত্রজীবনের ছায়াছবি। আজ, এত দিন পরে আবার সেই চোখের মেলার মধ্যে বসে ছবি আঁকা। ভিন্ন দেশ, সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতি। রুটির জন্যে অজস্র অভিজ্ঞ চোখের সামনে মিলিয়ে মিলিয়ে মুখ আঁকতে হবে। ছাত্র জীবনে, কলেজে মডেলের মুখ আঁকতুম যখন, তখন মডেল পয়সা পেতো, পোর্ট্রেট্ না মিললেও তার কিছুই যেত-আসত না। এখানে

মডেলই আমাকে উল্টে পয়সা দেবে, পোর্ট্রেট না মিললে পয়সা তো পাবই না, বকুনি জুটবে কপালে।

যিশু বললে,

—"আজকে থেকেই লেগে যাবে নাকি ?"

বললুম,

—"না থাক। আজ থেকে নয়, কাল থেকে।"

ঈভলীন বলল,

—"কেন, শুভস্য শীঘ্রম্ হলেই তো ভালো।"

দেনিস এবং যিশুকে দেখিয়ে বললুম,

—"এঁদের ধরনধারণ, ব্যবসার ফিকির-ফন্দি একটু ভালো করে দেখে নিই আজকে।"

এক-একজন দু' পাত্তর করে ওয়াইন খেয়ে নিলুম। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। বিল মেটাবার জন্যে ওরা সব্বাই একসঙ্গে তাড়াহুড়ো লাগিয়ে দিল। আমি নির্বিকার। পকেটের কাছেপিঠেও হাত নিয়ে যেতে ভরসা পাচ্ছি না। কিছু রেজ্‌গী পড়ে আছে ওখানে।

যিশু বললে,

—"ইণ্ডিয়ান আমার অতিথি, আমিই তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, সুতরাং, বিল মেটাবো আমি—"

মঁসিয় কোর্তোয়া তাঁর সরু গলা বেশ জোরালো করবার চেষ্টা করলেন,

"আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, সেটা তো তোমরা স্বীকার করবে, না কি ? আমিই দেব—"

পায়ে পায়ে হেঁটে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালুম। বাজার গমগম করছে। ধূসর আকাশের নিচে অজস্র রঙের খেলা শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে। বুরুশে, স্প্যাচুলায়, প্যালেটে, ক্যানভাসে, প্যাস্টেল কাগজের গায়ে পৃথিবীর সব রং মিলেমিশে শিল্পীদের হাতে হাতে খেলা। সমতল ভূমি থেকে উঠে এসেছে এক ভিন্নতর জগৎ অথবা ছোট্ট একটি স্বপ্নের বাগান, যেখানে কোনো ফুল নেই, শুধু রং, নানান জাতের নানান রঙের পসরা—চেনা-অচেনা, উষ্ণ-নরম, গোলাপী, নীল, সবুজ, হলুদ—

—"এখন কি ভাবছেন ?"

বাঁ পাশে ঈভলীন এসে দাঁড়িয়েছে। প্রায় গা-ঘেঁষে। খুব হালকা, দামী ফরাসী সেণ্টের গন্ধ পেলুম। ফিরে তাকালুম না। বললুম,

—"ভাবছি না কিছু। মানুষের হাতে তৈরি রঙের মেলা দেখছি।"

—"প্রকৃতির রং আপনার ভালো লাগে না?"

—"কখনো লাগে, কখনো লাগে না। তা ছাড়া, এত ছোট্ট জায়গার মধ্যে এত ধরনের রং নিয়ে প্রকৃতির খেলা হয় না বোধহয়।"

—"কেন, সমুদ্রের ঝিনুককে কিংবা প্রজাপতির পাখায়!"

খুব সুন্দর লাগল কথাটি। ওর চোখের দিকে তাকাবো না ভেবেছিলুম, এক পলক দেখতেই হল। হেসে বললুম,

—"জানি না ঠিক। একটি ঝিনুককে বা একটি প্রজাপতির পাখায় এতগুলি রং পাওয়া যাবে না বোধহয়। তবে, অসংখ্য প্রজাপতি বা অনেক ঝিনুককে একসঙ্গে দেখি নি কখনো।"

বিল মিটিয়ে ওরা চারজন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের দিকে ফিরে বললুম,

—"কাল সকাল থেকে তোমাদের দলে ভিড়ে যাব। আমার আঁকা প্রথম মুখের দাম দিয়ে তোমাদের লাল ওয়াইন খাওয়াবো, কেউ আপত্তি করতে পারবে না কিন্তু।"

যিশু আমার কাঁধে হাত রেখে বলল,

—"খুব ভালো কথা। কিন্তু তার আগে, আজ সন্ধ্যেবেলা আমার ঘরে বুনো পার্টি হবে। দেনিস কিছুতেই আমাকে বিল মেটাতে দিল না।"

ঈভলীন সঙ্গে সঙ্গে বলল,

—"ঠিক আছে। শুয়োরের রোস্ট আমি খাওয়াবো।"

মঁসিয় কোর্তোয়া বললেন,

—"শ্যাম্পেনের যোগাড় আমি দেখব।"

যিশু বললে,

—"ব্যস ব্যস। বাকী সব খাবার ও নেশার দায়িত্ব আমার।"

দেনিস বলে উঠল,

—"না না, তা কি করে হয় পীয়ের! শুয়োরের সঙ্গে বীয়ার বা ওয়াইন আনার ভার আমাকে দাও, না হলে, আমি পার্টিতে আসবোই না।"

ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেছি বউ। কিছুই কিনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। এই উৎসব আমার জন্যেই, আমাকে শুভকামনা জানাবার জন্যে যিশু প্ল্যান করেছে, বুঝতে পারছি। সবাই কিছু-না-কিছু হাতে নিয়ে আসবে। শূন্য

হাতে যিশুর দরজায় টোকা দিতে হবে আমাকে!' একটা কথা মনে পড়তেই খুব আস্তে, মানে, বলব-কি-বলব-না বুঝতে না পেরে বলে ফেলার মতো যিশুকে বললুম,

—"আমি, ইয়ে, যিশু—আমি কিছু ইণ্ডিয়ান সিগারেট নিয়ে আসবো।"

যিশু আমার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার কথা শেষ হতেই আমার চোখের দিকে এক, দুই, তিন কিংবা চার সেকেণ্ড চুপ করে তাকিয়ে রইল। ওর চোখের পলক পড়ল না। তারপর, হঠাৎ, একেবারে চমকে দিয়ে দু' হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে। আমার পিঠে ওর দুটি হাত খুব আস্তে আস্তে চাপড়ে দিল। কিছুই বলল না। অথচ, আমি শুনলুম, ওর হাত দুটির ছোঁয়ায় ও আমাকে বলছে, 'আমি জানি, আমি সব বুঝি ইণ্ডিয়ান, তোমার কাছে পয়সা নেই' আমি বুঝতে পারছি। কোনো ভাবনা, কোনো লজ্জা নেই আমাদের কাছে। আমরা তোমার বন্ধু, ইণ্ডিয়ান—'

যেমন হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল, তেমনিভাবেই আমাকে ছেড়ে এক পা পিছিয়ে গেল। বেশ নাটুকে গলায় বলল,

—"তোমাদের দেশের সিগারেট আমরা কেউ খাই নি কখনো। অবশ্যই নিয়ে আসবে। আনতে ভুলে গেলে কিন্তু, এই পাঁচটা ফরাসীর হাতে খুন হয়ে যাবে।"

ঈভলীনও খুশির গলায় জানাল,

—"ইণ্ডিয়ান সিগারেট আমাকেও কিন্তু চাখতে দিতে হবে।"

মেজাজটা একটু ভিজে গিয়েছিল, সামলে নিয়ে বললুম,

—"হাশহিশ বা গাঁজা-টাঁজা নয় কিন্তু সাদামাটা সিগারেট। ইণ্ডিয়ান গোলওয়াজ বলতে পারো।

দেনিস বললে,

—"আমি যদিও সিগারেট খাই না, তবু মনে হচ্ছে, ফরাসী শ্যাম্পেনের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান গোলওয়াজ দারুণ জমে যাবে।"

যিশু বলল,

—"আমরা এবার এগোচ্ছি। প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক আছে তো এখানে, তারা এতক্ষণ গুছিয়ে নিয়েছে। আমরাও গিয়ে দোকান-পাট খুলে বসি, বেলা পড়তে শুরু করেছে।"

যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে ঈভলীনকে বলল,

—"বাজারের কায়দাকানুন একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে দাও ওকে।"

চারজন শিল্পী লম্বা লম্বা পা ফেলে রঙের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

ঈভলীনের সঙ্গে একা হতে বা চোখে চোখ ফেলতে চাইছিলুম না। মাথার মধ্যে সর্বনাশের ভয়। অথচ, ইচ্ছে বড় টান। অনেক বড় বড় আতঙ্কের ঘরে মনের ইচ্ছে আশ্চর্য এক পাখির মতো খেলা করে। মনের খেলা এই রকম।

ওর দিকে না তাকিয়েই বললুম,

—"চলুন, বাজারের মধ্যে গিয়ে বসা যাক কোথাও।"

"বেশ তো, চলুন না!"

খোলা চত্বরের ভেতরে, শিল্পীদের আসরের গা ঘেঁষে একফালি উঠোন। কয়েক জোড়া চেয়ার-টেবিল সাজানো রয়েছে। এই অংশটি রেস্তোরাঁর দখলে। চেয়ার নিয়ে বসে পড়লুম দু'জনে। সামান্য দূরে দেনিস একজন খদ্দের পাকড়ে বসিয়ে দিয়েছে। বোর্ড হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে যিশু, আমাদের দেখে হাত নাড়ল। লিয়ঁকে দেখছি না। মঁসিয় কোর্তোয়া আমার পেছনে বেশ খানিকটা দূরে তাঁর ঈজেলের সামনে দাঁড়িয়ে।

রেস্তোরাঁ থেকে ওয়েটার বেরিয়ে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল। আমি যেন দেখতেই পাই নি এমনি মুখ করে ডানপাশের শিল্পীটিকে দেখছি। খুব দ্রুত হাতে ক্রেয়ন ঘষছে কাগজে। বালক মডেল। শিল্পীর পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন বোধ হয় ছেলেটির মা।

ঈভলীনের গলা,

—"কি খাবেন?"

চট করে ঘুরে ওয়েটারকে দেখে নিয়ে ঈভলীনকে বললুম,

—"না, আমি কিছু খাব না। আপনি নিন।"

ও হাসল। হেসে ওয়েটারের দিকে তাকাল। বলল,

"- লাল ওয়াইন। দু' গেলাস।"

তাড়াতাড়ি বললুম,

—"না মাদাম। আমি খাব না, আমার দরকার নেই—"

হাসি হাসি মুখে, টেবিলে রাখা ডান হাতের পাঞ্জা তুলে আমাকে থামাতে ইঙ্গিত করল। মুখে বলল,

—"আপনি না খেলে, আমি কি দু' গেলাস খেতে পারি না মশায়?"

গম্ভীর মুখে বললুম,

—"পারেন। তবে, একা খেলে দু' গেলাসের অর্ডার একসঙ্গে কেউ দেয় না সাধারণত।"

ও আমার মতোই গম্ভীর হয়ে বলল,

—"আমি দিই। একটু অসাধারণ হবার চেষ্টায় বলতে পারেন। একাই আমি দু' গেলাস খাবো।"

চুপ করে দু'জনে দু'জনকে দেখছিলুম। আচমকা একই সঙ্গে হেসে উঠলুম আমরা। পাশের শিল্পীটি ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিয়ে বোকার মতো হাসল। আমরা আরো জোরে হাসতে লাগলুম। হাসির দমকে ঈভলীনের মাথা নুয়ে পড়েছে। দু' পাশে কালো চুলের ঢল, মাঝখানে ধবধবে সিঁথি। তুমি যখন হাসতে আরম্ভ কর, তোমার মাথাও এমনি করে নুয়ে পড়ে, বউ। এই মুহূর্তে তোমার সিঁথির সিঁদুর আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।
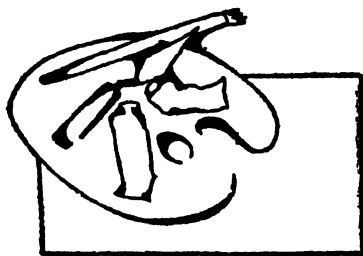
ঈভলীনের নুয়ে পড়া মাথা, সাদা সিঁথির আলের দু' পাশে কালো চুলেব ঢল। কোদাল হাতে সেই আল বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভারতবর্ষের কোনো কলেজে চলে গেলুম। পড়াতে পড়াতে অধ্যাপকের রসিকতায় ক্লাসসুদ্ধ ছেলেমেয়েরা হাসছে। তুমি হাসতে হাসতে নুয়ে পড়ছো। তোমার সাদা সিঁথির দু' পাশে কালো চুলের ঢল নেমেছে। সেই অধ্যাপক মশাই, 'দেখি নি দেখি নি' করেও তোমাকে দেখছেন। কি নাম যেন, সত্য না তীর্থ! হ্যাঁ, তীর্থই বলেছিলে তুমি। ভদ্রলোকের পুরো নাম তুমি বল নি কোনোদিন। আমিও 'ওসব জানার আমার কোনো দরকার নেই' এমনি নিস্পৃহ ভাব দেখিয়ে উদার সেজেছি। এমন ভাব, যেন তোমার অতীতে আমার কি দরকার! তুমি আমার, আমি তোমার। তুমি আমার বউ হবে, আমি তোমার বর। পাঁচশো লোককে খাইয়ে, তাদের সামনে ধোয়া তুলসীপাতা তুমি সিঁদুর ঘোমটা চড়িয়ে আমার সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকবে। আমিও সব শালার নাকের ওপর দরজা বন্ধ করে দেব। তারপর, তাহারা সুখে ঘর-সংসার করিতে লাগিল। আহা, নিমাই আমার নিমাই রে, বুকে আয়!

আচ্ছা, ধরো বউ, তুমি যদি তীর্থর কথা আমাকে কিছুই না বলতে ? বেমালুম চেপে যেতে ? তা তুমি পারতে না। সাহসে কুলোতো না তোমার। তোমাদের দু'জনের তিন বছরের পেরেম-পিরিত ; শরীর নিয়ে খেলাধুলার খবর টুকরো-টুকরো আমার কানে আসতোই। দু'দিন আগে আর দু'দিন পরে! তখন আমি হয়তো তোমাকে অপরাধী আসামীর মতো কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সরকারী উকিলের কায়দায় তোমার দিকে তর্জনী তুলতুম। এ ভয় তোমার ছিলই! কারণ, তুমি নিজেকে দিয়ে জেনে গিয়েছিলে, যে, আমিও জেনে গেছি—তিরিশ বছর ধরে শহুরে মেয়েরা তাদের শরীরটি গঙ্গাজলে ধুয়েমুছে 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না মোরে'র মতো সেফ্ ডিপোজিট ভল্টে রেখে দিতে পারলে ভালো, না পারলে আরো ভালো। সেই জন্যেই, আগে থেকেই, কি বলে গিয়ে সেই 'আত্ম-সমর্পণ' করে তুমি আমার কাছে দুটো মারবেল জিতে গিয়েছো। আমার তর্জনীটি কেটে আমারই চোখের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছো। আমাদের বুদ্ধিমান বন্ধু অমর সান্যাল বিয়ের পর ছ' বচ্ছর অ্যাতো সুখে সংসার করলো, যে হঠাৎ দু' পেগ মাল খেয়ে আরো একটু সুখের আশায় সরল মনে সরলা বউয়ের হৃদয়ে গল্‌গল্ করে বমি করে দিলে, তার অতীতের প্রেম-পিরিতি, শোয়াবসার সব কথা বলে নিজের ভেতরে যে পাষাণ ভার বয়ে বেড়াচ্ছিল ছটি বছর, তাই হালকা করে দিলে। সেই সরলা বউটি, দুটি ছেলেমেয়ের মা আজ প্রায় তিন বছর হতে চলল কথা বলে না, হাসে না, কাঁদে না—খালি রংচটা দেওয়ালের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে দিয়েছে—মস্তিষ্ক-বিকৃতি—রাঁচি ছাড়া গতি নেই। মনের খেলা এই রকম। সব কথা বলে ফেললেও দোষ, না বললেও ভোগান্তি—সুখ শালার পাত্তা নেই। সুকুমার রায়ের 'খুড়োর কলে' বাঁধা খাজা কিংবা লুচির নামই কি সুখ!

ওই দেখ, ঈভলীন আবার আমার দিকে সেই চোখ মেলে তাকিয়ে আছে! এ তো মহা দুশ্চিন্তার কথা হল! চোখে চোখ পড়তেই হেসে জিজ্ঞেস করল, —"আপনি কি প্রফেসনাল পোত্রেত পেইণ্টার ?"

আশ্বস্ত হলুম। সাধারণ কথাবার্তা চালু থাকলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, কিন্তু ওই সর্বনাশা চোখ আমাকে ঝুট্‌ঝামেলায় টেনে নিয়ে গেলেই মুশকিল। সাহায্য করা দূরে থাক, বন্ধু-বান্ধবেরা খেদিয়ে বিদেয় করবে! বললুম,

—"কলেজে পোর্ট্রেট স্টাডি করতে হত। কলেজ ছাড়ার পর আর মানুষের আপাত মুখ আঁকি নি।"

ইংরিজী-ফরাসীতে এই এক সুবিধে বা অসুবিধে। আমাদের বাংলার মতো শুধু সম্বোধনের ঠেলায় আপনার করে নেবে, সে উপায় নেই।

কৈশোরে প্রথম আপনি সম্বোধন শুনে যেরকম খুশী হয়েছিলুম তা আর কোনো দিনও হবো না। পরবর্তীকালে যে-কোনো মেয়েকে প্রথম 'তুমি' ডাকের মধ্য দিয়ে ভেতরে যাবার অজানা পথ অনেকখানি আলোকিত হয়ে উঠত; জয়ের আনন্দে বুকের মধ্যে ঢাকের বাদ্যি গুড়গুড়। এ রাজ্যে তার উপায় নেই বলেই সোয়াস্তি ছিল। কারণ, একে ওই চোখ, তার ওপরে ছোট্ট একটি বাংলা 'তুমি' ছুঁড়ে দিলেই নিজের বিপদ নিজেই টের পাওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতুম। সেই বিপদই উঁকি দিল বোধহয় এতক্ষণে। এইমাত্র টের পেলুম, ঈভলীন নিজের ভাষায় যে শাস ক'টি আলগোছে টেবিলে সাজিয়ে দিল তাদের স্বর, ধ্বনি, ধরন-ধারণ সব মিলিয়ে বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়াবে,

—"কী আঁকো তুমি ?"

হরি হে, বল দাও! কোমরের কষি শক্ত করে বেঁধে রাখতে দাও! একবার ভাবলুম, খুব রুক্ষ গলায় 'আপনার কি 'দরকার' ছুঁড়ে দিয়ে ওর চোখকে সজাগ করে দিই, কারণ, আমার মতো মানুষের পক্ষে নিজেকে সামাল দেবার বদলে অন্যকে থামিয়ে দেওয়া সোজা। কিন্তু, তাও তো চলবে না। বন্ধুমহলের মানুষী। আমার রুক্ষ ব্যবহারে চটে গেলে মুশকিল। বোঝো ব্যাপার! পেরেমের পথেও যাওয়া চলবে না, বিরক্তি দেখিয়ে এড়িয়ে যাওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ঢুম্ করে 'দিদি-মাসী' ডেকে ফেলব নাকি! কপাল ঠুকে নাকচ করে দেব! শেষ যৌবনের হতভাগ্য পুরুষ-মনটা তাও যেন চাইছে না!

নাটকীয় বিনয়ের সঙ্গে বললুম,

—"আজ্ঞে, আমি পেট আঁকি—পেটের জ্বালা! মুখ আঁকি, যে মুখে মনের জ্বালা ফুটে থাকে! সাদামাটা রিয়্যালিস্টিক বা ফটোগ্রাফিক মুখ বহুকাল আঁকি নি, মাদাম।"

আমার কথার ধরনে হেসে ফেলল ঈভলীন। বলল,

—"মাদাম-টাদাম না বলে আমাকে শুধু নাম ধরে ডাকলেই খুশী হবো, শিল্পী।"

'বল মা তারা, পালাই কোথা' গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করল! ওয়েটারটা ঈশ্বরের মতো হাজির হয়ে বাঁচিয়ে দিলে। দু' গেলাস ওয়াইন রেখে ফিরে গেল।

ঈভলীন জিজ্ঞেস করলে,

—"তুমি কি মডার্ন পেইণ্টার ?

রসিকতার গলায় বললুম,

—"কেন, আমাকে দেখে কি সেই বিগত দিনের ওলড্ মাস্টারদের একজন মনে হচ্ছে।"

কাঁচ ভাঙার শব্দ তুলে হাসতে লাগল ঈভলীন। হাসতে হাসতেই বলল,

—"না, না, তা বলছি না। মানে, তুমি কি মডার্ন ডিজাইনের ছবি আঁকো, অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাক্ট্—যার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না ?"

শব্দগুলির প্রত্যেকটি একেবারে তোমার মুখ থেকে শুনতে পেলুম, বউ! ভারতবর্ষে থাকতে শুনেছি, এখানে বসেও শোনা হয়ে গেল।

বললুম,

—"আপনি বুঝবেন কিনা জানি না। তবে, ওই যে বললুম, ফোটোগ্রাফিক ছবি আমি আঁকি না। কলেজে থাকতে রিয়্যালিস্টিক ড্রইং পেইন্টিং শিখেছি, করেছি, এখন আমার ক্যানভাসে ভাঙাচোরা মানুষের ছবি।"

—"কেন, ভাঙাচোরা কেন ?"

দুম্ করে জ্ঞান দিয়ে ফেললুম,

—"একটা মানুষের আপাত অ্যানাটমি কিংবা শরীর তো সেই গোটা মানুষটা হতে পারে না। গোটা মানুষটির ভাবনা-চিন্তা, বোধ-অভিজ্ঞতা সব মিলিয়ে একটা আস্ত চরিত্র। একা একটি লোকের অথবা একাধিক মানুষ-মানুষীর একটি গোটা দলের চরিত্রের অবস্থা আঁকতে গেলে ফোটোগ্রাফির থেকে অনেক গভীরে চলে যাওয়া যায়। আমার চোখের সামনে আমি যা দেখি, যাদের দেখি—সব ভাঙাচোরা। সেইজন্যেই—"

ওর চোখ দুটি বেশ গোলগোল হয়ে উঠেছে দেখে থেমে গেলুম। খুব সিরিয়াস গলা করে ঈভলীন বলল,

—"পড়ে যাবার ভয় নেই, টেবিলটা আমি শক্ত করে ধরছি। তুমি উঠে দাঁড়াও এবং একটু গলা তুলে আবার গোড়া থেকে শুরু করে দাও—"

আমি চট্ করে ধরতে পারি নি, ও কথা শেষ করল,

—"এক্ষুনি প্রচুর শ্রোতা এবং ক্রমশ অসংখ্য ছাত্রছাত্রী যোগাড় হয়ে যাবে তোমার।"

চারপাশে দেখে নিয়ে হাসতে লাগলুম। ঈভলীনও হাসছে এখন। কলুটোলা-কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে পার্টির দুর্দান্ত বক্তা বলাই ঘোষ কথা নেই বার্তা নেই

প্যাকিং বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করে দিত। পথ-চলতি লোকেরা ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ত। ভিড় জমে যেত চারপাশে। হাত-পা নেড়ে, দেশের দুর্দশার কথা কি করে যে অ্যাতো গরমা-গরম ভাষায় ও বলতে পারত, সে ও-ই জানে। অজস্র অচেনা মানুষজনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রম্প্টার ছাড়া অত কথা নিজে থেকে গুছিয়ে বলার ব্যাপারটি ভাবলেই অজ্ঞান হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

বলাই ঘোষের হলদে ছবিতে বিবর্ণ মুখটি সরে গেল, দেখি দূর দিয়ে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছেন দমিনিক, দিগেন দার স্ত্রী। এখানে কি ব্যাপার কে জানে। ও হরি, মনে পড়েছে। আজ মাসের পাঁচ তারিখ। তার মানে, তিন দিন পরেই তো ওঁর প্রদর্শনী। ভাবলুম, প্রদর্শনীর কার্ড বিলি করতে এসেছেন বোধ-হয়। কিন্তু দুটি হাতই তো ওঁর খালি। ভ্যানিটি ব্যাগ পর্যন্ত নেই! তা ছাড়া এমন উত্তেজিত ভঙ্গিতে কেউ প্রদর্শনীতে নেমন্তন্ন করতে যায় বলে শুনি নি। তবে, ওঁর হাঁটা-চলার ধরন যদি সব সময়ই এরকম হয় তা হলে অবশ্য বলার কিছু থাকে না। সেই প্রথম দিন শুধু দেখাই সার হয়েছিল, কথাও বলা হয় নি, হাঁটা-চলাও বিশেষ নজরে পড়ে নি।

দিগেনদা বেল টিপতেই দরজা খুলে দিয়েছিলেন। রোগা, লম্বা দমিনিক। দিগেনদার থেকেও বোধহয় ইঞ্চি খানেক লম্বা। চোয়াড়ে, পুরুষালী মুখে মোটা লেন্সের চশমা। ঘাড়ে ছাঁটা লালচে চুল। মহাকবি কালিদাস দমিনিকের বুকের কি বর্ণনা দিতেন বলা মুশকিল, কারণ যথাস্থানে আদৌ কিছু আছে বলে মনে হয় না। শুধু জলবায়ুর নিয়মে গায়ের রংটি ধবধবে। কোট-প্যাণ্ট পরিয়ে পার্ক স্ট্রীট এলাকায় ছেড়ে দিলে হোটেলের দারোয়ান মাথা ঝুঁকিয়ে বলবে,—"সেলাম সাব!"

প্রথম দর্শনেই ধাক্কা খেলুম। এই হল গিয়ে আমাদের কবি দিগেনদার বউ। আহা রে! দিগেন্দ্রনাথ পাল ফরাসী বউ পেয়েছেন। ওঁর সম্পর্কে অবশ্য এই কথা আমার মনে আসা উচিত নয়। শত হলেও গুরুজন ব্যক্তি! তাঁর জন্যে এক্ষেত্রে মনের মধ্যে 'আহা রে' শব্দটি আসা কি উচিত? উচিতার্থে বিধিলিঙ! কিন্তু, কি করব, বউ, মানুষের মনের ঘোড়া এইরকম! লাফ দিয়ে ফেলে, উচিতের লাগাম ধরে আমরা সব সামলে রাখি। মহাকাব্যের সীতাও যদি দেখতে সুশ্রী না হতো আর লক্ষ্মণ মুখ তুলে তাকিয়ে ফেলত হঠাৎ, তা হলে প্রথম দর্শনের ধাক্কায় ভ্রাতা লক্ষ্মণের ঘোড়াও লাফ দিয়ে উঠত। তারপর অবশ্যই দিনে দিনে

মিলে-মিশে সব সয়ে যায়। সুন্দর-অসুন্দরের সংজ্ঞাই যায় পালটে। অবোধ বয়েস থেকে যে সম্পর্ক তাতে মা শুধু মা হয়েই বেঁচে থাকেন আজীবন। কিন্তু ধরো যদি অবোধ বয়েসে হারিয়ে যাওয়া মা তাঁর ছেলের তিরিশ বছর বয়েসে ফিরে এসে সামনে দাঁড়ান এবং তিনি দেখতে মোটেই সুশ্রী না হন, তাহলে প্রথম দর্শনে সেই ছেলের মনের ঘোড়া একটা লাফ দিয়ে ফেলবেই—কেউ আটকাতে পারবে না।

দমিনিক দরজা খুলে আমার আপাদমস্তক এক পলক, কি বলে যেন, সেই 'নিরীক্ষণ' করেই ভেতরে সরে গেলেন। একটি ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দমিনিকের পেছনে। ফিলিপের বয়সী। ফিলিপকে মনে পড়তেই একটি রঙের বাক্স, জর্জ, জানী পর পর বুদ্‌বুদের মতো ভেসে উঠল। মেয়েটি ডাগর চোখে আমায় দেখছিল। দিগেনদা বললেন,

—"এসো, ভেতরে এসো।"

মেয়েটির কটা চুল ভরতি মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,—"এটি কে, দিগেনদা?"

মহাসমারোহে অভ্যর্থনা না হলেও, একটু দেখনহাসি অন্তত আমার দিকে ছুঁড়ে দিতে পারতেন দমিনিক। আমাকে একেবারে অগ্রাহ্য করে চলে যাওয়া মোটেই ভালো লাগল না। মহিলা শুধু দেখতেই অসুন্দর নন, সাধারণ ভদ্রতাটুকুও নেই মনে হল।

—"আমার মেয়ে।"

বলে কি দিগেনদা! আমি তো অবাক। ফিলিপ বা তার চেয়ে বরং একটু বড় এই মেয়ে দিগেনদার কি করে হয়? বসবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন,

—"এখন আমারই মেয়ে বলতে পারো। দমিনিকের প্রথম পক্ষের সন্তান।"

ওর দিকে তাকিয়ে আমায় দেখিয়ে ফরাসীতে বললেন,

—"আনেৎ! তোমার একটা অংকল। বঁ জুর বলেছো?"

দিগেনদার হাত ধরে হেঁটে হেঁটে ঘরে এসেছিল। আমার দিকে তাকিয়ে শোনপাপড়ির মতো দারুণ মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে বলল,

—"বঁ জুর।"

তারপরেই, আমাকে মুগ্ধ করে এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দিগেনদাও স্নেহের চোখে তাকিয়ে ওর চলে যাওয়া দেখলেন। আমার মনে হল, ইশ! ফিলিপকে যদি এমনি করে হাসতে, দৌড়তে দেখতুম। বেচারার

গম্ভীর বিষণ্ণ মুখটি বুকের ভেতরে একটা আলগা আস্তরণের মতো লেগে রয়েছে।

বললুম,

—"আনেতের ডাকনাম বাংলায় শোনপাপড়ি হতে পারত, দিগেনদা!"

দিগেনদা বললেন,

—"বাহ্! ভালো বলেছো।"

তারপর, আমাকে সোফা দেখিয়ে বললেন,

—"তুমি বসো। আমি একটু কফি করে নিয়ে আসি।"

দিগেনদা চলে যাবার পরে ভালো করে বসবার ঘরটি দেখলুম। বেশ বড়-সড় ঘর। অজস্র দামী জিনিস, আসবাবপত্র সুন্দর করে গোছানো। দিগেনদা বলেছিলেন 'ঘরের যা অবস্থা!' আসলে, আমাকে এখানে নিয়ে আসতে চাইছিলেন না, অজুহাত দেখাচ্ছিলেন। এমন সুন্দর বসবার ঘর দেশে যথেষ্ট ধনী লোকের বাড়িতেই দেখা যায়। তারপর দেখেছিলুম, দমিনিকের আতেলিয়ে। সেও এক এলাহী ব্যাপার। তিনতলার বিশাল ঘরে স্টুডিও। রাস্তার দিকের পুরো একটা দেওয়াল কাঁচের। ছবিগুলি খুব একটা উঁচুদরের নয়। মিষ্টি মিষ্টি নিসর্গচিত্র। তবে, টেকনিক দেখে মনে হল, খুব খেটে করা। তেলরঙের সঙ্গে জল মিশিয়ে মিশিয়ে টেক্স্চার তৈরি করা হয়েছে। নেহাত শৌখীন মেজাজে প্যাটার্নের মধ্যে একটু-আধটু ভাঙচুর। যেন, মডার্ন গন্ধ না থাকলে ভালো দেখায় না! ফরাসী রাজ্যের তথাকথিত শৌখীন বা বুর্জোয়া মহলে এসব ছবির কাটতি খুব। দমিনিকের রোজগার যে প্রচুর সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলুম। কিন্তু, ভদ্রমহিলার সঙ্গে সামনাসামনি আলাপ আর হল না। বসবার ঘরে কফির অপেক্ষায় থাকতে থাকতে শুধু গলা শুনেছিলুম, "অত আদিখ্যেতা সহ্য হয় না। নিজে গিয়ে দেখাও গে যাও—" অথবা, "আস্তে কথা বলার কি হয়েছে, আমার বাড়িতে বসে আমি কি চুরি করছি?" তারপর, "গ্যালারীতে এক্সপোজিশন না করলেও চলতো, এইখানেই তোমার সব দিশী ইয়ার দোস্তকে নিয়ে এসো—"

সেই ভদ্রমহিলা হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে যিশুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। যিশু একটি মডেল পাকড়ে বসে পড়েছে। দমিনিক কি যেন বললেন তড়বড় করে। যিশু তার প্যাকিং বাক্সের ওপরে বোর্ড রেখে উঠে দাঁড়াল, কয়েক পা হেঁটে একটু আলাদা হয়ে গেল দু'জনে। চশমা খুলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন দমিনিক। কাঁদছেন নাকি? যিশুকেও যেন উত্তেজিত মনে হল। কি ব্যাপার

জানতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু দমিনিককে আমার মোটেই পছন্দ হয় নি। পরে, উনি চলে গেলে যিশুকে জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটা জেনে নিলেই হবে।

মুখ ফিরিয়ে ঈভলীনের দিকে তাকালুম। ঈভলীন বলল,

—"চেনো ভদ্রমহিলাকে?"

চিনি কিনা জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"কাকে?"

—"ওই যে লম্বা রোগা ভদ্রমহিলা পিয়েরের সঙ্গে কথা বলছেন। বেচারি! তোমার এক জাত-ভাইকে বিয়ে করে ভাবেন, কি ভুলটাই না করেছেন।"

ফিরে ওদিকে তাকাতেই দেখি, যিশু হাত নেড়ে ডাকছে। আমিও হাত নেড়ে জিজ্ঞেস করলুম ইশারায়—আমাকে, না ঈভলীনকে? ঈভলীনও দেখছে। আমাকেই ডাকছে যিশু। দমিনিক আমার দিকে তাকিয়ে দেখছেন। যেতে খুব একটা ইচ্ছে করছে না। তবু যিশু ডাকছে। মাথার মধ্যে অনেক প্রশ্ন জট পাকিয়ে গেলেও উঠতে হল। ঈভলীনকে বললুম,—"এক্ষুনি আসছি। কেন ডাকছে দেখে আসি!"

ওয়াইন ভরতি দুটি গেলাস এবং মাদাম দ্যুপোঁকে টেবিলে রেখে যিশুর দিকে হাঁটতে লাগলুম। পেছন থেকে ঈভলীন বললে,

—"আমিও আসব নাকি?"

ফিরে তাকিয়ে বললুম,

—"আসতে পারেন।"

এক মুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে বলল,

—"না, থাক্! তুমি দেখে এসো, কেন ডাকছে। আমি বসে আছি।"

যিশুর কাছাকাছি পৌঁছে, ও কিছু বলবার আগেই দমিনিকের দিকে তাকিয়ে ভদ্রতার খাতিরে বললুম,

—"বঁ জুর, মাদাম।"

—"বঁ জুর।"

কোনোরকমে জবাব দিলেন ভদ্রমহিলা। গলার স্বরে কান্না লেগে আছে। লালচে চোখ। ইনিও যে কাঁদতে পারেন, প্রথম পরিচয়ের অভিজ্ঞতায় ভাবতে পারি নি। অথচ এই এখন, এঁর সেই পুরুষালি চেহারাটি কান্নার গন্ধ মিশে রমণী হয়ে উঠল আমার চোখে। এতদিন পরে যেন গয়না প'রে দিগেনদার বউ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কান্নার কারণ যাই হোক, যত গভীরই হোক, ওঁর ভেজা কণ্ঠস্বর, লালচে চোখ দেখে আরাম পেলুম যেন।

যিশু অবাক। দমিনিককে দেখিয়ে বলল,

—"চেনো নাকি ইণ্ডিয়ান?"

বললুম,

—"মাসখানেক আগে আলাপ হয়েছিল একবার।"

—"আমার দিদি।"

—"আপন দিদি?"

—"না। কাজিন।"

এই আরেক সুবিধে বা অসুবিধে এদের ভাষায়। 'কাজিন' বললেই মিটে গেল। পিসতুতো, মাসতুতো, খুড়তুতোর বালাই নেই। হয় আপন বোন, নয় কাজিন।

যিশু বলছে,

—"এঁর স্বামী তোমার দেশের লোক।"

বললুম—"চিনি। এককালে আমরা খুব কাছাকাছি ছিলুম।"

যিশু বলল,

—"খুব ভালো কথা। পরে জমিয়ে বসে সেসব শোনা যাবে। এখন আমার কথা মন দিয়ে শুনে নাও। দমিনিকের সঙ্গে একটা পারিবারিক কাজে এক্ষুনি যেতে হবে আমাকে। কি কাজ, সে তোমাকে ফিরে এসে হয়তো বলব। কিন্তু এখন তুমি আমার একটি উপকার করবে। পারবে তো ?"

যিশুর জন্যে কিছু করতে পারলে নিজেই খুশি হবো, হালকা হবো। উৎসাহের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললুম,

"আমার সাধ্যের মধ্যে হলে নিশ্চয়ই করব, যিশু।"

তারপর ও যা বললো তা শোনার জন্যে মোটেই তৈরি ছিলুম না আমি। ফলে সব কথা ঝরঝরে হয়ে কানে ঢুকল না। শীতবোধ কমে গেল। শুধু মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠাণ্ডা বাতাস নিচের দিকে নামতে শুরু করল,

—"ওই ভদ্রলোক আমেরিকান। আপাতত আমার খদ্দের। খদ্দের লক্ষ্মী। আমি মোটামুটি আউটলাইনটা করেছি, তোমাকে ওঁর পোত্রেত্‌টি কমপ্লিট করতে হবে।"

আবছা চোখে ফিরে তাকিয়ে দেখলুম, বয়স্ক ভদ্রলোক, লালচে মুখটি তুলে আমাদের দেখছেন। হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে শুনতে যিশুর হাত ধরে ফেললুম,

—"ভাই, আমাকে ক্ষমা করে দাও! এ আমি পারব না!"

—"কেন পারবে না ?"

—"এমন আচমকা, কথা নেই বার্তা নেই—এভাবে কি হয় নাকি! তাছাড়া,—"

ছাড়ান পাবার পথ খুঁজছি। গলা শুকিয়ে কাঠ। যিশু বললে,

—"তাছাড়া কি ?"

—"তাছাড়া, মানে, তোমার খদ্দের, আমার আঁকা পছন্দ নাও হতে পারে!"

—"সেসব কথা আমি বলে নিচ্ছি। তুমি শুধু 'হ্যাঁ' তো বলে দাও।"

—"যিশু, ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছি। এভাবে পোট্রেট মোটেই মেলাতে পারবো না—অন্য মুখ হয়ে যাবে—"

প্রায় টানতে টানতে নিয়ে গেল আমাকে ওর খদ্দেরের কাছে। কোনো কথাই শুনল না। যেতে যেতে বলল,

—"পঞ্চাশ ফ্রাঁ দেবে কথা হয়ে গেছে।"

মার্কিন ভদ্রলোক সিগারেটের প্যাকেট বের করছিলেন পকেট থেকে। যিশু ওঁকে ইংরিজিতে বলল,

—"ইণ্ডিয়ার বিখ্যাত আর্টিস্ট। এ আপনার পোত্রেত্ করে দেবে। একেবারে ঐতিহাসিক ছবি সঙ্গে নিয়ে দেশে যেতে পারবেন।"

বুড়ো ভদ্রলোক মিষ্টি করে হাসলেন। আমাদের দিকে সিগারেটের প্যাকেটটি এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

—"চেহারা মিলবে তো?"

যিশু সঙ্গে সঙ্গে বলল,

—"একশোবার মিলবে! না মিললে একটি ফ্রাঁও আপনাকে দিতে হবে না, বিনি পয়সায় শুধু ছবি হিসেবে আঁকাটি নিয়ে যাবেন।"

আমার দিকে ফিরে ফরাসীতে বলল,

—বুড়োর মুখে অনেক লাইন-টাইন আছে, মেলাতে অসুবিধে হবে না, বসে পড়ো। বঁকু রাজ!"

আমার হাতে ওর বোর্ডটি ধরিয়ে 'গুড লাক' ছুঁড়ে দিয়ে দমিনিকের কাছে চলে গেল যিশু। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে উধাও। পরে যিশু আমাকে বলেছিল,

—"লিয় বা দেনিসকে দিয়েও ব্যাপারটি মিটে যেত। কিন্তু তোমার জড়তা, লজ্জা, আড়ষ্টভাব কাটাবার এমন সুযোগ আমার ছাড়তে ইচ্ছে করল না, ইণ্ডিয়ান।"

জড়তা একেবারে অক্টোপাসের মতো আমাকে ঘিরে ধরেছিল। স্বাভাবিক। তবু যিশুর ওই একটা পয়েন্ট আমার ভেতরে টনিকের কাজ দিয়েছে। বুড়োর কপালে, গালে, থুতনিতে গভীর বলিরেখা। অনেক স্পষ্ট রেখা মুখে থাকলে পোর্ট্রেট মেলানো খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। তাজা বা ফ্ল্যাট মুখ মেলাতে কখনো-কখনো বেগ পেতে হয়। সেইসব মুখে ক্যারেকটার বা চরিত্র টেনে আনা বেশ মুশকিল। শিশুরা যেমন। পাঁচটি নবজাতককে পাশাপাশি শুইয়ে রাখো। 'ক' শিশুর পোর্ট্রেট এঁকে 'খ' কিংবা 'ঘ' শিশুর মাকে দেখিয়ে দাও, তিনি বলবেন,

—"ওমা, একেবারে আমার ছেলের মুখ গো।"

যতো বয়েস বাড়ে, তত মানুষের চরিত্র তৈরি হয়, রেখা তৈরি হয়। আলাদা আলাদা মুখ নিয়ে মৃত্যুর দিকে এগোতে থাকি সবাই।

দামী আমেরিকান সিগারেট আমার দিকে এগিয়ে ধরে আছেন ভদ্রলোক। কোনো রকমে ধপ করে বসে পড়লুম প্যাকিং বাক্সের ওপরে। 'হে-হে' করে একটা সিগারেট নিয়ে বললুম,

—'থ্যাংক ইউ স্যার!"

বুড়ো ভদ্রলোক খুব হাসিখুশি। ওঁর দামী লাইটার থেকে সিগারেট ধরিয়ে একটা মোক্ষম টান দিতেই ধাতস্থ হলুম খানিকটা। হাতে ধরা যিশুর বোর্ডটির দিকে তাকালুম এবার। বুড়োর মুখের আউট লাইন আঁকা রয়েছে শুধু। ঢুম করে মনে পড়ে গেল, এই রে! যিশুকে তো জিজ্ঞেস করা হয় নি, ভদ্রলোকের রঙিন মুখ আঁকতে হবে, না, সাদা-কালোয়! একবার ভাবলুম, দৌড়ে গিয়ে যিশুকে ধরে জেনে আসি। মাথার মধ্যে এমন গোলমাল পাকিয়ে গেছে—বুড়োকে জিজ্ঞেস করলেই যে ব্যাপারটা জানা যায়, এই সোজা ভাবনাটুকু বুদ্ধিতে আসতে বেশ সময় লাগল। সেই সময়টুকুর মধ্যে একবার এমনও ভাবলুম যে, যা থাকে কপালে, বোর্ড-টোর্ড ফেলে একেবারে চোঁ-চাঁ দৌড় দেব কিনা? দিয়ে, সোজা মোঁমার্ত্রের সীমানার বাইরে চলে যাব নাকি! বললুম,

—'মাফ করবেন, আমার বন্ধুটি বলে যায় নি, আপনার পোর্ট্রেট কি রঙিন করব, না—"

বাধা দিলেন ভদ্রলোক,

—"নোও, ইয়াংম্যান, নো! জাস্ট ব্ল্যাক-এন-হোয়াইট।"

অন্যান্য আমেরিকানদের মতোই ভদ্রলোকের গলার স্বরে খানিকটা নাক-বন্ধ সর্দির ভাব। ক্রেয়নের জন্যে কাঁধে ঝোলানো শান্তিনিকেতনী থলে হাতড়াতে গিয়ে টের পেলুম, হাত কাঁপছে। মনে পড়ল, আমার ড্রয়িং বোর্ডটি টেবিলে ফেলে এসেছি। ঈভলীন বসে রয়েছে ওখানে। গেলাসে মদ। ধুত্তোর! চুলোয় যাক মদ! পড়ে মরুক ঈভলীন! ড্রয়িং বোর্ডের নিকুচি করেছে! এখন শুধু, বুড়ো আমেরিকানের মুখ আঁকতে হবে।

ক্রেয়নের ছোট্ট বাক্সটি খুঁজে পেতে মনে হল যেন, দেড়-দু' মাস সময় লেগে গেল। চোখের সামনে তখনো সব কিছু কেমন পিছলে পিছলে যাচ্ছে। বুড়োর মুখ, মুখের দাগ দেখলুম। যিশুর আউট লাইন ড্রয়িংয়ের দিকে ভালো করে তাকালুম। মিলিয়ে দেখলুম। বাঃ, দু'টি মুখেরই সব ক'টি রেখা একেবারে পাকা হাতের। ক্রেয়ন পেনসিল আঙুলে ধরে বুড়োর দিকে তাকিয়ে দেখছি, মনে হল, ঘাড়ের ওপরে উষ্ণ নিশ্বাস, সেই গঙ্গার ধারে প্রথম দিন আউটডোর

করার মতো অনুভূতি। চমকে ফিরে তাকালুম, কেউ নেই। যে যার কাজে ব্যস্ত, এখন আর আমাকে লক্ষ্য করছে না কেউ। আপন মস্তিষ্ক, বুদ্ধি-সুদ্ধি এবং দেখার ক্ষমতা সব একত্র গুছিয়ে নিয়ে ক্রেয়ন ঘষতে শুরু করলুম।

গভীর মনোযোগ আনতে পারছি না নিজের মধ্যে। বুড়োর মুখের রেখাগুলি জীবন্ত সরু সরু সাপের মতো নড়ছে। ওদের সঠিক অবস্থান, ধরনধারণ পুরোপরি আয়ত্তে আসছে না। হাড়ের ভিতরে ভয়ের শিরশির—যদি না মেলাতে পারি! এখানে আমার ভবিষ্যতের দায়, যিশুর এবং আমার সম্মানের দায়িত্ব নির্ভর করছে এই একটি মুখের ওপর। ফোটোর মতো মিলিয়ে মিলিয়ে শেষ পোর্ট্রেট কার কিংবা কবে করেছিলুম, মনে পড়ছে না। ছাত্র জীবনেই হবে বোধহয়। নিজের ইচ্ছে মতন, মুড মতন ছবি আঁকা এক কথা, আর জোর-জবরদস্তি একটি মডেলের মুখ হুবহু এঁকে ফেলা কারিগরি বিদ্যের ব্যাপার। মাছিমারা কেরানীগিরি বা নকল করা বিদ্যেও বলতে পারো, বউ। অনেক শিল্পীবন্ধুরা হয়তো চটে যেতে পারেন, কিন্তু আমি কি করব বলো! মনে হচ্ছে, রোজগারের ধান্ধায় মনের তাগিদ ছাড়াই কেরানীর চেয়ারে বসে পড়েছি। ওপাশের খাতায় ছয়ের পিঠে শূন্য আছে তো এপাশের লেজারেও ছয়ের পিঠে শূন্য বসিয়ে দাও। ওপাশের খাতায় মাছি মরে চেপটে আছে, তো এ পাশের খাতার ঠিক একই জায়গায় হুবহু মাছি মেরে চেপটে দাও। ব্যাপারটা প্রায় এই রকমই মনে হল। দেখার ভুল হলেই লেখার বা ড্রয়িঙে ভুল এবং তৎক্ষণাৎ চাকরি নট। একটি পয়সাও পাওয়া যাবে না, উলটে বেইজ্জতি।

ভদ্রলোকের মাথায় ছোটো করে ছাঁটা পাতলা, ধবধবে চুল। কপালে তিনটি গভীর রেখা ভুরুর সঙ্গে সমান্তরাল। গালের দুটি মোটা দাগ বেয়ে নেমে এলুম চোয়াল অবধি। নিচের দিকে চামড়া ঝুলে আছে। দুই চোয়াল এবং থুতনি মিলিয়ে পর পর তিনটি ঢেউ অতিক্রম করে গেলুম। টকটকে লাল রঙের সাহেবের নাকটি টিয়া পাখির ঠোঁট। কুতকুতে নীল চোখের নিচে ঢেউ ফুলে আছে। আলোর মূল উৎস একটি হলে গভীর, গভীরতর অথবা হালকা ছায়ায় রকমফের বুঝিয়ে পোর্ট্রেট মেলানো সোজা। কাটা কাটা ড্রয়িং বেরিয়ে আসে। আকাশে সূর্য থাকলে সেই সুবিধেটুকু পাওয়া যেত। এখন গোটা মেঘলা আকাশের সব দিক থেকেই মলিন আলো পড়ে প্যারিসকে অন্ধকারের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাতেই যেটুকু আলো এবং আলোহীনতার স্তরভেদ বোঝা যায়, ক্রেয়ন ঘষে ঘষে সেই সনাতন পথেই ভদ্রলোকের সারা মুখ চষে বেড়ালুম।

বাঁ চোখটির কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ডাইনে-বাঁয়ে মিলিয়ে দেখি বাঁদিকেরটি একটু ছোট। হঠাৎ মনে হল, এই মানুষটি হাসতেই খুব হাসিখুশি মনে হয়েছিল। এখন পাতলা ঠোঁটের রেখাটি যেন অনেক ভার বয়ে বয়ে, ঝুলে পড়েছে দু'পাশে। চোখের মণি নীলচে হলে এবং সাদাকালো ছবিতে সেই ভাব ফোটাতে গেলে হালকা হাতে ক্রেয়ন ঘষে ধূসর করতে হয়। সেই ধূসরতার মধ্যে অনেক কিছু দেখতে পেলুম এক মুহূর্তে। বহু বেদনার অভিজ্ঞতা, অনেক অভিজ্ঞতার বেদনা যেন ধূসর হয়ে আছে। দেখতে দেখতে, ক্রেয়ন ঘষতে ঘষতে টের পেলুম, ওঁর মুখের একটি রেখাও ঠিক আঁকতে পারি নি। পুরো মুখে প্ল্যাষ্টিক সার্জারি করে বসে ছিলেন। আমার সামনে সব ভাঙতে আরম্ভ করল। ভদ্রলোকের চামড়া দেখতে পাচ্ছি, যে চামড়ার প্রত্যেকটি কুঞ্চন একা একা দুঃখের কথা বলে যাচ্ছে আমাকে। এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সামলে নিলুম। আর একটু হলেই নিজের মতো করে ওঁর মুখের আপাত রেখাগুলি পালটে দিতুম ছবিতে। তখন হয়তো আমি ছাড়া এই পৃথিবীতে ওঁকে আর কেউ চিনতে পারতো না। শুধু কিছু দুঃখ, কিছু বেদনা ওঁর বেনামে ছড়িয়ে পড়ত যিশুর কাগজটুকুর মধ্যে। ভয়ঙ্কর বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে যেতো। হাসাহাসি করতো সবাই—দুয়ো ইণ্ডিয়ান, দুয়ো! পোত্রেত্ মেলাতে পারলে না!

কি কাণ্ড! ভদ্রলোকের মুখ আঁকতে আঁকতে নিজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলুম। ছয়ের পিঠে প্ল্যাষ্টিকের শূন্যটি নড়েচড়ে বদলে গিয়ে চামড়ার পাঁচ হয়ে যাচ্ছিল। চ্যাপটা একটা মরা মাছির বদলে ডুবন্ত একটা নৌকো দেখতে পাচ্ছিলুম।

কোলের ওপরে বোর্ডটি শুইয়ে রাখলুম। আবার ঠিকঠাক কেরানী হবার জন্য চোখ রগড়ে নিলুম দু'হাত দিয়ে। হাত সরিয়ে চোখ খুলতেই দেখি গেলাস ভর্তি লাল ওয়াইন। আশ্চর্য মিষ্টি এক হাসি মুখে গেলাসটি বাড়িয়ে ধরে আছে ঈভলীন! ঈভলীন দ্যুপো। চারপাশের সব কিছু ভুলে গিয়েছিলুম। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখি, লিয়ঁ, দেনিস, মঁসিয় কোর্তোয়া এবং আরো দু'একটি অচেনা মুখ আমার পেছনে দাঁড়িয়ে। এরা সবাই কখন কোথা থেকে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে টের পাই নি কিছুই। প্রত্যেকটি উজ্জ্বল মুখে সামান্য বিস্ময় জড়ানো প্রশংসা ছড়িয়ে আছে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে দেনিস বলেই ফেলল,

—"দারুণ হচ্ছে, ইণ্ডিয়ান। শেষ করে ফ্যালো।"

ঈভলীন সেই হাসি মুখ নিয়ে শুধু বললে,

—"আ ভোত্র সাঁতে।"

এইসব মুখ আমি চিনি। এঁরা আমার শুভাথী হলেও শুধু ভরসা দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে নেই। আমেরিকান ভদ্রলোকের আপাত মুখটি প্রায় পুরোপুরি কাগজে উঠে এসেছে বলে এঁদের মুখে প্রসন্নতা। এই ভাব কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারে না, আপনি এসে যায়। ভরসা পেয়ে গেলুম। ঈভলীনের হাত থেকে গেলাসটি নিয়ে শেষ করে দিলুম এক চুমুকে।

আরো একটু কেরানীগিরি করে মনে হল, আর দরকার নেই, চাকরি রাখার জন্যে প্রকৃতির বই থেকে এই লেজারে যেটুকু তুলে আনলে অঙ্ক মিলে যায়, সেটুকু হয়ে গেছে।

—"ইজ ইট কমপ্লিট ?"

সাহেবের প্রশ্নের জবাবে উঠে দাঁড়ালুম। মনে মনে বললুম—হ্যাঁ, সায়েব, তোমার প্ল্যাস্টিক সার্জারি করা মুখটি আমি এঁকে ফেলেছি। ছবিসমেত বোর্ডটি ঘুরিয়ে দিলুম ওর দিকে। এখন আর আমি ছবির দিকে তাকাচ্ছি না। ভদ্রলোকের মুখের মধ্যে ভয়ে ভয়ে বিরক্তির চিহ্ন খুঁজে বেড়াচ্ছি। না, কোনো রেখা পাল্টালো না। দেখতে দেখতে উঠে দাঁড়ালেন। বিড়বিড় করে কি বলে আমার দিকে তাকালেন। বললেন,

—"তুমি তো জিনিয়াস, ইণ্ডিয়ান।"

খেয়াল হল, ঈভলীন আমার বাঁ হাতটি চেপে ধরেছে। উত্তেজিত গলায় ফিসফিস করে প্রায় কানের কাছে বলল,

—"ত্রে বিয়ঁা। ত্রে, ত্রে বিয়ঁা! খুব, খু-উ-ব ভালো হয়েছে!"

আমেরিকান ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে বললেন,

—"দেখি, ইয়াংম্যান, দাও। আমার হাতে দাও!"

ছবিসুদ্ধ বোর্ডটি দু'হাতে ধরে আমার মুখ দেখলেন, তারপর ছবিটি। নিজেকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে এমনি বার দুয়েক আমার মুখের দিকে তাকালেন, যেন আমারই পোর্ট্রেট আঁকা আছে যিশুর বোর্ডে। হঠাৎ আমার সামনে ছবিটি এগিয়ে দিয়ে বললেন,

—"শিল্পী, তোমার নাম সই করে দিলে আমার, এই মুখটির মধ্যে ইণ্ডিয়া, আমেরিকা এবং ফরাসী দেশের আশ্চর্য সঙ্গম হবে।"

সই করে দিলুম। দেনিস তাড়াতাড়ি বোর্ড থেকে ছবিটি খুলে নিজের বোর্ডের কাগজে মুড়ে মোঁমার্ত্রে আমার প্রথম মডেলের হাতে তুলে দিল।

ভদ্রলোক পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করলেন। . দশ ফ্রাঁর কয়েকটি নোট এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। গুণে দেখি ছটি। তাড়াতাড়ি একটি ওঁকে ফিরিয়ে দিতে গেলুম।

—"ষাট দিয়েছেন!"

—"হ্যাঁ।" স্মিতমুখে ভদ্রলোকের জবাব।

—"আমার বন্ধুর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছিল পঞ্চাশের। দশ বেশী!"

চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিলেন, আলতো হাত আমার কাঁধে রেখে মিষ্টি হেসে বললেন,

—"ইণ্ডিয়ান, তোমার শিল্পী বন্ধুটির সঙ্গে আমার মুখের দরদাম হয়েছিল পঞ্চাশে। তাতে সইয়ের কোনো প্রাইস ছিল না। তুমি যে ধরনের শিল্পী, তোমার সই দশ হাজার ফ্রাঁতে কিনতে হবে লোককে। দশ ফ্রাঁতে পেয়ে গেলুম।"

যদিও জানি, এসব ছেলেমানুষি ছবি, তবু, প্যারিসের মোঁমার্ত্রে দাঁড়িয়ে কীর্তনখোলা নদীর হাওয়ায় বড় হ'তে হ'তে ছোট্ট এই আমি মনে মনে দু'হাত বাড়িয়ে মাকে খুঁজলুম। আমার মাকে। তিনি যদি আজ এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তাঁর চোখে আমি জল দেখতে পেতুম। তিনি আমার মাথায় কাঁপা কাঁপা হাত রেখে আঁচলে চোখ মুছতেন, যা তুমি কোনোদিন পারবে না, বউ। তুমি খুব খুশি হবে। খুশিতে গর্বিতা। চোখে তোমার জল থাকতে পারে, কিন্তু তুমি কোনোদিন বলতে পারবে না,

—"বাবা আমার, আমি তো কিছু বুঝি না, ঈশ্বর তোমাকে আরো বড় করুন।"
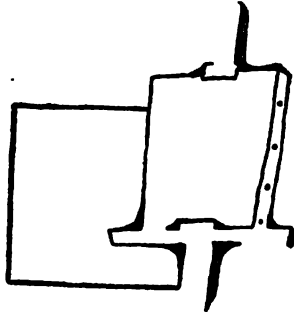
যিশু জিজ্ঞেস করল,

—"দিগেঁকে তুমি কদ্দিন চেনো ?"

—"বহুদিন। এক যুগেরও বেশী।"

সন্ধ্যে হতে না হতেই বৃষ্টি নেমেছে। মোঁমার্ত্রের অকাল মেলা গেছে ভেঙে। ঈভলীনের গাড়িতে উঠে পড়েছি সবাই। এক এক করে লিয়ঁ, দেনিস এবং মঁসিয় কোর্তোয়াকে নামিয়ে দিয়েছে ঈভলীন। এখন, যিশু এবং আমাকে নিয়ে সিতে ইউনিভার্সিত্যারের দিকে ছুটেছে।

যিশুও প্রায় বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মোঁমার্ত্রে ফিরে এসেছিল। দমিনিক ছিল না। যিশু একা। ঈভলীন ওরা হইহই করে এখানে আমার প্রথম মুখ আঁকার খবর দিয়েছে। একটু যেন অন্যমনস্ক যিশু নিরুত্তাপ গলায় বলেছে,

—"এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই বন্ধুগণ। আমি জানতুম।"

ঈভলীন চটেমটে বললে,

—"দিগ্‌গজের মতো কথা বোলো না। কি জানতে ?"

হয়তো চোখের ভুল, যিশুর মুখ কেমন থমথমে লাগছে। অন্য কিছু ভাবছে মনে হয়। আমাদের এই ছোট্ট হাসিখুশির দলটির মধ্যে ঠিক যেন মিশে যেতে পারছে না। সহজ হবার চেষ্টায় হাসল। বলল,

—"জানতুম যে, ইণ্ডিয়ান এই আসরে ছবি আঁকতে বসলে এই রকমই কিছু হওয়া স্বাভাবিক।"

বয়স্ক, গুরুজনী ভঙ্গিতে ঈভলীনকে কথা ক'টি বলে, আমার দিকে তাকালো। জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি করে জানতে তুমি ?"

—"তোমার সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপ মনে আছে? সেদিনই তোমার ভেতরকার সাহস এবং ক্ষমতার গন্ধ আমি পেয়ে গিয়েছিলুম।"

দেনিস, ঈভলীন একসঙ্গে বলে উঠল,

—"কি রকম ব্যাপার, শুনি!"

কথা বলতে বলতে যিশুর গম্ভীর মুখ হালকা হয়ে আসছে। হেসে বলল,

—"তেমন কিছু নয়। ইণ্ডিয়ানকে খদ্দের ঠাউরে,ওর পোত্রেত্ এঁকে দেবার প্রস্তাব করেছিলুম। বলেছিলুম, পঞ্চাশ ফ্রাঁ দিলেই করে দেব। উনি উল্টে করলেন কি, আমাকে চেয়ারে বসিয়ে আমারই ড্রয়িং বোর্ড বাগিয়ে ধরলেন।"

লিয়ঁ. দেনিস, ঈভলীন শব্দ করে হেসে ফেলল। মঁসিয় কোর্তোয়া তাঁর সরু গলায় বললেন,

—"আপনি তো গুণধর ব্যক্তি, মশায়।"

যিশু বললে,

—"শুধু তাই নয়। বলে কি না, পঞ্চাশ দিলে আমার পোত্রেত্ করবে, বলছিলে তো, আমাকে তার অর্ধেক দিও, আমি তোমার মুখ এঁকে দিচ্ছি—"

বলতে বলতে হেসে ফেলল যিশু। আমার পিঠে একটা আলগা থাপ্পড় দিল,

—"মনে আছে. দোস্ত!"

নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ালুম মনে মনে। যিশুকে ভালো আগেই লেগেছিল, এখন দেখছি ওকে না হলে আমার চলবে না। আমারই প্রশংসা করে জানিয়ে দিল যে, ও আমাকে চিনে ফেলেছে। এমনভাবেই কি একে অন্যের গভীরে আমরা ঠাঁই পেয়ে যাই! বললুম,

—"মনে আছে, যিশু। আরো মনে আছে, তুমি সেদিন তোমার ফিয়াসঁের কথা বলেছিলে। তিনি কে এবং কোথায় তা কিন্তু বলে দাও নি আমাকে!"

ঈভলীন একেবারে চোখ কপালে তুলে বললে,

—"কি, কি বললে ইণ্ডিয়ান? ফিয়াসেঁ! পীয়েরের ফিয়াসেঁ—" তার পরেই ফেটে পড়ল হাসিতে,

—"অমন কথা জিজ্ঞেস করতে নেই, শিল্পী। কারণ ও বস্তুটি পীয়েরের দোবেলা পালটায়—" সবাই হেসে উঠলুম একসঙ্গে।

দশ ফ্রাঁর ছটি নোট গুণে গুণে যিশুর দিকে বাড়িয়ে দিতেই দেনিস হাঁ হাঁ করে উঠল,

—"ও কী করছ ইণ্ডিয়ান ? দশ ফ্রাঁ তো তোমার। শুধু তোমার একলার।"

ঈভলীন জুড়ে দিল,

—"সইয়ের দাম! সাহেব নিজেই তো বলে দিয়েছিল।"

যিশু কিছুতেই একটা ফ্রাঁও নেবে না। আমিও নিতে রাজী নই। কেন নেবো ? ওর খদ্দের। ও ড্রয়িং শুরু করে গিয়েছিল। ওতে আমার হক কোত্থেকে হবে! বললুম,

—"ছাখো যিশু, আজকের ব্যাপারটাকে আমার টেস্ট বা প্রাক্‌টিস, বলতে পারো! রোজগার তোমার।"

মঁসিয় কোর্তোয়া গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন,

—"ঠিক আছে, দু'জনে মারামারি না করে মাদাম হ্যাপোঁর ওপরে ভার দিয়ে দিন. উনি বিচক্ষণ মহিলা. একটা জুতসই রফা করে দেবেন।"

নোটগুলি ঈভলীনের হাতে তুলে দিলুম। ঈভলীন বলল,

—"আমি যা রফা করব, তার অসম্মান করা চলবে না কিন্তু—" বলে নিজের মনিব্যাগ থেকে দুটি পাঁচ ফ্রাঁ বের করে একটি দশ ফ্রাঁর নোট ভাঙিয়ে দিল। তারপর আমাদের দু'জনকে পঁচিশ করে দিয়ে, শেষ নোটটি যিশুর সামনে ধরল। বলল,

—"এই নাও, পীয়ের, পকেট থেকে কলম বের করো। নোটের সাদা জায়গায় একটা সই মেরে দাও দেখি!"

যিশু হাসতে হাসতে ওর আদেশ পালন করল। তারপর, পুরস্কার দেবার কায়দায় দু' হাতের অঙ্গুলিতে ধরে আমার দিকে এগিয়ে দিল নোটটি। মনে মনে ঠিক করলুম, এটিকে কোনোদিনই খরচা করে ফেলা চলবে না।

বাঁ পাশে ঈভলীন গাড়ি চালাচ্ছে। ডান পাশে যিশু। বৃষ্টির কণা উইণ্ডস্ক্রীনে পড়ে ফেটে যাচ্ছে। বাইরের ঠাণ্ডা ও ভেতরের তিনটি মানুষ-মানুষীর উষ্ণ নিশ্বাসে জানলার কাচ ঠিক ঘষা কাচের মতো দেখাচ্ছে। আঙুল দিয়ে রেখা টেনে টেনে দুটি মুখের ড্রইং করল যিশু ডান দিকের কাচে। পুরুষ নারী। এখন ওই আঙুল টানা দাগের মধ্যে স্পষ্ট এবং চলমান প্যারিস দেখা যাচ্ছে। দুটি মুখের ড্রইংয়ে টুকরো টুকরো সন্ধ্যা বৃষ্টি মাথায় করে নেমে আসছে। বাইরের নিয়ন আলোয় বিজ্ঞাপন, পথচলতি লোক অথবা মোটরগাড়ি স্বচ্ছ দাগের মধ্যে ভাঙা ভাঙা। অল্প সময় ওদিকে দেখতে দেখতেই আবার দাগগুলি চারপাশের ঘষা কাচের সঙ্গে মিলে যেতে লাগল। যিশু বললে,

—"দিগেঁ কি দেশে থাকতে কবিতা-টবিতা লিখতো নাকি ?"

হঠাৎ দিগেনদার কথা কেন বুঝলুম না। মনে পড়ল, ও তো আবার দিগেনদার শালা হয়। ফরাসী শিল্পী দমিনিকের সঙ্গে বাংলার কবি দিগেন পালের সম্পর্ক খুব মধুর মনে হয় নি আমার। সেই প্রথম দিনই ওদের বাড়িতে কেমন খাপছাড়া লেগেছিল। দমিনিকের কান্নায় ভেজা লালচে চোখ দেখতে পেলুম। দিগেনদা কি অ-সুখী ! ওঁর কবিতা প্রসঙ্গে যিশুর হালকা প্রশ্নে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওকেই বা দোষ দিই কি করে ! বাঙালী কবি বন্ধুটির মধ্যে কি আগুন আমরা দেখেছি, তা যিশুকে কি করে বোঝাই ! বললুম,

—"ওরকমভাবে বোলো না যিশু ! 'কবিতা-টবিতা' নয়, রীতিমতন ভালো কবিতা লিখতেন আমাদের 'দিগেনদা'। আমরা বন্ধুরা ছাড়াও, যুবক মহলে বেশ নামডাক ছিল এক সময়।"

যিশু বললে,

—"আমি দুঃখিত ভাই। কিছু মনে কোরো না, তোমাকে কষ্ট দেবার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। তবে, ওঁর বাংলা কবিতা পড়ার ক্ষমতা তো আমার নেই—মুখ ফসকে ওইভাবে প্রশ্নটা করে ফেলেছি। জ রিগ্রেত।"

ঈভলীন সামনে চোখ রেখে বলল,

—"আমার মনে হয় পীয়ের, ভদ্রলোকের এখানে এসে সেট্‌ল্ করা উচিত হয় নি। তুমি কি বলো ?"

যিশুও সামনেই দেখছিল। যত আস্তেই বলুক, আমি শুনতে পেলুম ও বলছে,

—"বেচারা।"

অ-সুখের পায়ের শব্দ পাচ্ছি, বউ। দিগেনদার অ-সুখ। সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করতে বাধছিল। কারণ, দিগেনদা তো আমার অনেক বেশি আপনার লোক। এরা ওঁকে কতটুকু জানে ! আমি চিনি অনেক আগে থেকে, অনেক বেশি। এই সব ভাবতে ভাবতে আপন অধিকারবোধের রাজত্ব আগলাচ্ছিলুম। ঈভলীন বললে,

—"তাছাড়া, দমিনিকেরও ভুল হয়েছে। দ্বিতীয়বার বিয়ে না করলেই পারতো।"

যিশু বললে,

—"আসলে কি জানো, ঈভলীন ! শিল্পী, কবিদের বিয়ে করাই উচিত নয় ! এরা বেসিকালী একা জন্মায়, একলাই মরে যায়।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাইরের কোনো শব্দ গাড়ির ভেতরে বসে আমরা শুনতে পাচ্ছি না। সামনে চোখ রেখে সাবধানে জিজ্ঞেস করলুম,

—"দিগেঁ এখন করছেন কি ?"

যিশু বললে,

—"কিছুই না। গোড়ায় গোড়ায় বছর চারেক ফরাসী ভাষা, সাহিত্য শিখতে আদাজল খেয়ে লাগল। দমিনিক ওকে খুব সাহায্য করেছিল তখন। সমালোচনা-সাহিত্য, শিল্প-সমালোচনা নিয়েও বিস্তর পড়াশুনা করেছে দিগেঁ। সেই সময় ওরা দু'জনেই ভাবতো, দিগেঁ প্যারিসের নামকরা কলাসমালোচক হতে পারবে।"

বললুম,

—"কলকাতার কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় উনি সমালোচনা লিখে প্রশংসা পেয়েছেন অনেক।"

—"ইণ্ডিয়ায় দমিনিকের একস্‌পোজিশানের সমালোচনাও দিগেঁ করেছিল। তখনই তো দু'জনের আলাপ হয়েছে।"

'ওসব আমি জানি' গোছের মাথা নাড়লুম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ আবার। যিশু পকেট থেকে গোলওয়াজ বের করে আমাকে একটা দিল, নিজেও ধরালো।

ঈভলীন বলল,

—"উফ্, এই তামাকখোরদের নিয়ে আর পারি না বাপু—নামাও, নামাও, জানলার কাচ একটু নামিয়ে দাও পীয়ের। দমবন্ধ হয়ে মারা পড়ব।"

গম্ভীর মুখে হাতল ঘুরিয়ে কাচ সামান্য নামিয়ে দিল যিশু। ছলাৎ করে শীত এসে গাড়ির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বৃষ্টির কণাও। বুলভার রাসপাই দিয়ে গাড়ি ছুটছে। দঁফে রশরো ছাড়িয়ে সিতের কাছাকাছি এসে পড়েছি। যিশু বলল,

—"ফরাসীতে কবিতা লেখারও চেষ্টা করেছিল দিগেঁ। কিছু মনে করো না, ইণ্ডিয়ান,—খুব উঁচুদরের লেখা হয় নি। দু'একটি তৃতীয় শ্রেণীর পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল। তারপরে আর কেউ ছাপাতে চায় নি।"

সিগারেটে লম্বা টান দিল যিশু। দিগেনদার সেই সাড়াজাগানো কবিতার দু'একটা ছেঁড়া-খোঁড়া লাইন মাথার মধ্যে ঘুরছে, 'এ এক আশ্চর্য খেলা মানুষের' অথবা 'যেহেতু শিশুরা খেলে, এবং, যেহেতু সকল আশ্চর্য খেলাই পুরোনো হয়েছে,' 'আমি জানি এ খেলা কখন শেষ হয়'। শব্দগুলিকে মাড়িয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে অ-সুখ। দিগেনদার গভীর অ-সুখ।

যিশু বলছে,

—"গোলমাল কোথায় হয়েছে, জানো ইণ্ডিয়ান! নিজের মায়ের ভাষায় সৎসাহিত্য করতে গিয়েই হিমসিম খায় লেখকেরা। পিচুটি জমে যায় চোখে, শব্দ খুঁজে পায় না। সেখানে, দেড় পো জীবন পেরিয়ে নতুন রাজ্যে এসে বিজাতীয় ভাষায় সাহিত্য করে সাক্সেসফুল হওয়া বেশ কঠিন।"

বললুম,

—"কেন. কনরাডের মায়ের ভাষা পোলিশ, ইংরিজি সাহিত্যে তাঁর অবদান আছে। চেক ভাষাভাষী কাফকা, যদ্দূর জানি, ভিনদেশী ভাষায় লিখেছেন। তাছাড়া, আমাদের দেশের বহু জ্ঞানী-গুণী আপন মাতৃভাষা ছেড়ে ইংরিজিতে অনেক কিছু লিখেছেন। এঁদের সম্পর্কে কি বলবে তুমি?"

যিশু হেসে ফেলল। রসিকতার গলায় বলল,

—"ছ্যাখো ইণ্ডিয়ান, লিখলেই বোধহয় লেখা হয় না! সে রকম বলো তো আমিও ইংরিজিতে চিঠি লিখি! বলো তো, গোরুর ওপর চার পাতা রচনা লিখে দেখাই তোমাকে! তবে হাঁা, নিজের ভাষার বাইরে গিয়েও যদি কেউ সুসাহিত্য করেন, তাহলে বুঝতে হবে, শিশুকাল থেকেই সেই পরভাষায় তাঁর ভাবনা চিন্তা, খাওয়া-বসা এবং স্বপ্ন দেখা।"

এই প্রসঙ্গে যিশুর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতে পারতুম। কিন্তু এখন আর যুক্তিতর্ক কাটাকাটির মধ্যে যেতে মন চাইছে না। কাচে জল মোছার ওয়াইপার সড়াৎ করে এপাশে চলে আসছে ঠিকঠাক, কিন্তু অন্য পাশে যাবার সময় যেন একটু কাঁপতে কাঁপতে থরথর করে ফিরে যাচ্ছে। কাচের ওপারে দিগেনদার মুখ বৃষ্টির জলে ভিজছে মনে হল। ওয়াইপারটি এদিকে আসতেই কলকাতার দিগেনদা খুব চিৎকার করে কোনো কবিতা আমাকে শোনাবার চেষ্টা করছেন যেন। থরথর কাঁপতে কাঁপতে সেই মুখ মুছে গেলে—দিগেঁ পল। মসিয়ঁ দিগেঁ পল নিজের মনে বিড়বিড় করে কি সব বলে যাচ্ছেন। চোখ সরিয়ে যিশুকে জিজ্ঞেস করলুম;

—"দিগেনদা কোনো সমালোচনা লেখেন নি কোথাও? কোনো প্রদর্শনীর সমালোচনা?"

আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল যিশু। স্নেহের গলায় বলল,

—"দিগেঁকে তুমি খুব ভালোবাসতে, তাই না?"

—"ভালোবাসাবাসি বুঝতে পারি না, যিশু। তবে, বন্ধুলোক নিঃসন্দেহে।

ওঁর ভেতরকার যে আগুন আমরা দেখেছি, সেই প্রাণ, সেই ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করতুম, এখনো করি।”

—“তোমার দেশের সবাই কি তোমার মতো ইণ্ডিয়ান?”

—“তার মানে?”

—“মানে, তোমার বেঙ্গলের লোকেরা কি এখনো দিগেঁকে শ্রদ্ধা করে? আগের মতো?”

যিশুর প্রশ্নটি আমাকে এক ধাক্কায় পৌঁছে দিল ভিণ্ডি বাজারে। বোম্বাইয়ের ভিণ্ডি বাজার। ভ্যাপসা বস্তির একটি স্যাঁৎসেঁতে ঘর। মাথার ওপরে গোলপাতার ছাউনি। তারই ফাটাফুটো দিয়ে শীর্ণ রোদ আসে ঘরে। আর আসে বৃষ্টি। কলের জলের মতো বৃষ্টির জল। তোবড়ানো ঘটি, বাটি, বালতি বসিয়ে সেই জল ধরে ধরে বাইরে ফেলে দিতে হয় সারা রাত বসে থেকে। সমীর বসে থাকে। কলকাতার সমীরকুমার। সাত-আটটা বৃষ্টির জল ধরে ধরে সমীর এখন ক্লান্ত। বোম্বাইয়ের ধেনো, যাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যে আমরা 'বেওড়া' বলি, সেই মদ ভেতরে ঠাসা থাকলে চামড়ায় আর বৃষ্টির জল টের পাওয়া যায় না আজকাল। প্রায় এক ডজন বাংলা ছবির সেই নায়ক ভুম করে চলে এসেছিল বোম্বাই। হিন্দী দু'একটা সিনেমায় মোটামুটি মাঝারি চরিত্রে অভিনয় করেছে। জমে নি। ছাবও খেয়েছে মার।

বলেছিলুম,

—“বাংলা ছবিতে ফিরে যাচ্ছেন না কেন? সেখানে তো আপনার নামডাক আছে।”

বড় তাড়াতাড় মদ খায় সমীর। বলেছিল,

—“নামডাক যেখানে ছিল, সে জায়গা এখন অন্য ছোকরারা ভরিয়ে দিয়েছে। আমি গেলে এখন শুধু প্যাক খাবো, দাদা! সেরেফ প্যাক! ভাত জুটবে না। তারপর বিকৃত মুখে কল্পিত মানুষদের অভিনয় করে দেখিয়েছিল,

—“এই য্যা শ্রীমান স্সমীরকুমার! বোম্বাই বাজার জয় করে এলেন তা' লে! আস্সুন! বস্সুন! ওর‍্যা, বাবুকে চ্যা দিয়ে যা—”

বললুম,

—“তা না হয় একটু সহই করলেন! কিন্তু এরকম টানাটানির মধ্যে তো আর থাকতে হবে না! টুকটাক কাজ জুটে যাবেই।”

জল ছাড়াই জলের মতো ধেনো খায় সমীরকুমার। বলে,

—"দাদা, এক প্রেমিকা ছেড়ে দ্বিতীয়া ধরতে গিয়ে ধোঁকা খেলে, চল্লিশের কোঠায় বসে আর পেরথম প্রেয়সীর কাছে ফিরে যাওয়া চলে না। ততক্ষণে তার অন্য মরদ জুটে গেছে!"

হাতের পিঠে ঠোঁট মুছে গলায় শব্দ করে—অ্যাহ্! তারপর বলে,

—"এখানে, মাঝে-মধ্যে একস্ট্রা করে যেটুকু মদ জুটছে, তাতেই চলে যাবে স্যার। আত্মসম্মানটি হাতের মুঠোয় করে কলকাতায় গেলে, সেটিও থাকবে না, ভাত তো নয়ই—শুধু প্যাক—"

আমরা, বোম্বাইয়ের বন্ধুরা সমীরের জন্যে কষ্ট পাই। জানি, যারা আজ ওকে এটা-ওটা দিয়ে সাহায্য করে, তারাও করুণা মাখিয়ে করে। ও আর কোনোদিনই নায়ক হবে না। নিজেও তা জেনে গেছে এতদিনে। শিল্পীর সম্মানে ঘোর বিশ্বাস নিজেকে শিল্পী বলে জানে। আর জানে, রাজত্ব গেলে রাজা অন্য রাজ্যে ভিক্ষে করে ফেরে, নিজের দেশে নয়। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় সমীর। আপন মনেই মুখ বিকৃত করে চ্যাচায়,

—"স্শালা! ছ্যাখ্‌রে বোম্বাই-কা-বাবু ফিরে এসেছে—দে, বানচোতের পাছায় ক্যাৎ-লাথি!"

আর যাই নি ওর কাছে তারপর। গোড়ায় গোড়ায় কষ্ট হতো, পরে টের পেলুম, কষ্ট ছাপিয়ে ওকে করুণা করতে আরম্ভ করেছি। আর যাই নি তাই। শেষবার খবর পেয়েছিলুম, দিনরাত্তির এর-ওর কাছ থেকে মদ খেয়ে ফেলার জন্যে কাজের খোঁজেও আর বেরোতে পারে না সমীর। পড়ে থাকে। সম্মান নিয়ে শুয়ে থাকে, যতক্ষণ শুয়ে থাকা যায়।

যিশু বলছে,

—"ইণ্ডিয়ান, এই ছোট্ট দেশে প্রায় চল্লিশ হাজার শিল্পী। সমালোচকের সংখ্যাও প্রচুর। ভীষণ লড়াই। তারই মধ্যে যাঁরা পাত পেড়ে খেতে পান তাঁরা চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সব খান। তাঁদের খাতির আলাদা, সম্মান ঢালাও। ভিন্-দেশী মানুষ সেই লড়াইয়ের মধ্যে মৃত সৈনিকের ভূমিকাও পায় না।"

একটু চুপ থেকে জিজ্ঞেস করলুম,

—"তার মানে, তুমি বলতে চাও, দিগেঁ এখানে থেকে আর কিছুই করতে পারবেন না?"

—"না।"

কলকাতা, বোম্বাই প্যারিস একাকার হয়ে যাচ্ছে, বউ। দিগেনদা আর সমীর-

কুমার। দু'জনের মুখ, মুখের চেহারা ভাঙতে ভাঙতে এক রকম দেখাচ্ছে। এঁদের যে কোনো একজনের পোর্ট্রেট আঁকলেই কি অন্যজনের মতো দেখাবে! দিগেনদা, আপনি দেশে ফিরে যান। কিছু না হোক্, এখানে যে হতাশায় ভুগছেন, তার থেকে পালিয়ে যান। চাকরি-বাকরি না করলেও কবিতা তো লিখতে পারবেন দেশে ফিরে। বাংলা কবিতা। সাদা থান পরে, হাতে চায়ের কাপ নিয়ে কালীঘাটের এক মা এখনো বসে আছেন আপনার জন্যে।

যিশুকে জিজ্ঞেস করলুম,

—"তাঁর মানে, দমিনিকই সংসারে চালাচ্ছেন! আচ্ছা যিশু, এখানে কোনো চাকরি-বাকরির চেষ্টা করলে পারতেন না দিগেনদা?"

খবর দেবার মতো কথা বলল যিশু,

—"খুচ্‌খাচ্ দু'এক জায়গায় চাকরি করেছে। টেকাতে পারে নি। আসলে চাকরি ওর মেজাজের বাইরে।"

—"কি ধরনের কাজ করেছেন?"

—"খুব সম্মানজনক কিছু নয়। শিল্প-কবিতার গণ্ডীর থেকে দূরের চাকরি।" গাড়ির ভেতরকার ছাইদানে সিগারেট চেপে দিলুম। ঈভলীন চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছিল। হাল্‌কা গলায় বললে,

—"বিয়ে-টিয়ে করে তোমার আবার এখানে সেটল্ করার প্ল্যান নেই তো?"

ওর দিকে ফিরে দেখলুম। রাস্তার সব দোকানপাটের আলো জ্বলে গেছে। তবু, বৃষ্টির পর্দায় ঝাপসা দেখাচ্ছে চারিপাশ। সামনে হেডলাইটের আলোয় তীরের ফলার মতো সাদা বৃষ্টির ঝাঁক। গাড়ির ভেতরকার আধো অন্ধকারে তোমার প্রোফাইল। কালো চুলে ডান দিকের কান, গালের খানিকটা ঢাকা পড়েছে। ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি। না, এ হাসি তোমার নয়, বউ। এমন দুষ্টুমির হাসি তোমার ঠোঁটে খেলে না কখনো। তুমি নও, ঈভলীন। মাদাম ঈভলীন দ্যুপোঁ। আমার দিকে না তাকিয়েই বলল আবার,

—"কি দেখছো? জবাব দিলে না?"

বললুম,

—"দেশ থাকতে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগারিক হয়ে এখানে পড়ে থাকার ইচ্ছে নেই। তাছাড়া, ওখানে আমার স্ত্রী আছে, বাচ্চা আছে—"

ঈভলীন জিজ্ঞেস করলে,

—"কটি বাচ্চা ?"

ওর সঙ্গে এখন ঠিক খেজুরে আলাপের মুড নেই। ভাবছি দিগেনদা কি হেরে গেলেন! ওঁর মুখটি, ফরাসী মুখটি মনে করবার চেষ্টা করছি। খুঁজে পাচ্ছি না। এই একটু আগেই ছিল। হারিয়ে গেছে। আমার চেনা কবি দিগেন পাল কফি হাউসের কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নতুন কবিতা আবৃত্তি করছেন ?

সেই ছবিটি দেখতে পাচ্ছি। দেখতে দেখতে ঈভলীনকে জবাব দিলুম,

—"একটি।"

সঙ্গে সঙ্গে ঈভলীনের প্রশ্ন আবার,

—"ছেলে না মেয়ে ?"

সেবক অফিসের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে উদ্দাম নেচে চলেছেন দিগেনদা। বললুম,

—"এখনো হয় নি। হবে।"

ঈভলীন হাসছে। হঠাৎ ওর দিকে ফিরে বললুম,

—"তোমার তো বিরাট বিজ্ঞাপন কোম্পানি! দিগেনদাকে একটা ভালো চাকরি করে দাও না!"

যিশু চুপচাপ সামনে তাকিয়ে আছে। গম্ভীর মুখে শ্বাস ফেলছে বসে বসে।

ঈভলীন বললে,

—"কোম্পানিটা আমার নয়। আমার কত্তার। তবু, পীয়েরের সুপারিশে কপি রাইটার হিসেবে মঁসিয় পল দু'মাস আমাদের সঙ্গে ছিলেন। দু'মাসে একটিও ভালো কপি লিখতে পারেন নি। ক্লায়েণ্টদের মোটেই পছন্দ হয় নি। কত্তা কিছু না বললেও, দিগেঁ নিজেই বুঝেছিলেন, বিজ্ঞাপনের লেখা ওঁর দ্বারা সম্ভব নয়। ছেড়ে দিয়েছেন। আর আমরা কি করতে পারি বলো!"

সিতে এলাকার মধ্যে গাড়ি ঢুকে পড়ল। মেজোন্দ্যলান্দ্ দেখা যাচ্ছে। ডাকলুম,

—"যিশু।"

মুখ বন্ধ রেখেই লম্বা শ্বাস ফেলার ধরনে জবাব এল, যেন অন্য কিছু ভাবছে,

—"উঁ।"

—"দিগেনদার জন্যে আমরা কি আর কিছুই করতে পারি না ?"

যিশু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেণ্ড। খুব গম্ভীর মুখ। আবার সামনে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল,

—"না, ইণ্ডিয়ান, ওঁর জন্যে আর বোধহয় কিছুই করা যাবে না।" তারপর, দম নিয়ে, বেশ কাটা কাটা উচ্চারণে বলল,

—"তোমার দিগেনদা আজ দুপুরে মারা গেছেন।"

—"না—" বলে আমি বোধহয় চেঁচিয়ে উঠেছিলুম। ঈভলীনও কি একটা শব্দ বলতে বলতে এত জোরে ব্রেক করেছিল, যে কিছুই শুনতে পাই নি। সামনের কাচে কপাল ঠুকে গেছে। কয়েক মুহূর্ত, কান দুটিতে সেই ছেলেবেলার রাবণের চিতা জ্বলছে—এমনি দাউদাউ শব্দ পাচ্ছিলুম। মনে যেসব ভাবনাগুলি খেলে গেল, কিছুই বলতে পারব না, বউ। দিগেনদার সঙ্গে এত দীর্ঘদিন কোনো যোগাযোগই ছিল না। প্রায় ভুলেই তো গিয়েছিলুম। দিগেনদা আমার কেউ নন। কেউই কিছু নয়। তবু, বুকের ভেতরে এমন লাগছে কেন, অনেকখানি বাতাস যেন সেখান থেকে বেরিয়ে গেছে।
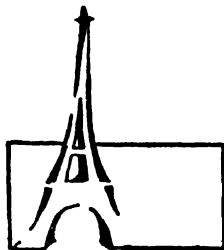
—"তোমার দিগেনদা মারা গেছেন।"

যিশুর শব্দগুলি ঝন্‌ঝন্ বাজছে কানের মধ্যে, মনের মধ্যে। অথচ, বউ, সেই মৃত ভদ্রলোক চুপটি করে বসে আছেন আমার চোখের সামনে। মাত্র কয়েক হাত দূরে! যিশুর ঘরের কোণে বসে সাঁ জেম্‌স্ রামের গেলাসে চুমুক দিচ্ছেন। খুব একটা কারুর দিকে তাকাচ্ছেন না। আমি কিন্তু সেই থেকে ওঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছি। চোখে চোখ পড়লেও আমায় যেন চিনতেই পারছেন না দিগেনদা।

পার্টির জন্যে অ্যানী যিশুর ঘরের ভোল পালটে দিয়েছে। বিছানা পত্তর নেই আজকে। সারা ঘরে মলিন কার্পেটের ওপরে নানান্ রঙের চাদর পাতা। সাদা,

লাল, সবুজ এবং আধুনিক ডিজাইন দিয়ে এমনভাবে সাজানো হয়েছে মেঝে, পুরো ব্যাপারটি ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। গোলাপীর বদলে শক্তিশালী বাল্‌বটি আজ লাল কাগজে মোড়া। বুনো পার্টিতে নাকি লাল রং জমে ভালো, অ্যানি বলেছিল। সবাই লেপ্‌টে বসে আছি মেঝেয়। পা মুড়ে পদ্মাসনে বসেছি আমি আর আনেৎ। লিয়ঁ, ঈভলীন আমাদের দেখাদেখি পদ্মাসনে বসার চেষ্টা করছে। পুরোপুরি পা মুড়তে পারে না এরা। চেয়ার-টেবিলে বসে বসে এই অবস্থা। হাসতে হাসতে ওরা দুজনে হাল ছেড়ে দিয়ে অন্যদের মতো পা ছড়িয়ে বসে হল্লা শুরু করে দিয়েছে। এখন, আমার ডান হাতের পাতার ওপরে ঈভলীন ওর বাঁ হাত ফেলে রেখেছে। দিগেনদাকে দেখছি।

ঘণ্টা দু'য়েক আগে ঈভলীনের গাড়ি থেকে নেমেও দিগেনদাকে দেখতে পাচ্ছিলুম। ঈভলীন আমার হাত চেপে ধরেছিল। ঝম্‌ঝমে বৃষ্টি। সামনে মেজোন্দ্যল্যান্দ। দিগেনদার মৃত সাদা মুখ ভাসছে বৃষ্টিতে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সেই কতকাল আগের রোগা দিগেনদার উজ্জ্বল মুখ। ঈভলীন বলছিল,

—"চলো, ইণ্ডিয়ান। ভিজে গেলুম একেবারে।"

গাড়ির ড্যাশবোর্ডের সঙ্গে কপাল ঠুকে খানিকটা জায়গা ফুলে গেছে। কপালে হাত ঘষে আকাশ দেখলুম। আহ্‌! ঠাণ্ডা, বরফের মতো বৃষ্টির জল! কপালে পড়ছে, চোখে পড়ছে। সারা মুখে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিচ্ছে আকাশ। যিশু আমার কোমর জড়িয়ে ধরে টানল। বাঁদিকে ঈভলীন। যিশু বলছে,

—"আমি জানি তুমি কষ্ট পাবে, তাই অনেকক্ষণ বলি নি। কথায় কথায় বেরিয়ে গেল। আমার যা সত্যি মনে হয়েছে, তাই বলে ফেলেছি! চলো, তোমার ঘরে চলো। সব বলছি খুলে। তুমি আশা করি কাউকে বলবে না। দিগের ভালোর জন্যেই বলবে না।"

মেজোঁর ঘরে ঢুকে দুপুরের ঘটনা সব বলতে লাগল যিশু। একেবারে গোড়া থেকে শুরু করে বিস্তারিত বলে যেতে লাগল। ভেজা শরীর নিয়েই তিনজনে বসে পড়েছি। আমি আর ঈভলীন খাটে। ঘরের একমাত্র চেয়ারে যিশু। ওর কথা,.শব্দ, অক্ষরের হাত ধরে ধরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলুম। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফেলল দমিনিক। বলল,

—"তুমি যেন কিছু বলতে যেও না পীয়ের। তাহলেই হয়তো আবার গণ্ডগোল হবে।"

যিশু ঘাড় নেড়ে জানালো, না, বলবে না। সকালেই দু'জনের এক পশলা

ঝগড়া হয়ে গেছে। দাম্পত্য কলহ নয়। তার চেয়ে তেতো। আজকাল খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও স্বামী-স্ত্রীর লেগে যায়। দিগেঁ খুব একটা কথা কাটাকাটির ধার ঘেঁষে না। কিন্তু, ভীষণ একগুঁয়ে। গুম্ মেরে বসে থাকে। দমিনিক তাতে আরো যায় চটে। ওর ঘ্যানঘ্যান সহ্য করতে না পেরে দিগেঁ নাকি একদিন বলেছিল,

—"আমি চলে গেলে কি তোমার সুবিধে হবে!"

দমিনিক একেবারে চুপ করে গেছে। নিঃশব্দে কেঁদেছে। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সারারাত। মেয়েটাও দিগেঁকে জড়িয়ে কাঁদে। বলে—"তুমি মাকে বকেছো। কেন বকলে? তুমি যাও, মাকে আদর করে দাও।"

বছর তিন চার ধরে এমনি চলে আসছে। যিশু কাকে দোষ দেবে বুঝতে পারে না। কারণ দোষ কাউকে দেওয়া যায় না। কেঁদেকেটে পরদিন সকালেই দমিনিক চলে আসে যিশুর কাছে। রেখে ঢেকে নালিশ করে। ওর তো কেউ নেই প্যারিসে। যারা আছে বা আছেন তাদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা হলে হয় কুশল-জিজ্ঞাসা। নিতান্তই 'কেমন আছেন ভালো আছি আপনি কেমন ধন্যবাদ'। বয়স বাড়তে থাকলেই যুবক-যুবতীরা আত্মীয়স্বজন বাপ-মায়ের থেকে দূরে সরে যেতে আরম্ভ করে। আপনা থেকেই! অলিখিত অনিবার্য নিয়মের মতো। দমিনিকের সঙ্গী এক ওই মেয়ে আনেৎ আর ছবি। প্রথম স্বামী সরে গেলে, আশ্রয় খুঁজছিল হাতড়ে হাতড়ে। পুরুষের বুকের আশ্রয়। দিগেঁর মধ্যে ভারতবর্ষ ছিল। ভারতবর্ষে আছে হৃদয়ের টান। মা-বাবা-ভাই বোনের একত্র সংসার। সংসারে থাকে হৃদয়। হৃদয়ে সংসার। দমিনিক দিগেঁকে ভালোবাসে। দিগেঁর মধ্যে ভরসা ছিল, ক্ষমতা ছিল। দু'জনের আশা গড়ে উঠেছিল দিগেঁকে নিয়ে। আশা, স্বপ্ন ভাঙতে ভাঙতে অনেক বছর পেরিয়ে গেছে। কড়া নাড়তে নাড়তে, নাড়তে নাড়তে হঠাৎ কখন নিঃশব্দে দরজা ভেঙে ঢুকে পড়েছে আশাহীনতা। দমিনিক ছবি আঁকে, রোজগার করে। ভিনদেশে এসে মার খেতে খেতে দমিনিকের জন্য গর্ববোধ কমে গেছে দিগেঁর। পরাজয়, অক্ষমতার জল পড়ে পড়ে এককালের ক্ষমতাবান কবির বোধ-বুদ্ধির ভিতরে জন্ম নিয়েছে ক্যাকটাস। সেই কাকটাসটা কিছুদিন শুধু খোঁচা দিয়েছে ওকে। এখন বড় হয়ে কথা বলতে পারে। বলে,

—"কিস্সু করতে পারলি না তো। দ্যাখ্ বউটাকে দ্যাখ্! কেমন নাম করছে। কেমন দাম পাচ্ছে ছবির! দেশে গেলেও পাত্তা পাবি না, উপোসে মরবি। খেয়ে যা। বসে বসে বউয়ের রোজগারে খেয়ে যা!"

দমিনিকের এখন একস্‌পোজিশনের দুশ্চিন্তা। কয়েকটি ছবিতে ছোটোখাটো কাজ এখনো বাকি। আজকের ঝগড়ার পর নিজের আতেলিয়েতে ঢুকে পড়েছে দমিনিক। আপন মনে কাজ শুরু করে দিয়েছে। মেয়ে চলে গেছে স্কুলে। কখন যে দুপুর গড়িয়ে গেছে, টের পায় নি দমিনিক। হঠাৎ খেয়াল হয়েছে, মেয়ে ফিরে আসবার সময়। ঘরে জিনিস থাকেই। দুপুরে হয় বাইরে কিছু খেয়ে নেয় দিগে অথবা নিজের হাতেই ঘরে কিছু করে নেয়। ওর জন্যে চিন্তা নেই। মেয়েটার জন্যে যা হোক একটু স্যুপ্‌ আর সেদ্ধ-টেদ্ধ করে রাখতে হবে চট্‌ করে। ভাবতে ভাবতে স্টুডিওর দরজা খুলে বেরোতে গিয়ে চম্‌কে উঠল দমিনিক। সরু প্যাসেজের অন্য প্রান্তে দিগের ঘর। দরজা খোলা: দিগে হাঁটতে হাঁটতে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে। সারা প্যাসেজে কাঁচা পেট্রোলের গন্ধ। দমিনিককে দেখেই ভূত দেখার মতো থমকে দাঁড়াল দিগে। দ্রুত পায়ে হেঁটে কাছে যেতেই দমিনিক টের পেল দিগের পোশাক সব ভেজা। উগ্র পেট্রোলের গন্ধ গায়ে।

বুঝতে সময় লেগেছিল একটু। নিজের ঘরে বসে সারা গায়ে পেট্রোল ঢেলে বোধহয় দেশলাই খুঁজে পায় নি। চুপিচুপি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল।

—"কি হয়েছে, কি ব্যাপার—" অথবা "করছো কি দিগে" ছাড়া আরো কি কি বলেছে দমিনিক, গুছিয়ে বলতে পারে নি যিশুকে। শুধু বলল—"গায়ের জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ওকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছি দরজা। কি করব কিছু বুঝতে না বুঝতেই কলিং বেল বেজেছে। আনেৎ এসে গেছে স্কুল থেকে।"

কান্না চেপে মেয়েকে জড়িয়ে ধরেছে বুকের সঙ্গে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছে,

—"তোমার পাপা কি কাণ্ড করছে দেখো গিয়ে—"

মেয়ে বলল,

—"আমার খিদে পেয়েছে মা!"

—"এক্ষুনি খাবে সোনা। তুমি একটু পাপার ঘরে যাও তো! দেখো কি এক বিচ্ছিরি সেন্ট্‌ গায়ে মেখে বসে আছে। কিছুতেই জামা-কাপড় পাল্টাচ্ছে না। আমার কথা শুনছেই না মোটে। তুমি দেখো তো মা, ওর জামাটা খুলে দিতে পারো কিনা! ও যেন, 'ওই বিচ্ছিরি সেন্ট মেখে বাইরে না যায়, কেমন?"

এক দৌড়ে আনেৎ ছুটে গেছে বাবার ঘরের সামনে,

—"পাপা ! পাপা দরজা খোলো তা। মা বলছে, কি বিচ্ছিরি সেন্ট মেখেছো গায়ে, দেখি—"

আনেৎকে দিগেঁর ঘরে ঢুকিয়ে আবার বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে দমিনিক। ছুটে এসেছে মোমার্ত্রে। যিশুকে সঙ্গে নিয়ে আবার দিগেঁর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে,

—"তুমি যেন কিছু বলতে যেও না পীয়ের—"।

ঘটনা বলতে বলতে একটু দম নিল যিশু। ঈভলীন ওর বুট-মোজা খুলে ফেলেছে। খাটের ওপরে জুত্ হয়ে বসে হেলান দিয়েছে দেওয়ালে। বললে,

—"তারপর, তারপর ?"

আমার গলার ভিতরে, কণ্ঠার কাছে শুক্‌নো তুলো বুলিয়ে দিয়েছে কে যেন। ঢোক গিললুম। কষ্ট হল বেশ। মুখে জল কেটে, খানিকটা থুতুর মতো করে গিলে ফেললুম। আরাম হল। যিশুকে বললুম,

—"থামলে কেন, বলো ?"

টেবিলেই চারমিনার পড়েছিল। যিশু জিজ্ঞেস করলে,

—"এই তোমাদের ইণ্ডিয়ান গোলওয়াজ ?"

ঘাড় নেড়ে জানালুম হ্যাঁ। ঈভলীন তাড়া লাগাল,

—"তারপর ? তারপর কি হল পীয়ের ? ঘরে ঢুকে কি দেখলে ?"

যিশু আমার দিশি সিগারেট ধরিয়ে বললে,

—"কি হবে শুনে ? আমার আর বলতে ভালো লাগছে না।"

ঈভলীন বললে বিরক্তির গলায়,

—"আহ্ ! বলোই না শুনি !"

যিশুও ঈভলীনের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। আস্তে আস্তে বলল তারপর,

—"ছাখো ঈভলীন ! একটা মানুষের দুঃখের বা পরাজয়ের গল্প 'তার চিতায় সে কি ভাবে পুড়ছে সেই খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে কি কারো ভালো লাগে ?"

ঘরে ঢুকে খাটের ওপর যেমন করে বসে পড়েছিলুম, এখনো ঠিক সেইভাবেই বসে আছি। নড়ে-চড়ে গল্প শোনার মতো তৈরি হয়ে বসতে পারি নি। কারণ, আমি তো গল্প শুনছি না। সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বউ। পেট্রোলে ভেজা

দিগেনদার ভয়ংকর মুখ। ছোট্ট মেয়ে আনেতের দুটি চোখ সেই মুখের দিকে চেয়ে অবাক। দমিনিকের চশমায় ঢাকা পুরুষালি মুখ কান্নায় ভেঙে ভেঙে রমণী এখন। কোনো কষ্ট হচ্ছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে, টানটান মন নিয়ে বসে আছি। ভেতরে কোথাও খুব কষ্ট হলে, কিছুতেই বলতে পারি না, বউ। আমার সবকিছু হিসেবপত্রে মাপা হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। খুশি হলে হইহই করে হাসা যায়। রাগ হলে চিৎকার করে তা জানানো এবং ঝগড়া করা আমার খুব সোজা মনে হয়। কিন্তু, কারোর জন্যে, কোনো কিছুর জন্যে অথবা নিজের জন্যে কষ্ট হলে তা প্রকাশ করা খুব মুশকিল। চট্ করে চোখ ঝাপসা হয়ে এলে মুখ ঘুরিয়ে নিতে ভালো লাগে। যিশু, তুমি বা তোমরা কেউ দেখে ফেললে বড় লজ্জার কথা। সেই জন্যেই, পরে, অনেক অনেক কিছুর পরে, চোখদুটো যদি ভিজতে আরম্ভ করে, তবে তা অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে—সে তুমি একদিন ধরে ফেলেছিলে প্রায়। সামলে নিয়েছিলুম। নাক টেনে, অন্ধকারে, সর্দির দোহাই দিয়ে। কারণ, তখন তুমি সুখ শুষে নিচ্ছো আমার অস্তিত্ব থেকে। অন্ধকারে বিছানায় আমরা তখন কি অসম্ভব স্বামী-স্ত্রী। চিৎকার করে সমাজকে ডেকে জানিয়ে দেবার মতো আইনসিদ্ধ, বৈধ প্রণয়ে লিপ্ত। অথচ, সমাজের স্বীকৃতি না নিয়েই তুমি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস দুপুরে, বিকেলে ডুপ্লিকেট চাবি ঘুরিয়ে তীর্থর ঘরে ঢুকে পড়েছো। তারপর, এমনি করে বারবার সুখ টেনে নিয়েছো একে অন্যের অস্তিত্ব থেকে। তফাত কোথায় আমি বুঝতে পারি না, বউ! আমি তো চিনতুমই না তোমাকে তখন। তোমার সেই তীর্থংকরকেও দেখি নি কখনো। তুমি বলেছিলে রোগা, লম্বা, কালো মানুষ। শুয়ে শুয়ে মনটা ছোট হয়ে যাচ্ছিল আমার। স্বার্থপরের মতো আমি অদেখা, অজানা এবং রোগা লম্বা একটা কালো মানুষ হয়ে যাচ্ছিলুম। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পায় না। স্পর্শ পায়, গন্ধ পায়। দীর্ঘ পরিচয়ের সুবাস ঘ্রাণের মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে। কেন জানি না, আমি কোনো গন্ধই পাচ্ছিলুম না সেদিন। না তোমার, না অন্য কোনো পার্থিব নারীর। তোমার গরজে, তোমার সুখের শব্দের মধ্যে নিজেকে খুঁজেই পাচ্ছিলুম না। খুব কষ্ট হচ্ছিল বোধের ভিতর। বুকে, পিঠে, হৃদয়ের মধ্যে থেকে সারা গায়ে কে প্রচণ্ড লাথি মারছিল। অসংখ্য সুখ পৃথিবীর মতো ঘুরতে ঘুরতে ভেঙেচুরে যাচ্ছিল তখন। উফ্, সে বড় কষ্ট বউ! ইচ্ছে হচ্ছিল, কোনো বিখ্যাত উপন্যাসের নায়কদের মতো গলা টিপে দিই তোমার। আপন সংসার করার বাসনার প্রয়োজনে, তৃতীয় প্রহরে পরিত্যক্ত যুবতীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে নিজেকে অসাধারণ

বোঝাবার চেষ্টায় তোমাকে করুণা করে ফেলেছিলুম। আমার ডান হাতের তর্জনী কেটে নিয়ে আমারই চোখের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছো তুমি। সে কথা প্রকাশ করবার সাহস আমার নেই—ধরা পড়ে যাবো। তুমি ছাড়া আমার কোনো গতি নেই, তুমি ছাড়া আমার কেউ স্ত্রী হতে পারে না আর। অথচ, সেই দিনই অন্ধকারে আমি রোগা, লম্বা, উলঙ্গ একটা কালো মানুষ হয়ে যাচ্ছিলুম বারবার। হাতের পিঠে চোখ মুছতে পারি না। তোমার কাঁধের লোনা ঘামের মধ্যে চেপে ধরছিলুম চোখ দুটো। আন্দাজে জিজ্ঞেস করেছিলে,

—"এই, তুমি কি কাঁদছো নাকি?"

গোটা শরীর নিংড়ে কান্না ঠেলে উঠে আসতে থাকলে নাকও বন্ধ হয়ে যায়। নাক টেনে বলেছিলুম,

—"দূর! কাঁদবো কেন! সর্দিতে নিশ্বাস নিতে পারছি না। দম বন্ধ হয়ে আসে।"

আজকাল আমি খুব সহজেই নিজেকে শুকনো খটখটে রাখতে পারি। আমার কষ্ট, সে তো আমারই! আমার শরীরের বেদনায় হাত বুলিয়ে দিতে পারো। কিন্তু, মনে? মনের গায়ে হাত বোলানো বড় কঠিন ব্যাপার। যদি কেউ পারে, তবে, আর চোখের জল কিছুতেই সামলানো যায় না। কিন্তু, 'আহারে বেচারার কি কষ্ট,' মনে মনেও কেউ বলবে, আমার সহ্য হয় না। তার চেয়ে বাপু, দু' ঘা জুতো মেরে যাও—লাগবে না।

যিশু জিজ্ঞেস করছে,

—"আনেৎকে দেখেছো তুমি, ইণ্ডিয়ান?"

—"কে?" প্রথমে বুঝতে পারি নি।

—"আনেৎ। দমিনিকের মেয়ে।" ঘাড় নেড়ে জানালুম,

—"হ্যাঁ। দেখেছি। একবার শুধু। ভারী মিষ্টি মেয়ে!"

—"ওর বয়েস কত বলো তো?"

—"দশ-বারো হবে!"

—"দশেরও কম।"

—"দেখে মনে হয় না।"

—"হ্যাঁ আর একটা ব্যাপার কি জানো? ওর সমবয়সী বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ শুধু ইস্কুলে যাওয়া, ফিরে আসা। জন্ম থেকেই দিগেঁকে দেখে আসছে। বড় ভালোবাসে। ও জানেই না ওর পাপা

অন্য আর কেউ। লুকিয়ে তুমি যদি ওদের দু'জনকে কখনো খেলতে ভাখো, মনে হবে, দিগেঁর বয়েস দশ, মেয়ে চল্লিশ। আসলে, আনেতের জাগতিক বোধবুদ্ধি চার বড়জোর পাঁচের মধ্যেই আটকে আছে এখনো। ইস্কুলের লেখা-পড়ায় খারাপ নয়, তবে মনের বয়েস বাড়ে নি সেই চার-পাঁচের পর।"

বাবার পেছনে দাঁড়িয়ে আমায় দেখছে দুটি চোখ 'বঁ জুর' জানিয়ে শোনপাপড়ির মতো উড়ে চলে যাচ্ছে—এইসব ছবি ভাবনায় খেলে গেল। যিশুকে বললুম,

—"হ্যাঁ, এখনো বালিকা হয়ে ওঠে নি মনে হয়।"

বাইরে থেকে ছিটকিনি তুলে দিয়ে মোঁমার্ত্রে চলে গিয়েছিল দমিনিক। দরজার সামনে এসে ছিটকিনি খুলতে যাবে, কি মনে হতেই ঝুঁকে পড়ল। চোখ পাতল চাবি লাগাবার ফুটোয়। যিশু দাঁড়িয়ে আছে। বলল,

—"কি হল? খোলো।"

ঠোঁটে তর্জনী চেপে ইশারায় ওকে চুপ থাকতে বলে সোজা হয়ে দাঁড়াল দমিনিক। তির্‌তির্‌ ঠোঁট কাঁপছে ওর, যিশু দেখতে পেল। দমিনিক খুব আস্তে কাঁপা কাঁপা গলায় কথা বলল,

—"ওইখানে চোখ লাগিয়ে ভাখো।"

নীচু হয়ে দরজার ফুটোয় ডান চোখ চেপে ধরল যিশু। গোল, আলোকিত ছোট্ট একটি বৃত্তের মধ্যে আনেৎ আর দিগেঁ। অল্প দূরে, জানলার কাছ ঘেঁষে খাটের পায়া। সেই পায়ায় হেলান দিয়ে দুই পা ছড়িয়ে বসে আছে দিগেঁ। জামার বুকের বোতাম সব খোলা। মাথাটি ঝুলে পড়েছে। থুতনি ঠেকে আছে বুকে। মাথাজোড়া টাকের পেছন দিকে লম্বা চুল সব উসকোখুসকো। খাটের পায়া ঘেঁষে ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আনেৎ। পরনে স্কুলের পোশাক। চিরুনি হাতে খুব যত্নে চুল আঁচড়ে দিচ্ছে পাপার। যিশু তার জীবনে নাকি এই রকম বিষণ্ণ অথচ মিষ্টি একটি গোল ছবি দেখে নি কখনো। কি যেন বলছে আনেৎ। ভালো করে শোনবার জন্যে যিশু বৃত্ত থেকে চোখ সরিয়ে কান পাতল সেখানে। সামনে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ানো দমিনিকের দীর্ঘ শরীর। এখন কাঁপছে। যিশু দেখল, দু'হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদছে দমিনিক। শুনতে পেল আনেতের মিষ্টি সরু গলা, টেলিফোনে কথা বলার মতো দূর থেকে ভেসে আসছে,

—"তারপর, সেই ছোট্ট রাজপুত্র করল কি পাপা, ঝাড়ন দিয়ে ওর তারার গায়ের তিনটে আগ্নেয়গিরি পরিষ্কার করল। একটা তো নিভে গেছে। তবু,

রোজ পরিষ্কার করে রাজপুত্তুর। বলা তো যায় না কিছু! আগ্নেয়গিরি ঝেড়ে-পুঁছে, ফুলের গায়ে জল ঢেলে পাখিদের বলল, 'উড়াল দাও।' মরসুমী পাখিদের পায়ের সঙ্গে সুতো বাঁধা। সেই হাজার সুতো দু' হাতের মুঠোয় ধরে উড়তে উড়তে, উড়তে উড়তে ছোট্ট রাজপুত্তুর কোথায় এসে পড়ল, জানো পাপা?—"

যিশুর চোখ জ্বালা করছে। পলক পড়তেই জল। তাড়াতাড়ি নিজের গাল, চোখের কোল মুছে উঠে দাঁড়াল। দমিনিককে আস্তে ঠেলা দিয়ে বলল,

—"কি, হচ্ছে কি? ওদের অমঙ্গল হবে। নাও, দরজা খোলো।"

চোখ মুছে, রুমালে নাক পরিষ্কার করে সহজ হবার চেষ্টা করল দমিনিক। ছিটকিনি টেনে দরজা খুলতেই আনেৎ এদিকে তাকাল। দিগেঁ যেমন ছিল তেমনি বসে থাকল। আনেৎ তড়বড় করে বলল,

—"মা, কোথায় গিয়েছিলে আমাদের বন্ধ করে? পাপা কথাই বলছে না আমার সঙ্গে। সেই জন্যেই আমি ওকে ছোট্ট রাজপুত্তুর শোনাচ্ছি—গল্প শুনলে আর কথা বলার দরকার নেই তো? সেইজন্যে।—"

যিশু পায়ে পায়ে এগিয়ে দিগেঁর কাছে পৌঁছুলো। বসে পড়ল উবু হয়ে। আনেৎ দৌড়ে এসে যিশুর গালে চুমু দিল একটা। তারপর, মাকে মায়ের মতো জড়িয়ে ধরে বলল,

—"পাপার বোতাম সব খুলে দিয়েছি। জামাটা খুলতে পারছি না। পাপা তো কত বড়। হাত না তুললে আমি জামা খুলবো কি করে?"

দমিনিক ওর মাথায় হাত বুলিয়ে শুধু বলল,

—"ঠিক আছে।"

আনেৎ আবার বলল,

—"তুমি মোটেই জান না। পাপা কোনো সেন্টই মাখে নি। পেট্রোল। টিনটা নামাতে গিয়ে না, পেট্রোল পড়ে গেছে, পাপা বলল।"

শুনে যিশু ফিরে তাকিয়ে আনেৎকে দেখল। দমিনিক ডান হাতে ওকে চেপে ধরে আছে নিজের শরীরের সঙ্গে। মুখ পাশে ফিরিয়ে বাঁহাত দিয়ে চোখ মুছছে।......

—"মুখই তো সব, ইণ্ডিয়ান। মুখই মানুষের ভাবের আয়না। মুখ লুকোতে পারলে অনেক কিছু ঢেকে রাখা যায়। সুখ-দুঃখ, রাগ, অভিমান—সব।"

বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল যিশু। আমি বললুম,

—"তুমি যে বললে, দিগেনদা মারা গেছেন?"

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে যিশু ম্লান হাসল। বলল,

—"যার বেঁচে থাকার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বাসনা মরে গেছে, যে সমস্ত শরীর মন দিয়ে মৃত্যুকে আহ্বান করছে, তাকে কি তুমি আর জীবিত মানুষ বলতে পারো, শিল্পী ?"

কি বলব ভাবছিলুম। দিগেনদাকে আবার দেখতে পাব শুনে অনেকখানি ভার সরে গেছে মন থেকে। ঈভলীন শ্বাস ফেলে বলল,

—"আজকের পার্টি ক্যানসেল করে দিলেই পারতে ?"

যিশু হাসল। নিঃশব্দ হাসি। বলল,

—"এক ইণ্ডিয়ানের নতুন জন্ম হয়েছে আজ মোঁমাত্রেঁ। আর এক ইণ্ডিয়ানের মৃতদেহ স্পিরিটে ডুবিয়ে রাখতে হবে আজ থেকে। এমন দিনে পার্টি হবে না তো হবে কবে !"

ঈভলীন নরম এবং ভারী গলায় বলল,

—"অমন করে বোলো না পীয়ের। দিগেঁ এখন ভালো আছে তো ?"

যিশুর কথার ধরনে কোনো হাল্‌কা ভাব নেই। যে যেমনভাবে নেয়। যে যতটুকু বোঝে, যেভাবে বোঝে সেইটেই কথা। ঈভলীনের খারাপ লেগেছে ওর কথার ধরন। আমার লাগে নি। আমি নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারি, যিশু ভেতরের ব্যথা ওইভাবে প্রকাশ করছে। যেন, দিগেঁর ব্যাপারে ওর আর কিছুই আসে-যায় না।

জুতো খুলে বসেছিল যিশু। উবু হয়ে ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলল,

—"ইণ্ডিয়ান, কাউকে কিছু বলতে যেও না। দিগেঁকেও নয়, কেমন ?"

চোখ তুলে আমায় দেখল। আবার বলল,

—"প্রমিস !"

ঘাড় নাড়লুম। বললুম,

—"ঠিক আছে।"

জুতোর ফিতে বেঁধে সোজা দাঁড়িয়ে ঈভলীনকে বলল,

—"ইণ্ডিয়ানকে নিয়ে এসো ওর দিশি গোলওয়াজ সমেত। আমি চললুম। দিগেঁ দমিনিকদের তুলে নিয়ে যেতে হবে।"

জিজ্ঞেস করলুম,

—"দিগেনদা পার্টিতে আসছেন ?"

দরজার কাছে পৌঁছে যিশু বলল,

—"আনতেই হবে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতেই সব শুনে উনি বলেছেন, ওকে সারাক্ষণ চীয়ারফুল রাখতে হবে। একলা রাখা চলবে না।"

দরজা খুলে আবার বলল,

—"দমিনিকের এক্সপোজিশন পর্যন্ত আনেৎ স্কুলে যাবে না। বাড়িতেই থাকবে। চলি। তাড়াতাড়ি এসো তোমরা।"

টেনে দরজা বন্ধ করে যিশু চলে গেল। ছোট্ট একটি আলোকিত বৃত্তের মধ্যে দিগেনদা এবং আনেৎকে দেখতে পেলুম।
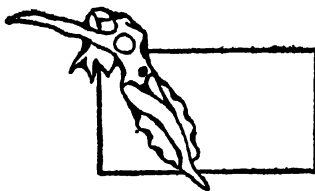
তোমাকে মেজোঁর কথা বলা হয় নি, বউ। মেজোন্দ্যল্যান্দের কথা। আমার ঘরটির কথা। 'পাসাজে' হিসেবে জায়গা পেয়ে গেছি। বারো ফ্রাঁ করে দিনে। জর্জ ওর গাড়িতে আমাকে পৌছতে এসেছিল। সেই চাঁড়ালমশাই বসেছিলেন কাউন্টারে। আঁদ্রে শাজাল। পকেট প্রায় খালি করে দু'মাসের ভাড়া একসঙ্গে আগাম দিয়ে দিলুম। চাঁড়াল এক বিন্দু ইংরিজি জানে না। রিসিট লিখতে লিখতে ফরাসীতে বললে,

—"আপনি তো ছবি আঁকেন!"

বলেই, মুখ তুলে তাকাল। ঘাড় নাড়লুম। আবার বলল,—"দেখবেন, ঘরের মধ্যে যেন পেইন্টিং-ফেইন্টিং করবেন না।"

বলে কি চাঁড়াল! অসহায় মুখ করে জর্জের দিকে তাকালুম। জর্জ সেই গুঁফো হাসিটি নিয়ে চাঁড়ালকে বলল,—"দেখুন মঁসিয়, শিল্পী মানুষ তো! ও যদি ছবি আঁকতে না পারে তো ভীষণ অসুখ-বিসুখে পড়বে। এমন কি টেঁসেও যেতে পারে—"

বলে, আমার পিঠে হাত রাখল। মৃদু চাপ দিয়ে আবার বলতে লাগল,

—"আপনি কি মেঝে নোংরা হবে বলে এ কথা বলছেন?"

চাঁড়ালমশায়ের খিটখিটে মুখে বেমানান একটি হাসির দাগ পড়ল,—"হাঁ মশায়। এখানে দু'জন ইণ্ডিয়ান পেইন্টার থেকে গেছে। ঘর এমন নোংরা করে রাখতো, বলবার নয়। ওপরঅলার কাছে কথা শুনতে হয়েছে আমাকে।"

জর্জ সঙ্গে সঙ্গে বললে,

—"কিচ্ছু ভাবরেন না, মঁসিয়। আমার বন্ধুটি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শিল্পী। তাছাড়া মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে ঈজেলে পেইন্টিং করবে, এক বিন্দু রঙ-ও কোথাও লাগতে পারবে না, দেখবেন।"

শুনে তো আমার হয়ে গেছে। নিজের পয়সায় কার্পেট বা ঈজেল জীবনে কিনি নি। আর, এখন পকেটের যা অবস্থা, ভাবাই যায় না। জর্জকে এক্ষুনি সে কথা বলা উচিত কিনা বুঝতে পারছি না।

চাঁড়াল বলল,—

—"ঠিক আছে। একটু সাবধানে রং-চং নিয়ে ঘাঁটলে কোনো অসুবিধে নেই। দেখবেন, ওপরঅলার কাছে আবার যেন আমাকে জবাবদিহি করতে না হয়!"

দোতলার বাইশ নম্বর ঘরের চাবি ঘুরিয়ে ঢুকতেই জর্জ একেবারে যাকে বলে গিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাঁদিকের গদিওয়ালা এবং মেরুন চাদরে ঢাকা বিছানায় বসে দুলে দুলে বলল,

—"খাসা ঘর, ইণ্ডিয়ান। প্রচুর আলো। গরম জলের পাইপ লাগানো গরম ঘর। শীত শেষ হলে পাশের দরজা খুলে বারান্দায়ও দাঁড়াতে পারবে—"

বাধা দিয়ে বললুম,

—"সে সব তো হল। কিন্তু মশায় ছবি আঁকবো কি করে? তুমি তো লম্বা চওড়া বলে এলে তাপি, শভালে—! কোত্থেকে আমি এখন ওসব যোগাড় করব বলো তো?"

পরদিন বিকেলেই চেনা একটি ঈজেল এবং সেই রং-লাগা কার্পেট নিয়ে এল জর্জ।

আঁতকে উঠলুম,

—"একি! এ তো জানীর আতেলিয়ে থেকে নিয়ে এসেছো! ও কি করবে? ছবি আঁকবে কি করে?"

মেঝের ওপরে কার্পেট বিছিয়ে এক গোঁফ হাসল ফরাসী ভাস্কর। হাতে হাত ঝেড়ে বলল,

—"ব্যস্! এক ফোঁটা রঙও লাগবে না ঘরে। মঁসিয় শাজালও আর তোমার ছবি আঁকার জন্যে বকুনি খাবে না কোথাও।"

প্রশ্নের জবাব না পেয়ে আবার বললুম,

—"কিন্তু জানী ছবি আঁকবে কি করে?"

ঈজেলটি খুলে কার্পেটের ওপর দাঁড় করিয়ে জর্জ বলল,

—"এ পাশের দেওয়ালে একটা বড় ব্রাউন কাগজ সেঁটে দিও, তাহলেই একেবারে নিশ্চিন্ত মনে রং ছেটাতে পারবে।"

কথার উত্তর পাচ্ছি না বলে মনে মনে রাগ হচ্ছে। বুঝতে পারছি, ও আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছে। এই দুটি জিনিস পাওয়াতে খুশি যে হই নি তা নয়। তবু, সেই খুশি ছাপিয়ে জিজ্ঞাসার চিহ্নটি বড় হয়ে যাচ্ছে। বেশ গম্ভীর গলায় জানিয়ে দিলুম,

—"দ্যাখো জর্জ। তুমি এ দুটো নিয়ে এসেছো বলে ধন্যবাদ। কিন্তু, আমার প্রশ্নের জবাব যদি না পাই, তাহলে আমি এগুলো ব্যবহার করতে পারব না।"

দুষ্টুমির হাসিমাখা জর্জ জিজ্ঞেস করলে,

—"আজ পর্যন্ত জীবনে সব প্রশ্নের জবাব কি তুমি ঠিকঠাক পেয়ে গেছো, শিল্পী?"

—"দ্যাখো জর্জ, বড় বড় কথা শুনতে চাই না। শুধু বলো, তুমি ওই দরকারী কার্পেট-ঈজেল আমার জন্যে নিয়ে এলে কোন্ আক্কেলে? জানী কি করবে?"

হোহো করে হেসে ফেলল জর্জ। বলল,

—"ইণ্ডিয়ান, তোমার বড় অহংকার! ভালো। সেইজন্যেই বোধহয় তোমাকে আমাদের অ্যাতো পছন্দ!"

এর মধ্যে অহংকারের কি দেখল ও-ই জানে। একটু থেমে আবার বলল,

—"দ্যাখো ভায়া, তোমার জিজ্ঞাসার জবাব এখন একটাই দিতে পারি—জানি ছবি আঁকবে এবং প্যারিসে এখনো তোমার চেয়ে আমরা বড়লোক।"

বলেই আবার হাসি। শব্দ ছড়িয়ে হাসি। ওর সেই প্রচুর হাসির পর্দা সরিয়ে দেখবার প্রয়োজন মনে করি নি। পর্দার ওপাশে, আড়ালে যে নিরানন্দ, তাঁর কিছুই টের পাই নি সেদিন। এখন ভাবছি কি বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছিলুম,

—"জানীকে বলেছো?"

হাসতে হাসতেই ওর জবাব,

—"বলেছো মানে। আঁদ্রে শাজালের সাবধানবাণী শোনাতে ও নিজেই বললে,—আমার কার্পেট আর ঈজেল ইণ্ডিয়ানকে দিয়ে দাও।"

পৃথিবীতে অনেক ভাষা আছে তো, বউ! কিন্তু, কোনো ভাষাতেই মনের সব সময়ের সব কথা গুছিয়ে বলা যায় না। অক্ষমতার জন্যে নিজের ওপরেই রাগ হয় কখনো কখনো। যেহেতু, সেদিন শুধু আপন বন্ধুভাগ্য নিয়েই তৃপ্ত ছিলুম, যাকে বলে গিয়ে সেই, 'কৃতজ্ঞতা টলটল' করছিল ভেতরে, তাই, কোনো রকমে আধা ফরাসী, আধা ইংরিজিতে জর্জকে বলতে পেরেছিলুম,

—"উড়ো জাহাজে কেনা একটু হুইস্কি আছে। খাবে ?"

জর্জ খায় নি। ওর সঙ্গে বহুদিন দেখাও হয় নি তারপর।

ঈভলীন বলল,

—"তোমার ঈজেল তো তিন পায়ে খাড়া। ছবি আঁকতে আরম্ভ কর নি এখনো ?"

ওর দিকে ফিরে তাকালুম। খাটের ওপরে পা তুলে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছো। চোখে পলক পড়ছে না তোমার। চুল দেখলেই বোঝা যায়, ভেজা ভেজা। ওভারকোট খুলে ঝুলিয়ে রেখেছিলে ঘরে ঢুকেই। হলুদ সোয়েটারে জড়ানো উন্নত ভরাট দুই বুকের দিকে চোখ পড়তেই খেয়াল হল, না বউ, এ তুমি নও। এর দিকে হঠাৎ তাকালেই মাম্‌দোবাজীর মতো চোখে ধোঁকা লেগে যায়। এর নাম ঈভলীন। এর চোখ পেতে বসে থাকা, ঠোঁটের কোণে পাতলা হাসি আমার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে। খাটের অন্য কোণে বসেছিলুম। উঠে দাঁড়ালুম। ঘরের লাগোয়া বেসিনের কাছেই তোয়ালে। মোটামুটি চেহারা ভদ্র আছে এখনো। সেই যে দেশে ধুইয়ে দিয়েছিলে, তারপর আর কাচা হয় নি। তুমি তো নাকে আঁচল চাপা দিয়ে বসে গেলে। বিশ্বাস করো বউ, তেমন উৎকট গন্ধ কিছু জমে নি ওতে। শীতের দেশ তো! ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললুম,

—"মাথাটা মুছে নাও। সর্দি লেগে যাবে।"

ও হাসল। বলল,

—"আমি গরম দেশ থেকে আসি নি, শিল্পী। এমন শীতে-বৃষ্টিতে ভেজা আমার অভ্যেস আছে।"

খুব আলতো হাতে তোয়ালে চেপে চেপে চুল মুছলো। বলল,

—"তবু তোয়ালেটি দেবার জন্যে, আমার ভেজা চুলের কথা মনে রাখার জন্যে ধন্যবাদ জানাই।"

কি চায় আমার কাছে মেয়েটি! কিছু একটা ওর চাই, সে আমি এই কয়েক ঘণ্টায় বুঝতে পেরে গেছি। 'প্রথম দরশনেই পেরেম', না শরীর। বিবাহিতা

মানেই যে সেই মহা-স্‌সতী—এ ধারণা আমার অনেককাল আগেই ঘুচেছে। তাহলে তো বলতে হয়, ওর যে কোনো পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গেই ওর সম্পর্ক। যিশু আছে, লিয়ঁ, দেনিস—।

দরজায় টোকা পড়ল। মাথা মুছতে মুছতে চোখ তুলে তাকালো ঈভলীন। টেনে দরজা খুলতেই গোবিন্দ। কলকাতার গোবিন্দ চৌধুরী। আমার থেকে দু' বছরের সিনিয়র ছিল। কমার্সিয়াল আর্টের ছাত্র। ফাইনাল ইয়ারে দু'বার গুঁতো খেয়েছে। কলেজ থেকে একই বছরে বেরিয়েছি আমরা। প্রথম প্রথম একটু 'দাদাগিরি' ফলাতে চাইতো, পরে সোজা হয়ে গিয়েছিল। পুরুষদের সঙ্গে বলতে গেলে মিশতোই না। কথ্য ভাষায় যাকে আমরা 'মেয়েন্যাকড়া' বলি, কলেজের বন্ধুদের মধ্যে ওর নামও সেই ধরনের কি একটা ছিল। মেজোঁতে আসার পর দিন দুয়েক যেতে না যেতেই ওর সঙ্গে দেখা। সিতের ক্যান্টিনের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। বেলা প্রায় একটা। আমার আগে জনা পনেরো। 'পাসাজে' হিসেবে খাবার কুপনের দাম পাঁচ ফ্রাঁ। সিতের বাসিন্দাদের তিন এবং ছাত্র হলে তো আরো কম। কুপন হাতে লাইনের সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছি। দরজার কাছে লালমুখো হোঁৎকা ফরাসী। কুপন ধরিয়ে দিলুম হাতে। আগের ক্ষুধার্তরা সাজানো কাউন্টার থেকে থালা, ছুরি-কাঁটা, নানান পদের রান্না তুলে নিতে নিতে এগোচ্ছো। ডানপাশে অল্প দূর অবধি ইস্পাতের রেলিং পেরিয়ে বিশাল হলঘর। কয়েক শো মেয়েপুরুষ টেবিল জুড়ে বসে খাচ্ছে, আড্ডা মারছে। টুংটাং ছুরি-কাঁটার শব্দ। প্রথমে খালি থালা তুলে নিলুম হাতে। ছুরি-কাঁটা পর্যন্ত পৌছোবার আগেই হঠাৎ সারা হলঘর জুড়ে একটা আওয়াজ উঠল। জোরে জোরে থালা পেটানোর শব্দ এবং প্রথমে অগোছালো, পরে সমবেত গলায় চিৎকার,

—"শাপো—ও—ও! শাপো—ও—ও—"

পাশ ফিরে তাকাতেই পটাপট কয়েকটা বাগেৎ পাঁউরুটির টুকরো আমার নাকেমুখে এসে লাগলো। আরো আসছে ঢিলের মতো। হলসুদ্ধু সকলের চোখ দেখি আমার দিকে। হাসি, হইহই, আর সব শব্দ ছাড়িয়ে দুয়ো দেবার ধরনের আওয়াজ,

—"শাপো—ও—ও"

শব্দটি চেনা-চেনা ঠেকছে। অথচ, ঠিক ধরতে পারছি না, কী ব্যাপার! সে এক বিতিকিচ্ছিরি অপ্রস্তুত অবস্থা। ন যযৌ ন তস্থৌ দাঁড়িয়ে বাগেৎ খাচ্ছি। এখানে 'খাচ্ছি' মানে; ওরা অনেকেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ইট-পাটকেলের

মতো পাঁউরুটির টুকরো ছুঁড়ে দিচ্ছে আমার দিকে টিপ্ করে। কিছু আমার গায়ে মাথায় লাগছে, কিছু এদিক ওদিক্ পড়ছে। এক মুহূর্ত আপন ছোটো মনের ভাবনায় এল, গরিব দেশের লোক বলে রুটি ছুঁড়ে ঠাট্টা করছে না তো? পর মুহূর্তেই বুঝলুম, অসম্ভব। এই ক্যান্টিনে এখন পৃথিবীর বিয়াল্লিশটি দেশের লোক্ একসঙ্গে বসে খাচ্ছে। যতই হোক, মানুষ অ্যাতো নীচ কখনোই হতে পারে না। তাহলে কি ব্যাপার! ঠাহর পাচ্ছি না কিছুই। আতঙ্ক, রাগ, লজ্জা সব মিলিয়ে মিশিয়ে এক হতভম্ব মানসিক অবস্থার মধ্যে কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল।

—"শাপো—ও—ও" ধ্বনিতে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়, ঘাড়ের কাছে পেছন থেকে ইংরিজিতে প্রশ্ন শুনলুম,

—"ফরাসী বোঝেন না বুঝি?"

চমকে ফিরে তাকাতেই তাজ্জব বনে গেলুম। ঠিক পেছনেই কলেজের গোবিন্দ। শ্রীমান গোবিন্দ চৌধুরী। এক বিন্দু পাল্টায় নি চেহারা। টেলিফোনের মতো ঘোর কালো মুখে চ্যাপ্টা নাক। নাকের নিচে এক ফালি গোঁফ থাকা সত্ত্বেও চামড়ার রঙের সঙ্গে ক্যামুফ্লাজ হয়ে বোঝবার উপায় নেই। সাদা জামা-কাপড় পরে ওকে হাঁটতে দেখলে করুণাময় বলতো,

—"অই যে, ছবির নেগেটিভ হেঁটে আসছে!"

সামান্য পাক ধরেছে দু'পাশের পরিপাটি আঁচড়ানো চুলে। তাছাড়া, তেমন কোনো পরিবর্তন হয় নি। এক পলক দেখেই চিনে ফেলা যায়। গোবিন্দও চিনেছে আমাকে। বলল,

—"ওমা, তুমি! কি কাণ্ড!"

ওদিকে শাপো-শাপান্ত চলছে। লাইনে আমার ঠিক পরে থাকার জন্যেই বোধহয় টিপ ফস্কে এক টুকরো রুটি লাগল গোবিন্দর গালে। ওকে দেখে, থই পেয়ে, 'ব্যাপার কি' জিজ্ঞেস করবার আগেই চাপা দ্রুত গলায় ও বললে,

—"শিগ্গীর—টুপি খুলে ফ্যালো!"

সড়াৎ করে মনে পড়ে গেল টুপির ফরাসী প্রতিশব্দ হল, শাপো। আমার মাথায় সেই ধুমসো 'কসাক' টুপি। বাইরের শীতে-বৃষ্টিতে প্রায় সবাই টুপি মাথায় দিয়ে ক্যান্টিনে এসেছে। হলঘরে ঢোকবার আগে খুলেও ফেলেছে প্রত্যেকে। আমার খেয়াল হয় নি। একটু বাদেই হয়তো খুলে ফেলতুম। কিন্তু, আমার মাথায় টুপি থাকলে কার কি অসুবিধে ঠিক বুঝতে পারছিলুম না। গোবিন্দকে পরে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলুম, এখানকার রেওয়াজই নাকি এই রকম। টুপি

মাথায় ক্যান্টিনে কেউ ঢুকে পড়লেই এমনি সমবেত ফরাসী প্যাক খেতে হয়। তাছাড়া কোনো বাড়িতে, পার্টিতে মাথায় টুপি পরে থাকলেই অন্যদের অসম্মান দেখানো হয়। তাই, ভদ্রতা বা শালীনতাবিরুদ্ধ। শুনে, মনে পড়ল পাঞ্জাবের সর্দারজীদের পাগড়ী। ধর্ম দিয়ে বাঁধা। সিতের ক্যান্টিনে পাগড়ী মাথায় পাঞ্জাবী কেউ ঢুকে পড়লে কি হবে বলা যায় না। একদিকে ধর্ম, অন্যদিকে সমবেত জনতার অসম্মান। দেশে দেশে ধর্ম-সম্মানের নানান্ খেলা এইরকম।

এককালে নাটক-টাটক করতুম কলেজে থাকতে। 'স্টেজ ফ্রাইট্' ব্যাপারটি, বলতে গেলে, আমার ছিল না। রঙ্গমঞ্চে ভুলচুক হয়ে গেলে হাজার চোখের সামনেও নিজেকে সামলে নিতে পারতুম। এখানেও গোটা ঘটনাটি বুঝে ফেলতেই সঙ্গে সঙ্গে টুপিটি ডান হাতে তুলে নিলুম। বাঁ হাতে খাবারের খালি থালা ছিলই। দু'হাত ওপরে তুলে ধরলুম। হাসি মুখ করে টুপি এবং থালা নাড়তে লাগলুম নাটকীয় ভঙ্গিতে। মন্ত্রের মতো কাজ হল। রুটি ছোঁড়া বন্ধ হল। শান্ত হল 'শাপো'। যারা দাঁড়িয়ে ছিল, সবাই একে একে বসে পড়ে হাসতে লাগলো। হাততালি এবং হাসির শব্দ উঠল চারপাশে। গোবিন্দ বললে,—"শাবাশ! এখনো দেখি তোমাদের সেই যাত্রাটাত্রা ভোলো নি হে!"

সেই গোবিন্দ দরজার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে প্রথমেই ঈভলীনকে দেখে নিল। জিজ্ঞেস করল,

—"আসতে পারি?"

গত মাসখানেক ও আমাকে বেশ খাতির-টাতির দেখিয়েছে। দু'টো গেলাস, একজোড়া কাপ-ডিশ, একটি সসপ্যান্ এবং ঘরে বসে চা-কফি করবার জন্যে একটি ছোট্ট ইলেকট্রিক হীটার ধার দিয়েছে। পরে শুনেছিলুম এই ধার দেওয়ার সংবাদ গোটা মেজোঁর বাসিন্দা, মেথরানী থেকে শুরু করে ম্যানেজার পর্যন্ত জেনে গেছে। কোত্থেকে এক স্কলারশিপ বাগিয়ে বছর দুয়েক ধরে একোল-দ্য-বুজার্টে কমার্সিয়াল কাজ শিখছে গোবিন্দ। তাছাড়া, যকৃৎ ফুসফুস্ এবং ক্ষুদ্র অন্ত্রের কিসব জটিল রোগের চিকিৎসাও করাচ্ছে সরকারী পয়সায়। কলেজে থাকতে দরোয়ানের হাতে বানানো খৈনী খেতো গোবিন্দ। আর খেতো পান। এক শো বিশ জাফরানী জর্দা এবং দোক্তা মিশিয়ে।

জিজ্ঞেস করেছিলুম,

—"এখানে ওসব খেতে পাও?"

কালো ঠোঁটের ফাঁকে দাগী দাঁতে লাল জিভ কামড়ে ধরেছিল—"পাগল! ওসব ছাড়তে হয়েছে। ভেতরে অনেক গোলমাল।"

—"কোনো নেশা করছো না?"

একটু চুপ থেকে বলেছিল,

—"না তেমন কিছু না। মাঝেমধ্যে এক-আধটা সিগারেট কেউ দিলে, খেয়ে ফেলি। অথবা, সিগারেটের তামাক ঠোঁটের ভেতরে তলায় মাড়ির কাছে চেপে রাখি। ইলিউশন!"

অনেক চালাক-চতুর হয়ে গেছে গোবিন্দ। সেই 'মেয়ে-ন্যাক্‌ড়া' ভাব আর নেই। কাজ চালানো ফরাসী শিখে ফেলেছে দু'বছরে। মিশেল নামে রোগা একটি ফরাসী ললনার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। অথবা, মিশেল নামে রোগা মেয়েটি ওর সঙ্গে ঘোরে।

বললুম,

—"এসো। ভেতরে এসো।"

ঢুকেই ঈভলীনের দিকে চোখ রেখে বিলিতি কায়দায় মাথা নোয়ালো। ঈভলীন ভেজা-চুলে তোয়ালে চেপে মৃদু হাসল। বললুম,—"মাদাম ঈভলীন দ্যুপঁ।"

'মাদাম' শব্দটিতে যেহেতু বিবাহিত মহিলা বোঝায়, সেই জন্যেই একটু জোর দিয়ে উচ্চারণ করলুম বোধহয়। আপনা থেকেই। ঢিপঢিপ বুকের ভেতরে, সত্যি বলছি বউ, অবচেতনে কোথাও ঈভলীনের এই চোখ পেতে বসে থাকা আমার ভালো লাগতে শুরু করেছে। অন্তত, গোবিন্দর সেখানে কোনো অধিকার নেই! ওকে দেখিয়ে ঈভলীনকে বললুম,

—"গোবিন্দ চৌধুরী!"

তোয়ালেটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ঈভলীন ভুরু কুঁচকে বললে,

—"কি বললে, মঁসিয় শোধরি?"

এখানে গোবিন্দর পদবী নড়ে চড়ে 'শোধরি' হয়ে গেছে, বউ। ওর বান্ধবী মিশেলও ওকে 'শোধরি' বলে ডাকে।

পেছন ফিরে দরজার বাইরে তাকিয়ে গোবিন্দ ডাকল,

—"আঁত্রে মিশেল!"
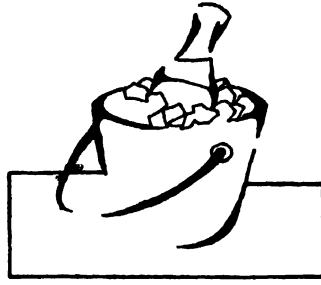
রোগা, ফর্সা, বিষণ্ণ একটি মুখের নাম মিশেল। বাদামী চুলে ঘেরা সাদামাটা, রুক্ষ অথচ সুশ্রী মুখের নাম মিশেল। গোবিন্দর সঙ্গে যেভাবে নাটকীয় পটভূমিকায় আমার দেখা হয়েছে এখানে, প্রায় সেই রকম, না, ঠিক সেই রকম নয়, তার চেয়ে বেশি অবাস্তব পরিবেশে ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।

মেজোঁর এক তলায় রিসেপশনের সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে দুটি সেণ্টার টেবিলে পত্রপত্রিকা পড়ে থাকে। চারপাশের সোফায় বসে এখানকার বাসিন্দা বা তাদের অতিথিরা গপ্পো-সপ্পো করে। দু'দিকে কাচের দেওয়ালের ওপারে রাস্তা এবং সিতের অন্যান্য কয়েকটি বাড়ি দেখা যায়। ওখানে বসে বসেই কয়েকদিন সময়ে অসময়ে মিশেলকে যেতে আসতে দেখেছি। সোজা তিন তলায় গোবিন্দর ঘরে চলে যায় অথবা ওখান থেকে ফেরত আসে। সাধারণত, মিশেল সঙ্গে থাকলে গোবিন্দ আমার কিংবা অন্য কারুর সঙ্গেই বিশেষ কথা বলে না। চোখাচোখি হলেও এড়িয়ে যায়। একদিন সামনাসামনি পড়ে যেতে শুধু নামটুকু বলে সরে পড়েছিল। মিশেলও খুব একটা আগ্রহ দেখায় নি, আমিও নির্বিকার।

সেদিন শনিবার। জাপানী হাউসে 'বুম্' ছিল। এই 'বুম্' শব্দটি কোত্থেকে এলো, আমি জানি না, বউ। শুধু শুনেছি, মাঝে মধ্যে ছুটি-ছাটার আগের দিন অমুক হাউসে 'বুম্'। ব্যাপারটা কি জানবার ইচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর। আমার পাশের ঘরে ফিরোজ থাকে। মরিশাস দ্বীপের ছেলে। মরিশাসের মোদ্দা ভাষা ফরাসী। পাসপোর্টে ছাপ মারা 'গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া'। বিষয়টি মজার এবং জটিল। এইসব জটিলতার মধ্যে ঢুকতে না চাইলেও ফিরোজের সঙ্গে ভাব জমতে দেরি হয় নি। মেজোঁর ব্যক্তিগত ক্যান্টিনে সন্ধ্যে আটটা থেকে বীয়ার খাচ্ছিলুম। এই ক্যান্টিনটি চালায় মেজোঁর বাসিন্দারাই। সিতে ইউনিভার্সিতারের সরকারী খাবার ক্যান্টিন সন্ধ্যে আটটাতেই বন্ধ হয়ে যায়। মেজোঁর

আপন রেস্তোরাঁ খোলে ঠিক সেই সময়। পাওয়া যায় ডিমের অমলেট এবং বীয়ার। চা, কফি এবং কোকাকোলা। কখনো সখনো দিশি মতে পুলে-অ-কারী অর্থাৎ কিনা মুর্গির ঝোল। সঙ্গে সেদিন ভাতও পাওয়া যায়। ঝোলভাতের সন্ধ্যেগুলি আমাদের কাছে প্রায় উৎসবের সামিল। রাত বারোটা অবধি খোলা থাকে রেস্তোরাঁ। বাইরের তুলনায় বীয়ারের দামও খুব কম এখানে। এক ফ্রাঁতে পাইট। অমলেট এবং কয়েক পাইট বীয়ারে রাত এগারোটা বাজিয়ে দিয়েছি। ফিরোজ এসে হাজির। বীয়ার নিয়ে আমার টেবিলে বসল। জিজ্ঞেস করল,

—"কি শিল্পী, সারাক্ষণ কি ভাবো বলো তো?"

হেসে বললুম,

—"ভাবি না কিছুই। আসলে ভাবার চেষ্টা করি।"

—"কি ভাবার?"

—"ভাবনা!"

দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠলুম। ফিরোজের দাঁতগুলি সব হলদে ছোপ ধরা। কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে বয়েস। লম্বা, ফ্যাকাসে মুখে ফরাসী-কাট দাড়ি। রোগা, লম্বা শরীরে সারাক্ষণ ছটফটে ভাব। পা নাচাতে নাচাতে জিজ্ঞেস করল,

—"বুমে যাচ্ছো নাকি?"

—"ব্যাপারটাই ঠিক বুঝি না। যাই নি তো এখনো কোনো বুমে। আজ কোথায় হচ্ছে।"

চোখ গোল করে ফিরোজ বললে,

—"মেজোঁতে তো মাসখানেকের ওপর হয়ে গেল। এখনো বুমে যাও নি! বল কি হে! চলো আজকে আমার সঙ্গে! আমি তো বীয়ারটা মেরেই যাবো!"

তারপর বিজ্ঞের মতো মাথা দুলিয়ে বললে,

—"শিল্পী মশায়, ভাবনা-চিন্তা-কল্পনার ফাঁকে ফাঁকে হৈ-হুল্লোড় ঢুকিয়ে দাও, মনটা একেবারে তাজা হয়ে থাকবে।"

হেসে বললুম,

—"তা তো বুঝলুম। কিন্তু ঘটনাটি হচ্ছে কোথায়?"

—"বাহ্। রিসেপশানে পোস্টার ছাখো নি। জাপানী হাউসে। দারুণ বুম্ আজকে।"

—"গচ্চা কত যাবে?"

—"তিন ফ্রাঁ লাগে। সে দেখা যাবে'খন! চলোই না আগে।"

—"কিন্তু, অ্যাতো রাত্রে কি ঢোকা যাবে?"

—"দুদ্দুর। সবে তো শুরু হয়েছে। শেষ হতে সেই ভোররাত।"

আরো এক এক পাঁইট হাতে নিয়ে মেজোঁ থেকে বেরিয়ে এলুম দু'জনে। গায়ে বর্ষাতি নেই, ওভারকোটও নয়। খালি মাথায় ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি নিয়ে হাঁটতে লাগলুম। শীত ছিল কন্‌কনে। ভেতরে অ্যালকোহলের গরমে বাইরের ঠাণ্ডা টেরই পাই নি। দাঁতে কামড়ে বীয়ারের বোতলটি খুলে ফেলল ফিরোজ। এগিয়ে দিল আমার দিকে। আমার পাঁইটটি ওকে দিয়ে দিলুম। দু'জনে বীয়ার খেতে খেতে পৌঁছে গেলুম জাপানী হাউসে।

ব্যাপারটা আসলে কিছুই নয়। পুরুষ-মেয়েরা জড়াজড়ি করে আধো-অন্ধকারে উর্ধ্বশ্বাস নেচে চলেছে। বুম্। চারপাশে, বাইরের দেওয়ালে হাতে-লেখা পোস্টার বুম্। রেকর্ডের পরে রেকর্ড পালটে নানান তালের বাজনা, গান হচ্ছে। মেজোঁর কয়েকটি ছেলের পরিচিত মুখ অস্পষ্ট অন্ধকারে দুলতে দেখলুম। কোন্ মেয়ের সঙ্গে যে ফিরোজও হঠাৎ নাচের ভিড়ে হারিয়ে গেল টের পেলুম না। ভূতের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ করে দিলুম বোতলটি। ভালো লাগছিল না। সঙ্গে একটা মেয়ে থাকলে হয়তো এই ঝাপসা প্রাগৈতিহাসিক আলোয় তালে-বেতালে দাপাদাপি করে সময় কেটে যেতো। কিন্তু একলা দাঁড়িয়ে এসব দেখতে ভালো লাগছে না। বেরিয়ে এলুম হলঘর থেকে। বীয়ারের চাপে তলপেট ফেটে যাচ্ছে। কোথায়-দাঁড়াই-কোথায়-দাঁড়াই করতে করতে গেটের সামনে পৌঁছে দেখি, মাতাল কপোতীকে সামলে বুম্ নাচের দিকে টানবার চেষ্টা করছে এক কপোতকুমার।

জিজ্ঞেস করলুম,

—"টয়লেটটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?"

জবাব দেবার মতো অবস্থা কপোতীর ছিল না। কপোতও প্রথমে শুনতে পায় নি বোধ হয়। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে বলল,

—"দোতলায়।"

উফ্ আবার ঠেঙিয়ে দোতলায় উঠতে হবে। বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে জাপানী বাড়ির দেওয়াল ধসাবো কিনা ভাবছি, কপোত আবার বললো,

—"উঠে বাঁদিকে, সিঁড়ির গায়েই।"

সিঁড়ি গুনে গুনে খেই হারিয়ে ফেলে দোতলায় পৌঁছোনো গেল। বাঁদিকে

ঘুরে পাঁচ-পা হাঁটতেই বাথরুম। ঢুকে পড়লুম। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঠিক মেজোঁর মতোই ডানহাতে তিনটি পেচ্ছাবের জায়গা। তারপর মুখ-হাত ধোয়ার বেসিন। দেওয়ালের সুইচ বার তিনেক টেপাটিপি করেও কাজ হল না। লম্বা করিডোরের আলো হালকা হতে হতে বাথরুমে যতটা নাক গলিয়েছে তাতেই চোখ সয়ে গেল। ভেতরের দিকে একটু এগোতেই হঠাৎ একটি ছায়ামূর্তি দেখে চমকে প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম, খুব জোর সামলে নিয়েছি। চোখ রগড়ে দেখি, একটি মেয়ে আমার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। মোটামুটি নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে একটি নারী আমার সামনে। মাথার আদিম গুবরেটা মদে ভিজে ছিলই। এখন উঠে হেলেদুলে হাঁটতে শুরু করল। ডানহাত বাড়িয়ে মেয়েটির কাঁধে রাখলুম। সোজা বাংলায় পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দিলুম না। মেয়েটি বললে, ইংরিজীতে বললে,

—"একস্‌কিউজ মি প্লিজ।"

গলার স্বরে আমার সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। মিশেল। গোবিন্দ শোধরির মিশেল। লুকিয়ে একা একা কাঁদছিল বোধহয়। অনেকক্ষণ কান্নায় গলার স্বর ভারী হয়ে এসেছে,

—"আমাকে যেতে দিন, প্লিজ!"

কাউকে একা একা গোপনে কাঁদতে দেখলে কষ্ট হওয়া উচিত। আমার হয়। তার চেয়ে বেশি হয় অসোয়াস্তি। কারণ অপরের কোনো গভীর বেদনায় সান্ত্বনা কিছুতেই দিতে পারি না। অন্যের কষ্টে সমবেদনার অথবা সহানুভূতির কি শব্দ ব্যবহার করা শোভন, মাথায় আসে না। ভীষণ অসহায় লাগে নিজেকে। শারীরিক ব্যথা-ট্যথায় একটা কিছু করণীয় খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু মনের কষ্ট আমার কাছে অসহায় ঘটনার মতো। 'বাবা, বাছা' অথবা 'ছিঃ! কাঁদতে নেই। মা-তো আর কারুর চিরদিন থাকে না,' কিংবা ধরো 'আমি সবই বুঝি দিদি, কি করবে বলো—ভবিতব্য। জামাইবাবুর সময় হয়ে গেছে, ঈশ্বর তাঁর কোলে টেনে নিলেন'—এ সমস্ত অ্যাতো হাস্যকর শব্দ মনে হয় যে, মুখ ফুটে অক্ষরই বেরুতে চায় না। পালাতে পারলে বাঁচি। তুমি কি আমায় নিষ্ঠুর বলবে, বউ? তা বোধহয় নয়। কারণ সেইসব শব্দহীন অথবা ফোঁপানো কান্নায় ভরা মুখ আমি ভুলতে পারি না বহুকাল। ওইসব মুখ আমার চাই না, তবু ওরা সময়ে-অসময়ে ক্যালিডোস্কোপের কাচে ঘুরে ঘুরে আসে। তারকেশ্বর থেকে ফিরতি পথে রেল লাইনের পাশে সেই কচি মুখটি যেমন। আট-দশ বছরের ছেলেটির

রোদে-পোড়া তামাটে মুখটি, কিছুর মধ্যে কিছু নেই, দুম্ করে দেখতে পাই। শনের মতো মাথা ভর্তি চুলে কপাল ঢেকে আছে। চুল ছুঁয়ে বিকেলের গনগনে সূর্য। ঠোঁট দুটির ভেতরে অল্প ফাঁকে অন্ধকার। রেললাইনের পাশে, ধুলোমাখা বিবর্ণ ঘাসের জমিতে, দু'হাতের বেষ্টনীর মধ্যে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। হাঁটুর ওপরে থমথমে মুখ। পলকহীন তাকিয়ে আছে মা অথবা মায়ের মতো কোনো আপনজনের রুগ্ন শরীরের দিকে। ছেঁড়া, ময়লা, পাড়বিহীন শাড়ির আঁচল অল্প অল্প হাওয়ায় উড়ছে। শরীরের ওপরের ভাগ প্রায় নগ্ন এবং রেললাইনের ভেতরে। পেট থেকে পা'দুটি বাইরে ছড়িয়ে আছে। পায়ের আঙুলগুলি কাত হয়ে দশটা ভিখিরী আকাশ দেখছে। পাশে তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের থালা। পৃথিবী নিঙড়ে বিস্ময় সরু জলের ধারার মতো নেমে আসছে ছেলেটির গাল বেয়ে। ছেঁড়া হাফপ্যান্ট, খালি গা দেখেও পয়সা ছুঁড়ে দিতে পারি নি আমি অন্যদের মতো। চারপাশের গোল ভিড় থেকে দৌড়ে পালিয়েছিলুম। আমি কি করতে পারি ! কতটুকু কিংবা কতখানি ভাবতে ভাবতে তিরিশ ছাড়িয়ে চলে এলুম।

এখন এখানে কোনো মৃত্যুশোক নেই নিশ্চয়ই। এই মুহূর্তে মিশেলের ভেতরে কোনো প্রিয়জনের বিয়োগব্যথা ওকে গোপন কান্নার দিকে ঠেলে দিয়েছে, এমন ভাবনা অসম্ভব। নিচে ফরাসী বুমের উত্তাল আওয়াজ ভাসছে। জাপানী বাড়িতে ও কোত্থেকে, কি করে এসে লুকিয়ে কাঁদতে বসেছে, সেইটুকুই ভাবনা এখন। আমার ডানহাত ওর বাঁ কাঁধে রেখে পথ আটকে দিয়েছিলুম। ও ইচ্ছে করলে সামান্য ঠেলা দিয়ে আমার হাত সরিয়ে বেরিয়ে যেতে পারতো এই আধো-অন্ধকার থেকে। গেল না। মুখ নিচু করে ডান হাতের রুমালে চোখ মুছলো। ক্লান্ত গলায় বলল,

—"আমি যাবো।"

জিজ্ঞেস করলুম,

—"কোথায় ?"

থেমে থেমে, নাক টেনে বলল,

—"নিচে। নিচে যেতে হবে। শোধরি হয়তো আমায় খুঁজছে।"

ঠিক কথা। ওকে দেখলেই গোবিন্দ ঢুকে পড়ে মাথায়। মিশেলকে একলা, দেখার অভ্যেস নেই। জিজ্ঞেস করলুম,

—"শোধরি কোথায় ?"

—"নিচে। এক তলায় নাচছে।"

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'কাঁধে হাত রাখলুম। ও তখনো মাথা নিচু করেই আছে। খাদে গলা নামিয়ে জানতে চাইলুম,

—"কিন্তু, তুমি কাঁদছিলে কেন ?"

চুপ করে রইল। কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে আন্তরিক গলায় আবার বললুম,

—"শোধরির সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া হয়েছে নাকি ?"

নাক টেনে, আর একবার রুমাল দিয়ে চোখ মুছলো। খুব অস্পষ্ট গলায় বলল,

—"তোমার বন্ধু সবার সামনে আমাকে যা তা ভাবে অপমান করে।"

গোবিন্দ আমার বন্ধু কোনোকালেই নয়। সে কথা না তুলে জিজ্ঞেস করলুম,

—"কেন, কি বলেছে শোধরি ?"

তাড়াতাড়ি সামলে নিল। আমার ডানহাত ওর কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল আল-গোছে। বলল,

—"ও কিছু না। আমি যাই। ও যদি খুঁজতে এসে আমাদের দু'জনকে এখানে, এভাবে দেখে ফ্যালে তো রক্ষে থাকবে না আমার।"

বলে কি বিদেশিনী ! গোবিন্দর মতো একটা মেয়ে-ন্যাকড়ার আতঙ্কে অস্থির। কৌতূহল বেড়ে গেল। বললুম,

—"শোধরি কি বলেছে না বললে তোমাকে ছাড়ব না মিশেল।"

এইবার মুখ তুললো। তুলে আমার দিকে তাকালো। করিডোরের যেটুকু আলো বাথরুমের মধ্যে ছড়িয়ে আছে তাতেই দেখলুম, চোখ দুটি কান্নায় লাল। ফর্সা মুখে গোলাপী ঠোঁট। ঠোঁটের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলুম। আলতো হাতে সরু চিবুক তুলে ধরতেই দেখতে পেলুম পরিষ্কার। বাঁদিকে ঠোঁটের কোণে ছোট্ট তাজা কেটে যাওয়ার দাগ। বেসিনে বোধহয় কাটা জায়গাটা ধুচ্ছিল মিশেল, তখনই আমি ঢুকে পড়েছি। দাগের ভেতরে চিনচিনে রক্ত জমছে আবার। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে চেপে ধরলুম। খুব দ্রুত গলায় জিজ্ঞেস করলুম,

—"শোধরি কি তোমাকে মেরেছে নাকি ?"

মাথা নিচু করে কান্না চাপতে চেষ্টা করল মিশেল।

আমার বা আমাদের পছন্দের খাতায় গোবিন্দর নাম কোনোদিনই ছিল না। দাদাগিরি ফলাবার চেষ্টা করতো বলে মনে মনে বেশ অপছন্দই করতুম ছেলেটাকে। সব মিলিয়ে মিশিয়ে এই মেয়েটির ঠোঁটের কোণে রক্ত দেখে দপ্‌ করে খুন চেপে

গেল মাথায়। শালা ভেবেছে কি। একটি নিরীহ বিদেশিনীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছিস কর, তাই বলে গায়ে হাত তুলবি।

মিশেল যখন আমার প্রশ্নের জবাবে 'না' বলল না, বুঝলুম, আমার ধারণাই ঠিক। তবু, পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হবার জন্যে আবার জিজ্ঞেস করলুম,

—"ও তোমার গায়ে হাত তুলেছে?"

আমার গলার স্বরে খানিকটা রাগ নিশ্চয় ছিটকে বেরিয়ে গেছে। চোখ মুছে তাড়াতাড়ি মুখ তুললো মিশেল। বলল,

—"প্লীজ ওকে কিছু বলতে যেও না।"

ওর কথার জবাব না দিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালুম। পেটে মদ থাকলে শাহেনশা হয়ে যাই। চারপাশের সবাই বশম্বদ প্রজা মনে হয়। প্রজাপালন শাহেনশার কর্তব্য। প্রজাদের মধ্যে অন্যায় দেখলে সহ্য করা উচিত নয়। আর, সবচেয়ে বড় কথা, শাহেনশা রেগে গেলে মাথায় রক্ত দপ্‌দপ্‌ করে। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসছিলুম, পেছনে জ্যাকেটে টান পড়ল। বললুম,

—"এক মিনিট, ঘুরে আসছি।"

—"দোহাই তোমার, ওকে কিছু বলতে যেও না!"

গলা শুনেই মনে হল, ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে মিশেল। ফিরে তাকালুম। ঠিক তাই। চোখে-মুখে কান্নার ভাব কমে গিয়ে ভয় ছড়িয়ে পড়েছে।

আমার হাত ধরে অনুনয়ের গলায় বলল,

"শোধরির কাছে যেও না এখন। আমার কথা কিছু বলতে হবে না। প্লীজ।"

অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি ব্যাপার! কি বলছো তুমি আমার মাথায় ঢুকছে না। শোধরি তোমাকে অপমান করেছে। গায়ে হাত তুলেছে লোকের সামনে। কেটে গেছে ঠোঁটের কাছে তোমার—অথচ কিছুই ওকে বলবো না!"

রুমাল দিয়ে ঠোঁটের কোণ চেপে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে আছে মিশেল। ছলছলে চোখের দিকে চেয়ে গোবিন্দর একটা দাঁত ফেলে দিতে ইচ্ছে করলো। নাক টেনে মিশেল বললে,

—"ও তো প্রায় রোজই হয়!"

বলে কি বিদেশিনী! কলকাতার কেলোভূতটা রোজ ওকে মারধোর করে নাকি? আমাদের দেশের বউ-মারা সেই বস্তির ছোটোলোকদের মতো। গোবিন্দ শিল্পী হলো কি করে। তিনবারেই বা পাস করলো কি করে শিল্পী হিসেবে। কানে

কানে পরশুরাম বলে দিলেন—অয় অয়, জানতি পারো না! সত্যিই অনেক কিছু জানতে পারি না, বুঝতে পারি না। কোনো কথা যোগায় না তাই। চুপ করে চেয়ে থাকি মুখের দিকে।

মিশেলই চোখ নামিয়ে আবার আস্তে আস্তে বলল,

—"আজকে নেহাত সবার সামনে ওইভাবে হাত তুললো, তাই ঠিক সামলাতে পারলুম না। তা ছাড়া, ঠোঁটের কোণে জ্বালায় টের পেলুম রক্ত পড়ছে। তাই, লুকিয়ে চলে এসেছি এখানে।"

ওরে শালা, শুয়োরের বাচ্চা, তোর অমন কালো কপালে এমন নিরীহ, ভালোমানুষ মেয়ে জুটলো কি করে! মিশেল অস্পষ্ট গলায় বলছে, শুনতে পাচ্ছি,

—"থ্যাংক ইউ, ইণ্ডিয়ান। আমার মতো সামান্যা মেয়ের লজ্জা-অপমানের জন্যে তোমার খারাপ লাগছে! মেরসি। মেরসি বোকু!"

আলতো হাত ওর মাথায় রেখে জিজ্ঞেস করলুম, নিজের কানে নিজেরই গলা ভার-ভার ঠেকল,

—"ওর সঙ্গে না মিশলেই পারো?"

—"পারি না। আমি ইণ্ডিয়াকে পুজো করি, ভালোবাসি। শোধরি ইণ্ডিয়ান। আগে ও এমন ছিল না। ওকেও ভালোবাসার চেষ্টা করছি। ও কেমন বদলে যাচ্ছে দিন-কে-দিন। হেরে যাচ্ছি, তবু, হাল ছাড়ি নি। আমাকে বিয়ে করে ও ভারতবর্ষে নিয়ে যাবে বলেছে।"

আর কথা বলবো কি, জিভ-টিভ শুকিয়ে আসছে। মুখ তুলে এক পা এগিয়ে এলো মিশেল। আমার বুকে হাত রেখে বলল,

—"তোমার সঙ্গে যে আমার আলাপ হল, অ্যাতো কথা বলে ফেললুম—তুমি কিন্তু কাউকে বলো না। শোধরিকে তো নয়ই।"

—"কেন?"

শুকনো জিভ বেয়ে শব্দটা বেরিয়ে গেল।

—"আমি অন্য কারুর সঙ্গে মেলামেশা করি, ও পছন্দ করে না।"

কেলোভূতের ভালোবাস্‌সা! প্রপোজেসিভ্ পিরিতি!

—"মিশেল! মিশেল!"

ডাকতে ডাকতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে গোবিন্দর চিৎকার। ত্রস্ত, চাপা গলায় মিশেল বলল,

—"সর্বনাশ! ও এদিকেই আসছে আমায় খুঁজতে। কি হবে!"

ও যতোখানি ভয় পেয়েছে, আমি তার চেয়েও বেশী শান্তভাবে বললুম,

—"কিচ্ছু হবে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। ও আসুক।"

আসলে শাহেনশা চাইছে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক।

—"না, না। তা হয় না! তুমি বেরিয়ে যাও। শিগগীর। বোলো বাথরুমে কেউ নেই। আমি টয়লেটে ঢুকে যাচ্ছি!" আলগা ঠেলা দিয়ে মিশেল বলল,

—"যাও, ইণ্ডিয়ান। প্লীজ!"

বলে, সামান্য উঁচু হয়ে আমার ঠোঁটে চুমু খেলো। ধন্যবাদ জানানোর মতো হাল্কা চুমু। তাড়াতাড়ি বলল,

—"দোহাই তোমার! আমাকে বিপদে ফেলো না। কিচ্ছু বোলো না ওকে। যাও—"

ওর ছোট্ট চুমুটুকুর জন্যে মোটেই তৈরি ছিলুম না। কষ্ট হচ্ছিল মেয়েটির জন্যে। ফরাসী রাজ্যের একটি ধবধবে বুনো, রুক্ষ ফুলের মতো মেয়ে! ভারতবর্ষকে পুজো করে। শ্রীগৌরাঙ্গ, পরমহংস, বিদ্যাসাগরের দেশকে ভক্তি করে। আহা রে! বেচারি জানে না, কি দারুণ চোর, ছ্যাঁচোড়, বদমায়েস, কালোবাজারী আর কি নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার দেশকে ও না জেনে এত ভালোবাসে। আমিই কি বাসি না। আমিও ভালোবাসি, বউ। কিন্তু, ঠিক বুঝতে পারি না কতখানি। বন্ধু-বান্ধবের আসরে, আড্ডায় তর্কের মধ্যে আমার ভালোবাসার কথা ভুলে না গেলেও মুখ ফুটে বলতে কেমন সঙ্কোচ হয়। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে দেশের শরীরের সব পুঁজ, বদরক্ত অথবা বিষাক্ত ফোড়ার কথা বলতে ইচ্ছে করে। এই বিদেশিনীর মতো সহজ করে বলতে পারি না, আমিও ইণ্ডিয়াকে পুজো করি, ভালোবাসি। অথচ, এরই মতো কিংবা জানী বোয়াগুন্‌তিয়ের মতো মুখ ফুটে, এমন সহজ করে কেউ বলে ফেললে বুকের মধ্যে বাতাস বইতে থাকে। হুহু করে সব কেমন খালি হয়ে যায়। তারকেশ্বরের রুগ্ন তামাটে মুখগুলি ভেসে ওঠে সেই হাওয়ায়। শনের মতো চুল উড়তে থাকে। জগৎসংসার নিংড়ে বিস্ময় সরু জলের ধারা হয়ে নেমে আসে চোখ থেকে গালে, চিবুকে।

দু হাতে মিশেলের বুনো, রুক্ষ মুখটি তুলে ধরলুম। ওর ঠোঁটের পাশে কাটা জায়গায় চুমু খেলুম আলগোছে।

একতলায় নাচ, বাজনা এবং হুল্লোড়ের মধ্যে থেকে গোবিন্দর ডাক উঠে আসছে,

—"মিশেল। মিশে-এ-এ-ল্!"

দোতলায় উঠে এসেছে গোবিন্দ। করিডোরে ওর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া গেল। জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি হে! বলি, অমন চ্যাচাচ্ছো কেন?"

আমাকে দেখে একটু যেন দমে গেছে গোবিন্দ। বলল,

—"মিশেল। মিশলকে খুঁজছি।"

গলায় রস মাখিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"সে আবার কে?"

—"বাহ্! আমার সঙ্গে তুমি ওকে দেখেছো। একবার তো আলাপও করিয়ে দিয়েছিলুম। মনে নেই?"

শালা! আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে! নামটুকু কোনো রকমে বলে কেটে পড়েছিলে, সোনা। আমার সব মনে আছে। বললুম,

—"ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ! মনে পড়েছে। কোথায় সে?"

—"একতলায় নাচের ওখানে ছিল। হঠাৎ খুঁজে পাচ্ছি না।"

হারামজাদা! ওকে অপমান করেছো, মেরেছো—সে কথা চেপে যাচ্ছো কেন? বললুম,

—"দোতলায় তো সব ফাঁকা। সবাই নাচের ঘরে। দেখছো না খাঁ-খাঁ করছে করিডোর। আমি তো বাথরুম থেকে ঘুরে এলুম। ওখানেও কেউ নেই।"

একটু অবাক হয়ে নিজের মনেই বলল,

—"গেল কোথায় তাহলে?"

ওর কাঁধে হাত রেখে সিঁড়ির দিকে হাঁটতে লাগলুম দু'জনে। বললুম,

—"নিচেই হবে! নাচছে-টাচছে কাউকে পাকড়ে। অ্যাতো অন্ধকার এই ঘুমের আসর, যে, সব মুখ খুঁজে পাওয়া যায় না সব সময়। চলো দেখা যাক নিচে।"

কি মাথায় এল, দুম্ করে বলে ফেললুম,

—"তা, মালটা খাসা হে তোমার !"

ঘুরে দাঁড়িয়ে ও যদি ক্ষেপে যেত, খুশি হতুম। গালাগাল করলেও হজম করে যেতুম। ভাবতুম, যাক, মেয়েটার জন্যে একটু সম্মান, ভালোবাসার নারী হিসেবে একটু শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই আছে—ঝগড়াঝাঁটি যতই করুক নিজেদের মধ্যে। তোমার সম্পর্কে অথবা আমার যে কোনো সঙ্গিনীকে উদ্দেশ্য করে কেউ 'মাল' ব্যবহার করলে মারামারি হয়ে যেতো। সেই যে বম্বের গ্যালারিতে সেই পরিচিত আর্ট ক্রিটিক মহাদেবন তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছুক্ষণ পরে বলেছিল,

—"তোমার স্ত্রীকে বহুকাল আগে থেকেই চিনি হে! টুকটাক কথাবার্তাও হয়তো হয়েছে। আজকে ঠিক চিনতে পারল না বোধহয়।"

—"তাই নাকি! বাহ্! কি করে?"

তখনো জানতুম না, ওর পরের কথা এই হতে পারে,

—"এককালে আমাদের এক অধ্যাপক বন্ধু তীর্থংকরের সঙ্গে তো খুব দলাই-মলাই ছিল ভদ্রমহিলার।"

চড়টা জোরে হয়ে গেলেও সামলে নিয়েছিল মহাদেবন। মনে আছে বউ, তুমি ছুটে এসেছিলে! ও শালার দাঁত দু'একটা সেদিন ফেলতুমই, মধ্যিখানে তুমি এসে না পড়লে। সেদিন কিছুই বলি নি তোমাকে। মেজাজ গরম হয়ে গিয়েছিল। বাঙালের রক্ত ধমনীতে। 'সুসিল্লী' হলেও 'এই গোরু সরে যা, ভাই' জাতের শিল্পী আমি নই সেটা মহাদেবন টের পেয়েছিল। গালে হাত বুলিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলেছিল,

—"সরি!"

আসলে, ও বোধহয় ভেবেছিল, আমাকে একটু গোপন স্কুপ দিয়ে আধাবন্ধু পরিচিত লোককে অবাক করে দেবে। কিছু কাগজের, কিছু কিছু লোক মাথায় খাটো হয়! বেমক্কা কথা বলে ফেলে!

তাও তো সেদিন, সেই ভর দুপুরবেলা পেটে মদ ছিল না। মনের মধ্যে সিংহাসনে বসে পড়ি নি। শাহেনশা ভাবের উদয় হয় নি তখনো। মিশেলকে কথা দিয়েছি। ঘুষি মারতে পারলুম না গোবিন্দকে। মালটি খাসা তোমার শুনে গোবিন্দ কি করল জানো বউ! মুচকি হেসে ঘুরে তাকালো আমার দিকে। বড়াই করার ধরনে সামান্য মাথা দুলিয়ে বলল,

—"আগাপাশতলা খাঁটি ফরাসী জিনিস বাবা!"

ইচ্ছে করলো, চুলের মুঠি ধরে শালাকে নিয়ে যাই বাথরুমে। মিশেলের

সামনে প্রচুর মার মেরে ক্ষমা চাওয়াই। কিন্তু, বেচারির ক্ষীণ আশাও তাহলে মরে যাবে। হারামজাদা কোনো সম্পর্কই আর রাখবে না ওর সঙ্গে। রাখলেও হয়তো আরো অত্যাচার করবে ওর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। তাছাড়া, ওকে কথা দিয়ে এলুম, মিশেলের ব্যাপারে শোধরিকে কিছুই বলব না। অথচ, মন বলছে, ওর দুরাশা বা অসম্ভব স্বপ্নের হাত থেকে ওকে ছাড়িয়ে আনলে হয়তো ওরই ভালো হতো।

ডান হাতের মুঠোয় রুমাল ছিল। রুমালে মিশেলের কাটা দাগ থেকে চোয়ানো রক্তের ছোপ। মন্দির বা গির্জার ঘণ্টাধ্বনির মতো কানে বাজছে আমি ইণ্ডিয়াকে পুজো করি, ভালোবাসি। ওকেও ভালোবাসার চেষ্টা করছি। হেরে যাচ্ছি। হাল ছাড়ি নি তবু। আমাকে বিয়ে করে ও ভারতবর্ষে নিয়ে যাবে বলেছে—

গোবিন্দর কথার জবাবে দাঁতে দাত চেপে বললুম,

—"শাবাশ!"

বলে, পিঠে একটা চাপড় দিলুম। সে মুহূর্তে আমার ডান হাতে যত জোর ছিল, সেই জোর মাখানো চাপড়! কাজ হল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল গোবিন্দ। খুব তাড়াতাড়ি নেমে গেল। হুমড়ি খেয়ে গড়াতে গড়াতে। সব কটা সিঁড়ি ডিঙোতে হল না। একেবারে এক তলায় পৌছোবার কয়েক ধাপ আগেই রেলিং ধরে সামলে নিল। আমিও যদ্দূর সম্ভব গম্ভীর মুখে 'কি হল, কি হল' করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম। ও পুরোপুরি মারমূর্তি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কাছাকাছি পৌছে 'লাগে নি তো? লাগে নি তো কোথাও' বলতে বলতে হারামজাদার হাত, গলা, সারা মুখ তন্ন-তন্ন করে খুঁজলুম লেগেছে কিনা! অন্তত একটা কাটা দাগ, যেখান থেকে দরদর করে না হলেও চুইয়ে রক্ত পড়তে পারে। না বউ, কাজ হয় নি। কই মাছের প্রাণ! ছিটেফোঁটাও রক্ত নেই কপালে, গালে বা মুখে! ও তখন বলছে, হাঁফাচ্ছে, রাগে ফুঁসছে,

—"ধাক্কা মারলে কেন?"

জবাব না দিয়ে উল্টে জিজ্ঞেস করলুম,

—"প্যারিসে কই মাছ পাওয়া যায়, গোবিন্দ?"

প্রথমে হতভম্ব হয়েই সামলে নিল,

—"মাছের কথা পরে হবে। আগে, ধাক্কা মারলে কেন বলো!"

কোমরে হাত দিয়ে প্রায় মারামারির জন্যে তৈরি চোখ নিয়ে শুয়োরের বাচ্চা

দাঁড়িয়ে। মারামারি হয়ে গেলে ভালো হতো। মন মেজাজ হাল্কা হয়ে যেত। মাথায় গুবরে পোকা নাচতে থাকলে শরীরে শরীর মিশিয়ে যেমন শান্তি, প্রায় সেই রকম। কিন্তু মারধোর শুরু হয়ে গেলে মুখ দিয়ে মিশেলের কথা বেরিয়ে পড়বেই আমি জানি। তাই, খুব দুঃখিত কোনো কাটা দাগ না পেয়ে সত্যি সত্যি দুঃখিত গলায় বললুম,

—"ধাক্কা কোথায় মেরেছি! 'শাবাশ' বলে পিঠ চাপড়ালুম আর তুই পড়ে গেলি। আমি কি করব বল? তোর অ্যাতো পলকা শরীর, গোবিন্দ।"

ওর চোখ সামান্য শান্ত হল। কোট্-প্যান্ট ঝাড়তে ঝাড়তে বলল,

—"অত জোরে কেউ পিঠ চাপড়ায়? তাছাড়া, তুমি আমাকে হঠাৎ 'তুই' বলতে শুরু করেছো, কি ব্যাপার!"

খেয়াল করি নি, মনে মনে গালাগাল দিতে দিতে তুই-তোকারি উগরে দিয়েছি। জিভ কামড়ে বললুম,

—"খুড়ি! মুখ ফসকে—"

শেষ চারটে ধাপ নামতে নামতে বলল, গলায় রাগের ভাব কমেছে,

—"খুব টেনেছো মনে হচ্ছে!"

বেশি কথা বলতে ইচ্ছেই করছে না ওর সঙ্গে। বাঁ পাশে বড় গেটের দিকে পা বাড়ালুম। ও ঘুরল ডান দিকে। আধো অন্ধকারে বুম্ চলেছে ওখানে। দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল,

—"নাচবে না?"

—"না। ঘুম পাচ্ছে!"

আসলে, ওর সঙ্গ আমার মোটেই সহ্য হচ্ছে না। তাছাড়া এতক্ষণে আবার তলপেটের খেয়াল হল। কোনো রকমে বেরিয়ে গিয়ে আগে জাপানী বাড়ির দেওয়াল ধসাতে হবে।

ও বললে,

—"হঠাৎ মাছের কথা কি বলছিলে যেন?"

হেসে ফেললুম,

—"ও কিছু না। তেল-কই খাবার ইচ্ছে হয়েছিল খুব!"···

সেই গোবিন্দ শোধরি সেই মিশেলকে ডাক দিল। আমার ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে ডাকল,

—"আঁত্রে মিশেল।"

মিশেল ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ঈভলীনের গলা,

—"এ কি ! মিশেল !"

ঈভলীনের দিকে ফিরে দেখি ওর চোখেমুখে অবাক এবং খুশির ভাব। মিশেলও হাসিমুখে আশ্চর্য হয়ে গেছে। দু' পা এগিয়ে গেল ওর কাছে। বলল,

—"ওমা, তুমি ?"

ঈভলীন উঠে দাঁড়িয়েছে। দু'জনে দু'জনের গালে চুমু খেল রেওয়াজ-মাফিক। আমি এক পলক গোবিন্দকে দেখে নিলুম। হাঁ করে দেখছে দু'জনকে।

বললুম,

—"ঈভলীন ওকে চেনো নাকি ?"

হাত ধরে টেনে মিশেলকে ওর পাশে বসাতে বসাতে ঈভলীন, উচ্ছ্বাসের গলায় বলল,

—"চিনি মানে ! কম-সে-কম দু-বচ্ছর একসঙ্গে ছিলুম।" বলে, মিশেলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল,

—"কি ? তাই না !"

এতক্ষণে মিশেল আমার দিকে ভীরু চোখে দেখল একবার। মাথা নুইয়ে সামান্য হাসবার চেষ্টা করল। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় ওর ঠোঁটের কোণ খুঁজলুম। হপ্তাখানেক হয়ে গেলেও কেটে যাওয়ার অস্পষ্ট শুকনো দাগ এখনো বোঝা যায়।

গোবিন্দ দরজার পাশে ঠিক একই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। তন্ময় হয়ে দেখছে দু'জনকে। এবং আমি জানি ও অমন চোখে কখনোই মিশেলকে দেখবার জন্যে তাকিয়ে নেই। সেই রাতেই আমি জেনে গেছি, ভালোবাসা বিয়ে এবং অন্যান্য মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়ে ও এই বুনো, রুক্ষ, সুশ্রী বিদেশিনীকে শুষছে। সব রস টেনে টেনে কৌতূহল মিটে গেছে লম্পটের।

সাদা বাংলায় বলে ফেললুম,

—"ছিরি গোবিন্দকুমার শুয়োরের বাচ্চা দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বোসো।"

চমকে উঠল। বলল,

—"অ্যাঁ ! হ্যাঁ। না,—কি বললে ?"

—"বললুম বোসো।"

—"বাপ তুলে গাল দিলে ?"

—"না হে না ! আদরে বহুবচন।"

ঈভলীন জিজ্ঞেস করল,

—"কি বলছো তোমরা? দুটো ইণ্ডিয়ান একত্র হলেই দুর্বোধ্য ভাষায় বক-বক করবে। উফ্! বলি, ম্যানার্স বলে তো একটা ব্যাপার আছে!"

আমার চোখে চোখ রেখে কথা শেষ করলো,

—"অসভ্য কোথাকার!"

হেসে বললুম,

—"পার্দঁ মাদাম! কাফ্রিটাকে একটু আদর করছিলুম।"

বিকৃত মুখে ঈভলীনকে একটু হাসি ছুঁড়ে দিয়ে গজগজে গলায় বলল গোবিন্দ, বেশ চটিতং,

—"ছ্যাখো, তোমার সঙ্গে আমার গালাগালির সম্পর্ক কখনোই ছিল না। তাছাড়া, সবার সামনে এমনি অপমান করবার অধিকারও তোমাকে দেওয়া হয় নি।"

ওর সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে ঈভলীন এবং মিশেলকে বললুম,

—"কি খাবে তোমরা? একটু কফি করব!"

ওরা কিছু বলবার আগেই গোবিন্দ ফরাসীতে খেঁকিয়ে উঠল,

—"না। দরকার নেই। দেরি হয়ে গেছে. যেতে হবে আমাদের। চলো মিশেল।"

ওরা দু'জনেই একটু অবাক চোখে আমাকে এবং শোধরিকে দেখল।

গোবিন্দ তখন বাংলায় গজরাচ্ছে,

—"দেশের ছেলে এক কলেজে, পড়তুম, নতুন এসেছ এখানে। ভাবলুম, সাহায্য-টাহায্য দরকার হলে করতে পারি। তা এই রকম অভদ্র ব্যাভার করলে তোমাকে এড়িয়ে চলতে হবে!"

তারপর মিশেলের দিকে ফিরে আবার তাড়া দিল,

—"চলো, ওঠো। তোমার বাড়ি পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।"

মনে মনে বললুম, অভদ্র ব্যবহার! শালা লম্পট! একটি বিদেশিনীকে ঠকিয়ে তার সঙ্গে শুচ্ছো, বসছো, যা-নয় তাই করে চলেছো হারামজাদা। মার-ধোর পর্যন্ত বাকি রাখো নি! মুখে ভদ্র ব্যবহার ফলাচ্ছো! তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারলে বুঝতে অভদ্র ব্যাভার কাকে বলে। মিশেলের মুখ চেয়ে চুপ করে আছি।

পৃথিবীর নানান মুখ, শরীরের সুবাস নিতে আমি এক পায়ে খাড়া। কিন্তু মিথ্যে বলে নয়, ঠকিয়ে নয়। সেই তোমাদের ভাষায় 'ভালোবাসার মুখোশ'

এঁটে কোনো মেয়ের সঙ্গে বিছানায় চলে গেলুম এ আমি ভাবতেই পারি না। মাথার ভেতর আমার আদিম গুবরেটাও লজ্জায় ঘেন্নায় থুতু ছেটাবে তাহলে।

বললুম,

—"আহা, বলি, চটো কেন? তোমার কাপ-গেলাস-হীটার ফেরত চাই?"

মিশেলের দিকে চোখ পড়তে বুঝলুম, ও ঝগড়ার গন্ধ পেয়েছে। ভাষা বুঝলেও ওর মনের ভয় ছড়িয়ে পড়েছে মুখে। ভীষণ করুণ চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

গোবিন্দ বললে,

"না। ওগুলোর জন্য আমি আসি নি। অত ছোট মন আমার নয়।"

হেসে বললুম,

—"না, না। ছোট মন হবে কেন! মেজোঁর সব্বাই দেখা হলেই বলে, 'শোধরি কাপ-গেলাস-হীটার তো দিয়েছে—চলো কফি খাওয়াও!"

অন্য রকম মুখ হয়ে গেল ওর। দ্রুত গলায় অবিশ্বাস ফোটাবার চেষ্টা করল,

"কে? কে বলেছে? আমি তো কাউকে কিছু বলি নি?"

হাসছি তখনো। সবিনয়ে বললুম,

—"না, না। তুমি কেন বলবে? দরজার বাইরে আমি নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছিলুম—আমায় কি কি দিয়ে তুমি সাহায্য করেছো!"

আবার গজগজ করল,

—"একেই বলে নেমকহারাম! দেশের লোকের উপকার করলে এই রকমই হয়!"

ঘুরে ফরাসীতে বলল,

—"চলো, চলো মিশেল।"

ঈভলীন চুপ করে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিল। মিশেলের হাত ধরে জিজ্ঞেস করল,

—"তুমি এখনো সেখানেই আছো? সাঁ প্লাসিদে?"

ম্লান হাসল মিশেল,

—"হ্যাঁ। এখনো আছি। যে কোনোদিন ছেড়ে দিতে হবে।"

ঈভলীন জিজ্ঞেস করলে,

—"কেন, কেন?"

গোবিন্দর দিকে একবার চোখ ফেলে অস্পষ্ট গলায় মিশেলের জবাব,

—"অনেক ঝামেলা আছে, ভাই। এক সময় বলবো।"

বলে দরজার দিকে পা বাড়াতেই কি মনে করে ঈভলীন বলল,

—"একটু বোসোই না মিশেল। কতকাল পরে দেখা। একটু বসে যাও!"

তারপর গোবিন্দর দিকে ফিরে বলল,

—"আপনিও বসুন না মঁসিয়। আমরা মবিলঁর দিকে যাবো। মিশেলকে নামিয়ে দিয়ে যাবো'খন। ওর বাড়ি আমি চিনি।"

গোবিন্দ দোটানায় পড়েছে। একদিকে দেশ থেকে সদ্য আমদানী একটা অসভ্য ছোকরার অসহ্য বুলি, অন্য দিকে সুন্দরী ভরাট যুবতীর সুমধুর ডাক। বসবে কি যাবে?

একটু ভেবে নিয়ে বলল,

"নো মাদাম। মেরসী। ওকে স্টেশন অবধি পৌঁছোতে যাচ্ছিলাম। তা, আপনি যদি আমার বান্ধবীকে পৌঁছোবার ভার নেন, তো আমি যাই। খেতে যাবার কথা। ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে যাবে!"

ঈভলীন বললে,

—"আপনি কোনো চিন্তা করবেন না মঁসিয়। বহুদিন আমি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি।"

মিশেল ভয়ে জড়-সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কি বলবে ঠিক বুঝতে পারছে না। ঈভলীনকে ছেড়ে এক্ষুনি যে ওর যাবার ইচ্ছে নেই, সে কথাও গোবিন্দকে সোজাসুজি বলার সাহস নেই। বেচারি একেবারে শোধরির কেনা বাঁদীর মতো দাঁড়িয়ে। 'ও আমাকে বিয়ে করে ইণ্ডিয়ায় নিয়ে যাবে বলেছে।'

অনিচ্ছার গলায় গোবিন্দ বলল,

—"আচ্ছা, তাহলে চলি!"

বলে, আমাকে গ্রাহ্য না করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ডাক দিলুম,

—"গোবিন্দ!"

—"তোমার সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই।"

টেনে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

পেছন পেছন এক পা এগিয়ে বললুম,

—"হঠাৎ আমার ঘরে এসেছিলে কেন, বলে গেলে না।"

উত্তর হল,

—"ছোটলোক কোথাকার!"

মনের ঝাল মিটিয়ে সত্যি সত্যি বেশ জোরে হাসতে লাগলুম। ফাঁকা করিডোরে হাসির শব্দ দেওয়ালে দেওয়াল হয়ে গোবিন্দর চারপাশে ঘুরতে লাগল। ঘুরে ঘুরে করিডোরটুকু পার করে দিল ওকে। খোশ মেজাজে দরজা বন্ধ করলুম। ফিরে দেখি কিছুই না বুঝতে পেরে দুই বিদেশিনী অবাক চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে! বললুম,

—"কি, তোমরা তো কিছু বলছো না! কফি করব একটু?"

তারপরে, মিশেলের চোখে চোখ রেখে বললুম,

—"ঘরের বাইরে, রান্নাঘরে যেতে হবে না। তোমার শোবরির দেওয়া হীটার আছে।"

ভীত মুখে হাসির রেখা টেনে বলল,

—"জানি।"

—"আর কি জানো?"

কথা বলতে বলতে মিশেলের মুখ থেকে আতঙ্কর ছাপ কমে স্বাভাবিক হাসি দেখা দিচ্ছে,

—"এক জোড়া কাপ-ডিশ, গেলাস—"

আবার হাসি পেল। গোবিন্দটা মূর্খ, মিথ্যুক এবং লম্পট। ধরা পড়ে গেছে। হোহো করে হাসতে লাগলুম।

ঈভলীন বললে,

—"কি শিল্পী, পাগলের মতো হাসছো কেন?"

মিশেলের চোখে ভয় ফিরে আসছে আবার,

—"ওকে কি কিছু বলেছো নাকি তুমি?"

—"কি?"

ঈভলীনের দিকে এক পলক দেখে নিয়ে বলল,

—"আমাদের যে সেদিন সন্ধ্যেবেলা কথা হয়েছিল, জাপানী বাড়িতে—"

বলতে বলতে ঠোঁটের কোণে ঝাপসা কাটা দাগে আঙুল পৌঁছে গেল ওর। আমি হাসি থামিয়ে বললুম,

—"না, মিশেল। আমি আর যা-ই হই, লম্পট বা মিথ্যুক নই। কাউকে দেওয়া কথার দাম আমি দিতে জানি।"

কৃতজ্ঞ চোখে তাকালো মিশেল।

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ঈভলীন বলল,

—"তোমাদের হেঁয়ালী আমি কিসসু বুঝতে পারছি না বাপু। কফি-টফি আর খেতে হবে না। চলো মিশেল, আমাদের সঙ্গে চলো!"

মিশেল বলল,

—কোথায়?"

আমিও ভেবে দেখলুম, এই বিষণ্ণ মেয়েটিকে আমাদের সঙ্গে যিশুর পার্টিতে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। ওর সারাক্ষণ ধরা-পড়া পাখির মতো ভয়, গোবিন্দকে হারাবার দুশ্চিন্তা একটু কমবে! ঈভলীনকে দেখিয়ে বললুম,

—"এরা সবাই আজ আমার অনারে পার্টি দিচ্ছে।"

মিশেল বললে,

—"কেন, কেন? কি ব্যাপার? জন্মদিন বুঝি?"

ঈভলীন বললে,

—"প্রায় তাই। ইণ্ডিয়ান আজ প্রথম মোঁমার্ত্রে ছবি এঁকে রোজগার করেছে।"

খুব খুশি হল মিশেল। আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলল,

—"বাহ্! দারুণ!"

তিন প্যাকেট চারমিনার নিয়ে নিলুম। পথে মাংস কিনে নিল ঈভলীন। রোস্ট হবে।

গাড়িতে বসে একবার শুধু মিশেল বলেছিল,

—"কিন্তু আমার যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে? আমি তো মোঁমার্ত্রে ছিলুম না!"

ঈভলীন বললে,

—"তাতে কি হয়েছে! তুমি ইণ্ডিয়ানের শুভ কামনা করো কি না?"

ডান দিকের জানলা ঘেঁষে আমি। বাঁ পাশে মিশেল। স্টিয়ারিংয়ে ঈভলীন। মিশেল আমাকে একবার দেখে নিয়ে চুপচাপ ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

ঈভলীন গাড়ি চালাতে চালাতে ওর শব্দহীন জবাব শুনতে বা দেখতে পায় নি। তাই, আবার বলল,

—"ও যে প্রথম মোঁমার্ত্রে ছবি এঁকে রোজগার করেছে, এতে তুমি খুশি তো?"

বলে, ডান পাশে মিশেলকে দেখল। মিশেল মাথা ঝাঁকিয়ে সরল একটি শিশুর মতো বলল,

—"নিশ্চয়ই! ইণ্ডিয়ান তো ভালো।"

ওর বলার ধরনে আমি আর ঈভলীন হেসে ফেললুম। ঈভলীন বললে,

—"ব্যস। তাহলে চলো। হই-চই করে শিল্পীর সঙ্গে নেচে ওকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দাও।"

আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল ঈভলীন। চেনা হাসি। যে হাসি, যে চাউনিতে আমার বুক টিপটিপ করে। ভয় হয়, পার্টিতে লাগাম ছাড়া মদ খেয়ে ফেললে গুবরেটা ভিজে যাবে। তখন তোমার এই হাসি, এই চাউনি আমি হজম করব কি করে। বেচাল কিছু হয়ে গেলে সবার অলক্ষ্যে দূরে দাঁড়িয়ে তুমি দুষ্টুমির হাসি হাসতে থাকবে হয়তো, আমি শালা চুরির দায়ে ধরা পড়ে যাবো। যিশু, দেনিসের মতো অসময়ের বন্ধুরা দূর-দূর করে খেদিয়ে দেবে দল থেকে। তাই, এখন ঈভলীনের হাত আমার ডান হাতের ওপরে আছে, ওর দিকে চোখ ফেরাচ্ছি না আমি। দিগেনদাকে দেখছি। দেওয়ালে হেলান দিয়ে শূন্য চোখে তাকিয়ে আছেন সামনে। অদৃশ্য বাতাস দেখছেন যেন। হাতের কাছে রামের গেলাস। পাশে কাত হয়ে শোনপাপড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে। দমিনিকের মেয়ে আনেৎ। ঈভলীনের ওপাশে মিশেল। পার্টির হুল্লোড় চলছে। তারই মধ্যে ওরা দু'জনে কথা বলছে। মিশেলের সঙ্গে ঈভলীনের কোথায়, কি-ভাবে পরিচয় জানি না। পরে জিজ্ঞেস করে নেব। তবে, মিশেল দিগেনদাকে চেনে দেখলুম। ঘরে ঢুকেই 'হ্যালো' বলে এগিয়ে যাচ্ছিল, হাত ধরে টেনে নিল ঈভলীন। দিগেনদার শূন্য চোখের দিকে তাকিয়ে বলল,

—"ওঁর শরীর-মন ভালো নেই। পরে কথা বোলো।"

অ্যানী রান্নাঘর থেকে এক প্লেট সসেজ ভাজা এনে আসরের মধ্যিখানে রাখলো। সেদিকে ঘোলা চোখে তাকিয়ে মঁসিয়ে কোর্তোয়া জড়ানো গলায় গান ধরলেন,

—"খিদে পেলে পেগ খেও, না পেলে বোতল—।"
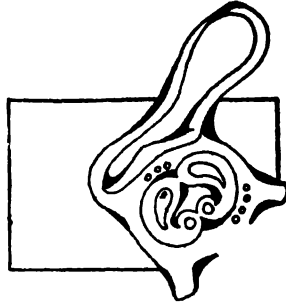
ঈভলীন বললে,

—"মঁসিয় কোর্তোয়ার নেশা জমে উঠেছে। ফরাসী লোকসঙ্গীত শুরু হল বলে!"

দিগেনদার দিকে চোখ রেখেই জবাব দিলুম,

—"হুঁ!"

ঈভলীন আবার বললে,

—"বছর তিনেক হল স্ত্রী মারা গেছে। ছেলেপুলে নেই। তোমার যিশুকে প্রায় ছেলের মতো স্নেহ করে। এখন ওই পিয়ের মোঁমাত্র্‌, আর মদ খেলে লোকসঙ্গীত—এই নিয়ে আছে।"

দিগেনদার ছেলেপুলে নেই। এই বয়েসে দমিনিক আর সন্তান চায় না। দিগেনদাও শোনপাপড়িকে নিয়ে খুশি। ঈভলীন না যিশু বলেছিল। সত্যিই কি তাই? কে জানে! পৃথিবীর সব শিশুই সমান, বউ। শিল্পী আর শিশুদের কোনো জাত নেই বোধহয়। হিন্দু শিশু, মুসলমান, আমেরিকান বা ফরাসী শিশু—শুনতেই কেমন অবাস্তব লাগে। কারণ, সরলতায়, বিস্ময়ভরা চোখে কৌতূহলে, কথা বলার ধরনে সব শিশুচরিত্রই আমার কাছে এক মনে হয়। কিন্তু, তবু কোথায় যেন রক্তের টান ব্যাপারটা আলাদা করে টেনে আনে মন-শরীরের বেশী কাছাকাছি। আপন ঔরসে গড়া একটা জীবন্ত পুতুলের সঙ্গে অন্য শিশুর, সামান্য হলেও, ফারাক তৈরি হয়ে যায়। সাধারণ, স্বার্থপর এবং স্বাভাবিক পিতার জন্ম হয় মানুষের মধ্যে। দিগেনদা কি তার উর্ধ্বে উঠে গেছেন! বুঝতে পারি না। যিশুর ভাষায়, মৃত মঁসিয় দিগেঁ পলকে নিয়ে ভাবনা, কল্পনা নড়ে গেল। ঈভলীন আমার হাতে চাপ দিয়ে বলছে,

—"ইণ্ডিয়ান! ওভাবে মঁসিয় পলের দিকে চেয়ে থেকো না।"

ফিরে তাকালুম ওর দিকে। আমার কানের কাছে মুখ এনে কথা বলছে ঈভলীন। মেয়েটির মৃদু উষ্ণ শ্বাস টের পাচ্ছি গালে,

—"ভদ্রলোক নিশ্চয়ই লজ্জায় গুটিয়ে আছেন। ওঁর দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকলে উনি ভীষণ আড়ষ্ট হয়ে ভাববেন, আমরা সবাই ওঁর কথা জানি। সেটা ভালো হবে না শিল্পী!"

দিগেনদার দিকে মুখ ঘুরিয়ে অপলক তাকিয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। ঈভলীনের কথায় ভুল নেই, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করব, বউ! তুমি তো ওঁকে দেখো নি। আমার দেখা একটা রীতিমত জীবন্ত মানুষ কেমন ক্লান্ত হয়ে বসে বাতাস গিলছে। জিরিয়ে নিচ্ছে দেওয়ালে হেলান দিয়ে। এখন কি শুধুই জিরোবে লোকটা! বাকি জীবনটুকু জিরিয়ে নেবে? ভাবতে ভাবতে তাকিয়ে থাকছি। চোখ সরাবার কথা বেখেয়াল হয়ে যাচ্ছে। আশেপাশের হুল্লোড় অথবা মদেও ঠিক মন বসাতে পারছি না। সাজানো চিতা নেই, মানুষটার সারা গায়ে পেট্রোলের আগুন দাউদাউ।

কথা ঘুরিয়ে দিল ঈভলীন,

—"তুমি এখানে এক্সপোজিশন করবে বলে এসেছো, শুনলুম! ছবি কোথায়? নিয়ে এসেছো সঙ্গে?"

—"না। আঁকতে হবে।"

—"কাজ আরম্ভ করে দিয়েছো?"

প্যারিসে পা রাখার পর আজই প্রথম ছবি আঁকলুম। 'ছবি আঁকলুম' বলা ঠিক হবে না। ফরমায়েশী কেরানীগিরি করলুম। ঈভলীনের কথায় ভেতরটা কেমন হালকা হয়ে গেল। নাগরদোলা ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠে গিয়ে নামবার সময় যে রকম বুকের মধ্যে ভার শূন্য মনে হয়, সেই রকমই একটা অনুভব হল কয়েক সেকেণ্ড। বহুদিন রং-তুলি-স্প্যাচুলা নিয়ে বসা হয় নি। সাদা ক্যানভাসের সঙ্গে কথা বলি নি অনেককাল। বিলেতে আসার তোড়জোড়ে গেছে দু'মাস। এখানেও এক মাসের ওপর হয়ে গেল। অথচ আমাকে ফিরে যেতে হবে, বউ। এখানে বসন্তকাল ফুরোবার আগেই ফিরে যেতে হবে। কারণ, তুমি লিখছো, তোমার পেটের মধ্যে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। শরীরের ভিতরে কোনো স্বজন এখন পাশ ফিরে, চিৎ হয়ে শোয়। আমি আসছি, আমি আসছি। ওর আসার আগেই আমাকে পৌঁছোতে হবে।

ঈভলীনকে বললুম,

—"না। এখনো শুরু করি নি।"

নিজের ভাবনা ভাবতে ভাবতেই বললুম,

—"ছবি আঁকি না অনেক দিন হয়ে গেল।"

ঈভলীন মুখ ঘুরিয়ে যেন মিশেলকে সাক্ষী রেখে বলল,

—"মিথ্যুক কোথাকার! আজকে পার্টিটা হচ্ছে কিসের? মোঁমার্ত্রে প্রথম তুমি ছবি এঁকেছো বলেই না!"

হেসে ফেললুম,

—"তা এঁকেছি। এক মার্কিন ভদ্রলোকের ছবি। আমার নিজের ছবির কথা বলছিলুম। বহুকাল আঁকি না!"

—"সেলফ্ পোত্রেত?"

—"হুঁ। সেলফ্ পোত্রেত বলতে পারো। সেলফ্ একসপিরিয়েন্সের পোর্ট্রেট। কারণ, আমাকে দেখতে আমার মতো নয়!"

ঈভলীন আমার গেলাসটি বিঘৎখানেক দূরে সরিয়ে রাখল। গম্ভীর গলায় বলল,

—"না। আর খেও না, শিল্পী। নেশা হয়ে গেছে তোমার।"

ফিরে দেখি, আশ্চর্য বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। একটু চুপ থেকে, গাঢ় শ্বাস ফেলবার মতো বলল,

—"তুমি এতো গভীর কথা ভাবো, ইণ্ডিয়ান।"

বলে, গেলাসটা নিজেই হাতে তুলে আমার ঠোঁটের কাছে এনে দিল,

—"খাও।"

চুমুক দিলুম। গাঢ় গলায় আবার জিজ্ঞেস করলে ঈভলীন,

—"তোমার ছবিও কি সব এমনি গভীর?"

হেসে বললুম,

—তা বলা মুশকিল। তবে, মনে হয়, অনুভবে পৌছোলে, মানে, সোজা ভাষায়, বুঝতে পারলে গভীর। না পারলে,—ছবি। আর, বুঝতে না চাইলে—উরিব্বাস! পেইলে চ দাদা, মডান আঁট!"

বলার ধরনে ঈভলীন মিশেল দু'জনেই শব্দ করে হেসে উঠল। বেশ জোরে। সবাই ফিরে দেখল আমাদের দিকে। চোখের কোণে দিগেনদাকে দেখে নিলুম এক পলক। সেই শূন্য চোখে সোজা তাকিয়ে বসে আছেন। আগের মতোই। স্থির। এতো স্থির, মনে হয় যেন স্পন্দন নেই। ওপাশে বসা দমিনিক ওঁকে হাল্কা

ঠেলা দিয়ে কি যেন বলল। উল্টোদিকের দেওয়ালে পিঠ রেখে যিশু, দেনিস তর্ক করছিল। ব্রাক্‌, পিকাসো বা মোদিগ্লিয়ানির নাম ছিটকে ছিটকে আসছিল কানে। তর্ক থামিয়ে ওরা জিজ্ঞেস করলে,

—"ইণ্ডিয়ান জোক চলছে নাকি?"

কথা ঘুরিয়ে দিল ঈভলীন। চট জবাব দিল,

—"না। মঁসিয়ে কোর্তোয়ার গান শুনছি আমরা।"

—"কি? কি গান? লোকসঙ্গীত! শুরু হয়ে গেছে? তবে, হয়ে যাক—"

বলতে বলতে ওই কোণের ছোট্ট দলটি মঁসিয়ে কোর্তোয়াকে নিয়ে পড়ল হইহই করে।

আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল ঈভলীন,

—"ছবি আঁকতে আরম্ভ করছো না কেন?"

ওর প্রশ্নে হাসি পেয়ে গেল আবার। হালকা গলায় বললুম,

—"কোত্থেকে আঁকবো! পয়সা কোথায়? আগে পেটের যোগাড় দেখি, তারপরে ছবি।"

মুশকিল আসান করে দেবার মতো ঈভলীন বলল,

—"কেন? কত লাগে ছবি আঁকতে! তোমার বোর্ড তো রয়েছেই। ক্রেয়ন-প্যাস্টেল রংও তো কিনে ফেলেছো! শুধু কাগজ। কাগজের দাম তো সামান্য!"

কেটে কেটে শব্দগুলো বললুম,

—"প্যাস্টেল-ক্রেয়নে ড্রয়িং বা স্কেচ করে মন ভরে না আমার। তেল রং। ক্যানভাস চাই, তেল রং চাই মাদাম।"

হাসতে হাসতে একটি ফরাসী প্রবাদ শোনাল ঈভলীন, যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়াবে, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি!

—"তোমার জবাব নেই, ইণ্ডিয়ান। খাবার পয়সার দুশ্চিন্তা করছো। ওদিকে আবার ক্যানভাসে পেইন্টিংয়ের সাধ!"

—"আলওয়েত-জঁত্যাল আলওয়েত—"

গলা ছেড়ে গান ধরেছে ওরা চারজন। মঁসিয় কোর্তোয়ার সরু গলা সবচেয়ে উঁচু পর্দায়। লিয়ঁ খালি প্লেটে চামচ ঠুকে তাল রাখছে বেতালে। অ্যানী আর এক দফা সসেজ নিয়ে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো, ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে,

—"আলওয়েত-জঁত্যাল আলওয়েত—"

ঈভলীন বললে,

"আমি যদি তোমাকে কয়েকটা ক্যানভাস এনে দিই; তাহলে নিজের কাজ শুরু করবে তুমি ?"

সঙ্গে সঙ্গে চার পাশ থেকে সাদা ক্যানভাসের দল আমাকে ঘিরে ধরল। নানান্ সাইজের ক্যানভাস। কানের কাছে চাপা গলায় কোরাস শুনতে পেলুম,

—"আঁকো শিল্পী। আঁকো। আমরা বুক পেতে দিয়েছি—আঁকো !"

পেইন্টিং করি নি যেন কত যুগ। ভীষণ লোভে আমার হাত নিশপিশ করতে লাগলো।

কিন্তু এই মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় মাত্র কয়েক ঘণ্টার। আমার প্রতি এত সদয় হবার কারণ বুঝতে পারছি না। সুইডেনের জেরীর কথা আলাদা। আমার ছবি দেখেছে, ভালো লেগেছে। কিনেও নিয়েছে কয়েকটি। তারপর, আমার ছবির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর জন্যে এদেশে আসা-যাওয়ার একটি বাতাস-টিকিট উপহার দিয়েছে। তাছাড়াও চুক্তি আছে, ছবি বিক্রি হলে শোধ দেব টিকিটের টাকা, না হলে পছন্দ মতন কয়েকটি পেইন্টিং। ঈভলীন তো আমার ছবিও দেখে নি !

বললুম,

—"তা মাদাম, ভালো করে চেনা নেই, শোনা নেই, হঠাৎ আমাকে এই দাক্ষিণ্য দেখাবার লোভ হচ্ছে কেন, জানতে পারি ?"

—"কারণ একটাই শিল্পী মশায়।"

ফিরে দেখলুম, ঈভলীন আমার দিকে চেয়ে আছে। গায়ে গায়ে বসে থাকার জন্যে দু'জনের মুখের মধ্যে ব্যবধান সামান্যই। ঘরের টকটকে লাল আলো ওর গালের ড্রয়িংয়ে জ্বলছে। আবছা অন্ধকার চোখের ভেতরে ঘন সমুদ্রের প্রাশিয়ান নীল। ঠোঁটের ফুলে সেই ভয়ংকর মৃদু মন্দ হাসি। জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি কারণ শুনি !"

—"আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি, শিল্পী।"

এই রকমই একটি ছোটোখাটো ধাক্কা খাবার জন্যে সেই দুপুর থেকে ভয়ে ভয়ে আছি। তৈরিই ছিলুম বলা যায়। সেই আশ্চর্য হাসি আর চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছো তুমি। তোমার চোখের মধ্যে দিয়ে এবং সমুদ্র পেরিয়ে আমি তোমার কাছে চলে গেলুম। এখন ওখানে দিন না রাত্তির হিসেব করতে পারছি না। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তোমার মুখ। সুখী-সুখী মুখ। তোমার বাবার বেতের চেয়ার টেনে এনে বারান্দায় বসে আছো। একটু আগেই দাদা-বউদির চোখ

এড়িয়ে রান্নাঘর থেকে কাঁচা আমের আচার-দু' টুকরো মুখে পুরে এসেছো। যদিও ওই আচারের বোতলটি তোমার জন্যই তোমার বউদি কিনে এনেছেন। তবুও সবার চোখ এড়িয়ে খাও তুমি। তোমাদের এই লজ্জার ব্যাপারটি কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না। আপন প্রাণের কাছাকাছি আর একটি প্রাণের আধার পূর্ণ হওয়াতে লজ্জা কোথায় কিছুতেই বুঝতে পারি না। সব্বাই জানে তুমি সন্তানসম্ভবা। তোমার পরিপার্শ্ব, তোমার স্বজন এবং গোটা সমাজে তোমার মাতৃত্বকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে আগ্রহ নিয়ে বসে আছে। 'কবে, আর কতো দেরি'র কৌতূহল মুখে মুখে। তুমি অসুস্থ হলে তাদের দুশ্চিন্তা, তোমার খাওয়া-দাওয়া সাবধানে চলাফেরার দিকে সকলের নজর। তুমি তো কোনো হাসির খোরাক নও। পৃথিবীর মায়েরা এমন কোনো লজ্জিত দৃশ্য তৈরি করে আমি জানি না। অথচ, অগণিত মায়েদের আমি দেখেছি, তাঁদের হাঁটাচলা, বসা শোয়ার মধ্যে সারাক্ষণ কুণ্ঠা জড়ানো, কাঁধের আঁচল খসে পড়ে যাওয়ার মতো লজ্জা সারা গায়ে, চোখে-মুখে। তোমার দিকে কেউ তাকাল, তুমি যেন শরমে চোখ সরিয়ে নিলে। কিন্তু, কেন! তুমি তো মা! তোমার শরীর মন তো এখন শ্রদ্ধার বিষয়। অথচ, কি মজার ব্যাপার ভেবে দেখো! আমাদের বিয়ে না হলে, সারাদিন উপোস থেকে সাতপাক না ঘুরলে, তোমার পরিচিত-অপরিচিত স্বজন, পরিপার্শ্ব সমাজ তোমাকে দেখে আজ নাকে আঁচল চাপা দিয়ে সরে যেতো। তখন আর তুমি কারুর মা হতে না। শ্রদ্ধা করার বদলে সমাজ তোমাকে কুষ্ঠ রোগীর চেয়ে বেশি ঘৃণা করত। এখন তুমি যার সম্মানিত স্বীকৃত আধার, সেই অপাপবিদ্ধ প্রাণ হয়ে যেত জারজ সন্তান। ন্যাকড়ার পুঁটুলি বেঁধে রাস্তার অভুক্ত কুকুরদের সামনে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসতে হতো তোমাকে। লুকিয়ে, শেষ রাতের অন্ধকারে, যখন সমাজ নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। তোমার শরীর, বুক, চোখের জল খালি হয়ে গেলে পাড়া-প্রতিবেশী কিংবা ইতর অনাত্মদের পাকা ঘুম ভাঙবার কথা নয়। আমাদের সমাজের খেলা এইরকম! সুতরাং বউ, তুমি নিশ্চিন্ত মনে সব্বাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে সশব্দে আচার খাও! আমি তো আছি! শিল্পী হিসেবে না হলেও, সোয়ামী হিসেবে আমার নামের খানিকটা তোমার লেজে জুড়ে দেওয়া গেছে! দুনিয়া-সুদ্ধ সমাজের মুখের সামনে অই লেজ নেড়ে নেড়ে তুমি পরাণ ভরে আচার খাও, ঈভলীন আমার প্রেমে পড়ে গেছে!

ও যে ঠাট্টা করে বলল না, তা বলল ওর চোখ-মুখ। আমার সেই আতঙ্ক তো আছেই, তার সঙ্গে আবার 'পেরেম-ভালোবাস্‌সা'। ভয়ের শিকড় মাটি ফুঁড়ে

উঠে আসছে । চোখ বুজে অল্প মাথা নুইয়ে নাটকীয় রসিকতায় ধন্যবাদ জানালুম,

—"মেরসা। মেরসী মাদাম। আপনার মতো ফরাসী ললনার প্রেম পাওয়া তো সৌভাগ্যের বিষয়। তবে, আগেই বলেছিলুম, পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো, অধমের বিয়ে হয়ে গেছে আর একটার বেশি প্রেম করে ফেলা আমাদের দেশে খুব সুনজরে দেখে না।"

—"অর্থাৎ তুমি প্রেম করে বিয়ে করেছো !"

গোপাল, কোথায় গেলি বাপ। এ তো ভালো ঠেকছে না ! মাল খাইয়ে তরজার আসরে নিয়ে ফেলার তাল ! বললুম,

—"এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুব মুশকিল। কারণ, কঠিন বিষয় ! তবে, প্রেম করে বিয়ে করি নি—এটি হক্ কথা ! আবার, বিয়ে করেও যে প্রেম করছি বা করছি না—সে প্রসঙ্গও আমার কাছে ওই তিনটে মুরগির মতো ! খাঁচার মধ্যে প্রথমজন আগে ঢোকে, দ্বিতীয় জন পরে—" বলেই দেনিস, কোর্তোয়াদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরলুম,

—"কঁ ত্রোয়া পুলে ভুতো শঁা

লা প্রমিয়ে ভা দ্ব ভাঁ

লা সকঁদ ভা লা—"

ঈভলীন হাসতে লাগলো। বার তিনেক মাথা নুইয়ে, তুলে হাসতে হাসতেই গলা মেলালো আমাদের সঙ্গে।

মঁসিয় কোর্তোয়া টুপি মাথায় গেলাস হাতে ঘুরে ফিরে গান গাইছিল। এবার কার্পেটের ওপরে দাঁড়িয়েই পা নাচাতে লাগলো। যিশু আর লিয়ঁ ঘরের মধ্যিখানের চাদর-কার্পেট সরিয়ে ফেলল দ্রুত হাতে। দেনিস উঠে এসে ঈভলীনের দিকে তার গোবদা হাত বাড়িয়ে নাচতে আহ্বান করল। মিশেলকে ডেকে নিল যিশু। শোনপাপড়ির পা সরিয়ে দিগেনদার কাছাকাছি চলে এলুম। দমিনিককে দেখিয়ে দিগেনদার গায়ে ঠেলা দিলুম,

—"দিগেনদা উঠুন। বউদির সঙ্গে নাচুন।"

ঘোলাটে চোখে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। মুখ চোখ দেখলেই বোঝা যায়, মেঘের মতো নেশা জমেছে ভেতরে। বেশ খানিকক্ষণ দেখে নিয়ে যেন চিনতে পারলেন। 'বাতাস বয়, তাই বইছে' এমনি ভাবে বললেন,

—"ও, তুমি। নাচো। তোমার বউদিকে নিয়ে যাও। নাচো। আমার আর দম নেই এ বয়েসে।"

ওদের নাচ দেখছিল দমিনিক। চাপা উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল আমায়,

—"কি, কি বলছে দিগে ?"

বললুম,

—"ও কিছু না। আপনার সঙ্গে ওঁকে নাচতে বলছিলুম।"

সঙ্গে সঙ্গে দমিনিক উঠে দাঁড়াল। সামান্য ঝুঁকে হাত বাড়াল দিগেনদার দিকে। বলল,

—"এসো।"

দিগেনদা আমার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। চোখ সরিয়ে দমিনিককে বললেন,

—"আমার ভালো লাগছে না। আমি বাড়ি যাবো।"

শিশু ভোলাবার মতো গলায় দমিনিক বলল,

—"যাবোই তো! একটু হইচই করি সবাই মিলে। তারপর, খেয়েদেয়ে বাড়ি যাবো। চলো, ওঠো। একটু নাচি—"

আমাকে দেখিয়ে দিগেনদা বললেন,

—"শিল্পীকে বলো। আমার ইচ্ছে করছে না।"

বলতে বলতে লিয়ঁ এসে দাঁড়াল। দমিনিকের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল,

—"নাচবেন ?"

দমিনিকেরও খুব একটা নাচানাচির মুড নয়। ওকেও খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। অসহায় চোখে এক পলক দিগেনদাকে দেখল। তারপর আমাকে। বললুম,

—"যান মাদাম। আমার আর একটু মদ না খেলে জমবে না।"

লাল আলো এবং অন্ধকারে ওরা নাচতে লাগল তালে বেতালে। মঁসিয় কোতোঁয়া পা ঠুকে গান গাইছিলো। রান্নাঘর থেকে অ্যানীও এসে জুটে গেল ওঁর সঙ্গে।

বললুম,

—"দিগেনদা, বাংলা কবিতা কি লিখলেন নতুন ?"

আমি জানি, পরাজিত কবির কবিতা শুনতে চাইলে অথবা অভুক্ত লড়িয়ে শিল্পীর নতুন ছবি দেখতে চাইলে, মনে মনে খুশি না হয়ে ওঁদের উপায় নেই। তার ওপরে, শ্রোতা বা দর্শককে যদি ওঁরা সমঝদার মনে করেন, তবে তো আরো ভালো। চারপাশে ভাঙনের শব্দ, হতাশা ভোলবার চেষ্টা করা যায়, ক্ষণিকের জন্যে হলোই বা! অতটা না হলেও, দিগেনদার মুখের রেখাগুলি যেন অল্পস্বল্প নড়ল। বললেন,

—"নতুন আর কোথায় ভাই! বেশ কয়েক মাস আগে লিখেছিলুম একটা। সময়ের, নিঃসঙ্গতার ওপর।"

খুব আগ্রহ দেখিয়ে বললুম,

—"শুনিই না একটু। অনেক কাল পর আপনার কবিতা শুনবো। বলুন।"

পকেট ডায়েরি বের করলেন। তার ভেতর থেকে বেরোলো চার ভাঁজে ছোট করা কাগজ। অল্প দূরে লাল আলোর দিকে লেখাটি ঘুরিয়ে, থেমে থেমে পড়তে লাগলেন। বউ, এমন ক্লান্ত গলায় দিগেনদার এত খারাপ কবিতা কোনোদিন শুনতে হবে, এমন দুঃস্বপ্ন দেখি নি কখনো। দু'তিন ছত্র পড়বার পর থেকে আর আমি শুনছি না কিছু। শুনতে ইচ্ছে করছে না। শ্রবণে শুধু মঁসিয় কোর্তোয়ার ফরাসী গান, নাচের শব্দ। মনে হচ্ছে, কি ভীষণ দুঃসময় এবং কতগুলি ভুল দুর্ধর্ষ এক জীবন্ত কবির দুর্গ ভেঙেচুরে খানখান করে দিয়েছে। তাঁর শব্দ-অক্ষর, মাত্রা-অনুভূতির সব অস্ত্রে মরচে পড়ে গেছে। সময় তাঁর দুর্গ কেড়ে নিয়েছে। চোখের সামনে একটা আগুনের মতো মুখ, চশমা, কিছু দুর্দান্ত কবিতার পুরোনো স্মৃতি।

—"কেমন? কেমন লাগলো?"

কিছুতেই জিভ বেয়ে মিথ্যে কথা আসছিল না। তবু, জোর করে বললুম,

—"ভালোই। ভালোই তো।"

দিগেনদার দেশে ফিরে যাওয়া উচিত নয় আর। কি করবেন গিয়ে। ওরা বড় অসম্মান করে। দিগেন পালকে ওরা বড় করুণা করবে।

জিজ্ঞেস করলুম,

—"আপনার কি মনে হয়, দেশে ফিরে যাওয়া দরকার?"

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করলেন। বড় আগ্রহ নিয়ে বললেন,

—"যাবো ভাই, শিগ্‌গিরই যাবো। যেতে যেতেও যাওয়া হয়ে উঠছে না। মা ডাকছেন আমাকে। ভীষণ দেখতে চাইছেন। কি লিখেছেন, জানো?—"

তারপর, বউ, আমি বুঝতে পেরে গেছি দিগেনদা ফরাসী হয়ে যান নি। পারেন নি! ফরাসী হতে চেষ্টা করে কলকাতা হারিয়ে গেছে। সময় একটা বিরাট হাঁ করে ওঁর দেশের ঠিকানা গিলে ফেলেছে। ডায়েরি হাতড়াতে হল না। ভাঁজ করা কোনো পুরোনো কাগজ লাল আলোর সামনে তুলে ধরতে হল না। দিগেনদা মুখস্থ কবিতার মতো বলে গেলেন,

—"পরম কল্যাণীয়েষু, বাবা বাচ্চু। আশা করি ভালো আছো। তোমাকে তিন চারিটি চিঠি পাঠাইয়াছি। পাড়ার সন্তোষের মা লিখিয়া দিয়াছেন। অদ্যাবধি একটিরও উত্তর পাই নাই। বিলটু কোয়ার্টার পাইয়াছে। আমাকেও সঙ্গে যাইতে

হইবে। তোমার বাবার স্মৃতিভরা পুরনো বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে বড় কষ্ট হইবে। তুমি তো আর আসিলে না। আমার ডান হাত এবং ডান পা অবশ হইয়া গিয়াছে। বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারি না। তোমার কন্যাটি সহ বউমা ভালো আছে আশা করি। আশীর্বাদ ছাড়া উহাদের আর কিছু দিবার ক্ষমতা আমার নাই। তুমি অবশ্যই বড় কাজে ব্যস্ত থাকো। তাই চিঠি দিতে সময় পাওনা। বংশের মুখ উজ্জ্বল করো। তোমার বাবার আত্মা তৃপ্ত হইবে। যদি একটু সময় করিয়া বউমা এবং নাতনী-টিকে দেখাইয়া যাইতে, তবে, বড় সুখে যাইতে পারিতাম। যাইবার সময় হইয়া গিয়াছে। মা জগদম্বার ডাক শুনিতে পাইতেছি।

আর অধিক কি লিখিব। মঙ্গলময়ের কাছে প্রার্থনা করি, তোমরা সকলে ভালো থাকো। বড় হও।

ইতি—

আঃ মা

পুঃ—সম্প্রতি তোমাকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। খাটো ইজেরের কষি খুলিয়া গিয়াছে, আমি বান্ধিয়া দিতেছি। এই স্বপ্ন দুইতিনবার দেখিয়াছি। সাবধানে থাকিবা।"

সাদা থান পরে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কেউ চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকে।

মঁসিয় দিগেঁ পলের চোখ টলটল করছে।

সাজানো চিতা নেই, মানুষটার সারা গায়ে দাউদাউ আগুন।
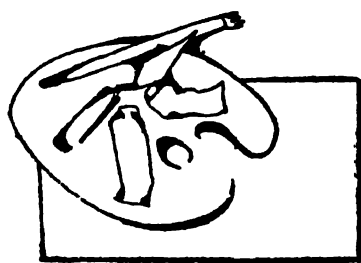
অনেকগুলি মরা পায়রার এক বিরাট স্তূপের মধ্যে বসে আছেন পিকাসো। পাবলো পিকাসো। পরনে খাটো প্যান্টালুন। আদুড় গা। মুখে তৃপ্তির হাসি। চারপাশে পায়রার পালক, রক্ত। ড্রিলিং বা লেদ মেশিন চলার মতো শব্দ পাচ্ছি। বিশাল একটি কারখানার মধ্যে বসে আছি দু'জনে। সমুদ্রের মতো বিশাল। এপার ওপার দেখা যায় না। শুধু, খুব দূরে দূরে অসংখ্য

পেইন্টিং টাঙানো। আকাশের মতো সিলিং থেকে ছেনি, হাতুড়ি, কলকব্জা, কিছু বড় বড় তুলি ঝুলছে।

কোলের ওপরে মৃত পায়রাটির গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে আমায় বললেন,

"এটি দেখতে কি সুন্দর, তাই না!"

বললুম,

—"কিন্তু, ও তো মরে গেছে।"

ধমকে উঠলেন পিকাসো,

—"মরে গেছে তো কি হয়েছে? মরে গেছে বলে কি সুন্দর নয়!"

ভয় পেয়ে গেলুম। তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে বললুম,

—"খুব সুন্দর।"

—"তবে!"

পিকাসো খুশি হয়ে আবার আদর করতে লাগলেন পায়রাটিকে। এমন সময় কিসিংজারের মতো দেখতে পিকাসোর প্রাইভেট সেক্রেটারি এক গামলা ঝালমুড়ি এনে রাখল আমাদের দু'জনের সামনে। তারপর, ওভারকোটের ঢাউস পকেট থেকে লম্বাটে ড্রয়িং বোর্ড বের করল। আগাগোড়া সোনায় মোড়া ড্রয়িং বোর্ড। তা'তে সাধারণ সাদা একটি কাগজ পিন দিয়ে সাঁটা। চারটে পিন চার কোণায়। প্রত্যেকটির মাথায় জ্বলজ্বলে হীরে বসানো। সেক্রেটারির আর এক পকেট থেকে বেরুলো প্ল্যাটিনামের দোয়াত। বোর্ড, দোয়াত কর্তার দিকে এগিয়ে দিল বিনীত ভঙ্গিতে। পিকাসো একটি মৃত পায়রা হাতে তুলে তার পায়ে খানিকটা দোয়াতের কালি ঢেলে দিলেন। তারপর, সেই পা'টি চেপে ধরলেন বোর্ডের কাগজে। টিপসই দেবার মতো।

জিজ্ঞেস করলেন,

—"কি নাম?"

পকেট থেকে ছোট্ট একটি কার্ড বের করে সেক্রেটারি পড়ে শোনাল,

—"মিস্টার ডি ও লরী। বস্টন। ইউ এস্ এ।"

আবার প্রশ্ন পিকাসোর,

—"কত দিল?"

—"চল্লিশ হাজার ডলার।"

বলে, একটি গোলাপী রঙের চেক কর্তার দিকে এগিয়ে ধরল সেক্রেটারি। পিকাসো প্যান্টলুনের পকেটে চেকটি রেখে দিলেন। গম্ভীর মুখে পায়রার পায়ের

ছাপওয়ালা কাগজ সমেত সোনার বোর্ড এবং দোওয়াত ফিরিয়ে দিলেন সেক্রেটারিকে। বললেন,

—"যাও, দিয়ে দাও। আজ আর কারো কাছ থেকে টাকা নেবে না। আমি একটু বিশ্রাম করতে চাই।"

গামলা থেকে এক মুঠো ঝালমুড়ি মুখে ফেলে চিবোতে লাগলেন শিল্পী। আমাকে বললেন,

—"খাও।"

পিকাসোর মাথা মুখ মসৃণ করে কামানো। মাথায় আকাশের সূর্য এবং চাঁদের আলো পড়ে হলুদ আর হালকা নীল রঙের হাইলাইট চকচক করছে। মুড়ি চিবোনোর তালে তালে চোয়ালের হাড় জেগে উঠছে, গালের ভাঁজ নড়েচড়ে চলন্ত ছবির মতন। আমি তন্ময় হয়ে দেখছি। দেখতে দেখতে বললুম,

—"আপনি বললেন বিশ্রাম করবেন। আমি তা হলে উঠি।"

পায়রার গায়ে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে বললেন,

—"আমি বড় ক্লান্ত। অনেক অনেক বছর কাজ করেছি।"

খুব বিনীত, আবদারের গলায় জিজ্ঞেস করলুম,

—"মঁসিয়, আমাকে একটা পায়রা উপহার দেবেন?"

আমাকে ভীষণ চমকে দিয়ে হা-হা করে হাসতে লাগলেন পিকাসো। মাথার ওপরে চাঁদ এবং সূর্যের দিকে মুখ তুলে হাসছেন। আদুড় গায়ের থরে থরে হাসির ঢেউ কাঁপছে। হাতের মৃত পায়রাটি সেই বেদম হাসির শব্দে পত্‌পত্‌ পাখা মেলে উড়াল দিল। তারপর, সব পায়রাগুলি একে একে উড়তে লাগল। অসংখ্য পায়রার ঝাঁক। ওঁর মাথার ওপরে চক্রাকারে উড়ে উড়ে ঢেকে ফেলল আকাশ। কাঁটা দিয়ে উঠল আমার সারা গায়ে। প্রচণ্ড ভয়ে কুঁকড়ে ছোটো হয়ে গেলুম। কানে হাত চাপা দিয়ে চোখ বুজে ফেললুম। উড়ন্ত পায়রার পাখার হাওয়া এবং হাসির শব্দ ধাক্কা দিতে লাগল আমার দু'হাতের দেওয়ালে। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল চারিপাশ। থেমে গেল তুমুল শব্দের ঝড়। সাবধানে চোখ খুলে তাকালুম। দেখি, বয়েস হয়ে গেছে। এত হাসির দম আর নেই পিকাসোর। হাসিমুখে হাঁফাচ্ছেন। আকাশ, চাঁদ, সূর্য সবাই ঠিকঠাক রয়েছে। কোনো পাখি ওড়ে না কোথাও। মৃত পায়রাটি শিল্পীর হাতে শুয়ে আছে। দশ দিকে আবার সেই মৃত পায়রার পাহাড়। একটিও নড়ছে না, উড়ছে না।

ভয়ে ভয়ে বললুম,

—"হাসলেন কেন, মঁসিয় ?"

—"তুমি একটা পায়রা চাইলে, তাই।"

—"তাতে হাসির কি হল, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

এক মুঠো মুড়ি মুখে দিয়ে বললেন,

—"আমার সব চেয়ে সস্তা একটা পেইন্টিঙের দাম কত জানো ?"

বললুম,

—"লাখ-দু'লাখের কম নয় নিশ্চয়ই।"

—"সেই সব পেইন্টিঙের যে কোনো একটা যদি তুমি উপহার চাইতে, দিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু, পায়রা দেওয়া অসম্ভব। একটা গোটা পায়রা তো দূরের কথা, একটি পালকও তোমায় আমি দিতে পারব না, ইণ্ডিয়ান।"

—"কেন ?"

মৃদু মৃদু হাসছেন পিকাসো। বললেন,

—"তুমি এই পায়রাদের চিনতে পারছো না।"

আর একবার সেই মৃত পায়রার বিশাল পাহাড়ের দিকে ভালো করে দেখলুম। খুব সাধারণ সাদা পায়রা সব। কি এমন দেখবার চেনবার আছে কে জানে! মনে পড়ল, এগারো বছর বয়েসের পিকাসো এক জোড়া দারুণ পায়রার ড্রয়িং করেছিলেন। মনে পড়ল, ওঁর বাবা পায়রা পুষতেন। বাড়ির ভেতরেই তারা উড়ে উড়ে বেড়াত। কিন্তু, সেই প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে এই মৃত পাখিদের কি সম্বন্ধ! কিছুই বুঝতে না পেরে বললুম,

—"আজ্ঞে না! চিনতে পারছি না তো!"

হাতের পায়রাটির গায়ে আদর বুলিয়ে বললেন,

—"চিনবে কি করে, ভায়া! এরা সব ব্যক্তিগত কবুতর। একান্তই আমার।"

—"কিন্তু, হে পিকাসো! এতগুলির মধ্যে থেকে যে কোনো একটি আমাকে উপহার দিতে আপনার এত আপত্তি কিসের বুঝতে পারলুম না!"

ধীরে ধীরে মাথা দুলিয়ে বললেন,

—"আপত্তি নয়, ইণ্ডিয়ান। আপত্তি নয়। অসম্ভব। কারণ, এদের নাম পিকাসোর সময়। পাবলো পিকাসোর বয়েস।"

বোকার মতো তাকিয়ে আছি। আবার বললেন,

—'কারুর আপন সময় অথবা বয়েস হাতে তুলে অন্য কাউকে দেওয়া যায় কি ? তুমিই বলো !"

ঘাড় নেড়ে জানালুম, না।

পাহাড়ের ওপারে কিংবা কারখানার বাইরে কে যেন খালি গলায় গান গাইছে। খুব মিষ্টি মেয়েলি গলা। গানের কথা বোঝা যাচ্ছে না। সুর ভেসে আসছে বাতাসে ভর দিয়ে।

জিজ্ঞেস করলুম,

—"আপনার বয়েস কত শিল্পী ?"

খুব যত্ন করে হাতের পায়রাটি নামিয়ে রাখলেন পাহাড়ের গায়ে। তারপর, অনেক অনেক দূরে তাকিয়ে থাকলেন। নিজেকেই বললেন বোধহয়, কেমন যেন বিষণ্ণ শোনাল,

—"আজ নব্বুই বছর। কাল জানি না।"

—"তার মানে ?"

—"মানে ?"

বলে, আমার চোখে চোখ রাখলেন পিকাসো। আবার বললেন,

—"পায়রাগুলি গুণে দেখো, ইণ্ডিয়ান। একটি পায়রা আমার এক বছর।"

বললুম,

—"এখানে তো নব্বুইটির অনেক বেশি দেখছি।"

—"কত বেশি, গুণে দেখো ! আমি ভরসা পাই না।"

—"কেন ?"

—"যদি গুণতে ভুল হয়, যদি কম মনে হয়—তা হলে সুখ নেই !"

পায়রা গুণতে লাগলুম এক এক করে। মৃত পায়রার পাহাড়। গুণে গুণে আর শেষ হয় না। গুণছি তো গুণছি তো গুণছিই—! মেয়েটি কানের কাছে এসে গান গাইছে। খুব চেনা সুর। কোথায় যেন শুনেছি গানটি। বহুদূরে চোখ পেতে বসে আছেন পাবলো পিকাসো। সূর্যের মধ্যে চাঁদ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। পায়রা গুণতে গুণতে ঘেমে গেছি আমি। দুশো সত্তর। চারশো ছয়। পাঁচশো বাহান্ন—, না কি, একশো বাহান্ন—গুলিয়ে যাচ্ছে। সারা গায়ে দরদর ঘাম !···

চোখ খুলে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলুম না। শুধু, টের পেলুম, সারা গায়ে ঘাম। ওই তো আমার ঈজেল। বারান্দার দিকে কাচের দরজা পেরিয়ে বৃষ্টি

দেখতে পাচ্ছি। শুয়ে আছি মেজোঁর ঘরে। কোথায় পিকাসো কোথায় পায়রার পাহাড়! স্বপ্ন দেখছিলুম ঘুমের মধ্যে। কম্বল সরিয়ে উঠে বসলুম খাটে।

স্বপ্নের কথা ভাবতে ভাবতে তোয়ালে দিয়ে গায়ের ঘাম মুছলুম। ঢকঢক করে বোতল থেকে জল খেলুম এক পেট। আচ্ছা, বউ! আমার চারপাশে পায়রার পাহাড় হবে না? মৃত পায়রা আমাকে কেউ পাঠাবে না জন্মদিনে! আবোল-তাবোল ভাবছি। এখনো ঘোর কাটে নি। চোখে মুখে জল দিয়ে গোবিন্দর হীটারে কালো কফি করে নিলুম এক কাপ। বাইরে, মিষ্টি গলায় ফাম্ ত্য মিনাজ গান গাইছে। করিডোর এবং বাসিন্দাদের ঘর ঝাড়পোঁছ করবার সময় রোজ গান গায় মহিলা। মোটাসোটা মাঝবয়েসী। বুড়ীই বলা যায় বোধহয়। ছোট্ট একটি পুরোনো গাড়ি করে সকালে আসে। বারোটা একটার মধ্যে কাজ সেরে চলে যায়। কলকাতার একটি ঠিকে ঝি, মনে করো খেঁদির মা, মোটরগাড়ি চেপে এসে তোমার রান্নাঘর সাফ করে, বাসন মেজে দিয়ে চলে গেল, ভাবতে পারো বউ!

কফির কাপ হাতে খাটে গিয়ে বসলুম। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। ক'টা বাজে জানতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু, আবার উঠে গিয়ে টেবিলে রাখা হাতঘড়ি দেখার আলসেমি। সুতরাং, খাটে আধশোয়া হয়ে কাপে চুমুক দিলুম। মনে মনে হিসেব করে দেখলুম, ফাম্ ত্য মিনাজ এসে গেছে মানে কম-সে-কম ন'টা। বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কত বেলা বোঝবার উপায় নেই। সব কেমন সাদা সাদা ধোঁয়ায় ঝাপসা। একটি গানের সুর ছাড়া বাইরের পৃথিবীর আর কোনো শব্দ আসছে না ঘরে। গতকালের সব ঘটনা কেমন অবাস্তব মনে হচ্ছে। পিকাসোর স্বপ্নের মতো। কত রাত অবধি যিশুর বাড়িতে ছিলুম। মনে পড়ছে না। খাবার-দাবার খেয়েছি কিনা তাও ভুলে মেরে দিয়েছি। কি করে যে মেজোঁতে পৌঁছে গেছি, নিশ্চিন্ত বিছানায় শুয়ে পড়েছি, কিচ্ছু মনে নেই। এত মদ বহুদিন খাই নি। ধক করে ভাবনা এলো, ঈভলীনের সঙ্গে বেচাল ব্যবহার কিছু করি নি তো! বেহুঁশ হয়ে অসামাজিক কিছু। তা হলে তো হয়ে গেল! এরকম আমার হয় না, সে তো তুমি জানোই, বউ। হুঁশ হারিয়ে রাত্রে ঘরে ফিরে সকালে কিছু মনে নেই, এ বড় মজার, করুণ অবস্থা। সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, ঘড়ি, টেবিলে ঠিক ঠিক জায়গায় আছে। অথচ জামাকাপড় ছাড়লুম কি করে, কিচ্ছু মনে নেই।

কফি শেষ করে খাটের তলায় কাপ রেখে দিলুম। সিগারেট খেতে ইচ্ছে

করছে। ঘাম-গরম কমে গিয়ে আবার একটু একটু শীত ভাব। সিগারেটের প্যাকেট হাত বাড়িয়ে পাব না। ওঠবার ইচ্ছে নেই। শুয়ে শুয়েই পায়ের দিকে নেমে গেলুম। পা দিয়ে টেবিল ছুঁতে পারি এখন। আরো একটু পিঠ ঘষে নেমে, পা তুলে দিলুম টেবিলে। ডান পায়ের বুড়ো এবং তার পাশের আঙুলে চেপে ধরলুম প্যাকেট। হাতে এসে গেল তারপর। দেশলাইও একইভাবে পেয়ে গেলুম। উঠে বসে, হাত বাড়িয়ে নিতে হয়তো এর চেয়ে অনেক কম কসরৎ করতে হতো! কিন্তু বেশি কসরৎ হয়, হোক, উঠে আমি বসব না—এমন জেদ বা আলসেমি অথবা আলসেমির ইচ্ছে আমার প্রায়ই হয়। সকালে ঘুম ভাঙার পর হলে তো কথাই নেই। মনে আছে, বউ? সেই যে, খাটে শুয়ে তুমি খবরের কাগজটা চাইলে, বললে,

—"আজকের কাগজটা একটু দাও না!"

সবে ঘুম থেকে উঠে বসেছিলুম। কাগজটা আনতে হলে আমাকে দাঁড়াতে হয়। তোমাকে উঠতে হয় বিছানা ছেড়ে।

বললুম,

"তুমি উঠে নিয়ে নাও।"

—"আহা, আমাকে উঠতে হয়, তা হলে।"

কি যেন ভাবছিলুম! কিংবা কিছুই ভাবছিলুম না হয়তো। হাতে পায়ে আলসেমি লেগেছিল। বললুম,

—"আমাকেও তো উঠতে হবে।"

তুমি যুক্তি দেখালে,

—"তোমাকে কম উঠতে হবে। অর্থাৎ বসা থেকে দাঁড়াতে হবে। আমাকে দাঁড়াতে হলে তার চেয়ে বেশি পরিশ্রম। শুয়ে আছি, বসতে হবে। তারপর দাঁড়ানো।"

ভোরবেলার কুঁড়েমিতে দু'জনেই সমান সমান। উঠে দাঁড়াতে এতোই খারাপ লাগছিল, ঝুপ করে শুয়ে পড়লুম টানটান। বললুম,

—"আমিও শুয়ে আছি।"

আজকে মনে পড়তে হাসি পাচ্ছে। কিন্তু, সেদিন সেই সময় উঠে দাঁড়াতে সত্যিই ইচ্ছে করছিল না। হাঙ্গ-ওভার-টোভার কিছু নয়, স্রেফ যে অবস্থায় ছিলুম, তার থেকে নতুন অবস্থায় যাওয়ার চেয়ে গা এলিয়ে শুয়ে পড়ায় কষ্ট কম, এই রকমই মনে হয়েছিল তখন। তুমি চটে-মটে হেসে ফেলেছিলে।

সিগারেট ধরিয়ে বুকের ভেতরে ধোঁয়ায় খুব আরাম গেলুম। প্রচুর মদের পরদিন সকালে ভরপেট ঠাণ্ডা জল আর প্রথম সিগারেট খেতে বড় সুখ।

আজ কি বার সে প্রশ্ন মাথায় আসে নি এতক্ষণ। ফাম্ দ্য মিনাজের গান বন্ধ হয়ে গেল আচমকা। তারপর যা শুরু হল তাতেই টের পেয়ে গেলুম, আজ সোমবার। অত সুন্দর মিষ্টি গানের গলা খন্‌খনে হয়ে গেল। আমাদের খেঁদির মার মতো চাঁচাছোলা।

—"হারামজাদা, আবাগির ব্যাটারা! কোত্থেকে যে জ্বালাতে আসে শয়তান মুনিষ্যিগুলো! অলপ্পেয়ে, বেজাতের দল। হুঁহ্, পড়াশোনা করতে আসে না ছাই!—"

প্রথম সোমবার গজর গজর শুনে দরজা খুলে উঁকি দিয়েছিলুম। এখন আর তার দরকার হয় না। সাদা বুড়িকে স্পষ্ট দেখতে পাই। ঝোলা অ্যাপ্রন হাঁটুর ওপরে তুলে নাকে ন্যাপকিন চাপা দিয়েছে। অন্য হাতের ডাণ্ডাওয়ালা ঝাড়ু দিয়ে কার ঘরের মেঝে সাফ করছে। খালি সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাইয়ের কাঠি, ধুলোবালি টেনে টেনে বের করে আনছে করিডোরে। এসব জঞ্জাল রোজ সকালেই থাকে। শনি-রবি ফাম্ দ্য মিনাজের ছুটি। ওই দু'দিন কারো ঘরেই ঝাড়পোঁছ হয় না। সোমবারে তাই ময়লা একটু বেশি। তাতেও সুরেলা গান থেমে যায় না হঠাৎ। ছুটির দুদিন মেজোর, অনেকেই আলাদা আপন ইচ্ছে মতন অথবা একসঙ্গে দল বেঁধে ফুর্তি-টুর্তি করে থাকে। যদিও, আইনত বাইরের কোনো পাখি বা বান্ধবীর কোনো ঘরেই রাত্রিবাসের কথা নয়। তাহলেও, আইন পৃথিবীর কোথায় নেই! ফুর্তির চোটে এক-আধ টুকরো আইন খুব সাবধানে ভেঙে ফেললে এমন কোনো বাইবেল-মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না! ধরা না পড়লেই হল হাতে-নাতে! তাছাড়া, ফুর্তিরও তো নিজস্ব আইন-কানুন আছে রে বাবা। সেই দু'নম্বর আইনে ফুর্তি-টুর্তি কারো কারো ঘরে বেশি হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এক নম্বর আইন লাগু হতে হতে সেই সকাল। কাজকর্ম, কলেজ-একোলের তাড়ায় ভুলও হয়ে যেতে পারে তখন। দ্বিতীয় আইনে ফুর্তির পরিত্যক্ত বাচ্চারা ঘরের মেঝেয় ধুলোতে গড়াগড়ি যায়। ছোটো ছোটো রবারের টুপিরা সবাই বেচারি ফাম্ দ্য মিনাজের অপেক্ষায় বসে থাকে, বেলা নটা-দশটা অবধি।

"অশ্লীল, নেংরা শুয়োরের দল! ধোপ-দুরস্ত জামাপ্যান্ট পরে সায়েব সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এখন! মুদ্দোফরাশ—ঝাঁটা মারি তোদের মুখে—"

সাদা বুড়ির বিকৃত মুখ চোখে ভাসে তখন। হাসতে গিয়েও হাসতে পারি না, যখন ভাবি, মায়ের বয়সী মহিলা। যখন শুনি বলছে, গালাগালের স্বরেই বলছে যদিও।

—"মর, মর তোরা! তোদের নোংরামি ঘেঁটে এই বয়েসে আমার শাপ লাগুক। তোরা কুকুর-বেড়াল হলে আমাকে এসব ঘাঁটতে হত না। হা ঈশ্বর! তুমিই বলে দাও, কোন্ মুখে কি লজ্জায় আমি এসব ম্যানেজারকে বলি! কাকেই যা বলি—"

তারপর, আর গান শোনা যায় না সেদিন। চুপচাপ নিজেব কাজ সেরে সবশেষে আমার ঘরে টোকা দেয় বুড়ি। জানে, আমি ঘরেই থাকি। বেলা করে উঠি।

এর মধ্যে দুদিন কফি করে খাইয়েছি ওকে। আমায় বোধহয় একটু নেকনজরে দেখতে শুরু করেছে। ভাবতে ভাবতে টোকা পড়ল দরজায়। মাথার কাছে আলমারি। তারপর দরজা। খাটে উঠে না বসলে দরজা দেখা যায় না।

শুয়ে শুয়েই বুড়িকে বললুম,

—"আঁত্রে মাদাম।"

খুট্ করে দরজা খুলল। বললুম,

"ক'টা বাজে মাদাম?"

মাদাম চুপ। আবার জিজ্ঞেস করলুম,

—"দশটা বেজে গেছে?"

কোনো জবাব নেই। খাটে উঠে বসতেই আমাকে অবাক করে দিয়ে তুমি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছো, বউ। না, তুমি নও। আবার সেই চোখের কিংবা মনের ভুল। ঈভলীন। ঈভলীন দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,

—"তুমি!"

দরজা ঠেলে বন্ধ করে বলল,

"কোন্ মাদাম আসার অপেক্ষায় শুয়ে আছো ইণ্ডিয়ান?"

ধাতস্থ হয়ে হাসলুম।

—"এসো। বেসো। আমি ভাবছিলুম, ফাম্ দ্য মিনাজ এসেছে।"

—"ঠিকই ভেবেছো! ঝিয়ের মতোই দেখাচ্ছে আমাকে! কত্তা তো চারদিন হল জুরিখ গিয়েছিল কাজে, ভোর রাত্তিরে আমি বাড়ি পৌছোতে না

পৌঁছোতেই এসে হাজির। আর ঘুম হয়! সারারাত জেগে কি চেহারা হয়েছে, ত্যাখো!"

ওভারকোট নেই। হাল্কা সবুজ এবং সাদা মিলিয়ে পুলওভার। সাদা ট্রাউজার। বেশ তাজাই দেখাচ্ছে! মুখে-চোখেও রাত জাগার ক্লান্তি খুঁজে পেলুম না। বললুম,

—"চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে।"

—"থাক্। রসিকতা করতে হবে না। ওঠো।"

অবাক হয়ে বললুম,

—"কোথায়!"

আমার হাত ধরে টানল,

—"আহা, চলোই না!"

গত রাত্রে বেচাল কিছু করি নি, সন্দেহ নেই। তাহলে ও আসতোই না। করুণ গলায় বললুম,

—"বাইরে এই বৃষ্টি। এখন আর বেরোতে ইচ্ছে করছে না।"

—"প্লীজ্। একটু ওঠো। বেরোতে হবে না। শুধু একতলায় এলেই হবে।" আবার হাত ধরে টানল। সন্দেহের গলায় জানতে চাইলুম,

—"শুধু নিচে গেলেই চলবে?

—"হ্যাঁ।"

—"আমি কিন্তু চেঞ্জ করছি না!"

—"দরকার নেই।"

লুঙ্গি পরেই বেরিয়ে এলুম। কি ব্যাপার কে জানে! কোনো গণ্ডগোল নেই তো। বেহুঁশ অবস্থায় কি করেছি কাল, মনেই নেই কিছু। তারই কোনো কালো নজির নিয়ে এলো নাকি ঈভলীন!

করিডোর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি দু'জনে।

ফাম্ দ্য মিনাজ ঝাড়ু হাতে এক দলা বিরক্তি বিস্ময় মুখে মাখিয়ে ঈভলীনকে দেখল। দ্রুত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আপাদমস্তক যতটা দেখা যায়। ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসি পেয়ে গেল আমার। মনে হল, যেন বলছে,—এইসব মেয়েরাই সব গুয়োর তৈরি করে। এরাই মেজোঁর নোংরামির মূলে। বুড়ির দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই মৃদু হেসে অভিবাদন জানালুম।

—"বঁ জুর। মাদাম।"

হাঁ করে আছে। জবাব দিতে পারল না।

ঈভলীনকে জিজ্ঞেস করলুম।

—"কি ব্যাপার বলো তো? কেউ দাঁড়িয়ে আছে নিচে?" গম্ভীর মুখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। বলল না কিছু।
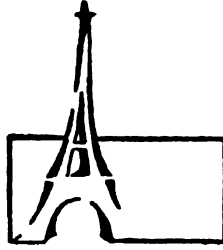
রিসেপশনের পাশ দিয়ে কাচের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালুম দু'জনে। কাউন্টারে চাঁড়ালমশাই টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলছেন। বসবার সোফাগুলি খালি। দরজা টেনে খুলল ইভলীন। বলল,

—"এসো।"

এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে শীত চাপিয়ে দিল গায়ে। বললুম,—"বাইরে যেতে হবে। গায়ে তো আমার গরম কিছুই নেই। তুমি বললে, শুধু নিচে অবধি!"

—"উফ্! শীতকাতুরে কোথাকার! ওইটুকু তো যেতে হবে, ওই গাড়িটা পর্যন্ত!"

মেজো থেকে বেরিয়ে যাবার সিঁড়ির মুখে একটা কালো ভ্যান্ দাঁড়িয়ে। বেশ বড় ভ্যান্। কালো একটা বন্ধ বাক্সের মতো। গায়ে সাদা এবং ধূসর রঙে বিজ্ঞাপন কোম্পানীর নাম।

গাড়িটির দিকে তাকিয়ে ঈভলীন ডাকল,

—"মঁসিয় শেভালিয়ে!"

জবড়জং বাদামী রঙের ওভারকোট গায়ে, ধূসর টুপি মাথায় গাড়ির সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন জর্জ বার্নার্ড শ'। সেই চোখ সেই নাক। দাড়ি পেকে ঝুরঝুরে সাদা। ভারতবর্ষের কোনো গাড়ির ড্রাইভারের এমন বুদ্ধিমান, সম্ভ্রান্ত চোখ আমি দেখি নি, বউ। পকেটে শ'য়ের ছবি থাকলে মঁসিয় শেভালিয়েকে

দেখিয়ে দিতুম। এবং আমি জানি, বুড়ো চমকে উঠত। ফরাসী ড্রাইভারের সঙ্গে বার্নার্ড শ'য়ের চেনাজানা থাকার কথা নয়।

ইশারায় কি যেন বলল ঈভলীন। মাথা ঝাঁকিয়ে খুব চটপটে ভঙ্গিতে গাড়ির পেছনে চলে এল বুড়ো। দু'পাল্লার দরজা খুলে ভেতরে চলে গেল।

বৃষ্টির তেজ কমে এসেছে। ঈভলীন বলল,

—"এসো। একটু সাহায্য করো।"

ওর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির পেছনের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমার পরনে লুঙ্গি আর সেই ছেঁড়া-হাতা গেরুয়া পাঞ্জাবিটা। ঠক্‌ঠক্ করে শীতে কাঁপছি। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। মঁসিয় শেভালিয়ে ভেতর থেকে একটা ক্যানভাস এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। নতুন, ধবধবে সাদা ক্যানভাস। মনে মনে আমি সব টের পেয়ে গেলুম। ঈভলীনের দিকে চোখ চলে গেল আপনা থেকেই। গাড়ির ভেতরে দেখছে ও। বুড়োকে বলছে,

—"সাবধানে মঁসিয়। পেরেক-টেরেক লেগে ছিঁড়ে না যায়। একটা একটা করে এগিয়ে দিন।"

সব টের পেয়ে গেলুম, মনে মনে। তবু, সেই নদীর পারে শহরের জাঁদরেল ডাক্তারবাবু ভুরু কুঁচকে আমায় জিজ্ঞেস করলেন,

—"কি ব্যাপার ?"

ঈভলীনকে বললুম,

—"কি ব্যাপার।"

দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারমশাই এক হাতে শঙ্কর মাছের চাবুক, অন্য হাতে চম্‌চম্ নিয়ে ধমক দিলেন,

—"লজ্জা করে না, হারামজাদা।"

ঈভলীনকে বললুম,

—"কি করতে হবে!"

ও তাড়াতাড়ি বলল,

—"আহ্! ভিজে যাবে! শিগ্‌গির মেজোঁর ভিতরে নিয়ে গিয়ে রাখো।"

কয়েক মাস অভুক্ত ভিখিরি কিংবা চোরের মতো চুপিচুপি একটার পর একটা ক্যানভাস ঘরে নিয়ে এলুম। তোলবার সময় ঈভলীনও হাত লাগিয়ে সাহায্য করল। ডাক্তারবাবু, জমিদারমশাই আমার রক্তের মধ্যে থুতু ছেটালেন। তাতে আমার শিরা উপশিরায় রক্ত কি জোলো হয়ে গেল, বউ। মেডিকেল

কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তদান করতে গেলে ডাক্তাররা কি নাকচ করে দেবে আমাকে, 'না মশাই, ও রক্ত চলবে না। কোনো গ্রুপেই পড়ে না। থুতু ভর্তি!' ওসব আমি জানি না। কিছুই বুঝতে পারছি না এখন। কারণ, রোগ সারানো জনকল্যাণ অথবা চম্‌চম্ খাওয়ার তৃপ্তির সঙ্গে ছবি আঁকার খিদের কোনো মিল বা তুলনা চলে বলে আমার জানা নেই। জর্জ বলেছিল, আমার নাকি বড় অহংকার। কিন্তু, ওর দেওয়া কার্পেট বা ইজেলে আমার খিদে মেটার কথা নয়। নুন-গোলমরিচ, হলুদ কিংবা পাঁচফোড়ন খেয়ে কি খিদে মেটে? ভাত চাই, ভাত! আমাকে ভালো-লাগার মন নিয়ে জর্জ যেটুকু সাহায্য করেছে, সেই ভালো-লাগা, সেই ভাবের প্রকাশে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলুম, তাতে কোনো খাদ নেই নিশ্চয়ই। তবু অবচেতনে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের দাঁড়িপাল্লায় হেরে কিংবা জিতে অহংকার ফোটে না বোধহয়। তিন মাস ছবি আঁকতে না পারার পর কুমারী সুন্দরীদের মতো কিছু সাদা সাদা ক্যানভাস আমার বড় প্রয়োজন।

শেষ ছোট ক্যানভাসটি ঈভলীন হাতে নিল। মঁসিয় শেভালিয়ে একটা প্লাস্টিকের থলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন গাড়ি থেকে। থলেটি আমায় দিয়ে পেছনের দরজা বন্ধ করছেন। ক্যানভাস নামিয়ে তুলতে তুলতে বৃষ্টি কখন থেমে গেছে খেয়াল করি নি। পেঁজা তুলোর তুষার পড়ছে ঝুরঝুর। বাঁ হাতে থলেটি বুকের কাছে চেপে ধরে ডান হাত শূন্যে বাড়িয়ে দিলুম ভিক্ষুকের মতো। আকাশ থেকে ঠাণ্ডা তুলো পড়তে দেখি নি কখনো। শুনেছি, বইয়ে পড়েছি। এখন, আকাশে এক অদৃশ্য ধুনুরী আপন মনে বসে তুলো ধুনছো। অতিকায় সব বালিশ, তোশক তৈরি হচ্ছে যেন। এদিকে, বিশ্বচরাচর ঠাণ্ডায় সাদা হয়ে গেল। মুখ তুলে তাকালুম। চোখে, কপালে, সারামুখে তুষার পড়ছে নরম নরম। হাতে তুষার পড়ছে, গলে যাচ্ছে। শরীরের স্বাভাবিক গরম রক্তের ছোঁয়ায় হাতের, মুখের চামড়ায় গলে যাচ্ছে আকাশের ঠাণ্ডা তুলোর কণাগুলি। এখন মনে পড়ার কথা নয়, তবু, দিগেনদাকে মনে পড়ল এক ঝলক। দিগেনদা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে। একা একা। মুখ তুলে কি প্রার্থনায় আকাশে তাকালেন। তুষারে মুখ সাদা হয়ে গেল। মঁসিয় দিগেঁ পলের চামড়ায় বরফ পড়লে, গ'লে গ'লে জল হয়ে যাবে কি এখন!

—"ইণ্ডিয়ান, কি হল? এসো!"

ঈভলীন ডাকছে। ঈভলীন তাকিয়ে আছে। ঈভলীন ঘরে ঢুকে খাটে বসে পড়েছে। ঈভলীন তেরোটা সাদা ক্যানভাসের মতো আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে

ধরেছে। আলাপ হবার পর কাল থেকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিলুম, এখন, বেকুবের মতো লজ্জায় ওর চোখে চোখ রাখতে পারছি না।

বহু কষ্টে নিজেকে জড়ো করে ওর দিকে তাকালুম। রুমালে মুখ মুছছে। সেই হাসিমুখ। অনেকক্ষণ পর এই প্রথম কথা বললুম। যা বললুম তাও নিজের কানেই কেমন অর্থহীন শোনাল,

—"এসব কি ঠিক হল, মানে, ভালো হল কি এমনিভাবে তোমার ভিক্ষে দেওয়া অথবা আমার সেই ভিক্ষে চোরের মতো গ্রহণ করা ?"

ওর হাসিমুখ কেমন বোকা বোকা অথবা নীল হয়ে গেল। শান্ত গলায় থেমে থেমে কথা বলল ঈভলীন,

—"অমনভাবে বোলো না। আমি তোমাকে ভিক্ষে দিই নি ইণ্ডিয়ান। আমার সাধ্যের মধ্যে থেকে তোমাকে কিছু উপহার দিলুম। 'কেন' জিজ্ঞেস করো না! জবাব খুঁজে পাব না। বলতে পারো, মন বলল, তাই। ইচ্ছে হল, তাই।"

চুপ করে আছি। গলার স্বর পালটে জিজ্ঞেস করল,

—"এবার তো নিজের কাজ আরম্ভ করতে পারবে ?"

বলতে বলতে উঠে এসে প্লাস্টিকের থলেটি খুলে ফেলল। তার ভেতর থেকে একটার পর একটা রঙের বাক্স, তুলি, দুটি স্প্যাচুলা, তেলের শিশি গুছিয়ে রাখতে লাগল টেবিলে। আবার স্বাভাবিক হয়ে এল গলার স্বর। কথা বলছে ঈভলীন। আমাকেই বলছে। ঠিকঠাক শুনতে পারছি না আমি। বাইরে, কাচের ওপারে তুষারের সাদা পর্দা ঝুলছে। মাথার ভেতর অনেক প্রশ্ন, লজ্জা, অসহায় রাগ এক-সঙ্গে জড়ো হয়ে ঘুরছে, ঘুরছে। ওদের প্রত্যেকের গায়ে গায়ে নতুন সুন্দর পোশাকের মতো অস্পষ্ট আনন্দ আমাকে বোবা করে দিয়েছে।

ঈভলীন বললে,

—"তুমি খুব কন্‌ফিউজ্‌ড্‌ ক্যারেকটার, তাই না ?"

সামান্য চম্‌কে মেয়েটির দিকে তাকালুম। ও আবার বললে,

—"শেষ রাতে তোমাকে যখন পৌছোতে এসেছি, তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে ?"

বললুম,

—"না তো। কিছুই মনে নেই! তুমি আমাকে পৌছোতে এসেছিলে ?"

—"হ্যাঁ। আমি আর পিয়ের। তুমি একেবারে আউট হয়ে গিয়েছিলে।

আমাদের দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে দোতলায় উঠেছো। ওই ক'টা সিঁড়ি ভাঙতে তুমি সময় নিয়েছো অন্তত পনেরো মিনিট।"

—"কি বলেছি আমি?"

জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করল ঈভলীন,

—"মোঁমাত্রে ছবি-আঁকা তোমার খুব পছন্দ নয়, তাই না?"

—"কেন? কি বলেছি, বলোই না!"

—"কাল আমরা দু'জনে টের পেয়ে গেছি তুমি খুব সেন্টিমেন্টাল এবং তোমার মাথাভর্তি ইগো।"

ও হাসছে। কৌতূহলে অধৈর্য হয়ে উঠেছি আমি। বললুম,

—"তোমার মন্তব্যগুলি পরে শুনবো। বেহুঁশ অবস্থায় আমি কি বলেছি, সেইটুকুই শুনতে চাইছি।"

নিজেকে জানার আগ্রহে বাইরের অমন ধবধবে স্নিগ্ধ তুষার ভুলে গেলুম। সাদা ক্যানভাসের মতো প্রিয় জিনিসও এই মুহূর্তে ঝাপসা হয়ে গেল মস্তিষ্কে। মাথার মধ্যে খালি হাতুড়ির ঘা পড়ছে, 'কি বলেছি', কি বলেছি'!

ঈভলীন বলল,

—"তোমার জড়ানো জিভে অনেক মনের কথা প্রকাশ করেছো তুমি!"

তারপর আমাকে নকল করবার ঢঙে বলতে লাগল,

—"আমি কেন মোঁমাত্রে বসে মুখ আঁকবো? এইসব খদ্দেরদের মুখগুলো সব মিথ্যে! সব মুখোশ এঁটে কিংবা সারামুখে প্লাষ্টিক সার্জারি করে আসে শিল্পীদের সামনে। যৌনরোগীদের মতো অসুখ, গভীর অসুখ ঢেকে হ্যা হ্যা করে হাসে। সুখ নেই সারা চোখেমুখের ভেতর কোথাও। বুঝলে যিশু, মুখ হচ্ছে ভেতরের আয়না। এইসব দরিদ্র মুখ আমি চিনে ফেলি। কষ্ট হয় আমার। শালাদের কিস্সু হয় না! কিস্সু না! কারণ ওদের সত্যি মুখরে ছবি আঁকলে —শালারা নিজেরাই চিনতে পারবে না। বলবে—হ্যা হ্যা, হয় নি মাইরি! পোত্রেত মেলে নি।"

তোমার যিশু বলেছে,

—"ঠিক আছে, ইণ্ডিয়ান। চলো, ওঠো! ঘরে চলো।"

তুমি আমাদের কাঁধে ভর দিয়ে কয়েক ধাপ উঠেই আবার দাঁড়িয়ে পড়েছো। পিয়েরকে বলেছো,

—"যিশু, তুমি আমার দোস্ত্!"

মনে রেখো, ইণ্ডিয়ান, ওই 'দোস্ত' শব্দটি বলতে বলতে তুমি তোমার বুকে হাত চাপড়েছো, তারপর আবার বলেছো,

—"তোমার জন্যে জান ছাড়া সব দিতে পারি। তুমি আমাকে যে সম্মান দিয়েছো, তাতে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু, একটা কথা মনে রেখো, জীসাস্ ক্রাইস্ট, কেরানীর মতো ছবি আঁকতে আমি রাজী নই। মিথ্যে, নকল মুখ আমার চাই না।—" বলে, আবার তিন ধাপ উঠতে না উঠতেই টাল খেয়েছো। দু'জনে মিলে সামলে নিয়েছি। তক্ষুনি, ঘুরে আমার দিকে চেয়ে বলেছো,

—"ছাখো, সুন্দরী! তোমাকে আমি চিনি এবং চিনি না। সেই জন্যেই তোমাকে আমার ভয়—"

তারপর, তুমি আমাকে যা বলেছো, আমি তা কোনোদিনও মুখ ফুটে তোমাকে বলতে পারব না, ইণ্ডিয়ান।

ঈভলীন চুপ করে নতমুখে বসে। ওর পাশটিতে গিয়ে আমিও বসলুম। খুব নরম, সামান্য ভীরু গলায় বললুম,

—"দেখ, ঈভলীন। কাল রাত্তিরে মত্ত অবস্থায় কি বলেছি না বলেছি কিছুই খেয়াল নেই। আশা করি, মোঁমাত্রে ছবি আঁকার ব্যাপারে তোমরা আমাকে উল্টো বুঝবে না। পয়সাকড়ি কিছু রোজগার করা দরকার তো বটেই! আমি, মানে—"

ঈভলীন মুখ তুললো। ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি মাখিয়ে বললে,

—"কালকেই তো বললুম, তোমার প্রেমে পড়ে গেছি! তোমাকে উল্টো-পাল্টা বোঝার অবস্থা কি আমার আছে!"

এখন যে ও ঠাট্টা করেই বলছে, তা বুঝতে পারছি ঠিকই। কিন্তু, কালকের কথা মনে পড়তেই ভীরু চোখে একবার তাকিয়ে দেখলুম। দুষ্টুমির হাসি মিলিয়ে গিয়ে মুখ গম্ভীর করে বলল,

—"তাছাড়া, পিয়েরও ফিরে যেতে যেতে গাড়িতে তোমার দারুণ প্রশংসা করল। তোমার নাকি খুব খোলা, দুঃসাহসী শিল্পীমন। ইত্যাদি, ইত্যাদি।"

ঈভলীনের সঙ্গে তেমন কথার মারপ্যাঁচ জমল না আর। চুপচাপ বসে একটা চারমিনার ধরালো ও। কাশলো। অল্প পরিচিতা এই মেয়েটির উপহার কতগুলি সাদা ক্যানভাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি বাইরের তুষার দেখলুম।

স্তেন নদীর জল ভালো করে দেখা যাচ্ছে না এখন। তুষারের দেওয়াল চার-পাশ ঢেকে দিয়েছে আমাদের। ঘরে একটু কফি খেতে চেয়েছিল ঈভলীন। চিনি

ছিল না। একসঙ্গে বেরিয়ে এসেছি দু'জনে। সাঁ মিশেলে মেট্রো থেকে বেরিয়ে মত পালটে ফেলল ও। কফির বদলে আইসক্রীম খাবে। বললুম,

—"এই ঠাণ্ডায় আবার আইসক্রীম।"

—"ওই যে বুড়ি জবুথবু বসে আছে, ওর আইসক্রিম খুব ভালো। স্বাদই আলাদা। আগে, এ পাড়ায় এলে প্রায়ই খেতুম।"

বুড়ি ও তার আইসক্রিমের গাড়ি দেখে বললুম,

—"আকাশের দিকে তাকাও, পেট ভরে বিনি পয়সায় আইসক্রিম খেতে পারবে।"

হাঁ করে মুখ তুলে চোখ বন্ধ করল ঈভলীন। প্রসাধনের সময় সারা মুখে স্নো অথবা ক্রিম লাগানো হচ্ছে যেন। দু'দণ্ড তেমনি দাঁড়িয়ে বলল,

—"উঁহু! আকাশ আইস দিচ্ছে বটে! ক্রিম নেই। বুড়ি দুটোই দেবে!"

ও বিল মেটাতে চেয়েছিল। মোঁমার্ত্রের প্রথম রোজগার থেকে আমিই খাওয়ালুম। বললুম,

—"আমার সাধ্যের মধ্যে সামান্য উপহার, মাদাম!"

ঝগড়া করতে গিয়ে থেমে গেল। দু'পলক আমাকে দেখে হেসে ফেলল,

—"তুমি বেশ কম্প্লিকেটেড ক্যারেকটার, বাবা!"

জবাব দিলুম,

—"আমার তো মনে হয় পৃথিবীর সব চরিত্রই কমবেশি জটিল। তুমিও সরল বোধের মধ্যে পড়ো না!"

আমার বাহুর ওপরে ওর হাত জড়ানো। অদৃশ্য নদীর জল থেকে চোখ ফিরিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করল,

—"কেন শিল্পী, আমি তো সাদামাটা প্যারিসিয়েঁ ঈভলীন।"

একই সুরে জবাব দিলুম ওর দিকে চেয়ে,

—"আমিও তো কালোমাটা ইণ্ডিয়ান!"

ও এতো জোরে হেসে উঠবে আমি বুঝতে পারি নি। হাসতে হাসতে আমার তুষার-সাদা কাঁধে গাল ছুঁইয়ে ফেলবে ভাবতে পারি নি। একটা মোটরলঞ্চের আবছা ধূসর শরীর সামনে থেকে এসে পুলের তলায় চলে গেল। স্বপ্নের ছায়ার মতো অস্পষ্ট আউটলাইন। ক্ষীণ ভট্-ভট্ শব্দ শীতে কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল।

ঈভলীনকে বললুম,

—"তোমাকে কাল নেশার ঘোরে কি বলেছি বললে না কিন্তু!"

—"ও আমি হয়তো কোনোদিনও বলতে পারব না।"

—"আমি যিশুকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব!"

—"তোমার অস্পষ্ট জড়ানো কথা ও বুঝতে পারে নি। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। ওকেও বলি নি।"

—"খারাপ কিছু?"

—"জানি না!"

—"ভালো কিছু?"

—"জানি না।"

দু'জনের মুখের ব্যবধানে তুষার পড়ছে। ফিরে তাকাতেই দেখি, এমন করে তাকিয়ে আছো তুমি, কথা বলা যায় না। এমন হয় অনেক সময়। কথা বলতে গেলে কেমন নিজের কানেই শুকনো পাথর ঠোকার শব্দ হয়। তাই, তুষারের পর্দা পেরিয়ে তাকিয়ে থাকলে। ভয়ে ভয়ে, খুব আস্তে চোখ সরিয়ে এই শহরের একমাত্র অথচ অদৃশ্য যে নদী এখন, তাকেই খুঁজতে লাগলুম। রুক্ষ, কটা চুলের একটি সুশ্রী মুখ খুঁজে পেয়ে সেই নদীকেই জিজ্ঞেস করলুম যেন,

—"মিশেলকে তুমি কবে থেকে চেনো?" একটু চুপ থেকে ঈভলীন বললে,

—"প্রায় দু'বছর। কি, তার একটু বেশি।"

মিশেল ঈভলীনের কর্তার কোম্পানীতে স্টেনোর কাজ করেছিল বছরখানেক। ফুরনে কাজ। অন্য একটি স্টেনোর বদলি হিসেবে। সেই সময়েই দু'জনের খুব ভাব হয়ে যায়। ঈভলীনের থেকে মিশেল বয়সে বেশ ছোট। কিন্তু, ভাবের ঘরে বয়েসের বসার জায়গা নেই বলেই খুব অল্প সময়ে কাছাকাছি চলে এসেছিল দু'জনে।

তখন অন্য এক প্রেমিক ছিল মিশেলের। সেও ইণ্ডিয়ান। পাঞ্জাব না কোথাকার ছেলে, ঈভলীন ঠিক বলতে পারল না। তবে, সুন্দর সুঠাম দেখতে। প্রায়ই আসতো অফিসে ছুটির সময়। তারপর, দু'জনে মিলে বেরিয়ে যেত। তখন নাকি মিশেলের মধ্যে অনেক প্রাণ ছিল। ঈভলীন বলল, জীবন্ত একটা বুনো পাখির মতো উড়ে উড়ে আসতো-যেতো মেয়েটি। এখন কেমন হয়ে গেছে। চোখের চাউনিতে ভয়। হাঁটাচলায় সন্ত্রস্ত-ভাব জড়িয়ে গেছে। সেই ছেলেটিও মেজোঁর বাসিন্দা ছিল। মিশেলও স্বাভাবিক নিয়মেই এর ঘরে আসতো-যেতো-থাকতো।

ঈভলীন বললে,

—"মিশেলের জন্যে কষ্ট হয়, শিল্পী। ও তোমাদের দেশকে বড় ভালোবাসে। বইয়ে পড়ে, শুনে শুনে বড় বেশি শ্রদ্ধা করে। ওখানে শুনেছি, পরিবারে সবাই মিলেমিশে থাকে। ঘরের বউ বলে যে ব্যাপারটি সমুদ্রের ওপারে আছে—সে বড় মিষ্টি লাগে ভাবতে। আমরা সব্বাই মনের কোথাও তেমনি একটি ঘরের বউ হতে চাইতুম। কিন্তু, এদেশে আর তা হবার উপায় নেই বোধহয়।"

মনে মনে ভাবলুম, আমাদের দেশেই কি আর সেই রকম ঘর, কি বলে গিয়ে সেই একান্নবর্তী পরিবারের গ্রুপ ফটো মিলেমিশে আছে। কাচ গেছে ভেঙে। ফ্রেম খাচ্ছে ঘুণপোকায়। হলুদ হয়ে গেছে ছবি। ভেঙে চুরে যাচ্ছে সব। যেটুকু আছে, তা বোধহয় ওই বধূবরণেই শেষ। তারপর, ছিঁড়তে ছিঁড়তে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে শুধু দিন অথবা রাত্রিযাপন। আমরা পশ্চিমের ঢঙে এগোতে বাধ্য হচ্ছি, একটু ঘরোয়া শান্তি, একটু অলৌকিক সুখের আশায়। আর, এরা ভাবছে, আহা। পূবে কি না সুখ।

ঈভলীন বললে,

—"ছেলেটি কথা দিয়েছিল, মিশেলও বিশ্বাস করেছিল, দু'জনে বিয়ে করে ইণ্ডিয়ায় ঘর করবে। মিশেলের বিশ্বাস না করে উপায় নেই। ওর মতো মেয়ে কোনো ইণ্ডিয়ানকে অবিশ্বাস করতে শেখে নি। কেউ মিথ্যে বলতে পারে—সেইটুকুই বিশ্বাস করে না মিশেল। পড়াশোনা শেষ করে হঠাৎ ছেলেটি উধাও। কাউকে না জানিয়েই, কবে এবং কি ভাবে যে দেশে ফিরে গেল কে জানে।"

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি দু'জনে। গোবিন্দর মুখটা তুষারে বিকৃত হয়ে ভাসছে। ফুম্ করে বলে দিলুম,

—"এখন তো আবার এই শোধরির সঙ্গে ভাব জমেছে!"

বলার ধরনে একটু ব্যঙ্গ বা অবজ্ঞার ভাব ছিটকে বেরিয়ে গেছে হয়তো। ঈভলীন তা লক্ষ্য করে আমার দিকে তাকাল। অল্প ভুরু কাঁপল ওর। যেন একটু আহত হয়েছে এমনি করে বলল,

—"অমনভাবে বলতে নেই, শিল্পী। ও কিন্তু, তোমার দেশকে ভালোবাসে। যে কোনো সৎ ইণ্ডিয়ানকে বিয়ে করলেই খুশি হবে ও। আমি জানি।"

তারপর সামান্য চুপ থেকে জিজ্ঞেস করল,

"শোধরি কেমন ছেলে?"

কি বলব। যা জানি, তাই বলে ফেললুম, মিশেলের বারণ মনে থাকা

সত্ত্বেও বলে ফেললুম। যদি ঈভলীন ওর বান্ধবীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরাতে পারে। আর, স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্নের মধ্যে হয়তো সুখ বাসা বাঁধে। কিন্তু, স্বপ্ন তো পৃথিবী নয়, মানুষ নয়, সমাজ নয়। এইসব কথাই ঈভলীনকে বললুম। ও চুপচাপ শুনলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মুখোমুখি হয়ে আমার হাতে মৃদু উষ্ণ চাপ দিল। ঠোঁটের কোলে হেসে গাঢ় গলায় প্রশংসা করলো আমার,

—"তুমি বড়ো ভালোমানুষ, ইণ্ডিয়ান। সাগরপারে তোমার বউ না থাকলে তোমাকে আর মিশেলকে ধরে বেঁধে গির্জায় নিয়ে যেতুম।"

হাসলুম দু'জনেই। খুব শব্দ করে নয়। শুধু হাসলুম। তুষারপাতের কোনো শব্দ নেই তো! সেই নৈঃশব্দ্য ভাঙা উচিত নয়, এমনিভাবে। কেমন যেন বিষণ্ণ মনে হল ঈভলীনকে, নিজেকে। শোধরিরি কথা শুনে ওরও মন খারাপ হয়ে গেছে।

বললুম,

—"দেখো না, যদি ওকে শোধরিরি কাছ থেকে সরিয়ে আনতে পারো!"

ও বললে,

—"চেষ্টা করতে হবে। তুমিও তোমার বন্ধুকে বলে-কয়ে বোঝাতে পারো কি না, দেখো না।"

—"না ওর সঙ্গে কথা বলতে আমার গা ঘিন্‌ঘিন্ করে।"

—"তাহলে, মিশেলকেই একটু ভোলাতে চেষ্টা করো। তোমাদের ইণ্ডিয়ায় যে খারাপ মানুষও আছে, সেইটুকুই বুঝিয়ে দাও না ধীরে ধীরে!"

হঠাৎ মনে হল, এ সবের মধ্যে আমি কেন? আমি কোন্ হরিদাস পাল। কে ভালো কে মন্দ সেই নিয়ে আমার মাথাব্যথা কিসের। কোথায় কোন্ ধুনুরী তুষার ধুনছে তুলোর মতন, কোথায় কার মুখে সেই তুষার পড়ে গলে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, তা দিয়ে আমার কি দরকার!

খানিকটা রুক্ষভাবেই বলে দিলুম,

—"দ্যাখো ঈভলীন! ওসব আমার কম্মো নয়! তোমার বান্ধবী, তুমি সামলাও। তোমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে ইণ্ডিয়ান বোঝানোর দায়িত্ব আমার নয়। শোধরিও মানুষ। সে তার ইচ্ছে মতন জীবনযাপন করছে। মিশেল বোকা অথবা সরল বলেই ভুগছে। ভুগুক। আমি কি করব। তাছাড়া যার যা শেখার, জানার, ঠেকে শিখবে, জানবে। আমার বয়ে গেছে। চলো।"

বলে, পুল থেকে নেমে বুলভার সাঁ মিশেলের দিকে হাঁটতে লাগলুম।

ঈভলীনের সঙ্গে আর এ ব্যাপারে কোনো কথাই বললুম না। তবু, বুনো রুক্ষ অথচ সুশ্রী একটি কিশোরীর মুখ তার ঠোঁটের পাশে রক্তাক্ত কাটা দাগ নিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল।

সেদিন সকালে ফাম ভ্য মিনাজ আসবার আগেই দরজায় টোকা পড়ল। শব্দ শুনে প্রথমেই বাঁদিকে, বারান্দার দিকে কাচের দরজায় তাকালুম। ভোর হয়ে গেছে। একঘেয়ে বৃষ্টির মধ্যেই বাইরের অন্ধকার কখন সরে গেছে টের পাই নি। ঈজেলের পায়ায় আল্‌গা হেলান দিয়ে চোখ বুজে ছিলুম। সারারাত ধরে শেষ হয়েছে ছবিটা। মুখে বলে বা লিখে ছবি বোঝানো মুশকিল। আমার কাছে তো দুঃসাধ্য ব্যাপার মনে হয়। 'ক' যেমন 'ক', 'খ' যেমন 'খ'—ছবি শুধু ছবিই। বর্ণনা দিতে গিয়ে হয়তো খাবলা খাবলা বিষয়টুকু বোঝানোর শুধু চেষ্টা করা যেতে পারে, বউ। যেমন ধরো, এই আট নম্বর ছবিটি আঁকার জন্যে সাদা ক্যানভাসের সামনে বসে থাকতে থাকতে যে কথা ভাবছিলুম। ভারতবর্ষের কোনো মায়ের কথা। শরীরে হাড় সাজিয়ে বসে আছে। শূন্য তোবড়ানো থালা ধরে আছে হাতে। আকাশে ঝুলছে সেই হাত। কোলে কোনো সনাতন শিশু অথবা হাত-পাওয়ালা বিশুদ্ধ হাড়ের তৈরি ডাকাতে পিণ্ড। আপ্রাণ চেষ্টায় মায়ের চামড়ার মতো এককালের স্তন শুষছে, দু'এক ফোঁটা জলীয় কিছু পাবে ভেবে। ছবিটি কত পুরোনো, কতখানি দেখে দেখে লোকেরা হয়রান, তা বিচার করবার প্রয়োজন নেই। আমারও মনে হয়, যেন এক চিরন্তন ছবি আমার দেশে। সেই জন্যেই ক্যানভাসে তুলে রাখলুম, ইচ্ছে মতন, ভেঙে চুরে, ফর্ম তৈরি করে। রং নিয়ে ঝামেলা হচ্ছিল নিজের সঙ্গে, তাতেই রাত কাবার।

খিদেয় নাড়িভুঁড়ি পাক খাচ্ছে। কাল সারা দিনেরাতে শুধু তিন চার কাপ কফি খেয়েছি। চিনি ফুরিয়ে গেছে আগেই। সুতরাং দুধ ছাড়া, চিনি ছাড়া। কফির কৌটোও প্রায় শেষ হতে চলল। বড় জোর আরো পাঁচ ছ' কাপ হবে টেনেটুনে। ক্যাশ পয়সা আর একটা সাঁত্যোমও হাতে নেই, পকেটে নেই!

স্যুটকেসের আনাচে-কানাচেও খালি। শেষ ফ্রাঁটি খরচ করে ফেলেছি পরশু রাত্তিরে। লোভে পড়ে মেজোঁর ক্যান্টিনেই একটা গোটা অমলেট খেয়ে ফেলেছি। অথচ আজকে নিয়ে একচল্লিশ দিন নাগাড়ে বৃষ্টি। বিদ্যুৎ নেই। মেঘের তর্জন গর্জন নেই। হয় চুপচাপ বৃষ্টি ফেলে চলেছে আকাশ অথবা সেই অতিকায় ধুনুরি, কাজ নেই কম্মো নেই, বসে তুষার ধুনছে। মোঁমার্ত্রের মেলা বসছে না। আমার ধুমসো গরম বর্ষাতিটি চাপিয়ে দু'দিন গিয়েছিলুম মোঁমার্ত্রে। গোটা মেলার আসরে বৃষ্টি হেঁটে বেড়াচ্ছে। জনপ্রাণী বলতে ভেজা কাকের মতো কয়েকটি মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেস্তোরাঁয় বসে ঝিমোচ্ছে। শিল্পী নেই, খদ্দের নেই। রঙের বাগান ধুয়ে মুছে সাফ। আলু ভাজার দোকানের ঝাঁপও বন্ধ ছিল। টিলার ওপরে এই গোটা এলাকাটি যেন ঝিম ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে ভিজছে। প্রথম দিন কারুর সঙ্গেই দেখা হয় নি। পরের দিন গিয়ে দেখি, রেস্তোরাঁর মধ্যে আমাদের দলটি বসে আড্ডা মারছে। আমিও ভিড়ে গেলুম। মঁসিয় কোর্তোয়া কফি খাওয়ালেন। হাসতে হাসতে বললেন—"কি ছবি আঁকলেন মশাই, একেবারে আকাশ ছিঁড়ে গেল!"

সকলের হাসির মধ্যে আমি কি জবাব দেব ভাবছি। হাই তুলে যিশু ফোড়ন কাটলে,

—"সেলাই করার চেষ্টা দেখতে পারেন, মঁসিয়। আপনার পূর্বপুরুষদের কে যেন দর্জি ছিল না, বলছিলেন!"

বৃষ্টি থামাবার উপায় হিসেবে একজন এক একটি ফরমুলা বের করছে। অভিনব আইডিয়া দেনিসের,

—"এসো! আমরা সবাই বুকে বুকে তেল রঙের সূর্য এঁকে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকি চত্বরে!"

দিশী প্রবাদটি শুনিয়ে দিলুম এই প্রসঙ্গে। সেই যে ব্যাঙ মেরে চিৎ করে শুইয়ে রাখলে কি যেন হয়! বৃষ্টি থামে কিংবা নামে। ঠিক ঠিক মনে নেই। 'থামে' বলেই চালিয়ে দিলুম।

লিয়ঁ কম কথা বলে। গম্ভীর মুখে মন্তব্য করা হল,

—"বৃষ্টি থামুক, না থামুক, দেনিস বুকে সূর্য এঁকে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে মোটামুটি ব্যাঙের মতোই দেখাবে!"

রোজগারপাতি প্রায় বন্ধ। অলস আড্ডা মেরে যেটুকু মেজাজ ঠিক রাখা যায় তারই চেষ্টা চলছে। যদিও আলোচনার বিষয়ও সেই

খোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-খোড়। তুষার-আকাশ-বৃষ্টি। বৃষ্টি-আকাশ-তুষারপাত।...

আবার টোকা পড়ল দরজায়। বেশ জোরে এবার। আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালুম। মুখহাত ধোবার বেসিনের কাছে ধুমসো বর্ষাতিটা ঝুলছে। মনে মনে ঠিক করলুম, যে করে হোক আজকেই এটার একটা গতি করতে হবে। চেনাশোনা কাউকে গছিয়ে দেব। যা পাওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে দরজা খুলে দিলুম। ও হরি! এ কে!

স্ট্যালিনের গোঁফ এবং দুষ্টুমির হাসি সমেত জর্জ বোয়াগুন্‌তিয়ে। চ্যাপলিনের মতো মুণ্ডু ঝাঁকিয়ে চোখ পিটপিট করল। নাটকীয় গলায় বলল,

—"বঁ জুর, মঁসিয়!"

ভীষণ ভালো লাগল অনেক দিন পর ওকে দেখে। হাত ধরে ভেতরে টেনে আনতে আনতে বললুম,

—"আরে! কি কাণ্ড! এসো, এসো!"

ঘরে ঢুকেই প্রথম শব্দটি বেরলো ওর মুখ থেকে,

—"বাহ্!"

তারপর, আমাকে সরিয়ে পেইন্টিংগুলির দিকে এগোতে এগোতে বলল,

—"কাজ শুরু করে দিয়েছো, ইণ্ডিয়ান! শাবাশ!"

জর্জের হাত থেকে ভেজা ওভারকোটটা নিয়ে টাঙিয়ে দিলুম। বললুম,

—"জানী-ফিলিপ কেমন আছে?"

ছবির দিকে চোখ রেখেই ঝুপ করে বসে পড়ল খাটে। পাশ কাটাবার মতো জবাব ছুঁড়ে দিল,

—"ভালো, ভালো! সব ভালো।"

তারপর ঘুরে আমাকে দেখে বলল,

—"এখন বিরক্ত কোরো না তো। আগে ছবি দেখি! ততক্ষণে তুমি এক কাপ কফি করো ভায়া। শীতে জমে গেছি একেবারে।"

কফির জল চাপিয়ে দিলুম। জর্জ একটার পর একটা ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। কখনো দূর থেকে, কখনো কাছে গিয়ে নিজের মনে তন্ময় হয়ে দেখছে।

আমার বর্ষাতিটি হ্যাঙার থেকে নামিয়ে আনলুম। ভেতরে ভেড়ার লোম কেমন হলদে মতন হয়ে গেছে। বাইরের তারপোলিন প্রায় আস্তই বলা যায়।

তবে ভীষণ নোংরা দেখাচ্ছে। কলারের কাছে সেলাই খুলে গেছে খানিকটা। এখনো শীতে-বর্ষায় দারুণ মজবুত।

ঈভলীন হাসতে হাসতে বলেছিল,

—"এখান থেকে তোমার কি আলাস্কায় যাবার প্ল্যান আছে নাকি, শিল্পী?"

কোটের বোতাম আটকে বলেছিলুম,

—"যতই হাসো তুমি। এই সাংঘাতিক তুষার-বৃষ্টিতে এটা না থাকলে মরে যেতুম।"

মেত্রোর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ও জিজ্ঞেস করেছিল,

—"পেলে কোত্থেকে এই কিম্ভূত গরম বর্ষাতি?"

পর পর তিন চার দিন ঈভলীনের সঙ্গে বেরিয়েছিলুম বৃষ্টি মাথায় করে। ওর গাড়ি ছিল না। সার্ভিসে দেওয়া হয়েছে। মেত্রোয় চেপে, হেঁটে হেঁটে প্যারিসের নানান গ্যালারীতে ঘুরেছি। আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যালারী, বড়, মাঝারি, এমন কি ভ্যাপসা খুদে গ্যালারীও বাদ দিই নি। বুলভার সাঁ জার্মান, সাঁ মিশেলের অলিগলি কিংবা সাঁ-জে-লিজের প্রশস্ত রাস্তার গ্যালারী থেকে শুরু করে স্যেন নদীর গায়ে গায়ে মুদিখানা সাইজের ঘুপচি গ্যালারী ঘুরে দেখলুম। 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই' এক চিলতে কোথাও। শুধু ফরাসী দেশেই চল্লিশ হাজার শিল্পী, বউ। তাছাড়া, পৃথিবীর নামী-দামী ছবি আঁকিয়েও আসছেন এখানে। কোথাকার এক দরিদ্র নামবিহীন বাদামী শিল্পীর জন্যে মাথাব্যথা নেই কারো। দিল্লীর এক পেইণ্টার নাকি তিন মাস এ রাজ্যে দশাসই ছবি কাঁধে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মেত্রোর কানাইবাবু বলেছিল। আমার বয়সী কলকাতার কানাই হালদার। শহরতলির কোন্ কলেজে ফরাসী শেখায় বা শেখাতো। দুম্ করে স্কলারশিপ বাগিয়ে সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অধিকতর' শিক্ষা লাভের জন্যে প্যারিসে হাজির। বছর খানেক হতে চললো মেত্রোতে আছে। দেশে আছেন স্ত্রী, একটি শিশুপুত্র, বাবা মা ইত্যাদি ইত্যাদি যাঁদের থাকা উচিত। দু'বেলা ঘরের দরজা বন্ধ করে আহ্নিক করে কানাই হালদার। গরু খায় না। মদ ছোঁয় না। সাত্ত্বিক ছাপোষা মানুষ। এর কথা পরে তোমায় বলব, বউ।

কানাইবাবু বলেছিল,

—"দিল্লীর পেইণ্টার শেষে কার বাড়ির ড্রয়িং রুমেই তার ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। প্যারিসের কোনো শিল্পরসিক সমালোচক, কাগজওয়ালারা

যায় নি সেখানে। ঘরেয়ো প্রদর্শনীটি করে সমস্ত ছবি ঘাড়ে আবার দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।"—

কানাই হালদারের মুখে নাম শুনতেই চিনতে পারলুম। তুমিও বোধহয় নাম শুনে থাকবে, বউ। দেশে ফিরে তার সে কি তর্জন-গর্জন। হ্যান কিয়া ত্যান কিয়া—হুঁহুঁম্‌বাবা প্যারিসের মতো জায়গায় প্রদর্শনী কিয়া!

সেদিন স্তেন নদীর গায়ে গায়ে ঘুরছি দু'জনে। ঈভলীন দূরে আঙুল তুলে দেখাল। বলল,

—"ওই আর একটা গ্যালারী মনে হচ্ছে। চলো!"

গত দু'দিন ঘুরে ঘুরে আমার উৎসাহ ঝিমিয়ে পড়েছে। ঈভলীন দমে নি। মেলায় যেমন নতুন নতুন খেলনার দোকান দেখে শিশুরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, বাবা-মায়ের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় একটার পর একটা স্টলে, ঈভলীন ঠিক তেমনি করে আমায় নিয়ে ঘুরছে। আর, আমার কানের কাছে শুধু শুনতে পাচ্ছি, নানান্ গলায় একই কথা ঘুরে ঘুরে,

—"এ দোকানে হবে না, মঁসিয়ে! অন্য দোকান দেখুন—"

প্যারিসে পা রাখার প্রথম দিন জর্জ এবং জানী আমার দিকে কেন অবাক চোখে তাকিয়েছিল, যখন জানিয়েছিলুম, ছ'মাস মতো থেকে, প্রদর্শনী না করে যাবো না; কেন বলেছিলো ওরা,

—"ভালো। ভালো কথা। তুমি খুব আশাবাদী শিল্পী"—সেদিন বুঝতে পারি নি কিছুই, আজ সব আস্তে আস্তে টের পাচ্ছি। জর্জ ঠিকই বলেছিল,

—"ধীরে শিল্পী, ধীরে। সব টের পেয়ে যাবে আপনাআপনি।"

খোলাখুলি এখানকার অবস্থা আলোচনা করলে আমি পাছে গোড়াতেই দমে যাই, সেইজন্যেই ভেঙে ওরা কিছুই বলে নি আমাকে।

গ্যালারীটির ভেতরে ঢুকে খোঁচা দেবার মতো ঈভলীনকে বললুম,

"উহুঁ! একে তো গ্যালারী বলা যাবে না, সুন্দরী। দোকান বললে আপত্তি করব না!"

আমার হাতে চাপ দিয়ে নিচু গলায় বলল,

—"আহ্, কি হচ্ছে কি! ভদ্রলোক শুনতে পাবেন। আমার চেনা লোক।"

তাকিয়ে দেখি কোণের দিকে উঁচু টেবিলের পেছনে গুড়ি মেরে বসে আছে যেন মানুষটি। পিটপিট করে দেখছে, আমাদের। ঈভলীনকে জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি রকম চেনা ?"

—"না, তেমন কিছু না। তবে, যদ্দূর মনে হচ্ছে, ইনি এই এলাকার কোনো গীর্জার পাদরী ছিলেন। হয়তো এখনো আছেন, জানি না। মুখটা চেনা-চেনা। এসো, জয়গুরু বলে এঁকেই পাকড়াও করি গ্যালারীর জন্যে। চেনা মুখ যখন—কপাল আমাদের খুলে যেতে পারে।"

ঈভলীনের মুখে 'আমাদের' শব্দটি শ্রুতির মধ্যে দিয়ে আমার মস্তিষ্ক ছুঁতে ছুঁতে হৃদয়-টিদয় অবধি চলে গেল। গিয়ে, মেঝে পরিষ্কার করে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল যেন। চোখের কোলে মেয়েটিকে দেখে নিলুম। ও পাদরী সাহেবের সঙ্গে কি সব কথা বলছে ফিস্‌ফিস্ করে। আমি সেই 'আমাদের' শব্দটির গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে ভাবলুম, ঈভলীন ছবি বোঝে না। আমার ছবি যে ক'টি আঁকা হয়েছে তাই দেখেই উচ্ছ্বসিত। বুঝুক না বুঝুক, আমি যেন গভীর পুজোর কাজে লেগে গেছি, এমনি এক শ্রদ্ধা জড়ানো চোখে ও বলছে,

—"বেশ হয়েছে। আমি জানি ইণ্ডিয়ান, খুব ভালো হয়েছে। বুঝি তো না কিছু, তবে তুমি খারাপ ছবি আঁকবার মতো শিল্পী নয়, এটা আমি ষোল আনা বুঝি।"

প্রদর্শনীর জন্যে গ্যালারী না পাওয়া যেন ওরও দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। শুধু আমার একার নয়, দু'জনেরই কপাল খারাপ। আমাদের।

তিন দিকের দেওয়ালে গিজগিজ করছে ছবি। নিসর্গ চিত্র, স্টাডি, স্কেচ—সব একেবারে খিচুড়ির মতো ঝুলছে। টেবিলে রাখা একটি স্যুভেনির তুলে নিলুম। শিল্পীর নাম এবং ছাপা ফোটো দেখে ঈভলীন বললে,

—"ও বাবা! এ তো নামকরা আর্টিস্ট।"

বললুম,

—"তাই নাকি!"

বলে, আবার একবার দেওয়ালজোড়া খিচুড়ি দেখে নিলুম

ও বললে,

—"এঁর পেইন্টিং থেকে আমাদের কোম্পানী ক্যালেণ্ডারও বানিয়েছে।"

রাস্তা থেকে দেখে মনে হয়েছিল একটাই ঘুপচি ঘর। এখন, বাঁ দিকের দেওয়ালে ছোট্ট দরজা আবিষ্কার করলুম। ওপাশেও ঘর আছে। ছবি ঝুলছে। এসব ছবির দিকে চেয়ে থাকা বেশ কষ্টের ব্যাপার। চোখ সরিয়ে ভালো করে পাদরীকে দেখলুম। ঈভলীন বোধহয় চিনতে ভুল করেছে। গোলমাল তো

হয়ই। কে জানে! তবে, চোখ মুখ দেখে প্রশান্ত কোনো ধর্মযাজকের ছবি আমার মনে পড়ল না। তেঁয়েটে বদমাস, চশমার আড়ালে খিটখিটে যজমান বা আমার চেনা জগতের বামুন পুরুতঠাকুর মনে পড়ল, যারা লুকিয়ে তন্দুরি চিকেন চিবোয়। সাদা সোয়েটার গায়ে এই বুড়ো বা আধাবয়সী ব্যক্তিটি যদি আদৌ পাদরী হয়, তাহলে, মনে মনে ঠিক করলুম, গ্যালারী না দিলে, এখান থেকে বেরিয়ে যাবার আগে এঁর কানে কানে বলে যাবো,

—'দাদু, পাদরী আপনাকে মানায় না। ছবি-টবির মধ্যেও বড় বেমানান আপনি। দোকান খুলুন! মাংসের দোকান খুলুন, ভালো বিক্রি-বাটা হবে।'

এক-একটা লোক হয় না, যাদের প্রথম দেখলেই অপছন্দ হয়ে যায়। মানুষ হিসেবে পরে হয়তো দেখা গেল, হীরের টুকরো! অথচ, গোড়াতেই কোনো বিশেষ কার্যকারণ ছাড়াই এক-একটা মুখের আদল কেমন অপছন্দের দিকে হেলে পড়ে। এই পাদরীটিও তেমনি। টকটকে ফর্সা মুখে মুচকি হাসির চেষ্টার দিকে চোখ পড়লেই উচ্ছে-করলার মতো তেতো স্বাদ লাগে জিভের ডগায়। ঢুলুঢুলু অথচ চঞ্চল চোখদুটি দেখলে শ্রদ্ধা জাগার কথা নয়। আমার অন্তত শ্রদ্ধা উথলে উঠল না। তবু, পাদরী যখন,

—"বঁ জুর, ফাদার!"

ঈভলীনও গদ্গদ গলায় সুপ্রভাত জানাল।

উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঈভলীনকে বললেন,

—"গড ব্লেস!"

তারপর, আমায় জিজ্ঞেস করলেন,

"তুমি কি ইণ্ডিয়া থেকে আসছো?"

ঘাড় নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ।

আমার হাত ছাড়েন নি তখনো। চোখে চোখ রেখে সরিয়ে নিচ্ছেন বরাবর। আবার রাখছেন।

বললুম,

—"আমি শিল্পী। তেল রঙের ছবি আঁকি।"

খুব খুশির ধরনে মাথা দুলিয়ে বললেন,

—"বাহ্! খুব ভালো!"

ঈভলীন সঙ্গে সঙ্গে কলকল করে উঠল,

—"খুব ভালো আর্টিস্ট, ফাদার। সব ছবি এঁকেছে, আঁকছে।"

প্রসঙ্গ এড়িয়ে পাদরী খবর দিলেন,

—"আমার গ্যালারীতে বেশ কয়েক জন ইণ্ডিয়ানের এক্স্‌পোজিশন হয়েছে।"

হুম করে বললুম,

—"আমাকে একটা সুযোগ দেবেন ? অবশ্যই, যদি আমার ছবি পছন্দ হয় !"

হাত ছাড়ে না কেন পাদরীসাহেব ! ঘামতে শুরু করেছি হাতের মধ্যে। পায়ে পায়ে ঘুরে দেওয়ালের খিচুড়ি দেখিয়ে বললেন,

—"কেমন লাগছে শিল্পী ?"

—"বেশ ভালোই তো ?" কোনো রকমে বলে দিলুম।

—"খুব ভালো ছবি। নামকরা আর্টিস্ট এখানকার !"

নাম করা হলেই ভালো ছবি-আঁকিয়ে হবেন, এমন কথা শাস্ত্রে লেখা আছে কিনা আমি জানি না, বউ ! যদি থাকে, তবে তা শাস্ত্রেই থাকুক ! পাদরী আমাকে টেনে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন। এটি আরো ছোট ঘর। 'কুঠুরি' বললেই ঠিক বলা হবে। দেওয়ালময় নাম-করা শিল্পীর ছবি !

ঈভলীনও পেছন পেছন এসে পাদরীর অন্য পাশে দাঁড়িয়েছে। ওকে যেন পাত্তাই দিচ্ছেন না সায়েব। আমরা একটু অস্বস্তি হচ্ছে। ঈভলীনকে বললুম,

—"কেমন লাগছে ছবি ?"

আমাদের দু'জনের মধ্যিখানে পাদরী দাঁড়িয়ে। সরাসরি দু'জনে দু'জনকে দেখতে পাচ্ছি না। অল্প সামনে ঝুঁকে আমায় দেখে নিয়ে ঈভলীন বললো, ঠিক আমার বলার ধরনে,

—"বেশ, ভালোই তো। গ্যালারীটিও ছোটোখাটোর মধ্যে সুন্দর !"

সাহেবকে জিজ্ঞেস করলুম আবার,

—"আমাকে প্রদর্শনী করবার একটা সুযোগ দেবেন এখানে ?"

আমার পিঠে হাত রাখলেন সস্নেহে। বললেন,

"গ্যালারী তো গোটা বছরের জন্যে 'বুক' হয়ে আছে। একটা সপ্তাহও খালি নেই। তবু, দেখি আগে তোমার ছবি-টবি কেমন !"

ঈভলীন আরেক দফা আমার প্রশংসা জুড়ে দিল। কিন্তু আমি আর শুনতে পাচ্ছি না কিছুই। কারণ, আমার সমস্ত শরীর রাগে, ঘেন্নায় রি রি করতে আরম্ভ করেছে তখন।

এই কুঁজো বুড়ো হারামজাদা যদি পাদরী হয়েই থাকে, এবং ঈশ্বর-টীশ্বর ইত্যাদি ও তাঁর ঘর বলে কিছু থেকে থাকে, তবে, সেই ঘরে বড় ধুলো জমছে

সাফ করা দরকার। প্রচুর ফিনাইল ঢেলে সাফ করবার সময় হয়েছে। কারণ, পাদরীর সেই 'স্নেহময়' বাঁ হাত কাঁপতে কাঁপতে আমার পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে নামতে নামতে, নামতে নামতে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে মেরুদণ্ড আমার। যদিও পশ্চিমের কোনো কোনো রাজ্যে আইনত এসব কোনো বিকৃতি নয়। গীর্জা-আদালত সাক্ষী রেখে পুরুষে পুরুষে বিয়ে শুরু হয়ে গেছে। তবু, আমার অপটু শরীরের মনের শিরদাঁড়া বেয়ে ঘৃণা নামতে থাকে।

ভগবান অথবা ভালোবাস্‌সা কাহাকে বলে আমার জানা নেই, বউ। তোমার ঘরের কোণে কুলুঙ্গিতে একটা ছোট্ট রুপোর মূর্তির সামনে প্রদীপ, ধূপধুনো জ্বলে। বিশ্বাস, সংস্কার অথবা ভয়ের থেকেই জ্বলে। জ্বলুক। তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। দু' চারজন অসামান্য মানুষের মধ্যেই কিছু শ্রদ্ধেয় শক্তি লালিত। যাঁদের তোমরা ভগবান বানাও, অবতার বানাও। ভেজাল ঘিও 'গব্যঘৃত' হয়ে চলে যায় ভয়ের, সংস্কারের বাজারে। এ ক্ষেত্রে ঠিক বিশ্বাস কিনা তা বুঝতে পারছি না। ভয়ের থেকে তো নয়ই। শুধু ধুলো জমছে দেখে সেই অদেখা অদৃশ্য শ্রদ্ধার ঘরের জন্যে আমার কষ্ট হল।

আহা রে। মাথার কাঁটার মুকুট পরা, পেরেক দিয়ে ঠুকে ঠুকে ঝোলানো, পুরাতন এক রক্তাক্ত ক্ষমার শরীরকে পুজো দেবার বদলে এই সাদা শুয়োর পদরীটির বাঁ-হাত কেমন অবলীলায় আমার মেরুদণ্ডের শেষ হাড়ে পৌঁছে মাংসের দেওয়ালে আদর করার মতো থরথর কাঁপছে !
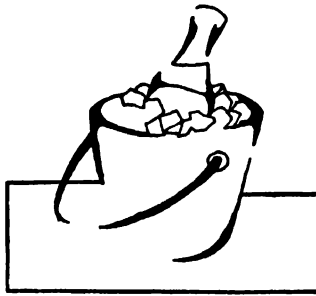
ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগলো কয়েক সেকেণ্ড। বুঝতে পেয়ে প্রথমে খুব হাসি পেল। প্রায় বাপের বয়সী বুড়ো! কি করা উচিত ঠিক ঠাহর পাচ্ছিলুম না। মনে পড়ল, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ফাইন্যাল খেলা দেখছিলুম আমরা র‍্যামপার্টের ভিড়ে দাঁড়িয়ে। পাঁচ-ছ'জন একসঙ্গে ছিলুম। করুণাময়ের পিছনে দাঁড়িয়ে এক অবাঙালী এই রকম ছোঁয়াছুঁয়ি শুরু করেছিল। করুণার চেঁচামেচিতে

সবাই মিলে ধরে লোকটাকে টেনে আনা হয়েছিল ভিড়ের বাইরে। তারপর বেদম মার। একেবারে 'পাবলিক ধোলাই' যাকে বলে।

মনে মনে এক পলক ভাবলুম, এই সাদা শুয়োরটার চোয়ালে একটা রাম ঘুষি ঝেড়ে বেরিয়ে যাবো কিনা। এ দোকান তো খালি। বৃষ্টি-বাদলায় দর্শক নেই একটিও। আপত্তি করছে কে!

একে গ্যালারী খুঁজে খুঁজে হায়রান। মেজাজ এমনিতেই গরম হয়ে আছে। তার ওপরে এইসব। চট করে উল্টো একটা বাতাস বয়ে গেল মাথায়, বুড়োর দুর্বলতা ভাঙিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নিলে কেমন হয়! এ রাজ্যে প্রদর্শনী না করে আমি যাবো না! যদি আপত্তি না করি, তাহলে বুড়ো দু-এক সপ্তাহের জন্যে আমার ছবিগুলিকে এই গ্যালারীতে ঠাঁই দিতে পারে। ভাবতে ভাবতে আরো বেশি রাগ হল। রক্ত চড়ে গেল ব্রহ্মতালুতে! আমি কি শালা টেরিটি বাজারের বেশ্যা!

কাজ চালানো ফরাসী যেটুকু জানি তাও গুলিয়ে গেছে এখন। দেওয়ালে একটা পেইন্টিঙের দিকে চোখ রেখে কলের জল পড়ার মতো শান্ত গলায় বলে উঠলুম, ইংরিজিতে,

—"মাই ডিয়ার ফাদার। তোমার বয়েস যদি আর একটু কম হোতো এবং দু'টি স্তন ইত্যাদি থাকতো, তাহলে আমি আপত্তি করতুম না!"

বলতে বলতে মন্ত্রের মতো কাজ হল। বুড়োর হাত থেমে আমার শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল। যেন পাঁচন গিলে ফেলে 'হেঁ-হেঁ' করে হাসল। তারপর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে যেই বলতে আরম্ভ করল,

—"ঠিক। ঠিক বলেছো, মাই ডিয়ার বয়—"

এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি চিৎকার করে বললুম,

—"চো-ও-ও-প্!"

বলে, মুখের ভেতরে সেই মুহূর্তে যতটা থুতু তৈরি ছিল, থু করে ছিটিয়ে দিলুম শুয়োরটার সারা মুখে?

হাঁউমাউ করে কি সব বলতে লাগল পাদরীটা! কে শুনছে! ঈভলীন তো হতভম্ব,

—"কি হল, কি করলে, ইণ্ডিয়ান—"

কথা শেষ হবার আগেই ওর হাত ধরে টেনে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি। হনহন করে হেঁটে সামনেই নেমে যাবার সিঁড়ি। নানান্ কথা জিজ্ঞেস করছে

ঈভলীন। আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে পারছে না। ওর হাত ধরে টেনে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম। স্হেন নদীর জলের গা ঘেঁষে দু'ধারে পায়ে চলার বা ব'সে মাছ ধরার মতো শান বাঁধানো রাস্তা। ওপরের সদর রাস্তা থেকে অন্তত তিন-চার মানুষ নিচু। লোকজন নেই। প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে ব্রীজের তলায় এসে দাঁড়ালুম। মনের ভেতরে ভয় ঢুকছে! শত হলেও আমি ভিন্‌দেশী মানুষ। তার ওপরে যার মুখে থুতু ছিটিয়ে এলুম, সেই লোকটি যদি সত্যিই পাদরী হয়—পুলিস-টুলিসের ঝামেলায় না পড়ি আবার!

ব্রীজের তলাকার ঝাপসা অন্ধকারে চোখ সয়ে যেতেই দেখি কয়েক জোড়া কপোত-কপোতি দেওয়ালের খাঁজে-খাঁজে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে প্রেম-ট্রেম করছে। ঘুরেও কেউ দেখলো না আমাদের। ঈভলীন হাঁফাতে হাঁফাতে ফিসফিস করে বলল,

—"কি করলে ইণ্ডিয়ান? তোমার কি হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল! একজন সম্মানিত পাদরীর মুখে ওইভাবে—ছিঃ ছিঃ—"

—"সম্মানিত পাদরী না, ছাই—"

ফোঁসফোঁস করে বলে ফেললুম।

ঈভলীন বললে,

—"কেন, কি হয়েছে?"

—"বলছি, দাঁড়াও। আগে বলো, কোনো ঝুট-ঝামেলায় ফেঁসে যাবো না তো?"

—"বলা যায় না। এদিকটায় পাদরীর খুব প্রতিপত্তি থাকা অসম্ভব নয়। চলো—আমরা বরং আর একটু এগিয়ে যাই—"

বলতে বলতে বাঘের ভয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেল! পাদরীর 'হাঁউ-মাউ' গলা জোর পায়ে ছুটে আসতে লাগল এদিকে। সঙ্গে আরো কয়েক জোড়া ভারি বুটের শব্দ। হাল্‌কা বৃষ্টির পর্দায় ওদের প্রায় স্পষ্ট দেখতে পেলুম। ছ'সাত জনের দলটি মাত্র কয়েক গজ দূরে এখন। ভয় পেলে বুদ্ধি কমে যায়। দারুণ ভয় পেয়ে গেছি আমি। কিসের থেকে কি হয়ে গেল! ঈভলীনের হাত ধরে টেনে দৌড়োতে যাবো, ও আমাকে গায়ের জোরে দাঁড় করিয়ে রাখল। অস্থির মনের গা ঘেঁষে বিচ্ছিরি একটা ভাবনা খেলে গেল। নিছক অভিমানে ভর দেওয়া ভাবনা। ঈভলীন কি ওর ধর্মযাজকের সম্মানের জন্যে আমাকে পুলিসি ঝামেলায় ফেলতে চায়! না কি, আমি বিপদে পড়েছি তো ওর কি

যায় আসে! আমার ঝামেলায় ও নিজেকে জড়াতে চাইছে না বোধহয়? পায়ের শব্দ, পাদরীর 'হাঁউ-মাউ' এগিয়ে এল আরো।

আর এক মুহূর্তে সবুর না করে, ঈভলীনের হাত ছেড়ে দিলুম। তাড়াতাড়ি বলে দিলুম,

—"ঠিক আছে। যেতে না চাইলে যেও না, আমি চলি—"

বলে ঘুরতে যাবো, ও যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে হাসল। ডান হাত দিয়ে আমার বাহু জড়িয়ে ধরল। বেড়াতে যাবার ধরনের ডুলকি চালে হেঁটে দেওয়ালের কাছে নিয়ে এল আমাকে। একটি খাঁজে পিঠ রেখে হেলান দিল। তারপর, আমি কিছু বোঝবার বা করবার আগেই আমার দু'কাঁধে হাত রাখল এবং আস্তে আস্তে ওর শরীরের কাছাকাছি টেনে নিল আমাকে। দেড়-দু'হাত ব্যবধানে ব্রীজের তলাকার ঝাপসা অন্ধকার খাঁজগুলিতে যারা জোড়ায়-জোড়ায় দাঁড়িয়েছিল, চুমুটুমু মাখিয়ে গাঢ় স্বরে নিজেদের ছোটো ছোটো স্বপ্নের বাগান অথবা পৃথিবীর কথা বলছিল, তারা তাদের দলে নবাগত দু'জনকে গ্রাহ্যও করল না, ফিরেও দেখল না।

তাতে অবশ্য আমার নিশ্চিন্ত হবার কথা নয়। ওরা কাছে এসে গেছে। সঙ্গে ভারী বুটের শব্দ, মানে, পুলিসও নিশ্চয়ই রয়েছে! একে একে প্রত্যেকটি জোড়ার কাছে গিয়ে ওরা দেখবেই। আমি কালো মানুষ। এপাশ থেকে তিন নম্বর জোড়ার কাছে এসে দাঁড়ালেই চিনে ফেলতে অসুবিধা হবে না। পাদরীই সনাক্ত করবে। ঘাড় ধরে টেনে আমাকে ঈভলীনের শরীর থেকে আলাদা করে ফেলবে। তারপর, থানা জেলখানা। সাজা বিশেষ কিছু না হলেও, হয়তো ফ্রান্সের বাইরে পাঠিয়ে দেবে। চাই কি, আমাদের দূতাবাসে যোগাযোগ করে দেশেও চালান করে দিতে পারে! এক পলকের রাগের জন্যে ছবি আঁকা, স্বর্গ রাজ্যে প্রদর্শনী, স্বপ্ন সব চৌচির হয়ে যাচ্ছে মনের মধ্যে। যদিও জানি, অন্যায় আমি কিছুই করি নি। তবু, ব্যাপারটা হয়তো এড়িয়ে যাওয়া যেত। চুপচাপ গ্যালারী থেকে বেরিয়ে এলে এসব কিছুই হত না। কিন্তু, কি করব বউ! রাগ চণ্ডাল। তুমি তো জানোই, আমার এই চণ্ডালটিকে ভেতরে কিছুতেই পুষে রাখতে পারি না। ভাবছি এইসব, আর ঠোঁট কামড়াচ্ছি। ঈভলীন-টিভলীন, অন্যান্য দৃশ্য ইত্যাদি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। থুতুমাখা শুয়োরটার চশমা এবং মুখ, পুলিসের সাদা বর্ষাতি চোখে ভাসছে।

—"এইদিক দিয়েই গেছে। রাস্তা থেকে ঝুঁকে আমি ওদের এদিকেই দৌড়োতে দেখেছি।"

পাদরীর কথাগুলি ব্রীজের তলায় এসে গমগম করছে,

—"ব্লাডি নিগারকে গ্যালারী দেব না বলেছি, তো, থুতু ছেটাবে মুখে ? অ্যাঁ—"

এমন সরাসরি মিথ্যে কথাটা শুনে ভয়ের মধ্যে ও মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছিলাম আর একটু হলে। ঈভলীন হাত দিয়ে আমার মুখ নামিয়ে আনল। আস্তে আস্তে আমার গাল চেপে ধরল ওর গালের দেওয়ালে। দ্বিতীয় একটি প্রাণের উষ্ণতায় ভরসা হল খানিকটা। এবং, এই এতক্ষণে টের পেলুম, আমরা দু'জনেই প্রায় এক তালে থরথর কাঁপছি। শ্বাস ফেলছি জোরে জোরে।

মৃদু বৃষ্টির শব্দে কথা বলল ঈভলীন,

—"ভয়ের কিছু নেই। ওরা চিনতে পারবে না।"

বলতে বলতে আমার বর্ষাতির কলার পুরোটা তুলে দিল ওপরে। পেছন থেকে আমাকে চিনতে পারার সম্ভাবনা কমিয়ে দিল আরো। গলা জড়িয়ে ধরে আমার মাথার পিছন দিকের চুল হাত দিয়ে চেপে রাখল। হালকা গলায় শ্বাস ফেলবার মতো বলল,

—"ভালো মানুষের এমন সুন্দর কালো চুলও লুকিয়ে রাখতে হবে, ইণ্ডিয়ান !"

বলে, এমন অবস্থার মধ্যেও রসিকতা জুড়ে দিল,

—"কি থুতুই ছেটালে বাবা !"

মুখ দেখতে পাচ্ছি না ঈভলীনের। ওর গালে গাল রেখে আমার চোখের সামনে এখন খাঁজের বিবর্ণ পাথর। আলো অন্ধকারে জায়গাটুকু ঝাপসা হয়ে আছে। পেছনে কয়েক হাত দূরে কতকগুলো অদৃশ্য ভয়। কানের কাছে ঈভলীনের উষ্ণ নিশ্বাস এবং ছেঁড়া-ছেঁড়া কথার বাতাস কি রকম আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে বুকের শব্দ গুণছি। ঈভলীনের না আমার ঠিক বুঝতে পারছি না। বুট জুতোর আওয়াজ, পাদরীর গলা থেমে গেছে। ওরা বোধহয় এক-এক করে প্রত্যেকটি জোড়াকে খুঁটিয়ে দেখছে এখন।

ঈভলীন আমার কানে কানে বলল,

—"তেমন দরকার হলে, ওরা আমাদের দিকে আসতে আরম্ভ করলে চুমু খেতে হবে কিন্তু ! তৈরি থেকো !"

আমার শরীর, মন, মস্তিষ্কের কোথাও কোনো নারী জেগে নেই। মদও পড়ে নি পেটে যে গুবরেটার নড়াচড়া টের পাব। থম্ ধরে পেছনের শব্দের জন্যে কান পেতে আছি।

ঈভলীন আবার কথা বলছে,

—"ফাদারের সঙ্গে হঠাৎ তোমার কি হল, বলো নি কিন্তু।"

পেছনের মানুষগুলোকে ভোলবার চেষ্টা করলুম। বললুম,

—"সেদিন রাত্রে, যিশুর বাড়ি থেকে বেহুঁশ অবস্থায় ফেরবার পথে তোমাকে কি বলেছিলুম, বলো নি কিন্তু।"

দু'জনেই চারপাশের বৃষ্টির শব্দের থেকে নিচু স্বরে কথা বলছি। যেন কোনো গভীর প্রেমের জলাশয়ে ডুবে আমরা ভয়ানক স্বর্গীয় সব ভালোবাসার কথা, বলছি নিজেদের মধ্যে। পাদরী কাকে বলে, পুলিস কি জিনিস, কিছুই জানবার দরকার নেই আমাদের। ওরা সব যেন অন্য গ্রহের প্রাণী অথবা অনাবিষ্কৃত গাছপালা!

ঈভলীন বললে,

—"ও আমি কোনোদিনও বলব না তোমাকে।"

—"থাকগে। আমিও বলব না কিছু।"

—"কিন্তু, তুমি একটু আগেই বলেছিলে যে পরে বলবো!"

—"ঠিক আছে। পরে বলবো।"

—"পরে কখন?"

—"আপাতত পেছনের পাদরী-পুলিস কেটে যাক—"

চাপা স্বরেই ধমকে উঠল ঈভলীন,

—"উফ্‌! ওদের ভুলে যাও তো এখন! শুধু মনে রাখো, আমরা দুই দারুণ প্রেমিক-প্রেমিকা, আর চারধারে কেউ নেই, কিছু নেই।"

—"সে রকম ভাবতে পারলে এক্ষুনি তোমায় বলবো, কোট-প্যান্ট্‌ জামা কাপড় ইত্যাদি সব খুলে ফেলতে—"

—"ধ্যৎ, অসভ্য কোথাকার!"

চেয়ে থাকতে থাকতে খাঁজের পাথরে চোখ সয়ে গেল। উত্‌পটাং কথার পিঠে কথা বলে যাচ্ছি। মনের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। পাদরীটা কি যেন বলছে আবার। শুনবো না। কানে তুলো দিতে পারলে হতো।

ঈভলীনকে বললুম,

—"কানে হাত চেপে রাখতে পারো?"

—"দেখছি।" বলে, হাত দুটি সামান্য সরিয়ে এনে কান বন্ধ করে দিল আমার। বলল,

—"কিন্তু, আমার কথা শুনবে কি করে এখন?"

—"ও আমি ঠিক শুনতে পাবো। তাছাড়া, তুমি তো আপাতত প্রেমিকা

আমার। প্রেমিকার কথা শুনতে কি আর কান লাগে, মাদাম! পরাণ থাকলেই হল!"

ওর মাথার অল্প ওপরে কি যেন লেখা রয়েছে। ধূসর দেওয়ালে আলকাত্‌রা বা অন্য কোনো কালো রঙে ফরাসী শব্দ। মসৃণ পাথর নয় বলে পরিষ্কার পড়তে পারছি না। বড়জোর দু'ইঞ্চি আকারের অক্ষরগুলো পর পর সাজানো! বার তিনেক হোঁচট খেয়ে পুরোটা পড়ে ফেললুম। ঈভলীনকে বললুম,

—"তোমার মাথাটা ওপরে একটি সাবধান বাণী ঝুলছে। শুনবে?"

—"কোথায়?"

—"ঠিক তোমার মাথার ওপরে দেওয়ালে, কালো রঙে লেখা।"

ঈভলীন বললে,

—"পড়ো।"

—"এই স্থানে দৈহিক মিলন নিষিদ্ধ!"

ফিক্ করে হাসির শব্দ হল ঈভলীনের। বলল,

—"কে লিখেছে?"

—"তা কি করে বলবো! তবে, ঠিক তার নিচেই ব্রাকেটে সাদা রঙে আর একটা লাইনে লেখা আছে!"

—"কি?"

—"শনি-রবি ও ছুটির দিন বাদে!"

হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খেলো ঈভলীন। বলল,

—"তুমি কিন্তু পাজী নম্বর এক!"

—"আমি আবার কি করলুম! যা লেখা রয়েছে, তাই পড়ে শোনালুম তোমায়!"

পেছন থেকে আমাকে প্রায় চমকে দিয়ে হেঁড়ে গলায় কে জিজ্ঞেস করলে,

—"তোমাদের মধ্যে কেউ ইণ্ডিয়ান আছো?"

সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ভুলে বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটার শব্দ শুনতে পেলুম,

—"আমি আছি। আমি আছি!"

আপনা-আপনি চোখ বন্ধ হয়ে গেল। শ্বাস চেপে দাঁড়িয়ে আছি। কে জানে কি করছে ওরা পেছনে। সব চোখগুলি যেন আমার পিঠের কালো চামড়া দেখতে পাচ্ছে। ঈভলীন কোনো কথা বলছে না কেন!

—"ঈভলীন! কি হল? চুপ করে গেলে যে! ওরা কি আমাদের দেখছে?"

ও বললে,

—"জানি না। ওদের দিকে তাকাচ্ছিই না আমি। চোখে চোখ পড়ে গেলেই সন্দেহ করবে।"

—"চুপ করে থেকো না! কানে কানে যা হোক্ কিছু কথা বলো, যে কোনো বিষয় –"

—"বলছি।" বলে, ও যেন ভাবতে বসলো কি বলবে।

চারপাশ থেকে বাতাস-বৃষ্টির শব্দ ভীষণ জোরে বাজতে লাগলো। ঈভলীনের গালে গাল চেপে আছি, অথচ এই মুহূর্তে ওর মুখটি কিছুতেই মনে পড়ছে না। নিজের মুখ ভাবার চেষ্টা করছি। মিলছে না। মেয়েলী গলায় কে যেন বলছে,

—'ইসি পারী। নে কিতে পা লে কুত্। মু রঁ শের্শ ভোত্র্ করেস্পন্দঁ!'

মেয়েটি থেমে যেতেই পুরুষকণ্ঠ ইংরিজিতে বলছে,

—'দিস্ ইজ্ প্যারিস। প্লীজ্ হোল্ড্ অন্। উই আর ট্রাইং টু কনেক্ট ইউ!'

কে বলছে আমাকে কথাগুলি? কোথায় শুনেছি যেন! ওই আবার বলতে শুরু করেছে মেয়েটি ফরাসীতে। কে মেয়েটি! পুরুষ কণ্ঠই বা কার? কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না। গুলিয়ে যাচ্ছে সব! তিন দিন দাড়ি কামাই নি। ঈভলীনের গালে নিশ্চয়ই আমার বাসি দাড়ি খোঁচা লাগছে! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ইউনেস্কোয় টেলিফোন করেছিলুম এক ভদ্রলোককে। যিশুর পরিচিত ভদ্রলোক। কি যেন নাম? ভুলে গেছি। ইউনেস্কোয় চাকরি করেন। নিজের আর্ট্ গ্যালারী আছে বুল্‌ভার রাস্‌পাইতে। যিশু টেলিফোনে যোগাযোগ করতে বলেছিল। ওঁর গ্যালারীতেও জায়গা হবে না এক বছরের মধ্যে। সেটা কথা নয়। কথা হল, ইউনেস্কোর টেলিফোন নম্বর ঘোরালেই লাইন পাওয়া পর্যন্ত ওই কথাগুলি শোনা যায়। একবার ফরাসীতে, একবার ইংরিজিতে। ঘুরে ঘুরে বাজতে থাকে টেপ,

—"দিস ইজ ইউনেস্কো—"

অথচ, এইমাত্র আমার কানে 'ইউনেস্কো' শব্দটি পাল্টে গিয়ে কেমন 'প্যারিস' হয়ে গেল,

—"এর নাম প্যারিস! দয়া করে অপেক্ষা করুন। আপনাকে আমরা ঠিকঠাক যোগাযোগ করিয়ে দেবার চেষ্টা করছি!"

ঈভলীনকে জিজ্ঞেস করলুম,

—"তোমার চেনা জানা উকিল-টুকিল আছে তো?"

—"কেন?"

—"ধরা পড়লে লাগবে !"

—"আহ্ ! বলছি তো ধরা পড়বে না। ওরা চিনতেই পারছে না।"

আমাকে কাঁপিয়ে দিয়ে আবার সেই,

—"এখানে কেউ ইণ্ডিয়ান পেইণ্টারকে দেখেছো ?"

ঝিম্ ধরার মতো বৃষ্টির শব্দ এবং এই প্রেমের গাঢ় শব্দহীনতাকে ধর্মের হাত ধরে আইনের এক পাহারাদার ভেঙেচুরে খান্‌খান্ করে দিল। ছন্দছাড়া হেঁড়ে আওয়াজটি এবার একেবারে আমার ঘাড়ের কাছে মনে হল।

গলা বোধহয় কেঁপে গেল একটু, বললুম,

—"মনে হচ্ছে, চুমু খাবার সময় হয়ে এলো ঈভলীন !"

ও মুখ পিছিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকালো। ওর ঠোঁট ধীরে ধীরে আমার শ্বাসের উষ্ণতার মধ্যে এগিয়ে আসছে। পেছনে বুটের শব্দ পায়ে পায়ে হেঁটে আমার থেকে দু'হাত দূরে এসে থামল। এইবার আমার বর্ষাতির কলার ধরে টান পড়বে। পলকের জন্যে ভাবলুম, 'যা থাকে কপালে' করে এক ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড় দিয়ে পালিয়ে যাই। এমনিভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোকার মতো ধরা পড়বার চেয়ে পালাবার চেষ্টা করলে বোধহয় ভালো হত। কেন যে ঈভলীনের বুদ্ধি নিয়ে ওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লুম !

চাপা গলায় বললুম,

—"আমি আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। তোমাকে ছেড়ে দৌড় দিচ্ছি—"

ও আমার চোখে চোখ রেখে বলল,

—"পাগলামো কোরো না। এসো। প্রেমিকের মতো চুমু খাও দেখি—" বলে চোখ বুজে ওর মুখটি সামান্য ডানপাশে কাত্ করল। অথচ, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়, বোধ, অনুভূতি ইত্যাদি পিঠের দিকে একসঙ্গে জড়ো হয়ে অপেক্ষা করছে !

এবারে প্রায় ধমক দেবার মতো জিজ্ঞাসা ব্রীজের তলায় গম্‌গম্‌ করতে লাগলো,

—"শুনতে পাচ্ছো! তোমাদের মধ্যে কেউ ইণ্ডিয়ান পেইণ্টার আছে?" আমাদের চমকে দিয়ে ওইদিকের শেষ প্রান্ত থেকে ঝাঁজালো গলায় কোনো পুরুষ জবাব দিয়ে দিল,

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমরা সব ইণ্ডিয়ান পেইণ্টার এখানে। বিরক্ত কোরো না তো! একটু শাস্তিতে থাকতে দাও।"

দেওয়ালের বোধহয় সব ক'টি খাঁজ থেকেই হাসির শব্দ উঠল। ঈভলীনও চোখ মেলে ফিক্ করে হেসে দিল।

—"যত্তো সব নিষ্কর্মার দল!"

বলতে বলতে ভারী জুতোর শব্দ তুলে পেছনের ছোট্ট দলটি ওদিকের শেষ প্রান্তে চলে গেল। সামান্য থমকে দাঁড়িয়ে বক্তাকে খুঁটিয়ে দেখল বুঝি। তারপর আবার সেই বিরক্তির গলায়,

—"যত্তো অপগণ্ড এসে জোটে এখানে—" এবং আরো কি সব বকতে বকতে ওরা সরে যেতে লাগল। ক্ষীণ গলায় পাদরীর হাঁউ-মাউ শুরু হল আবার। আমরা দু'জন বাদে বাকি সকলেই আবার যেন ডুবে গেল ঝাপসা অন্ধকারে আর চারপাশের বৃষ্টির শব্দের মধ্যে।

ওরা চলে যেতেই প্রথম খেয়াল হল, আমিও ঈভলীনের কোমর রীতিমতো জাপটে ধরে আছি। বেশ জোরে শ্বাস ফেলে হাত-পা-শরীর আলগা দিলুম। এবং নিজেকে আলাদা করতে করতে এতক্ষণে খেয়াল হল যে, আমি একটি সুন্দরী যুবতীকে প্রাণপণে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছিলুম। ভরা বুক সমেত একটি আস্ত নরম শরীর ধীরে ধীরে আলগা হয়ে গেল এখন। সাঙ্ঘাতিক বিপদ-আপদের ভয়ে যেন গুহায় লুকিয়ে পড়েছিলাম। বিপদ কেটে যেতে গুহা থেকে বেরিয়ে আসবার

সময় টের পেলুম, এটা একটা গুহা ছিল। অন্ধকার, গহ্বর, সাপ-বাঘ যা খুশি থাকতে পারতো। খেয়াল করে দেখবার মতো অনুভূতি তৈরি ছিল না।

ঈভলীনের দিকে চেয়ে খুব বোকার মতো হাসলুম। হেসে, আরো বেশি বোকার মতো ধন্যবাদ দিয়ে ফেললুম,

—"মের্‌সি। মের্‌সি মাদাম!"

গহন সমুদ্রের সেই নীল চোখে তাকিয়ে আছো। আমার কথা শুনে কেমন করে হাসলে। এক মুহূর্ত মনে হয়েছিল, তুমি। হাসতেই ফিরে এলুম। না, তুমি নও, বউ! ঈভলীন। একটা ভয় সরে গিয়ে অন্য একটা গুরগুর করে উঠল বুকে। এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, এ আমার সঙ্গে কতদূর যাবে! ও বললে,

—"এবার যাওয়া যাক। চলো।"

ওকে বাজিয়ে দেখবার ইচ্ছে হল হঠাৎ। বললুম,

—"তাড়ার কি! আর একটু থাকি না এখানে? জায়গাটা ভালো!"

মুখ টিপে হাসল। বলল,

—"হ্যাঁ! বেশ নির্জন।"

তারপর, দেওয়াল থেকে পিঠ তুলে এনে এক পা এগোল। আমার হাত ধরে বলল,

—"আসা যাবে, ইণ্ডিয়ান! পুলিসে তাড়া করলে, আবার আসা যাবে!"

বলে হাঁটতে লাগলো আগে আগে।

ও বাজলো ঠিকই। সুরেই বোধ হয়। কিন্তু কোন্ সুরে বোঝা গেল না। রোজমারীর মুখটা মনে পড়ল। হাসলে যার গালে ভাঁজ পড়ে। ভাঁজ পড়লে বয়েস ওঠে লাফিয়ে। রোজমারীর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয় নি। ও তো করেই নি। আমিও আর গা করি নি বিশেষ। তবে, ওর সঙ্গে ওই রকম একটা কাণ্ড না হয়ে গেলে, আমি বোধহয় আবার ভুল করতুম। আরো বড় জায়গায়, আরো বেশি ক্ষতি হওয়ার ময়দানে। ঈভলীনের সঙ্গেই হয়তো ভুল খেলে ফেলতুম। ধন্যবাদ রোজমারী। মের্‌সি বোকু!

এ মেয়েটি কোন্ সুরে বাজে, বুঝতে পারি না। বড় সাবধানে আছি। গুবরেটাকে আর আমল দিতে চাই না। বিশ্বাস নেই ও শালার। তাই, আমি আছি, বউ। তোমাকে চিঠিতে যদি এসব লিখতুম, তাহলে চিঠির ভাষায় লেখা যেত, আমি সাবধানে আছি।

তুমি লিখেছো, যেন আমি সাবধানে থাকি। চিঠি দিই। তোমার দাদা লিখেছেন তাঁর বন্ধুর নার্সিং হোমে তোমার নাম লেখানো হয়ে গেছে। তোমাদের সব খবর পাচ্ছি, বউ। কিন্তু আমার চিঠি লেখার সময় নেই। ইচ্ছেও করে না। তা ছাড়া, চিঠি লিখতে বসলে তোমাকে নিয়ে আমার সব অভিযোগের খবর যদি ভুল করে লিখে ফেলি! যদি আমার কাটা তর্জনীর কথা, কালো একটা লম্বা উলঙ্গ মানুষের সঙ্গে তোমার সুখের শব্দকে ঘিরে আমার যন্ত্রণার কথা—খামের ভিতরে করে তোমার কাছে চলে যায়, তবে বড় সর্বনাশ হবে। এই সময় মায়েদের মন নাকি হালকা রাখতে হয়, খুশি রাখতে হয়। নাড়িতে নাড়িতে যোগ। গর্ভের সন্তানেরও নাকি ক্ষতি হয়। চিঠি লিখতে ভরসা পাই না। সেই জন্যেই মনে মনে কথা বলি তোমার সঙ্গে। খুঁটিনাটি সব কথা প্রায়। ভালো থেকো। সুস্থ থেকো। নিশ্চিন্ত মনে আচার খেতে খেতে তোমার দাদার বন্ধুর নার্সিং হোমে চলে যাও। ফেরার সময় আর একটা প্রাণ নিয়ে এসো। আমার নামের খুব কাছাকাছি প্রাণ।...

জর্জ যেন কি বলল। জিজ্ঞেস করলুম,

—"অ্যাঁ! কি বলছো?"

জর্জের জবাব,

—"কফির জল তো সব শুকিয়ে গেল ইণ্ডিয়ান!"

খাটের ওপরে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বসার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়, ছবি দেখা শেষ হয়েছে ওর। হাতের বর্ষাতিটা হ্যাঙারে ঝুলিয়ে দিলুম। হিটার বন্ধ করে কফির গুঁড়ো ঢেলে দিলুম সসপ্যানে। বললুম,

—"ছবি কেমন দেখলে?"

জোরে জোরে মাথা দুলিয়ে জর্জ বলল,

—"ভালো, ভালো। খুব ভালো। তবে—"

—"তবে কি?"

—"ক্রেতার কথা ভেবে, মানে, কিছু মনে কোরো না ইণ্ডিয়ান, আর একটু জমকালো রং ব্যবহার করলে পারতে—"

বলে, পিটপিট চোখে তাকিয়ে থাকলো আমার দিকে। গেলাসে অর্ধেক অর্ধেক কফি ঢেলে বললুম,

—"দারিদ্র্য এবং নিঃসঙ্গতার রং কি খুব জমকালো?"

ধীরে ধীরে আবার মাথা দোলাচ্ছে জর্জ। গেলাসটি হাতে নিয়ে উঁচু করে ধরল। বলল,

—"তুমি রাজা হবে, ইণ্ডিয়ান। ছবি আঁকতে বসে আপোস কোরো না। আমি জেনে গেলুম, তুমি রাজা হবে একদিন। চিয়ার্স্।"

ওর বলার ধরনে বুক ভরে গেল। সামান্য হাসতে গিয়ে লজ্জা ছড়িয়ে পড়ল মুখে। আমিও কফির গেলাসে চুমুক দিয়ে বললুম,

—"ধন্যবাদ জর্জ।"

হুশ্ হুশ্ করে গরম কফি শেষ করল। করে, একটা আরামের শব্দ তুলল,

—"আঃ!" তারপর বলল,

—"বর্ষাতিটা হাতে নিয়ে অত কি ভাবছিলে?"

চারমিনারের শেষ প্যাকেটটি থেকে সিগারেট ধরিয়ে বললুম,

—"এই বর্ষাতিটা কি করে বেচে দেওয়া যায়, তাই ভাবছিলুম।"

জর্জ অবাক,

—"সে কি? বর্ষাতি বেচবে কেন? এই শীতে-বৃষ্টিতে বেরোবে কি করে?"

—"বৃষ্টি তো শেষ হয়ে এল বলে।"

ওর পাশে গিয়ে বসলুম। বললুম,

—"তা ছাড়া টানাটানি শুরু হয়েছে একটু। তুমি নিয়ে নেবে এটা? পারো তো কাউকে গছিয়ে দাও। যা হোক্ কিছু পেয়ে গেলেই আমার আপাতত চলবে।"

ঈশ্! তখন যদি জানতুম বউ, কি কঠিন সাহায্য চেয়ে ফেলেছি জর্জের কাছে! ও জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে থাকল কয়েক মুহূর্ত। যেন কিছু ভাবল। তারপর ঝট্ করে মুখ তুলে দেখল আমায়। সেই দুষ্টুমির হাসি তখন বুঝি নি, ওই এক ফালি হাসি দিয়ে চারপাশের সমস্ত অ-সুখ ও দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। বলল,

—"বর্ষাতি নেব না। তোমাকে একশো ফ্রাঁ দিয়ে যাব আমি।"

বেশ রুক্ষ গলায় জবাব দিলুম,

—"না। দান। আমার চাই না জর্জ। ধন্যবাদ।"

ও তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরল,

—"দান নয় ইণ্ডিয়ান। ধার দিয়ে যাচ্ছি। তোমার ছবি বিক্রি হয়ে গেলে শোধ দিও। ডাকে পাঠিয়ে দিও।"

ঠিক বুঝতে পারি নি তখনো। ভুরু কুঁচকেই জিজ্ঞেস করলুম,

—"ডাকে পাঠাবো কেন? ধার নিলে, নিজে গিয়ে দিয়ে আসব বাড়িতে!"

ও হাসল। বলল,

—"ও বাড়ি ছেড়ে, মানে, প্যারিস ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমরা। বেশ দূরে। আমাদের গ্রামে। দক্ষিণ ফ্রান্সের শেষ প্রান্তে।"

তারপর, সেদিন ঘুম ভাঙতেই হঠাৎ একেবারে সকাল। এমন সকাল যেন কত যুগ দেখি নি। কাচের দরজা পেরিয়ে বারান্দায় রোদ যেন হয় না কখনও। এতগুলো বৃষ্টির বিষণ্ণ দিনরাত্রির পর সূর্য এক অলৌকিক ঘটনা। এমন সূর্যের দিনে কেউ মুখ কালো করে এ শহর ছেড়ে চলে যাবে, ভাবতেই পারছি না। দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। মনে হল, পৃথিবীতে প্রথম সূর্য উঠেছে। হলুদ একটা মস্ত ফুলের মতো পাপড়ি ছড়িয়ে দিয়েছে সারা আকাশে। নতুন নতুন লাগছে সব কিছু। যেন সামনের জাপানী বাড়ি ছিল না কখনো। সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হল। যেন কোনো নরওয়ের ছাত্রাবাস ছিল না এপাশে। রোদ পড়তেই মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল। দেশে বসে টের পাই না সূর্য কি জিনিস। এখানে হঠাৎ সূর্য উঠলে আপনা থেকে মনের মধ্যে বাজতে থাকে—'ওঁ জবা-কুসুমশঙ্কাশং কাশ্যপেয় মহাদ্যুতিং ধ্বন্তারিং সর্বপাপঘ্ন প্রাণোতঽস্মি দিবাকরম্—'।

শীত আছে যথেষ্ট। শীতের বাতাস নেই। বৃষ্টিতে ভেজা পিচের কালো পথ এখন রোদ পড়ে চক্‌চকে। আকাশে তাকালে মনে হয় মেঘ বলে কিছু নেই পৃথিবীতে। অনেক অনেক দিন পর মোঁমার্ত্রে মেলা বসবে। যিশু, দেনিস ড্রয়িং বোর্ড হাতে ঘুরে বেড়াবে। অথচ, ওরা কেউ জানবে না, আমাদেরই মতো এক শিল্পী হাসতে হাসতে হেরে চলে যাবে দূরে। আমার পয়সার খুব দরকার। কিন্তু, আজ আমি মোঁমার্ত্রে মুখ চেয়ে ঘুরে বেড়াতে পারব না।

জর্জের কাছ থেকে টাকা নেবার আর প্রশ্নই ওঠে না। ও তবু বলেছিল,

—"ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান। এক কাজ করা যাক্। তোমার বর্ষাতিটা দাও। আসছে মঙ্গলবার আমার বাড়িতে নিলাম হবে। তোমার বর্ষাতিও নিলামে তুলে দেব। যা পাওয়া যায়।"

আমি দিই নি। মন এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, ওর সঙ্গে আর আমার বর্ষাতি বা অনটনের বিষয় নিয়ে কথাই বলি নি। পরে, যিশুকে গছিয়ে এসেছি ওটা। ও আমাকে একশো ফ্রাঁ নগদ দিয়েছে। বলেছে,

—"এই বাদলা-বিষ্টিতে বর্ষাতি বেচছো যখন, তার মানে বড় ফাঁপরে পড়েছো। আমি তোমাকে কিছু ফ্রাঁ ধার দিলে নেবে ?"

'না' বলেছিলুম বলেই ওটা রেখে একশো ফ্রাঁ দিয়ে দিয়েছে। ভিজতে ভিজতে বু দ্য বুজার্টের দোকান 'এসকিস' থেকে বেশ দামী একটি সুন্দর রঙের বাক্স কিনে এনেছি। আজ সকালেই রোদ।

সেই রঙের বাক্স পকেটে নিয়ে ম্যালমেজোঁর এই গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ভাবছি, ঢুকবো কি ঢুকবো না। গেট পেরোলেই উঠোন। উঠোনের ওপারে সোজা সেই একতলা লম্বাটে ঘর দুটি দেখতে পাচ্ছি। জর্জ আর জানীর আতেলিয়ে। ভাস্কর এবং শিল্পীর স্টুডিও। যার দেওয়ালগুলোতে কঙ্কালের মতো পেরেক দাঁত বের করেছিল। কয়েকটি ছবি শুধু মেঝের কার্পেটে রাখা। তখন বুঝতে পারি নি, এরা চলে যাচ্ছে প্যারিস ছেড়ে। তখন বুঝতে পারি নি, স্বামী-স্ত্রী এই স্বর্গরাজ্যে কি করুণভাবে হেরে গেছে। এদের বাড়িতে প্রথম দিন এসে মনে মনে বোধহয় একটু ঈর্ষাই হয়েছিল। ভেবেছিলুম, খুব সচ্ছল অবস্থা। দেশে আমার কার্পেট-পাতা ঘর, হরিণের চামড়ায় মোড়া সোফা, গাড়ি, টেলিফোন থাকলে আর ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হত না। সেইসব ভাবনাগুলি বিকৃত মুখে হাসতে হাসতে আমারই গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে আজ। মনে আছে, জর্জের কাজের ঘরে ঢুকে সেদিন দেখেছিলুম, কিচ্ছু নেই। শুধু প্লাস্টার, কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়েছিল সারা ঘরে। প্রতিমা নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দেবার পর যেমন পুজো মণ্ডপে ছেঁড়া-খোঁড়া, টুকরো, পরিত্যক্ত জঞ্জাল পড়ে থাকে, জর্জের পুজোর ঘরও তেমনি পড়েছিল। কারণ জিজ্ঞেস করতে কেমন অদ্ভুত হেসে বলেছিল, —"বিক্রি হয়ে গেছে। সব বিক্রি হয়ে গেছে।"

সেদিন কিছুই বুঝতে পারি নি। শুধু একটু অবাক হয়েছিলুম। আজ সব কথা একটি একটি করে কাঁটার মতো খোঁচা দিচ্ছে স্মৃতির পর্দায়।

—"মঁসিয়। ছবি আঁকা কি দোষের ?"

জীবনের সব কিছু পণ করে জুয়ো খেললে দোষের। হেরে গেলে ছবি আঁকার প্রতি ঘৃণা ধরে যায়। তবু, ছাড়া যায় না। মুখ থুবড়ে শিল্পময় পৃথিবীর ধুলোয় পড়ে গিয়ে সারা মুখ, মন, শক্তি, আশা ক্ষতবিক্ষত হলে মনে হয়, আমি, আমার স্ত্রী অথবা আমরা যে পরাজয়ের গ্লানি বয়ে বাকি জীবনটুকু কাটাতে বাধ্য হব, আমাদের সোনাছেলে যেন সে ভুল না করে। রং, ক্যানভাস, সৃষ্টি অথবা নাম-সম্মানের জুয়োখেলায় সেও যেন মেতে না ওঠে। ওকে তাস চিনতে দিও

না। তাস ভালো লাগলে সেই তাসের প্যাকেট বা রঙের বাক্স আলমারিতে চাবি বন্ধ করে রাখো। যাতে রঙের প্রতি লোভ অঙ্কুরেই মরে যায়। বড় কষ্ট। বড় কষ্টে একমাত্র ছেলের ছবি আঁকার ছেলেমানুষি ইচ্ছেকে তার নাগালের বাইরে তুলে রাখে জর্জ। একটা গোটা জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, পরিশ্রম সবকিছু হেরে গিয়ে কী ভয়ংকর আতঙ্কে, কী অসহ্য বেদনায় ফিলিপকে ছবি আঁকতে দেখলে সে ছবি, সেই খেলা-শেখার তাস ছিঁড়ে ফেলতে হয় তা কি আর কাউকে বলে বেড়াবার কথা—আজ এই গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি সব বুঝতে পারছি, বউ। কারণ, জর্জের বাড়ির উঠোন আজ খালি নেই। ফ্রিজ, আলমারি, চেয়ার, সোফাসেট, বইপত্র সারা উঠোন জুড়ে ছড়িয়ে আছে। কাগজে দেখেছিলুম, এগারোটা থেকে নিলাম শুরু হবে। নিলামওয়ালা আসে নি এখনো। কোম্পানীর অফিসবয় গোছের দুটি ছেলে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। জর্জ-জানী-ফিলিপ কেউ নেই উঠোনে।

একবার ভাবলুম ফিরেই যাই। কলকাতার শ্মশানঘাটে রাত-বেরাতে যেতুম। ঘুরে বেড়াতুম বন্ধুদের সঙ্গে। গাঁজা, ভাং অথবা যে কোনো নেশায় চুর হয়ে আরো নেশার খোঁজে রোমান্টিক ভাবনায় দল বেঁধে উদাস সাজতে চলে যেতুম কেওড়াতলায়। আধা পরিচিত পাড়ার লোক পোড়াতে শ্মশানে যাওয়ার মধ্যে যে উচ্ছলতা বা হুল্লোড় খেলা করতো মনে, প্রায় সেই মন নিয়েই আত্মীয়-স্বজন পুড়িয়ে বেড়িয়েছি

অথচ, এখন জর্জ, জানী বা ফিলিপের মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করছে না। কী বলবো! এরা তো আমার কেউ নয়। এদের জন্যে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। তবু, স্ট্যালিনের গোঁফের নিচে এক ফালি হাসি আমাকে এখন এই গেটের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে ভরসা দিচ্ছে না। কী কথা বলবো! রাজ্যপাট হেরে গিয়ে প্রাসাদের বাইরে খালি পায়ে রাজা রাণী অথবা রাজপুত্র দাঁড়িয়ে থাকলে তাদের কী বলতে হয়!

বুক সমান উঁচু গেটের হাতল ধরে এইসব ভাবছি, ডানদিকে ড্রয়িং রুমের দরজা খুলে গুটি গুটি ফিলিপ বেরিয়ে এল। কপালের ওপর চুল, লাল জ্যাকেট গায়ে ছোটো রাজপুত্র উঠোনে এসে দাঁড়াল সোফা সেটের গা ঘেঁষে। তেমনি সরল চোখদুটি জিনিসপত্র দেখতে দেখতে এদিকে ঘুরল। আমাকে দেখে ধীরে ধীরে হেঁটে এগিয়ে এল। মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন নেই। আগের মতোই গম্ভীর। কাছাকাছি এসে মৃদু মাথা ঝুঁকিয়ে বলল,

—"বঁ জুর মঁসিয়।"

এই ভঙ্গিটুকু দেখলেই জর্জের ছোটোবেলা ভেবে নেওয়া যায়। এতক্ষণ যে ঝামেলা ছিল না, এইবারে সেটা টের পেলুম। পাপার মতো ফিলিপের মাথা ঝুঁকিয়ে আমাকে অভিবাদন জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলুম, আমার চোখ কর্‌কর্‌ করছে। ওর দিকে চেয়ে অল্প হেসে সামলে নিলুম। টেনে গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললুম,

—"বঁ জুর, ফিলিপ! তোমার পাপা কোথায়?"

—"সকালবেলা বেরিয়ে গেছেন। এক্ষুনি আসবেন। আপনি ভেতরে আসুন। মা আছেন।"

তারপর কিছু না ভেবে, না বুঝেই বলল,

—"আপনি কী কিনবেন, মঁসিয়?"

সব বিক্রি হচ্ছে। লোকে কিনবে। আমিও নিশ্চয়ই কিছু কিনতে এসেছি, এই সহজ ভাবনা থেকে ও আমাকে জিজ্ঞেস করল। আমি কি জবাব দেব! ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ঘরের দরজার দিকে হাঁটতে লাগলুম।

সারা উঠোনে একটা গোটা সংসার। অবিন্যস্ত, পরাজিত সংসারের ছবি। বাঁদিকে দেওয়াল ঘেঁষে লম্বা সোফা সামান্য কাত হয়ে পড়ে আছে। হাতলের কাছে ঝুলছে সেই সুন্দর হরিণের চামড়াটি। শৌখিন জিনিস আর বইপত্র-ভর্তি কাচের আলমারিটিও সোফার কাছে দাঁড়িয়ে। তাকে টুকিটাকি জিনিসগুলি আগোছালো। মোটা মোটা খণ্ডে পৃথিবীর শিল্পজগতের ইতিহাস। দেলাক্রোয়া, গেরিকোণ্ট, দ্য ভিঞ্চি থেকে এ যুগের পিকাসো, ব্রাক্‌ পর্যন্ত প্রায় সব শিল্পীর জীবন ও ছবির বই নিচের তিনটি তাকে ঠাসা। সবাই গায়ে গায়ে ঢলে পড়ে হাসছে মনে হল। ছবির জগতের সেইসব লড়িয়েদের নামগুলি যেন কথা বলছে,

—'ওহে ছোকরা! অতো সোজা নয়, ছবি এঁকে বিখ্যাত হবে! গাড়ি-বাড়ি টেলিফোন করবে—তোমার বন্ধু আর তার বউকে জিজ্ঞেস করো, অত সোজা নয়! তুমি তো কোন্‌ হরিদাস পাল বিদেশী, এরা চোদ্দ পুরুষ ধরে ফ্রান্সের অধিবাসী। এই স্বর্গরাজ্যে এসেছিল—হুট্‌ করে নাম-দাম উপার্জন করা যাবে ভেবে। চাকরি নষ্ট হয়ে গেল! যাও বাছা, গাঁয়ে ফিরে যাও! ক্ষেত-খামার ভ্যাখো গে—'

সোনার জলে লেখা নামগুলো দেখতে দেখতে এইসব কথা শুনতে পাচ্ছিলুম। হঠাৎ দেখি, নিজের অজান্তেই হাত কখন পকেটে চলে গেছে। শক্ত মুঠোয় ধরে

আছে দেশলাই। আর একটু হলেই বইগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিতুম। আপন মনের ভয়ের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে, নইলে চলবে না। জর্জের চলে যাওয়ায় তোড়জোড়ে কষ্ট হচ্ছে, আর একটু একটু ভয় উঁকি দিচ্ছে ভেতরে।

পাশে তাকালুম। সেই সুন্দর, দামী কার্পেটটি গোল করে রাখা। এর ওপরে বোয়াগুন্‌তিয়ে পরিবারের হাঁটা, চলা শেষ হয়ে গেছে। এক-একটি পরিচিত জিনিসে চোখ পড়ছে আর ভাবছি, সব বিক্রি হয়ে যাবে। বোয়াগুন্‌তিয়েরা আজ প্যারিসের ক্রেতাদের সামনে নিলামে দাঁড়াবে। জর্জ মাথার টুপ খুলে দু'হাত ছড়িয়ে বলবে,

—'কিনে নিন, বন্ধুগণ! আমাদের স্বপ্ন-সাধের ছবি-আঁকা মিটে গেছে। নামমাত্র দামে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। স্বপ্ন-সাধ কিনে নিন্!'

জানীর খোঁজে ড্রয়িংরুমের দরজার দিকে এগোতেই ছোট্ট একটি প্রশ্ন মনে এল। সবই তো গেল! যেতে যেতে সেই দুষ্টুমির হাসিটিও হারিয়ে যাবে। নিলামওয়ালা যখন হাতুড়ি ঠুকে বলবে,

—'চলে গেল দেলাক্রোয়া, ভ্যানগঘ্-দা ভিঞ্চির জীবন ও স্বপ্ন—সব চলে গেল! সাতশো চল্লিশ ফ্রাঁ—এক, সাতশো চল্লিশ ফ্রাঁ, দুই—'

স্ট্যালিনের মতো কোনো গোঁফের নিচে সেই দুষ্টুমির হাসি টেনে গ্রাম থেকে ছিটকে আসা এক ফরাসী শিল্পী কি তার চোখ অথবা হৃদয় ভিজতে দেবে না!
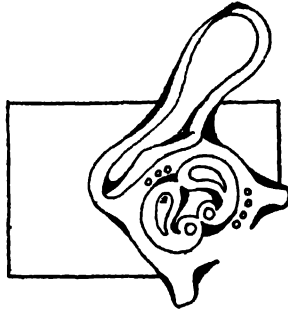
আসলে চলে যাওয়াটা কিছু নয়। চলে যাওয়াই তো স্বাভাবিক। সময়ের সঙ্গে, অগণিত বাধা-বিপত্তির সঙ্গে হাতাহাতি করতে করতে টিঁকে থাকা বা বেঁচে থাকাটাই তো বিস্ময়কর ঘটনা। যুগ যুগ ধরে এক আশ্চর্য এবং অমোঘ নিয়মের মতো পৃথিবীর সহস্র শিল্পীরা ক্ষুধার্ত জীবন, স্বপ্ন ও পরিশ্রম দু' হাতের মুঠোয় ধরে নিলামওয়ালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। শিল্পবোদ্ধারা তাদের সমসাময়িক সেই সব 'অলস' অথবা 'উন্মাদ' ছবি-আঁকিয়েদের প্রতি করুণা দেখিয়ে তাদের স্বপ্ন-

সাধ কিনে নিয়েছেন। নিলামওয়ালাদের নির্দয় হাতুড়ির ঘায়ে এক একটি হাড় পাঁজর ভেঙে গেছে যাদের, তারা নিতান্তই স্বাভাবিক নিয়মে সেই ভাঙা পাঁজর গায়ের চামড়া ছিঁড়ে বের করে এনেছে। এনে, যত সব সহৃদয় সমঝদারদের দেওয়াল, গুদাম অথবা আপিস ঘর সাজিয়ে দিয়ে আরো স্বাভাবিক এবং সাধারণ নিয়মমাফিক চলে গেছে। বিলাস-ব্যসন, নয় শুধু পেট ভরে রুটি-তরকারি একটু আমিষ, কিছু পানীয় এবং মমতাময় উষ্ণ একটি নিশ্চিন্ত ঘরে ইচ্ছেমতো রং আর ক্যানভাস—এই সব টুকরো টুকরো ছোটোখাটো সুখের মুখ খুঁজতে খুঁজতে তাদের চলে যেতে হয়েছে। কারণ, চলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, তার পরে অবশ্য সেই সব পাঁজরার এক একটি টুকরো নিয়ে লোফালুফি খেলা শুরু হয়ে গেছে। হাড়ের টুকরোরা মালিকের মৃত্যুর পর হীরের টুকরো হয়ে নিলামে উঠেছে। পরবর্তীকালের সমঝদাররা কে কতো বেশী দাম দিয়ে ওই সব হীরের টুকরোদের দেওয়ালে টাঙাতে পারে তাই নিয়ে রেষারেষি। দেশে-বিদেশের জাদুঘরে জাদুঘরে ঠাণ্ডা লড়াই। সমালোচক, গবেষকরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে এক এক ফোঁটা শুকনো রঙের ইতিবৃত্ত নিয়ে হইচই লাগিয়ে দিয়েছেন। এ এক আশ্চর্য খেলা। পিকাসো বা যামিনী রায়ের মতো চোখের সামনে এই সব খেলা দেখে যাবার সৌভাগ্য ক'জনের হয়! আমি জানি, বউ, এই মুহূর্তে দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ শিল্পী ছবি আঁকছেন। তাঁদের মধ্যে সকলেই শিল্পী নন, কেউ কেউ শিল্পী। কয়েক লক্ষের মধ্যে কয়েক হাজার অথবা কয়েক শো হয়তো সংখ্যায়। তাঁদের মধ্যে একজনও পিকাসো বা যামিনী রায় নন। কারণ, তা হলে তাঁদের নাম এক্ষুনি বলে দেওয়া যেত। তার মানেই, শ্বাস গ্রহণ করতে করতে যদি তাঁরা পিকাসো হতে পারলেন তো ভালোই, নইলে, সেই নিলামওয়ালার হাতে হাড়গুলি তুলে দিয়ে তাঁরাও চলে যাবেন। দুঃসাহসীরা হামাগুড়ি দিয়ে হয় গিয়ে উঠবেন চিতায় কিংবা নেমে যাবেন কবরে। বাকি যাঁরা, তাঁরা চলে যাবেন ইস্কুলে ড্রয়িং মাস্টারী করতে, বিজ্ঞাপন কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার বানাতে অথবা গিন্নীর গয়না বেচে খুলে বসবেন দোকান—'এইখানে নামমাত্র মূল্যে যাবতীয় সাইনবোর্ড ও ব্যানার তৈরি হয়!' কলেজের সেই করুণাময় তার বাবার মৃত্যুর পরেও তিন-তিনটে সোনার মেডেল পেয়েছিল। পেয়ে, চা দিয়ে পাঁউরুটি ভিজিয়ে খেতে খেতে চার বছর ছবি এঁকেছে। খুব ভালো ভালো ছবি। দুটো একক প্রদর্শনীও করেছিল। পরে, মাস্টারী নিয়েছে তমলুকে। গোড়ায় গোড়ায় ছুটিছাটার দিন রং-ক্যানভাস নিয়ে বসত। আজকাল চিঠিতে

লেখে, 'দুদ্দুর, ওসব করে কি হবে? বেশ আছি। খাসা সুখে আছি, ভাই। গিন্নি বড় ভালো রাঁধে। গেল ছাব্বিশে একটি মেয়ে হয়েছে আমার। কি নাম রাখা যায়, বল তো?' করুণাময় সুখে নেই। থাকতে পারে না। সুখের মুখ খুঁজতে খুঁজতে না পেয়ে এখন মেয়ের নাম খুঁজছে। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। তাই, ও এখন স্বস্তিতে আছে।

চলে যাওয়া হয়তো কিছুই নয়। কিন্তু, এমনি করে চলে যাওয়াটা বড় ভয়ের। যে গেল, সে গেল। কিন্তু, যারা কাঁধ দিচ্ছে, যারা হরিধ্বনি দিয়ে খই ছড়াচ্ছে কিংবা যারা শুধু দর্শক হিসেবে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকাচ্ছে, তাদের মধ্যে এই সব চলে যাওয়া একটা শীতের মতো ভয়। আমাকেও তো চলে যেতে হবে! আমাকেও কি চলে যেতে হবে এমনি করে?

শীতের মতো একটা নিষ্করুণ, শুকনো ভয় সমস্ত শরীরে কাঁপুনি দিয়ে যায়। কানের কাছে কারা যেন ফিস্‌ফিস্ করে হরিধ্বনি দিল। চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ভেজানো দরজায় টোকা দিলুম। ভেতরে জানী আছে। কিভাবে আছে, কে জানে। কি সান্ত্বনার কথা শোনাবো ওকে, এই সব ভাবতে ভাবতে আবার টোকা দিলুম দরজায়।

একসঙ্গে, ঘরের ভেতর থেকে জানীর আহ্বান এবং পেছন থেকে পুরুষ গলায় ডাক শুনতে পেলুম,

—"হেই ইণ্ডিয়ান! এসে গেছো—"

ফিরে দেখি, গেটের বাইরে রাস্তা দিয়ে এদিকে হেঁটে আসছে জর্জ। সঙ্গে এক বিশাল চেহারার ভদ্রলোক, এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে দেনিস কাস্তেল আর লিয়ঁ। ওরা দু'জন আমায় দেখে মৃদু হাসল। অচেনা ভদ্রলোকের গায়ে বুক খোলা ওভারকোট। মাথায় বাঁদর টুপি। গোঁফ-দাড়ি নিখুঁত কামানো। হাঁটাচলার মধ্যে বেশ ভারিক্কি ভাব। উনি বোধহয় কথা বলছিলেন। ওরা শুনছিল। জর্জ আমাকে ডেকে হাত নাড়তেই ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে আমায় দেখেছিলেন। আবার জর্জের দিকে ফিরে আগের খেই ধরে কথা বলতে লাগলেন। ওঁর কথা শুনতে শুনতে সবাই গেটের কাছে এসে দাঁড়াল।

জর্জকে দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। মনেই হচ্ছে না, যে, এই লোকটির সব নিলাম হয়ে যাবে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে। কে বলবে, মানুষটি তার স্বপ্নসাধ পুড়িয়ে দূর দক্ষিণের কোনো অখ্যাত গ্রামে চলে যাবে! ওকে দেখে মনে হঠাৎ খটকা লাগে, ওর শিল্পসাধনা কতদূর গভীর ছিল! না কি জীবনের সমস্ত কিছুই

ও হালকাভাবে নিয়েছে। আছে তো অনেকেই এরকম। বাতাস হয়, তাই বইছে—আমি কি করব! দিন যায়, তাই যাচ্ছে। যেতে দাও যদ্দিন যায়! এই জাতের লোককে দেখে কেমন হতাশ মানুষ মনে হয়। কি হবে কিছু সৃষ্টি করে? সৃষ্টির চেষ্টা করে? ছবি আঁকা, কবিতা, লেখা অথবা নতুন ফর্ম, প্রয়োজনীয় কোনো শব্দ হঠাৎ আবিষ্কারের মধ্যে কি আনন্দ আছে—তা এরা জানে না, জানতে চায় না। কিন্তু, জর্জও কি তাই? না, বউ, জর্জ বোধহয় পরাজয়ে বিশ্বাসই করে না। বহু কষ্ট, পরাজয় ঘেঁটেঘুঁটে এই বয়সে এসেছে। স্ট্যালিনের গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে উড়িয়ে দিতে চায় সব। এই দীর্ঘদেহ ফরাসীটি যদি গভীরভাবে তার শিল্পকে সাধনার বিষয় হিসেবে না গ্রহণ করতো, তাহলে ছোট্ট একমাত্র ছেলের রঙের বাক্সটি বন্দী করে রেখে দিত না। ফিলিপ ছবি আঁকলে, তা ছিঁড়ে ফেলতো না। এইখানেই ওর পরাজয়ের চেহারা লুকিয়ে আছে। শিল্পকে ভালোবেসে পারিপার্শ্বের সঙ্গে লড়াই করতে করতে পরাজয়ের গ্লানি এক গভীর বাসনার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে হৃদয়ের গভীরতর প্রদেশে বেদনা হয়ে বাসা বেঁধেছে। সেই প্রদেশ, সেই বাসাটির কথা ও কাউকে বলবে না। যেন, সব হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

তেমনি হাসতে হাসতেই বললো,

—"অনেকক্ষণ এসেছো, মনে হচ্ছে!"

তারপর, কানের কাছে মুখ এনে গলা নামিয়ে বললো,

—"তুমি তো কিছু কিনতেপারবে না, ভাই! তুমিতো আমার চেয়েও গরিব।"

অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল আমার,

—"মঁসিয়ে বর্জেরোঁ। ওই যে টেবিলটা দেখছো, ওর ওপরে হাতুড়ি পিটে আমার জিনিসপত্রের দাম ঠিক করবেন।"

নিলামওয়ালার সঙ্গে হাত মেলালুম। অফিস বয় গোছের ছেলে দু'টি মঁসিয়ে বর্জেরোঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাল। উনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমাদের বললেন,

—"পার্দঁ! আমি এগিয়ে দেখি। যোগাড়-যন্তর করতে হবে তো! এগারোটা বাজে প্রায়।"

বলতে বলতে ছেলে দুটিকে নিয়ে তড়বড় করে হেঁটে চলে গেলেন উঠোনের দিকে। অগোছালো জিনিসপত্রের পাশ কাটিয়ে, পোশাক বাঁচিয়ে অত বড় শরীরটা কি করে যে পাখির মতো উড়ে গেল, না দেখলে ভাবা শক্ত।

জর্জ ওর যাওয়ার দিকে চোখ রেখে আমার কানে কানে জিজ্ঞেস করল,

—"তোমার ওভারকোট এনেছো? কই?"

মাথা নেড়ে জানালুম, না।

—"সে কি! কেন? বলেছিলুম না নিয়ে আসতে! নিলামে ভালো পয়সা পেয়ে যেতে হয়তো?"

ও আমাকে বলেছিল ঠিকই, ওর জিনিসপত্রের সঙ্গে আমার কোটটাও নিলামে তুলে দিতে পারবে। সেদিন, 'হ্যাঁ'-'না' কিছুই বলি নি। ওর চলে যাবার খবর শুনে কোটের ব্যাপার ভুলেই গিয়েছিলুম। যিশুর কাছে বিক্রি করতে যাবার সময় একবার মনে পড়েছিল জর্জের কথা। কিন্তু, বউ, এ কি ভাবা যায়! তোমাকে বলে, ব্যাখ্যা করে ঠিক বোঝাতে পারব না হয়তো, তবে, জর্জের সব-কিছু নিলাম হয়ে যাবার আসরে আমি অন্তত কিছুতেই আমার একটা ওভারকোট এনে সেই সঙ্গে জুড়ে দিতে পারতুম না, পারি নি।

বললুম,

—"খুব দরকার ছিল। ভালো খদ্দের পেয়ে আগেই বেচে দিয়েছি।"

—"বোকা কোথাকার।"

বলে, দেনিসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল জর্জ,

—"ইনি হলেন আমাদের গাঁয়ের বিখ্যাত কুস্তিগীর মঁসিয় ক্যাস্তেল—"

বাধা দিয়ে বললুম,

—"মঁসিয় দেনিস ক্যাস্তেল।"

তিনজনেই একসঙ্গে হেসে ফেললুম। জর্জ পিটপিট চোখে আমাদের দেখে নিয়ে বলল,

—"হুম্! তার মানে, উল্টে আমিই বোকা হয়ে গেলুম।"

লিয়ঁর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলুম,

—"তুমি জর্জকে চেনো কি করে?"

লিয়ঁ খুব একটা কথা বলে না। বললেও, গোণা-গুণতি। দলের সব রকমের আড্ডায় লিয়ঁকে পাওয়া যাবে। সকলের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কখনো বড় জোর 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'। ব্যস! ওর বোধহয় খুব বেশি প্রশ্ন নেই জীবনে। অথবা, অনেক বেশী জবাবও জানা নেই। তাই, মনে হয়, চুপচাপ সকলের সঙ্গে ঘুরে, আড্ডায় বসেই আনন্দ।

ও আমার কথার জবাব দেবার আগেই দেনিস বললে,

—"ও চেনে না। আমিই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি ওকে। পিয়েরকেও বলেছিলুম। তোমার সেন্টিমেন্টাল 'যিশুখৃষ্টকে। সে আবার আর এক কাঠি! দার্শনিকের মতো বলে, 'কারুর সমস্ত কিছু নিলাম হয়ে যাবার আসরে আমার যেতে ভালো লাগে না।"

দেনিসের কথাগুলিতে ভর দিয়ে যিশু আমার মনের মধ্যে শরীর জুড়ে দাঁড়িয়ে গেল। ওকে আর কতো ভালোবাসব, বউ!

চারপাশে দেখে নিয়ে বাঁ হাতের থলেটি উঁচু করে দেখাল দেনিস। জর্জকে বলল,

—"লোকজন এখনো আসতে আরম্ভ করে নি। এলেও তো আমাদের কিছু করবার নেই। মঁসিয় বর্জেরেঁা তাঁর বিশাল শরীর দিয়েই সব সামলাবে। চলো, ততক্ষণে আমরা ভেতরে বসে থলে খালি করি।"

জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি আছে ওতে?"

—"দুটি বোর্দো ওয়াইন, একটি সাদা রাম।"

বসবার ঘরে আজ বসবার জায়গা নেই। অথবা, পুরো মেঝেই খালি। যেখানে খুশি বসে পড়া যায়। ফায়ার প্লেসে কোনো আগুন জ্বলছে না আজ। কোণে, দেওয়াল ঘেঁষে একটি তোরঙ্গ। তার ওপরেও পা তুলে গুটিসুটি জানী বসে আছে। আমরা দরজা খুলে ঢুকতেই মুখ তুলে তাকালো। জর্জের মতো দুষ্টুমির হাসি তো সবার থাকে না! জানীরও নেই। বাস্তুহারার উদ্‌ভ্রান্ত চোখে আমাদের দেখে হঠাৎ যেন কাউকেই চিনতে পারল না। জানীর দিকে আজ আমার তাকাতে ইচ্ছে করছে না। শুকনো মুখে দশ বছর বয়েস বেড়ে গেছে। আমরা তিনজন মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালুম। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে চিনতে পারার মতো ম্লান হাসল। জর্জ এগিয়ে গিয়ে ওকে দু'হাতে জড়িয়ে চুমু খেল। যেন বলল, ভয় কি? আমি আছি!

দেনিস আমার হাতে থলেটি ধরিয়ে বলল,

—"দাঁড়াও গেলাস নিয়ে আসি।"

বলে, ভেতরের ঘরের দিকে পা' বাড়াতেই জর্জ হেসে ফেলল,

—"কুস্তি করলে বুদ্ধি যে সত্যি সত্যিই কমে যায়, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ দেনিস ক্যাস্তেল।"

—"কেন, কি করলুম আমি?" দেনিস অবাক!

—"আমাদের শৌখীন ক্রকারির সেট্, থালাবাসন-গেলাস কি আজ আর তুমি রান্নাঘরে পাবে, বৎস! ওই তোরঙ্গে কিছু জামাকাপড় আছে, বাকি সব আলমারি সুদ্ধু উঠোনে শোভা পাচ্ছে।"

'সব' কথাটি এমন লম্বা করে বলল জর্জ, যে, ওর মুখের হাসিটি এক মুহূর্তের জন্যে হলেও কেমন বেঁকে গেল। দেনিস ঠিক যত দ্রুত ভেতরের ঘরের দিকে যেতে পা বাড়িয়েছিল, তার চেয়ে অনেক আস্তে, টেনে টেনে বাইরের দরজার দিকে হাঁটতে লাগল। তারপর, কি ভেবে, আচমকা মেঝেয় লেপ্টে বসে পড়ল। জর্জের 'সব' কথাটির ভারি বাতাস ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবার মতো বলল,

—"দুদ্দুর! সব পাঁড় মাতাল আমরা। গেলাস দিয়ে হবেটা কি? বোতল থেকেই খাবো। শেষ হলে, বোতল তিনটেও নিলামে তুলে দেব—!"

ওর বলার ধরনে ফল হল উল্টো। হাল্কাভাবে শুরু করলেও শেষের কথা ক'টি ঘরের মধ্যে বাতাসের ওজন বাড়িয়ে দিল আরো। আমরা কেউ কোনো কথাই বলতে পারলুম না।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, বোতলে মুখ লাগিয়ে কয়েক মিনিটেই বোর্দো ওয়াইন শেষ। দেনিস বললে,

—"গাড়িটার কি করলে জর্জ?"

—"ও তো গত মাসেই বেচে দিয়েছি। এক বছর পাঁচ মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ে ছিল তো! বড় লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলুম!"

একটু থেমে, যেন জানীকে সাক্ষী রেখে বলল,

—"তবে, যাই বলো জানী, বুড়ি মাদাম বড় ভালো! সব ভাড়া একসঙ্গে মিটিয়ে দিতেই আমায় জাপটে ধরে বুড়ির কি কান্না—"

বলতে বলতে হাসতে লাগল জর্জ। আমরা কেউ শ্মশানে বসে হাসতে পারি না। জানী ওয়াইন খাচ্ছে না। তেমনি থম্ ধরে তোরঙ্গের ওপরে বসে আছে। বললে, গলার স্বর ভারি শোনাল খুব,

—"প্লীজ! চুপ করো জর্জ। বড় বেশি কথা বলছো তুমি।"

জল ছাড়া সাদা রাম বুক জলে নামছে আমাদের। লিয়ঁর হাতে বোতল ধরিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। বললুম,

—"একটু ঘুরে আসছি। নিলাম শুরু হয়ে গেছে।"

আমার কথা কেউ শুনতেই পেল না যেন।

দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি, বেশ ভিড়। সূর্যের আলোয় ঝলমলে পোশাক-

আশাক পরে খুশি খুশি মুখের মানুষ-মানুষীরা সারা উঠোনে ঘুরে ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিনিসপত্র দেখছে।

অল্প দূরে পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফিলিপ। গম্ভীর উদাসীন মুখ। পকেটে রাখা রঙের বাক্সটি ছুঁয়ে দেখলুম। পায়ে পায়ে হেঁটে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ও নিলামওয়ালাকে দেখছিল। সারা উঠোনের মৃদু গুঞ্জন ছাপিয়ে মঁসিয় বর্জেরোঁ চেঁচাচ্ছেন। পুতুল-পুতুল দেখতে এক ভদ্রমহিলা হরিণের চামড়াটি কিনে নিল নামমাত্র দামে। বেঁটে ছোটোখাটো বুড়ো মানুষটি খুব সাবধানে আলমারির এক একটি বই পরখ করে দেখছিলেন। ক্রকারি সেট-ভর্তি কাচের কাবার্ডের কাছে দাঁড়িয়ে দুই মহিলা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন।

কিছুক্ষণ ফিলিপের পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম। ও আমাকে দেখতেই পায় নি। পকেটে হাত দিয়ে রঙের বাক্সটি দু'বার বের করে আনতে চেষ্টা করলুম। পারলুম না। এখন, মনে হচ্ছে, কেমন ছেলেমানুষের মতো ভেবেছিলুম, ওকে একটা রঙের বাক্স উপহার দেব। জর্জকে অনুরোধ করব, যেন এই রংগুলি দিয়ে ওকে ওর ইচ্ছে মতন যা খুশি ছবি আঁকতে দেয়। পারলুম না। চোরের মতো পা টিপে ওর কাছ থেকে সরে এলুম। ঢুকে পড়লুম ঘরে। দেখি, জর্জ নাচছে। বোতল প্রায় শেষ। আমাকে দেখে হাত ধরে ঘরের মধ্যিখানে টেনে আনল। বলল,

—"ইণ্ডিয়ান, নাচো। তোমার সেই স্পেশাল নাচ নেচে দেখাও দিকি আমাদের।"

বুঝতে পারলুম না। জর্জের বেশ নেশা জমেছে মনে হল। ঢুলু ঢুলু চোখ। ঠোঁটের কোলে হাসি। টুপি খুলে এক হাতে নিয়েছে। অন্য হাত কোমরে রেখে দুলছে।

জানীকে দেখিয়ে বলল,

—"আমরা দু'জন তো হিজড়ে শিল্পী! সন্তান হল না। শুধু সঙ্গম করে গেলুম এতগুলো বছর।"

বলে, ফিক্ করে হাসল।

হঠাৎ আমার সমস্ত গা-হাত-পা দিয়ে ওকে ভীষণ মার মারতে ইচ্ছে করল। আমার শরীরের সব শক্তি আপন অসহায় মনকে ঘিরে চিৎকার করতে লাগল। সেই ভয়ংকর চিৎকার যেন জর্জকে বলছে,

—'হাসি থামাও, জর্জ! নইলে, তোমার ওই অসহ্য হাসি আমি চোয়ালে একটা ঘুষি মেরে থামিয়ে দেব!'

বিলিতি নাচের ধরনে দুলে উঠল জর্জ। হাসিমুখে বলল,

—"কিছুতেই ঠিক ঠিক লাইনটা মনে পড়ছে না! গাও না, ইণ্ডিয়ান, সেই যে—"

বলে, জর্জ বোয়াগুন্তিয়ে তার আপন ফরাসী উচ্চারণে বিকৃত সুরে গাইতে চেষ্টা করল,

"সোনার ডালে কাক বসালি,
গেঁথে অই মতির-মালা,
কোন বাঁদরের গলায় দিলি—"

লিয়ঁ, দেনিস কিছু বুঝতে পারছে না। হাঁ করে তাকিয়ে জর্জকে দেখতে দেখতে তুড়ি দিয়ে তাল রাখার চেষ্টা করছে। মনে পড়ল, সেই প্রথম দিন জর্জের এই ঘরে কি নাচ নেচেছিলুম দু'জনে। কি বিপুল আগ্রহে হিজড়ের গানটা আমার কাছে শিখে নিয়েছিল জর্জ।

—"ছবি আঁকা কি দোষের, মঁসিয়!"

বাইরে নিলামওয়ালার চিৎকার আবছা ভেসে আসছে ঘরে। ভেতরে সেই ভয়টা কাঁপুনি দিয়ে গেল। শীতের মতো ভয়। ঝাপসা হয়ে এলো চোখ।

জানী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জর্জের অমন বিকৃত নাচ থামবার জন্যেই বোধহয় ওকে জড়িয়ে ধরল। থরথর করে কাঁপতে লাগল মাদাম বোয়াগুন্তিয়ে। ওর অমন কান্নার শব্দে চোখ আপনা থেকে ভরে আসে।
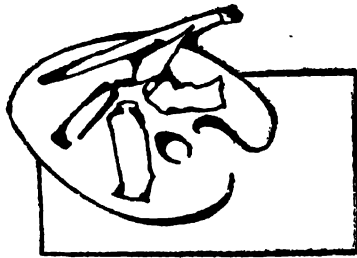
সেদিন মেজোঁতে 'বুম্'। সন্ধ্যে আটটা থেকে নাচানাচি শুরু হবে। ঝিম্‌তাক্ পপ্ গান-বাজনার রেকর্ড যোগাড় হয়েছে ডজন তিনেক। বিকেল থেকেই মেজোঁর নিজস্ব ক্যান্টিনে সাজসাজ রব। দুই কোণে উঁচুতে দুটি লাউড-স্পীকারের বাক্স লাগানো হয়েছে। চেয়ার টেবিল বাইরে সরিয়ে মসৃণ মেঝেতে নাচের জায়গা। মরিশাসের ফিরোজ খুব উৎসাহে এক কৌটো গায়ে মাখা

পাউডার এনে ফেলে দিল মেঝেয়। দু'জনে মিলে জুতো দিয়ে ঘষে ঘষে ছড়িয়ে দিচ্ছিলুম পাউডার। বললুম,

—"নাচতে নাচতে আছাড় খাবার পক্ষে যথেষ্ট মসৃণ হয়েছে। আর ঢালতে হবে না।"

পাউডারের কৌটো উপুড় করে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চোখ টিপল ফিরোজ। বলল,

—"আছাড় খেয়ে যাতে শুয়ে শুয়েও নাচতে পারে সবাই সে ব্যবস্থাও হয়ে গেল।"

মনে মনে আমিও বেশ উত্তেজিত। গান-বাজনা, নাচানাচির জন্যে নয়। আসলে, কাউন্টারে ডিউটি দেবার সুযোগ পেয়েছি আজকে। আমি আর গোবিন্দ। ফিরোজ সহায়ক। অন্যান্য সাধারণ দিনে কাউন্টারে কাজ করলে পনেরো ফ্রাঁ পারিশ্রমিক পাওয়া যায়। 'বুম্'-এর দিনে পঁচিশ। ক্যান্টিনে কাজ করতে ইচ্ছুক আবাসিকদের নামগুলি কাগজে লিখে বাক্সে ফেলে দেওয়া হয়। লটারির মতো প্রথম যে দু'জনের নাম উঠে আসে তারা সুযোগ পায়। তৃতীয় ব্যক্তি সহায়ক পায় পনেরো ফ্রাঁ। রাতের খাওয়া এবং এক পাঁইট বীয়ার ফ্রি। প্রথম দু'জন কাউন্টারের মধ্যে কাজ করে। তৃতীয় জন ঘুরে ঘুরে খালি বোতল, কাপ, ডিশ তুলে এনে ধুয়ে রাখে। গোবিন্দ রান্না-বান্না করতে পারে। তাই অমলেট আর চা, কফি বানাবার দায়িত্ব পড়ল ওর ওপরে। আমি কোক, অরেঞ্জ, আর বীয়ারের পাঁইট খুলে খুলে খদ্দেরদের দেব এবং পয়সার হিসেব রাখব। ক্যান্টিন সেক্রেটারি মিস্টার সাঠে দরজার বাইরে টেবিল পেতে বসে গেছেন। ওঁর কাছ থেকে স্ট্যাম্প মারা টিকিট কিনে ঢুকতে হবে সবাইকে। তিন ফ্রাঁ করে দাম।

আমার ঘরে সেই ঘটনার পর রাগে অপমানে গোবিন্দ শোধরি আর আমার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলে নি। সামনা-সামনি পড়ে গেলে আমার মৃদু হাসির জবাবে উদাসীন মুখ করে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু আজ একেবারে সেই ছেলেবেলার 'আড়ি-আড়ি' ভাব রাখা চলবে না। কাউন্টারে একসঙ্গে কাজ পড়েছে। টুকটাক এটাসেটা কাজের কথা বলতে বলতে দু'জনেই প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছি। সাড়ে নটা-দশটার মধ্যেই ঘর ভর্তি মেয়ে পুরুষের হল্লা, নাচ এবং স্টিরিওর প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে গোবিন্দ ওর অপমান ভুলে গেছে। আমার রাগ-টাগ কমে বেশ মেজাজ খোলতাই। পট করে বীয়ারের দুটো পাঁইট খুলে ফেললুম। একটা ওকে দিয়ে নিজেও গলা ভিজিয়ে নিলুম।

চা ছাঁকতে ছাঁকতে চেঁচিয়ে বলল গোবিন্দ,

—"হিসেবে গোলমাল কোরো না।"

কথা বলতে গেলে বেশ গলা তুলে চিৎকার না করলে পাশের লোকের সঙ্গেও আলাপ করা প্রায় অসম্ভব। আমিও চেঁচিয়ে বললুম,

—"সে চিন্তা করতে হবে না। চীয়ার্স।"

বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার কি যেন বলল গোবিন্দ। বাংলায়। যদিও খদ্দেরদের সঙ্গে আলাদা আলাদা দু'জনেই ফরাসীতে কথা বলছি, নিজেদের মধ্যে খাঁটি মায়ের ভাষা চলছে। টুকরো বাংলা অক্ষর কানে এলো বলেই বুঝতে পারলুম শোধরি আমায় কিছু বলছে। গলা তুলে বললুম,

—"শুনতে পাচ্ছি না। কি বললে ?"

গোবিন্দর জবাব,

—"আমি পরে বুঝতে পেরেছি সেদিন কেন তুমি আমায় অপমান করেছিলে ?"

যেন প্রচণ্ড ঝড়-তুফানের শব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে গল্পসল্প করছি দু'জনে। জিজ্ঞেস করলুম,

—"কেন ?"

অমলেটের জন্যে দুটো ডিম বাটিতে ভেঙে পেঁয়াজের কুচি, নুন মিশিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে লাগল ব্যস্তভাবে। জবাব দিল না। বাটিতে চামচ নাড়ার কোনো শব্দ নেই।

আমার ঠিক সামনে, কাউণ্টারে ওপারে দাঁড়িয়ে কালো একটি আলজেরিয়ার ছেলে। বীয়ারের তিনটে পাঁইট শেষ করেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। গম্ভীর মুখে বলল,

—"আর একটা পাঁইট চাই।"

ফরাসীরা খুব একটা আদরের চোখে আলজেরিয়ানদের দেখে না। ওরা নাকি কারণে-অকারণে গুণ্ডামি-মারামারিতে বেশ পোক্ত। ফরাসী মেয়েরা তো একলা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কোনো আলজেরিয়ানকে দেখলে আতঙ্কে অন্য ফুটে চলে যায়।

তিনটে বীয়ারের দাম এখনো দেয় নি ছেলেটি। তাক থেকে আর একটা পাঁইট হাতে নিয়ে বললুম,

—"চারটে বীয়ার। আট ফ্রাঁ দিন, সিল্-ভু-প্লে!"

দাম মেটাতে ঝামেলা করতে পারে। আরো কিছু আলজেরিয়ান আধো-অন্ধকারে নাচছে। ছোটোখাটো, সামান্য কারণে একটা হট্টগোল-মামামারি লেগে যেতে পারে, এই ভয় হচ্ছিল। ছেলেটি বোধহয় সেটা আমার মুখ দেখে বুঝতে পারল। হেসে, পকেট থেকে দশ ফ্রাঁর একটি নোট বের করে দিল। ছিপি খুলে পাঁইট এগিয়ে দিয়ে বললুম,

—"মেরসী।"

ফেরত পয়সা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করল,

—"তোমরা দু'জন কি ভাষায় কথা বলছো?"

বললুম,

—"বাংলা। আমাদের দেশের ভাষায়।"

—"তোমরা তো ইণ্ডিয়ান। ইণ্ডিয়ান ভাষা কি বাংলা?"

—"না। ইণ্ডিয়ার একটা বিরাট অংশের ভাষা বাংলা।"

সামান্য অবাক চোখে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল ছেলেটি,

—"তার মানে, ইণ্ডিয়ায় দু'রকমের ভাষা চলে?"

—"না। অন্তত পনেরো-যোলো রকমের ভাষা আছে আমাদের দেশে। তার চেয়েও বেশি হয়তো!"

ওর কুতকুতে চোখ দুটি এর চেয়ে বেশী গোল হওয়া বোধহয় অসম্ভব। অল্প ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলে, হতভম্বের মতো,

—"ফ্রাঁন্সের যেমন ফরাসী, জার্মানীর যেমন জার্মান—ইণ্ডিয়ার ভাষার নাম কি।"

ভারতবর্ষের খিচুড়ি ভাষার ওপর রাগে এবং বাংলা ভাষার প্রতি ভালো-বাসায় দাঁত চেপে জবাব দিতে গিয়েও হেসে ফেললুম বোকার মতো। খোঁড়া মায়ের ছোট্ট ছেলেকে তার কোনো বালকবন্ধু যদি অবাক হয়ে জানতে চায় যে, তার মা খোঁড়া কিনা, তা হলে ছেলেটির মনের অবস্থা যা হবে আমারও কি তাই হল? কে জানে! কেমন শান্ত গলায় বলে দিলুম,

—"ফ্রান্স বা জার্মানীর থেকে ইণ্ডিয়া অনেক বড়।" বলে, এপাশে দাঁড়ানো 'এতাজুনী'র ছেলেটিকে দুটো কোক খুলে দিলুম। পয়সা নিয়ে বাক্সে রাখতে রাখতে আলজেরিয়ানকে বললুম,

—"ইণ্ডিয়ার কোনো ভাষা নেই। রাষ্ট্রভাষার নাম হিন্দী, আদ্ধেকের বেশী ভারতবাসী যা জানে না এখনো।"

ছেলেটি আর কথা বলল না। 'কৃষ্ণের জীব' দেখার মতো আমাকে এবং শোধরিকে দেখল। পাঁইট মুখে লাগিয়ে ঢক্‌ঢক্ করে অনেকটা বীয়ার গিলে ফেলল।

গোবিন্দ আগের কথার খেই ধরে এবং না ধরে আমার দিকে না তাকিয়ে বলে উঠল,

—"মিশেল আর আমার কাছে আসে না। দেখাও করে না।"

কথাগুলি যেন চারপাশের ঝড়-তুফানের শব্দের মধ্যে মিশে গিয়ে হা হা করে ঘুরতে লাগল আমাকে ঘিরে। কোথায় যেন একটু অস্বস্তি টের পেলুম। অথচ, আমি তো মিশেলকে তেমন কিছু বলি নি। শুধু একটু সতর্ক করে দিয়েছিলুম। যা' যা' বলা উচিত ঈভলীনই বলেছে হয়তো। গোবিন্দকে বলার প্রয়োজন মনে করি নি মিশেলের খবর। ওর সঙ্গে আমার মাঝেমধ্যে দেখা হওয়ার কথা। আমার ঘরে ও কখনো সখনো হুট্ করে এসে পড়ে। কফি থাকলে বানিয়ে খায়। আমাকে খাওয়ায়। না থাকলে চুপচাপ বসে আমার ছবি আঁকা দেখে। হঠাৎ কখন উঠে দাঁড়িয়ে বলে,

—"চলি, ইণ্ডিয়ান।"

চলে যায়।

কচিৎ কখনো আমার জন্যে কম দামী ওয়াইনের বোতল নিয়ে এসেছে। দু'জনে মিলে খেয়েছি। ফ্রনে, সামান্য পয়সায় এখানে সেখানে কাজ করছে, বলেছিল একদিন। শোধরির ঘরে যাওয়া বন্ধ। তবু, ইণ্ডিয়া হাউস, এই মেজোঁতে আসার অভ্যেস ছাড়তে পারে নি।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল সেদিন, জিজ্ঞেস করেছিলুম,

—"শোধরির ঘরে চললে?"

আমাকে এক পলক দেখে নিয়ে মাথা নিচু করল। বানান করে কথা বলার মতো আস্তে আস্তে বলল,

—"আমি আর কারো ঘরেই যাই না।"

ওর রুক্ষ চুল করিডোরের অল্প হাওয়ায় কাঁপছে। খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বা বসে থেকেও ওর শরীর থেকে কোনো ফরাসী এসেন্সের সৌরভ আমি পাই নি কোনোদিন। ওর গায়েও কোনো নিজস্ব গন্ধই নেই বোধহয়। অনেক বুনো ফুল হয় না, দেখলেই আশ্চর্য রকম চোখ টেনে নেয়। কাছাকাছি পৌঁছে শ্বাস টেনে দেখতে ইচ্ছে করে, কোনো গন্ধ আছে কি না! নাম-না-জানা তেমনি কিছু ফুলের ঘ্রাণ নিয়ে দেখেছি, কেমন এক বুনো সোঁদা গন্ধ। প্রথম বৃষ্টির পরে মাটির

সোদা গন্ধের মতো নয়। অন্য রকম। কোনো তুলনা জানা ছিল না। এখন, বলতে পারি ওই সব ফুলের মৃদু সৌরভ অনেকটা মিশেলের শরীরের গন্ধের মতন। সেদিন ওর হাত তুলে এনে লম্বা আঙুল চারটি ধরে খানিকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলুম। হাতে চুমু খাবার মতো। অথচ, চুমু না খেয়ে, ওর হাতের পিঠের ঘ্রাণ নিয়েছিলুম গভীর শ্বাস টেনে। এবং বলেছিলুম,

—"আমার ঘরে আসো কেন ?"

মাথা তুলে অপরাধীর মতো বলেছিল,

—"ভালো লাগে, তাই।"

তারপর একটু থেমে সোজা সরল চোখ মেলে, কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বলল,

—"তুমি 'না' বললে, আর আসবো না।"

আমি ওকে 'না' বলতে পারি নি।

গোবিন্দকেও এখন এসব কথা বলার কোনো মানে হয় না আর। কারণ, ও জেনে গেছে, মিশেল কোনো সম্পর্কই রাখছে না ওর সঙ্গে আজকাল। একটু বাদে নিজেই সে কথা যেন দীর্ঘশ্বাসের মতো শুনিয়ে দিল আমাকে, থেমে থেমে, কাজ করতে করতে,

—"ও আর আসে না তো ! বড় একলা লাগে। হয়তো ভালোই হয়েছে।"

প্রথমে মনে হল স্বাভাবিক নিয়মে ও বিলাপ করছে। কিন্তু, শেষের কথাগুলি আমাকে জিজ্ঞাসায় পৌঁছে দিল। কারণ, মিশেলের সম্পর্কে ওর সেই মন্তব্য তো আমি ভুলি নি, 'আগাগোড়া ফরাসী জিনিস, বাবা' ! হাল্কা গলায় জিজ্ঞেস করলুম,

—"কেন ? ভালো হয়েছে কেন ?"

এতক্ষণে আমার দিকে তাকালো। কালো মুখে ভয়ংকর ঝকঝকে হাসি,

—"সে তুমি বুঝবে না হে ! সময় পেলে, ইচ্ছে হলে বলব একদিন।"

বলে, সামনের মেয়েটিকে চা এবং অমলেট এগিয়ে দিল। আমি ধাঁধায় পড়ে গিয়ে অরেঞ্জের বোতল খুলতে লাগলুম। তখনো তো জানি না, কি বিশাল এক জোড়া পা নিয়ে গোবিন্দ আমাকে লাথি মেরে দেবে ! তাই, ওর হেঁয়ালি ভুলে গিয়ে উত্তাল নাচ আর শব্দের মধ্যে ডুবে গেলুম।

ক্যান্টিনে আজ আলো নেই বললেই চলে। কাউন্টারে কাজ করার জন্যে ঢাকা আলো ছাড়া ঘরের চার-কোণে চারটে লাল-নীল বাতি। জ্বলছে, নিবছে। জড়াজড়ি করে ছায়ার মতো মানুষ-মানুষী সেই আবছা অলৌকিক আলোয় দুলছে। কাপ ডিশ জড়ো করা এবং ধুয়ে দেবার ফাঁকে ফাঁকে ফিরোজ দু-এক পাক নেচে

নিচ্ছে যার-তার সঙ্গে। আমার বা গোবিন্দর কাউন্টার ছেড়ে বেরোবার উপায় নেই।

হঠাৎ ফিরোজ কাউন্টারের ওপাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে ইশারায় কাছে ডাকলো আমাকে। গেলুম। চোখ টিপে বলল,

—"তোমার বান্ধবী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তোমায় খুঁজছে!"

আমার বান্ধবী! কে? মেজোঁতে ঈভলীন আর ইদানীং মিশেল ছাড়া আমার ঘরে কোনো মেয়ে আসে না।

এই রাত্তিরে কে এলো? মিশেল, না ঈভলীন।

—"গুড্ লাক্—" বলে আবার ভিড়ের দিকে চলে যাচ্ছিল ফিরোজ, আমি হাত চেপে ধরলুম। বললুম,

—"এক মিনিট। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে একটু সামলাও। আমি দেখে আসছি।"

ফিরোজকে আমার জায়গায় দাঁড় করিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলুম। সেক্রেটারি মিস্টার সাঠে টেবিল চেয়ার আগলে বসে আছে। তিনজনকে টিকিট ছিঁড়ে দিচ্ছিল। দুটি মেয়ে, একটি ছেলে। মেয়েদের একটি আমার চেনা মুখ। অস্ট্রেলিয়ান। থাকে 'এতাজুনি' অর্থাৎ মার্কিন আবাসে। ওরা ভেতরে ঢুকে যেতেই চারপাশে তাকালুম। এখানেও বিশেষ জোরালো আলো নেই। সামান্য দূরে সিঁড়ির মুখে জড়সড় ভঙ্গিতে মিশেল দাঁড়িয়ে। দেখলেই কেমন দুঃখ হয়। আমার পিঠের দিকে ঝড়-তুফানের হুল্লোড়ে আনন্দ, উচ্ছ্বাস, হই-চই। চোখের সামনে কোণ ঘেঁষে একলা ভিক্ষুকের মতো দাঁড়িয়ে মেয়েটি। কাছে এগিয়ে যেতেই লজ্জায় অথবা অকারণ ভয়ে যেন আরো কুঁকড়ে ছোট হয়ে যেতে চাইল। ভেঙে ভেঙে খুব আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল,

—"ইণ্ডিয়ান!"

তাড়াতাড়ি ওর কাঁধে হাত রেখে বললুম,

—"কি ব্যাপার মিশেল?"

আমার হাতের ছোঁয়ায় যেন একটু সাহস পেল। বলল,

—"মাপ করো, ইণ্ডিয়ান! তোমায় বিরক্ত করলুম বলে। তোমাদের মেজোঁতে 'বুম্'। অনেক ইণ্ডিয়ান থাকবে তো! তাই, আসতে ইচ্ছে করলো!"

ওকে উৎসাহ দেবার গলায় বললুম,

—"বেশ করেছো! খুব ভালো করেছো!"

মাথা নিচু করে আরো অস্ফুটে বলল, আরো আস্তে আস্তে,

—"আমার কাছে না, আজ একটাও ফ্রাঁ নেই তো! তাই, মানে, তাই তোমাকে ডেকে পাঠাতে হল। তুমি রাগ করো নি তো!"

ওর বলার ধরনে মনটা এত ভার-ভার লাগল, চট্ করে কথা বলতে পারলুম না। দেশে অনেক অনেক গরীব দেখেছি। কাতারে কাতারে ভিখিরী। কিন্তু, ইউরোপের এমন উচ্ছল, রঙিন, বড়লোকের শহরে এই মেয়েটির অমন করে দাঁড়িয়ে ওইসব কথা আর একটু হলেই বোধহয় ঝাপসা করে দিত চোখ!

ও মুখ তুলে তাকালো। সামলে নিলুম তাড়াতাড়ি,

—"আরে! তাতে কি হয়েছে। এসো, এসো। ভেতরে চলো। প্রাণ ভরে নাচো যার সঙ্গে ইচ্ছে।"

শুকনো মুখের কোনো ক্ষুধার্ত শিশুকে আস্ত একটা পাঁউরুটি হাতে দিলে যেমন করে তাকায়, হাসে, মিশেলও তেমনি খুশি চোখে তাকালো। ঠোঁটের কোলে হাসি ফুটল কুঁড়ির পাপড়ি মেলে ধরার মতো ধীরে ধীরে।

হাত ধরে দরজার কাছে নিয়ে এলুম। মিস্টার সাঠেকে বললুম,

—"আমার রোজগার থেকে তিন ফ্রাঁ কেটে নেবেন।"

একগাল হাসল সেক্রেটারি। মিশেলকে চোখের পাশে দেখে নিয়ে বলল,

—"ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিচ্ছু দরকার নেই! আপনি তো খুব লাকী মশাই! ঘর একেবারে ভরে গেছে। ঠাসাঠাসি করে নাচ। আর কাউকে টিকিট দেওয়া চলবে না। যান ভেতরে নিয়ে যান বান্ধবীকে। এন্‌জয় করুন, মশাই!

তারপর একটু খাটো গলায় জিজ্ঞেস করলে,

"বিক্রি কেমন কাউণ্টারে?"

সাঠের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললুম,

—"বীয়ার, কোকাকোলা প্রায় শেষ। ডিমও ফুরিয়ে এল বলে!"

খুশিতে একেবারে ডমমগ ভদ্রলোক,

—"চালিয়ে যান, দাদা, গুড্ লাক্!"

মিশেলকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকতে কেমন একটু থমকে গেলুম। ওর দিকে চেয়ে বললুম,

—"শোধরি রয়েছে। ও আমার সঙ্গে কাউণ্টারে কাজ করছে।"

সুশ্রী এবং রুক্ষ মুখটি তুলে আমায় দেখল মিশেল। বলল,

—"তা'তে কি হয়েছে।"

বললুম,

—"আমার সঙ্গে ওর সামনে যেতে তোমার ভয় করছে না তো ?"

ম্লান হাসল,

—"আমি আর কাউকে ভয় পাই না।"

'কাউকে' বলতে ও শোধরিকেই বোঝাচ্ছে। একটু চুপ থেকে আবার বলল, যেন ভয়ে ভয়ে,

—"তবে, তোমার যদি আপত্তি থাকে তো আমি যাই—"

হাসি পেয়ে গেল। ওর সেই কথাগুলো মনে পড়ে গেল, 'আমি অন্য কারোর সঙ্গে মিশি বা কথা বলি, শোধরি তা পছন্দ করে না।' হাসতে হাসতেই বললুম,

—"আমি তোমার শোধরি নই, মিশেল! তাছাড়া, তোমার সঙ্গে আমার কোনো পেরেম-ভালোবাস্‌সাও নেই!"

বলে, টানতে টানতে কাউন্টারের সামনে নিয়ে এলুম ওকে। চেঁচিয়ে বললুম,

—"গোবিন্দ! মিশেল এসেছে!"

ও ঘুরে তাকিয়ে মিশেলকে দেখল। হঠাৎ খুশি হতে গিয়ে এক পলকের জন্যে গোবিন্দর মুখ কেমন ফর্সা হয়ে গেল! না কি কেউ সাদা ছাই মাখিয়ে দিল মুখে? নিজেকে খুব দক্ষ অভিনেতার মতো তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল,

—"কি খবর মাদ্‌মোয়াজেল! কেমন আছো?"

মিশেল আমার চোখ দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে জবাব দিল,

—"ভালো আছি, শোধরি! মেরসী।"

কাউন্টারে ঢুকে ফিরোজকে রেহাই দিলুম। গোবিন্দ বলছে,

—"কি খাবে মিশেল? চা, কফি, কোক, বীয়ার?"

মিশেল অল্প হাসল। বলল,

—"না, শোধরি। আমার এক্ষুনি কিছু খাবার দরকার নেই। পরে ভেবে দেখব।"

নতুন দ্রুত তালের বাজনা শুরু হয়েছে। ভিড় বাঁচিয়ে খালি কাপ-ডিশ নিয়ে এলো ফিরোজ। বেসিনে রাখল। ঘুরে দাঁড়িয়ে হেসে আমাকে ও গোবিন্দকে বলল,

—"এক্‌স্‌কিউজ্‌ মি।"

বলে, হাত বাড়াল মিশেলের দিকে! খুব ভালো নাচে ফিরোজ। নাচতে ভালোবাসে। মুহূর্তে দু'জনে ভিড়ের মধ্যে উধাও।

হঠাৎ দেখি, কানাই হালদার। কাউন্টারের কোণ ঘেঁষে অধ্যাপক গুটি-সুটি কখন এসে দাঁড়িয়েছে। চোখে চোখ পড়তেই নিরীহ গোবেচারার মতো হাসল। বললুম,

—"কি দাদা। সন্ধ্যা-আহ্নিক হয়ে গেল ?'

এবার একটু সহজ ভঙ্গিতে হেসে বলল,

—"সে তো অনেকক্ষণ !"

—"বাহ্! একটা বীয়ার দিই তাহলে ?" তাড়াতাড়ি হাসি মুখ বন্ধ করে বলল,

—"না, না। জানেনই তো ওসব আমার ঠিক চলে না !"

কেমন ভূতে পেয়ে বসল আমায়। দু'টো বীয়ার খুলে একটা এগিয়ে দিলুম ওর দিকে। বললুম,

"আরে দূর মশাই, চালালেই চলে। এমন সুরা পরীর দেশে শুকনো হয়ে বসে থাকার কোনো মানে হয় ? নিন্! জলের মতো গিলে ফেলে ভিজে যান। চিয়ার্স !"

ভয়ে ভয়ে বোতলটা হাতে নিয়ে দেখল। বলল,

—"কত দাম ?"

"দাম-টাম নেই। আমি খাওয়াচ্ছি। আসুন। বলুন, চিয়ার্স।"

চোপসানো গলায় কোনোক্রমে 'চিয়ার্স' বলে এক ঢোক খেয়ে ফেলল। পাঁচন খাওয়া মুখ করে বলল,

—"বড্ডো তেতো, মশাই।"

প্রথমটা আমি খাইয়েছিলুম। আধ ঘণ্টার মধ্যে আরো দুটো নিজে থেকে চেয়ে খেল। সাড়ে এগারোটা নাগাদ কাউন্টার প্রায় খালি। বীয়ার, কোক শেষ। উদ্দাম নাচে-বাজনায় সব ব্যস্ত। মিশেলও পরিচিত আধা-পরিচিত মুখগুলোর সঙ্গে নেচে চলেছে সমানে।

গত ক'দিন মোঁমার্ত্রে দম ফেলবার ফুরসৎ পাই নি প্রায়। অন্যান্য অপরিচিত বহু শিল্পীর চোখ টাটিয়ে, যিশুদের শুভ-কামনায় প্রচুর রোজগার করেছি। যিশু আনন্দে জড়িয়ে ধরেছে। হাসতে হাসতে বলেছে,

—"চালিয়ে যাও, ইণ্ডিয়ান। আমরা সব মুখ-আঁকিয়েরা বেকার হয়ে পড়লুম বলে। সাব্বাশ !"

পকেটে দু' তিন শো ফ্রাঁ জমে গেছে। তার ওপরে আজকে আবার এই উপরি রোজগার। গোবিন্দকে বললুম,

—"আমার বীয়ার কোক শেষ। শুধু কয়েকটা অরেঞ্জ পড়ে আছে। তুমি একটু কাউণ্টার সামলাবে? বাইরে ঘণ্টাখানেক ঘুরে আসতুম তাহলে। বীয়ারে গা গরম হচ্ছে না। হুইস্কি চাই।"

গোবিন্দ বললে,

—"ঠিক আছে। যাও। ঘুরে এসো। এখন আর চাপ বিশেষ হবে না।"

দরজা দিয়ে বেরুবার মুখে কানাই হালদারের কাঁধে হাত রাখলুম। বললুম,

—"চলুন, দাদা। একটু ঘুরে আসি বাইরে।"

গোল ফ্রেমের চশমার পেছন থেকে ঘোলাটে চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। ঝিম্ ধরেছে। বলল,

—"কোথা' যাবো, গুরু!"

—"আরে, চলুন না মশাই। দেখা যাক।"

ঝুলে পড়া মুখে কোনো রেখার হেরফের নেই। একই রকম গলায় কথা বলছে,

—"অ্যাতো রাত্তিরে বাইরে যাবো?"

—"দূর! গেঁইয়ার মতো কথা বলবেন না। বাইরে বিষ্টি শেষ হয়ে গেছে দু'হপ্তার ওপর। বসন্তের রাত্রি। হয়তো চাঁদ-টাঁদও উঠে বসে আছে আমাদের জন্যে। তাও আবার প্যারিসের চাঁদমামা। একে কি রাত্তির বলে! চলুন, ঘুরে ফিরে ফরাসী চাঁদ দেখিগে বাইরে।"

পোষা কুকুরের মতো শব্দহীন পায়ে আমার পেছন পেছন হেঁটে এল কানাই হালদার। মেজোঁর বাইরে এসে আকাশে মুখ তুলে যেন গন্ধ শুঁকল। বলল,

—"ঘেউ। চাঁদ কোথায়, গুরু?"

হাসতে হাসতে বললুম,

—চাঁদ নেই। জ্যোৎস্না তো আছে। চলুন, চাঁদ খুঁজি।"

প্যারিসের পাখিপাড়া পিগাল। মেট্রো স্টেশন থেকে রাস্তায় উঠে এলুম দু'জনে। প্লেস দ্য ক্লিশি! দুপাশে স্ট্রিপ্‌টিজ্ শো'য়ের দোকান। আলো জ্বলছে মাঝ রাতেও। রেস্তোরাঁয়, মদের দোকানে হই-হল্লা রাতকে প্রায় দিন করে রেখেছে।

কানাই হালদারকে বললুম,

—"এখানে এসেছেন কখনো?"

পথে দু'পাত্র হুইস্কি আরো পেটে গেছে ব্রাহ্মণের। বীয়ারের পর। ফরাসী অধ্যাপক ফ্রান্স-প্যারিসের বইয়ে-পড়া সব খবরই রাখে নিশ্চয়ই। তাই, যেন হঠাৎ ভাব এল। স্টিপ্‌টিজের দোকানগুলোর দিকে দু'হাত প্রসারিত করে দেখিয়ে বলল,

—"ঘেউ। 'এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। হেতায় সতত সঞ্চরমান গিরিপর্বতমালা'—"

ধমক দিলুম,

—"চোপ্ স্‌সালা! কাব্য ফলানো হচ্ছে!" বলেই, হেসে ফেললুম,

—"চলুন। আগে চারপাশের গলিগুঁজি ঘুরে দেখি চাঁদ-তারা আছে কিনা!"

ঢুলুঢুলু চোখে রঙ লেগেছে কানাইয়ের। আকাশে মুখ তুলে ডাকল,

—"ঘেউ!"

ডেকে, আমার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল।

প্লেস দ্য ক্লিশির দুদিকের আবছা অন্ধকার রাস্তাগুলো সব হাঁ করে আছে। কে আসে? কেউ আসে কি? বাঁদিকের প্রথম রাস্তায় ঢুকে পড়লুম।

কোলকাতার সোনাগাছি বা বোমবাইয়ের পাখিপাড়ায় সুস্থ অবস্থায় পৌঁছোতে পারি নি কখনো। তবু, এ-গলি ও-গলি ঘুরতে ঘুরতে মনে হতেই পারে,

প্যারিসের সোনাগাছিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কখনো পেছনে, কখনো গায়ে গায়ে তথাকথিত এক সৎ-ব্রাহ্মণ। আকাশ শুঁকতে শুঁকতে টালমাটাল পা ফেলে হাঁটছে। জড়ানো গলায় বিড়বিড় করছে,

—"এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি—"

অলিগলির মোড়ে পাখিদের ঘিরে মরদেরা বকবকম্ করে চলেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে জ্যোৎস্নায় সারা আকাশ আলো। পথে-ফুটপাতে সেই আলো কেমন নেতিয়ে শুয়ে আছে। দূরে দূরে রাস্তার বাতিরা সব এক পায়ে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে। কোনো গাড়ি বা সুস্থ নাগরিক এখন এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। চার হাতে-পায়ে আমরা কয়েকজন হাঁটছি অথবা এই এলাকার এক একটি সম্রাজ্ঞীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছি। ইংরিজি, বাংলা, ফরাসী, মারাঠী সব ভাষার একটিই প্রকাশ,

—"ঘেউ ঘেউ !!"

দূরে একটি মেয়ে একলা দাঁড়িয়ে। কানাইয়ের কাঁধে হাত রেখে বললুম,

—"ওই যে, একলা একজন অপেক্ষা করছে।"

চোখ টানটান করবার চেষ্টা করে কানাই বললে,

—"ঘেউ। কই, কই ?"

তারপর, দেখতে পেয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। হাসি পাচ্ছে। বেদম হাসি পেটের মধ্যে গুরগুর করে উঠছে। কানাই হালদারের গুবরে পোকা ওর সর্ব মন্ত্র জপ-তপ গিলে ফেলে এখন মাথার মধ্যে হাঁটছে দুলে দুলে।

এখানে পৌঁছবার আগে মোঁপানাসের রেস্তোরাঁয় হুইস্কি খেতে খেতে বলেছিলুম,

—"চলুন দাদা, একটু পরীদের পাড়ায় ঘুরে আসি।"

—"কোথায় ?"

—"এ রাজ্যের বিখ্যাত পিগাল এলাকায় দারুণ দারুণ সব ফরাসী পরীরা ধবধবে চোখ-ঝলসানো শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক-আধটা ধরে একটু ফুর্তি-টুর্তি—"

ভ্যাবাগঙ্গারাম একেবারে আঁতকে উঠেছিল। দেখে মনে হল, নেশা ওর প্রায় ছুটে যাবার যোগাড়,

—"বলেন কি মশায়। নরকের পথ। পাপে একবারে গিজ্‌গিজ্‌ করছে। আমার চোদ্দপুরুষে কেউ ওসব পাড়ায় যাবার কথা ভাবতেও পারতেন না।"

হেসে খোঁচালুম,

"তা দাদা, আপনার চোদ্দপুরুষের ক'জন এমনি সুন্দর রাতে প্যারিসে বসে হুইস্কি খেয়েছেন, বলতে পারেন ?"

হালদার মশায়ের ইচ্ছে পুরো কানায় কানায়। শরীরে ঢিল দিয়ে হাঁ করা মুখে সামান্য হাসল। বোধহয় লজ্জার হাসি। খুব সাবধানে বলল,

—"তা অবিশ্যি আপনি ঠিকই বলেছেন। চিড়েখানায় জন্তু-জানোয়ার দেখতেও তো লোকে যায়! দেখে আসতে ক্ষেতি নেই, কি বলেন! না ছুঁলেই হল!"

এখন, যেন চার হাতপায়ে হেঁটে যাচ্ছে মেয়েমানুষটির দিকে। বললুম,

—"ছোঁবেন না কিন্তু! জাত চলে যাবে!"

দাঁড়িয়ে পড়ে হ্যা হ্যা করে হাসল। বলল,

—"কী যে ঠাট্টা করেন না দাদা! আপনার কোনো সময়ের জ্ঞান নেই! হ্যা হ্যা।"

একটু গম্ভীর মুখেই বললুম,

—"তার মানে, আপনি কি ছুঁয়ে দেখবেন নাকি ?"

হাসি থামিয়ে ঝপ্ করে আমার হাত চেপে ধরল,

—"কাউকে বলবেন না তো, গুরু ?"

মৃদু হেসে মাথা নেড়ে অভয় দিলুম, 'না'।

খুশি চোখে তাকিয়ে বলল,

—"মাইরি বলছেন!"

—"মাইরি বলছি!"

আমার হাত ছেড়ে মেয়েটির দিকে এগোতে লাগল আবার। মুখে বলল,

—"বাস। তাহলেই ঠিক আছে।"

হাসি চেপে উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলুম,

—"কিন্তু—আপনার পাপ-তাপ, বংশের কি হবে ?"

হাঁটতে হাঁটতে চটু-জবাব,

—"গায়ত্রী আছে কি জন্যে! দশবার জপ করে নেব—সব পাপ সাফ।"

মেয়েটির সামনে পৌঁছে কিন্তু আর কথা বলতে পারে না হালদার। হাঁ করে তাকিয়ে আছে। মেয়েটিও গম্ভীরমুখে অবজ্ঞা ফুটিয়ে আমাদের দেখছে। সোজা-সুজি নয়। ভুরু তুলে, অপাঙ্গে। দেওয়ালে পিঠ, সরু কোমরে হাত। পোশাক নিমিত্তমাত্র। কিছুর মধ্যে কিছু নেই, হঠাৎ ওর ডান বাহুর চামড়ায় একটু হাত

বুলিয়ে নিল কানাই। ভুরু কুঁচকে হাত সরিয়ে নিল মেয়েটি। চোখে বিরক্তির ভাব।

জিজ্ঞেস করলুম অকারণেই,

—"ইংরিজি বলতে পারো?"

মেয়েটির জবাব,

—"তুশো ফ্রাঁ।"

সোনাগাছি, হাড়কাটা, বম্বে সেন্ট্রাল, পিগাল সব একাকার হয়ে গেল চোখের সামনে।

সোনাগাছির কোন্ রানীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যেন করুণাময় একটি বিহারী মেয়েকে জিজ্ঞেস করছিল,

—"বাংলা বলতে পারো?"

ঠোঁট বেঁকিয়ে জবাব দিয়েছিল মেয়েটি,

—"তিরিশ টাকা।"

করুণাময় জড়ানো গলায় বিড়বিড় করেছিল,

—"যা বাব্বা। জিজ্ঞেস করলুম, 'বাংলা বলতে পারো কিনা'? জবাব হবে, 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'। বলি, টাকার কথা আসে কোত্থেকে?"

মেয়েটি আর কোনো কথাই বলে নি। ভাবখানা, 'ক্যালো কড়ি তিরিশ টংকা, মাখো তেল। বাংলা ধুয়ে কি জল খাবে!'

ঘটনাটি মনে পড়তে শব্দ করে হেসে ফেললুম। কানাই হালদার ঘাবড়ে গিয়ে বলল,

—"কি হয়েছে, গুরু?"

হাসতে হাসতেই বললুম,

—"ইংরিজি জানে না যে!"

—"তাতে কি হল?" কানাই অবাক।

—"বলি, আলাপ করবেন কি করে?"

—"কেন? কথা দিয়ে কি হবে!"

ওর আর তর সইছে না। জুড়ে দিল,

—"কথায় কথা বাড়ে। গুরুজনেরা বলে গেছেন, কথা কম কাজ বেশি। তাছাড়া, টেক্নিকাল কথাবার্তা তো ফরাসীতেই বলা যাবে। বোবা হলেও— মানে, ইশারায় কত কাজ চলে যায়—"

ওর বলার ধরনে হাসতে হাসতে আমার নেশা প্রায় কেটে যাবার যোগাড়। বললুম,

—"ঠিক আছে। চলুন, আগে আর একটু মাল খেয়ে নিই। তারপর, ফিরে আসবেন।"

হতাশ গলায় কানাই প্রায় ডুকরে উঠল,

—"আরো মদ খাবেন! কি দরকার? বেশ তো নেশা হল!"

—"ঠিক আছে। আপনি তাহলে যান। আমি একটু মদ খেয়ে আসি।"

ভয়ও তো আছে ব্রাহ্মণের! বলল,

—"তা কি করে হয়, গুরু! একলা কি করে যাবো! চেনা নেই, শোনা নেই—"

—"মদ আমাকে একটু খেতেই হবে।"

বলে, হাঁটতে লাগলুম।

বড় অনিচ্ছায় পিছু নিল আমার। এক পা হাঁটে, ফিরে ফিরে মেয়েটিকে দেখে। বড় রাস্তায় পড়ে পুরোপুরি হাল ছেড়ে দিয়ে বলল,

—"ঠিক আছে! ছোটো করে আমিও এক পাত্তর খেয়ে গাটা গরম করে নিই!"

প্রথম যে সাইনবোর্ড চোখে পড়ল, তার সামনে এসে দাঁড়ালুম। খুব ছোটো দরজায় কোলাপ্‌সিবল্ গেট। খোলা। চারপাশে ছবি-আঁকা পোস্টার। আধা উলঙ্গ নারীদেহের ছবি। তারই পাশে পাশে কোথাও লেখা, 'স্ট্রিপটিজের স্বর্গ প্যারিসের সেরা নাচিয়েরা আপনাকে উন্মত্ত করে দিতে প্রস্তুত', কোথাও আবার, 'সমুদ্রের চেয়েও উত্তাল মিমি-নোনা-লুলু এবং ঈভেতের সোনা দেহের ঢেউ দেখতে মাত্র পাঁচ ফ্রাঁ লাগে—'।

লোলুপ ক্ষুধার্ত চোখে ছবি এবং লেখাগুলি চেটে নিচ্ছিল কানাই। উবু হয়ে, ঝুঁকে পড়ে চতুষ্পদের মতো কানাই হালদার। ওর গায়ত্রী মন্ত্র আমার মাথায় ভূত হয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। বলছে, আয় আয় ব্রাহ্মণের চেহারাটা দেখি! মুখটা দেখি!

কোমরে খোচা দিয়ে বললুম,

—"মোটে পাঁচ ফ্রাঁ! চলুন, ঢুকে পড়ি।"

চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল,

—"ঘেউ। অ্যাঁ, হ্যাঁ!"

বললুম,

—"মদও পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।"

ছোট দরজা দিয়ে ঢুকতেই বাঁ পাশে কাউন্টারের ফুটো। ভেতরে লোক বসে। দুটি টিকিট কেনা গেল ওর কাছ থেকে। তারপর, অধঃপাতে যাবার মতো সরু আধো অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম। সামনে আর একটি ছোটো খোলা দরজা দিয়ে ঢুকতেই মাঝারি আকারের লম্বা মতন হলঘর। দু'পাশে দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো গদিমোড়া বসবার জায়গা এবং ছোটো ছোটো গোল টেবিল। ঘরের মাঝ-মধ্যিখানে এক, বড়জোর দেড় হবে উঁচু সাদা কাঠের গোল মঞ্চ। অনেকটা দেশী যাত্রার মঞ্চের মতো। তবে, খুব বড় নয়। চার পাঁচটি মেয়ে এক কোণে বসে সিগারেট ফুঁকছিল। হাসাহাসি করছিল নিজেদের মধ্যে। মঞ্চের কাছাকাছি জায়গায় এক টাকমাথা বুড়ো টেবিলের বালতিতে শ্যাম্পেন, বগলে দুটি মেয়ে নিয়ে বসে হল্লা করছে। দেখে মনে হয়, মার্কিন মুলুকের। টাকের চাকচিক্যে অজস্র ডলারের গন্ধ।

আমরা ঢুকতেই সকলে এক পলক দেখে নিল। মেয়েদের ছোট্ট দলটি হাসি এবং কৌতূহল মেশানো মুখে অল্প মাথা ঝুঁকিয়ে যেন অভিবাদন জানাল আমাদের। মঞ্চের কাছ ঘেঁষে একটা টেবিলে বসে পড়লুম।

ডাকাডাকি নেই, আমরা বসতেই দলের মধ্যে থেকে দুটি চপলা গতর দুলিয়ে আমাদের দু'পাশে এসে দাঁড়াল। মুচ্‌কি হেসে ঝুপ্ করে বসে পড়ল। গায়ে গা ছুঁইয়ে। এ পাশের মেয়েটি আমার সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে বলল,

—"একটা খেতে পারি, মঁসিয় ?"

প্রথম তো! এতটা আশা করে নি। ওপাশের চপলাটি একেবারে গা ঘেঁষে বসে পড়ায় একটু কুঁকড়ে গেল কানাই। শত হলেও বামুন মানুষ। বাংলায় বললুম,

—"কি হল ? আলাপ করুন!"

ঘুরে, মেয়েটিকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে দিলুম।

ষণ্ডামার্কা আলজেরিয়ান যেন কার্পেট ফুঁড়ে উঠে এগিয়ে এল,

—"কি দেব, মিস্টার।"

কানাই সামলে নিয়েছে। আলজেরিয়ানের ভাঙা ইংরিজির জবাবে বিশুদ্ধ ফরাসীতে বলল,

—"মদ! মদ চাই আমাদের!"

ওপাশের যুবতী কানাইকে প্রায় জাপটে ধরে আদুরে গলায় বলল,

—"আমি একটু শ্যাম্পেন খাবো। ছ!"

বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলুম,

—"মেনু কই?"

—"আমার জিভের ডগায়।" বলে, পটাপট সব হুইস্কি, রাম, বীয়ার, শ্যাম্পেনের নাম বলে গেল।

হুইস্কি মানেই স্কচ। জিজ্ঞেস করলুম,

—"রেড লেবেল কত করে পেগ?"

যা বললো, আস্তেই বললো। তবু, শুনে মনে হল কান ঝাঁ ঝাঁ করছে বেরিয়েই যাব কিনা ভাবছি। ওদিকে মদের দামের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই বামুনের মেয়েটিকে নিয়ে পড়েছে। তার নাম-ধাম ইত্যাদি নিয়ে। খিলখিল হাসিতে জবাব দিচ্ছে যুবতী।

বীয়ারের দামও বাইরের তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ বেশী। এতক্ষণে বোঝা গেল, মাত্র পাঁচ ফ্রাঁতে চারটি মেয়ের ষ্ট্রিপটিজ এরা দেখায় কি করে। এসে বসলেই মদের অর্ডার দিতে হবে খদ্দেরকে। তার দামেই ষ্ট্রিপটিজ চলে বোধ হয়।

চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে ছুটো বীয়ার নিলুম। ভাগ করে খেলুম চারজনে।

সাদা কাঠের মঞ্চে তীব্র আলো পড়লো চক্রের মতো। চারটি মেয়ে একের পর এক এসে জামাকাপড় খুলতে খুলতে নাচ দেখাল। অথবা, নাচতে নাচতে জামাটামা যেটুকু ছিল তাও খুলে ফেলল। আমাদের পাখি ছুটিও প্রায় উলঙ্গ গতর দেখিয়ে ফিরে এসে আবার বসল। অনেকটা হোটেলে উত্তেজক ক্যাবারে-নাচের মতোই ব্যাপার-স্যাপার।

কানাইয়ের পাশের মেয়েটি যখন মঞ্চে ছুলে ছুলে খুলে খুলে ঘুরছিল, তখন বামুনের মুখ আমি দেখে নিয়েছি। চোয়াল ঝুলে পড়েছে। হাঁমুখ থেকে জিভ বেরিয়ে তিরতির কাঁপছে। লালচে চোখছুটি জ্বলছে। সমস্ত শরীরের ক্ষিদে ওইটুকু মুখের চামড়া ফেটে, কি আশ্চর্য অবলীলায় ছবির মতো ফুটে উঠেছে। ছবির মতো, না, বসন্তের গুটির মতো!

হালদার বাংলায় আমার কানে কানে বলল, দ্রুত উত্তেজিত স্বর,

—"দরদাম হয়ে গেছে। দেড়শো। পাশেই নাকি কেবিন আছে লাগোয়া। ভাড়া পনেরো! ঘুরে আসব দাদা?"

সোৎসাহে বললুম,

—"তা আর বলতে!"

উঠতে গিয়ে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলে,

—"আপনিও যাবেন তো?"

—"দেখা যাক!"

ও আর আমার জন্যে অপেক্ষা করল না। মেয়েটির প্রায় গা চুলকোতে চুলকোতে উল্টো দিকের কোণের দরজা দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

হঠাৎ ভাবলুম, এটা কি হল! বেচারাকে এর মধ্যে টেনে আনলুম কেন? 'আমিই ঠিক'—এই বিশ্বাসটিকে আরো জোরদার করবার জন্যেই কি? হবেও বা! শান্তশিষ্ট অধ্যাপক কানাই হালদার প্যারিসে এসেও ত্রি-সন্ধ্যা পুজোপাঠ করে। আমার বোধহয় তা সহ্য হল না! নিতান্তই সাধারণ কৌতূহলে ও 'বুমে'র আসরে উঁকি দিয়েছিল। অন্য কোনো বাড়িতে 'বুম' হলে হয়তো যেতোই না। আর, ওকে দেখেই অবচেতনে ওর মন্ত্র-তন্ত্র-পুজো-আহ্নিককে চ্যালেঞ্জ করে ফেললুম। দেখি না, একে মদ খাওয়ানো যায় কিনা! দেখি না, সমাজের তথা-কথিত পাপ-তাপের মধ্যে একে একটা ডুব দেওয়ানো যায় কি না। এই সবই বোধহয় আমার অবচেতন থেকে আধাচেতন হয়ে পুরোপুরি চেতনায় পৌঁছোবার চেষ্টা করছে এখন। উচিত-অনুচিত মন্দ-ভালো বোঝবার ক্ষমতা আমার এত কম যে খেই হারিয়ে ফেলি। নিজেকেই ঠিকঠাক খুঁজে পাই না। না পেয়ে, তখন মনে হয়, আরে বাপু, নিজেকে খুঁজে-পেতে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলে তো আমিও ব্রাহ্মণ হয়ে যেতুম। ভয়ে ভয়ে ভূতে বিশ্বাস করি, শুনে শুনে ভগবানে। তেমনি ভেবে ভেবে থই না পেয়ে ব্রহ্মকেও বিশ্বাস করাটাই সুবিধে। কিন্তু, আসল জিনিসটি হাতড়ে পাই না বলেই তো মুখ খুঁজে বেড়াই। মহাজন বলে গেছেন, দোষে-গুণে-মানুষ। আম্যুও মানুষ, তুম্যুও মানুষ। কানাই হালদারের ত্রি-সন্ধ্যাও সত্যি, এখন যা চেহারা দেখলুম, তাও তো অসত্য হতে পারে না। আবার, উল্টোদিক দিয়ে ভাবতে বসলে বলা যাবে, দু'টোই মিথ্যে। বলি, তাহলে বাপু, সত্যিটাকে ধরে দাও। পেয়ে বাঁচি। তা হবার উপায় নেই। কারণ, কানাই হালদার ফিরে এল বিমর্ষ মুখে। বলল,

—"বাড়ি যাবো।"

দু' চারবার কানের কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে কখন যে আমার পাশের মেয়েটি উঠে গেছে, খেয়াল করি নি। তাকিয়ে দেখি ওদিকের মার্কিন বুড়োর কোলে বসে আছে। চোখে চোখ পড়তেই মুখ ভ্যাংচাল।

উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলুম, হেসেই অবশ্য,

—"পৈতেটার কি করলেন ?"

চমকে বুকের ভেতরে হাত দিয়েছিল কানাই,

—"আছে।"

—"সারাক্ষণ গায়েই ছিল ?"

—"না। খুলে দেওয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে—"

কথা শেষ করতে পারে নি। হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিল। 'ষ্ট্রিপটিজ' শো'য়ের পর কোনো খদ্দেরকে ফরাসী মেয়েরা কাঁদতে দেখে নি বোধহয়। অবাক হয়ে হেসেছিল।

আর, সবচেয়ে মজার কথা, সেদিনের পর থেকে কানাই হালদার আমাকে দারোগা ভাবত। চুরির দায়ে যেন ধরা পড়ে গিয়েছিল আমার কাছে। আমার সামনে নিজের কাছে। দেখা হলেই এড়িয়ে যেত। সামনাসামনি পড়ে গেলেই জিজ্ঞেস করেছি,

"কি দাদা, কেমন আছেন ?"

—"ব্যস্ত আছি ! ব্যস্ত আছি একটু। পরে দেখা হবে।"

ঢিলের মতো কথা ছুঁড়ে দিয়ে মুখ নামিয়ে সরে যেত। তাই, ওর সঙ্গে সেই রাতের পর আর আমার দেখা হয় নি। মহাজনেরা হয়তো বলবেন, আমি একটা ইতর। নিজে তো গেছি ! ভালোমানুষকেও টেনে নামাচ্ছি। কিন্তু, হুজুর ! অই 'ভালোমানুষটি' কে ? কানাই হালদার ! কানাই আমার কানাই রে !

মেজোঁর 'বুম' তখন পুরোদমে চলছে। রাত প্রায় তিন প্রহর ফুরোলো। কাউণ্টার বন্ধ করে গোবিন্দও চলে গেছে। অলৌকিক অন্ধকারে উদ্দাম নাচা-নাচির মধ্যে ফিরোজকে খুঁজে পেলুম। রোগা, লম্বা একটি মেয়ের সঙ্গে নাচছে। কাছাকাছি গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"কাউণ্টার কখন বন্ধ করলে ?"

নাচতে নাচতেই ওর জবাব,

—"ঘণ্টাখানেক আগে।"

—"সব বিক্রি হয়ে গেছে ?"

—"হ্যাঁ।"

—"ক্যাসের হিসেব কি তোমার কাছে ?"

—"না। শোধরি—"

ফক্স্ট্রট নাচছিল। বোঁ করে ঘুরে বেশ দূরে চলে গেল। চার-পাঁচটি জোড়াকে

ডিঙিয়ে ভারি সুন্দর ভঙ্গিতে। এই ভিড়ের মধ্যে এত কম জায়গায় কি করে ও এই নাচ নাচছে অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে রুক্ষ, বুনো সেই সুশ্রী মুখটির কথা মনে পড়ল। আলো-অন্ধকারে কোথাও নেই! থাকলে একটু নাচা যেত। আঁতিপাঁতি খুঁজে দেখলুম। এ ঘরে কোথাও মিশেলের চিহ্ন নেই। অথচ মিশেল তো ছিল! আমার কাছেই এসেছিল! কেমন গরিবের মতো দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে। ধক্ করে একটা ভাবনা মাথায় আসতে ভিড়ের মধ্যে ফিরোজকে আবার খুঁজে বের করলুম। বললুম,

—"সরি! আমার সেই বান্ধবীকে দেখেছো?"

প্রথমে বুঝতে পারে নি। মনে করিয়ে দিলুম,

—"যে মেয়েটি আমায় খুঁজতে এসেছিল। তুমি যার সঙ্গে নাচলে! মিশেল।"

দাঁড়িয়ে পড়ে এক পলক ভাবল। বলল,

—"ঠিক বলেছো! ওকে তো অনেকক্ষণ দেখি না!"

—"কতক্ষণ আগে দেখেছো, মনে আছে?"

আবার একটু ভেবে বলল,

—"তাও তো প্রায় ঘণ্টাখানেক হল। কাউণ্টার বন্ধ হবার পর ওকে আর দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। বোধহয়, বাড়ি চলে গেছে।"

বলে, আবার নাচতে লেগে গেল।

না। মিশেল এত রাতে একলা বাড়ি ফিরে যেতে পারে না। ঘণ্টাখানেক আগে হলেও দেড়টা। কেউ পৌঁছে দেবার না থাকলে অত রাতে বাড়ি যাবেই না মিশেল। আমার ভয়টিকেই মোটামুটি ঠিক ধরে নিয়ে লিফ্‌টে চাপলুম। আবার সেই তার শোধরির পাল্লাতেই পড়ল। আমারই ভুল হয়েছে। ওকে অপেক্ষা করতে বলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কি করব! তখন যে কানাইয়ের শান্তশিষ্ট মুখ আমায় চ্যালেঞ্জ করে বসল!

গোবিন্দর ঘর বন্ধ থাকলে, ও মিশেলকে পৌঁছতে গেছে এবং আর ফেরে নি সেখান থেকে। যদি গোবিন্দর ঘর বন্ধ না থাকে তবে ওরা দু'জনেই ওখানে। ভাবতে ভাবতে তিনতলায় গোবিন্দর ঘরের সামনে পৌঁছে গেলুম। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। টোকা দিয়ে ডাকলুম,

—"গোবিন্দ শোধরি!"
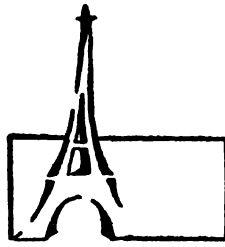
শেয়ালদা থেকে রেলগাড়িতে রাণাঘাটের কয়েকটা আগের স্টেশনে পালপাড়া। সব লোকাল দাঁড়ায় না সেখানে। সময় দাঁড়িয়ে থাকে। অথবা খুব ধীরে ধীরে হাঁটে। নাম-না জানা রিফিউজি কলোনীতে গোবিন্দর বাবা আছেন। তাঁরও নাম আমার জানা নেই, বউ। কলেজে থাকতে লোকমুখে শুনতুম, উনি যজমানগিরি করেন। মাঝে-মধ্যে ন' মাসে ছ' মাসে হঠাৎ হয়তো ছেলের কাছে আসতেন। কি কারণে, কেউ জানি না আমরা। প্রায় খালি গা। শীর্ণ শরীরে পৈতে। বাবা ও ছেলের গায়ের রং একই প্যালেটে গোলা হয়ে থাকবে। ভদ্রলোকের বয়েস কম করেও পঞ্চান্ন-ষাট। মাথায় ছোটো ছোটো চুল ধবধবে সাদা। প্রথম দিন দেখে আমরা বলাবলি করেছিলুম, "'বিসর্জনে' সমীর চৌধুরীর বদলে গোবিন্দর বাবাকে পেলে 'রঘুপতি' জব্বর হতো!

ছেলেকে শুধু দেখতেই আসতেন বোধহয়। কারণ, না উনি পারতেন গোবিন্দকে সাহায্য করতে, না পারতো গোবিন্দ ওর বাবাকে কিছু দিতে। ছাত্র তো অসাধারণ ভালো কিছু ছিল না গোবিন্দ। টিউশনি করতো এক-আধটা। থাকতো হস্টেলে। রাতের খাবার ওখানে বাঁধা। 'মেয়ে-ন্যাকড়া' গোবিন্দর দিনের টিফিন জুটে যেত মেয়েদের সঙ্গে থেকে থেকে। ফাইফরমাশ খেটে।

—"গোবিন্দ, জিওলজিক্যাল সার্ভের ক্যান্টিন থেকে একটা সাদা ডোসা এনে দেবে, লক্ষ্মীটি!"

—"যাচ্ছিস্ই যখন, দুটো ইডলিও নিয়ে আয় না ভাই আমার জন্যে! এই নে পয়সা। চাটনি আনিস কিন্তু!"

এটা সেটা ওদের এনে দিত গোবিন্দ। 'না' বলত না। পৌরুষে লাগত না ওর। দুপুরের টিফিন হয়ে যেত। আমরা জগাদার ক্যান্টিনে টেবিল চাপড়ে, কচুরি চিবিয়ে, ওকে বলতুম, 'মেয়ে-ন্যাকড়া'।

দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে ওর গলা,

—"দাঁড়াও, খুলছি।"

খুট্ করে ছিটকিনি খোলার শব্দ। দরজা খুলতেই দেখি লুঙ্গি এবং তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে গোবিন্দ। জিজ্ঞেস করল,

—"কি ব্যাপার ? এতো রাত্রে।"

ঘরে কেউ নেই। মানে, মিশেল নেই। দ্রুত গম্ভীর গলায় জানতে চাইলুম,

—"মিশেল কোথায় ?"

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ও সাদরে অভ্যর্থনা জানালো,

—"এসো। ভেতরে এসো।"

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আবার বললুম,

—"মিশেল কোথায় ?"

নিতান্তই আবেগহীন গলায় গোবিন্দ বলল,

—"মিশেলের খবর তো এখন আর আমার জানার কথা নয়।"

তখনো মনে মনে খানিকটা রেগে আছি। মিশেলের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় রাগ। রুক্ষ জবাব ছুঁড়ে দিলুম,

—"তোমার ওই বাঁকা উত্তর শুনতে আমি এখানে আসি নি। মিশেল কোথায় ?"

খাটে বসে পড়ল। পাশের জায়গা চাপড়ে বলল,

—"বোসো তো আগে।"

দাঁড়িয়েই রইলুম। ও আবার বললে,

—"মিশেল কোথায় আমি কি করে জানবো! ও তো তোমার কাছে এসেছিল।"

ওর কথায় রাগ চড়তেই মনে পড়ল, মিশেল সম্পর্কে ও আমায় কি যেন বলছিল ক্যান্টিনে। কাজ করতে করতে ছাড়া-ছাড়া আবছা দু' একটা সংলাপ। বসে পড়লুম। বললুম,

—"তুমি ক্যান্টিনের কাউন্টার বন্ধ করবার সময় মিশেল ছিল। আমি ফিরে এসে দেখি, 'বুমে' ও নেই।"

গোবিন্দ ঝক্‌ঝকে হাসল। বলল,

—"তার মানেই কি মেয়েটির খবর আমি জানি!"

আমি কিছু বলতে যাবার আগেই আবার বললে,

—"এক মিনিট ! আগে বলো, একটু জিন খাবে কিনা ! তুমি তখন বীয়ার খাওয়ালে। ভাবলুম, কাউন্টার বন্ধ করবার আগে একটা বীয়ার আমিও তোমায় খাইয়ে দেব।"

হেসে ফেললুম,

—"শোধ-বোধ বলছো !"

দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো আলমারি খুলে জিনের বোতল বের করল। হেসে ফেলল গোবিন্দও। বলল,

—"তা ঠিক নয়। তবে আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। তার থেকে মনোমালিন্য। কাউন্টারে কাজ করতে করতে সেই 'আড়ি' ব্যাপারটি ভেঙে গেছে তো ! তাই—"

আধ বোতলের একটু কম জিন আছে। দুটো গেলাসে ঢালা হল। গোবিন্দ উঠে গিয়ে বেসিনের জল মিশিয়ে একটা গেলাস আমায় দিল। বাহ্যজ্ঞান লোপ পাবার মতো না হলেও, নেশা আমার হয়েছে। চুমুক দিয়ে বললুম,

—"প্রথমে বীয়ার, তার ওপর হুইস্কি। হুইস্কির পেছন পেছন এখন আবার জিন দৌড়োলো—কাল সকালে যে কি অবস্থা হবে !"

গোবিন্দ বললে,

—"কিস্সু হবে না ! তাছাড়া আমার কাছে রাজ্যের ওষুধ আছে, মাথা ধরার ওষুধও পাওয়া যাবে। দুটো নিয়ে যেও। সকালে হ্যাংওভার হলে—"

হেসেই বলে ফেললুম,

—"হ্যাঁ, তোমার ওষুধ নিয়ে যাই, আবার তুমি প্যারিসসুদ্ধ লোককে বলে বেড়াও যে, আমাকে ওষুধ দিয়ে 'হেলপ' করেছো !"

এই মুহূর্তে ওকে ঠিক খোঁচা দেবার জন্যে বলি নি। আলগোছে জিভ বেয়ে বেরিয়ে গেছে। বলে ফেলেই একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। নিজের কানেই খারাপ লাগল। এই নিয়ে তো ওকে যথেষ্ট অপমান করেছি সেদিন। আবার কেন ? মিশেলকে কোথাও খুঁজে পেতে না পেয়ে বিরক্তিটা কি গোবিন্দর মুখেই ছুঁড়ে দিলুম ! অন্য যে কেউ থাকলে হয়তো সেই ব্যক্তিরই কোনো জানা দুর্বলতায় খোঁচা দিতুম। পুরোপুরি ইচ্ছে করে অথবা জেনেশুনে ওকে লজ্জিত করবার জন্যে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি বোধহয় মিশেলের সঙ্গ না পেয়ে। দেখা যখন আমার সঙ্গেই করতে এসেছিল মেয়েটি, তখন থাকাও উচিত ছিল

ওর আমার কাছেই। অথবা, ওর সেই গরিবের মতো ভীত চেহারা, ভিক্ষুকের মতো দীন মুখটিই আমাকে আঘাত করছে। সামনে না থেকেও যেন বলছে,

—"কেন তুমি আমায় না বলে উধাও হয়ে গেলে? আমার কাছে তো একটা পাঁউরুটি খাবার মতো পয়সাও আজ ছিল না, তুমি জানতে। তুমি যদি আমাকে বলে যেতে ইণ্ডিয়ান, তাহলে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করতুম—" ভাবতে ভাবতে ভয় পেলুম হঠাৎ! গোবিন্দর ঘরে যখন নেই তখন অভুক্ত ভীত মেয়েটি কি একা একাই অত রাতে বাড়ি ফিরে গেছে? পথে আলজেরিয়ান থাকতে পারে। থাকতে পারে নয়, থাকেই। মাতাল পুরুষরাও মাঝরাত্তে দানবের মতো যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ায়। কোনো বিপদে পড়ল না তো?

চোখের সামনে একটা আহত পশুর মুখ। আহত কালো একটা পশুর মতো দুঃখিত মুখে আমার দিকে চেয়ে আছে গোবিন্দ। অন্ধকার মুখে দুটি সাদা চোখ আমাকে দেখছে, যেন কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। মাথায় দু'পাশে কানের ঠিক ওপরে অল্প অল্প ধূসর চুল। হাঁ-মুখের সামান্য ফাঁকে গভীরতর অন্ধকার।

যে কথাকটি বলা হয়ে গেছে বা বলে ফেলেছি তাদের আর গিলে ফেলবার কোনো উপায় নেই, বউ। ঠিক ঠিকানা লেখা ভুল চিঠি ডাকবাক্সে ফেলে দেওয়ার চেয়েও অনেক বেশি অসহায় লাগে। সরি, আমি কিছু 'মীন' করে বলি নি—এসব কথাও তখন অর্থহীন মনে হয়। লজ্জা লজ্জা করে। নিজেকে গুছিয়ে তোলবার আগেই দেখি, গোবিন্দ ছোট একটি ঢোক গিলে অল্প হাসল। দেখলেই বোঝা যায় নকল হাসি। অথবা ক্ষমার হাসি। অথবা আমি যেন কৃপার পাত্র, ভুল করে ফেলেছি, তাই অবজ্ঞার হাসি। ভীষণ কালো মেঘের ভিতর থেকে এক ঝলক বাঁকাচোরা বিদ্যুতের মতো।

—"গোবিন্দ, মানে, আমি ঠিক—"

ও বাধা দিল। বলল,

—"ঠিক আছে, ভাই। কোনো অসুবিধে নেই। কারো ওপরেই আমার আর রাগ-টাগ নেই বিশেষ। তোমার ওপরেও নয়। থাকলে, ঠিক সেদিন যেমন তোমার ঘরে যেতে তুমি আমায় অপমান করেছিলে মেয়ে দুটির সামনে, ঠিক তেমনি আমি এখন ঝগড়া বা মারামারি করে ফেলতুম। হয়তো তোমার চেয়ে আমি দুর্বল। তবু, দু'চারদিন আগের ব্যাপার হলে প্রথম ঘুষিটা অন্তত তোমার চোয়ালে বা নাকেই পড়তো আজ।"

ম্লান হাসিমুখেই বলল কথাগুলো। আমি দুঃখিত গলায় জানালুম,

—"ভেবেচিন্তে কিছু বলি নি। অমনি বেরিয়ে গেছে। সরি।'

আমার কথা বিশ্বাস করুক বা না করুক, ও হাসছে। আবার বললুম, ঝোঁকের মাথায় নয়, খানিকটা অপরাধীর মতো,

—"আমি দু'হাত তুলে দাঁড়াচ্ছি। একটা ঘুষি তুমি আমার চোয়ালে মারতে পারো! আমি আপত্তি করব না।"

সত্যি সত্যিই সেই মুহূর্তে ও একটা ঘুষি মারলে মারামারি হতো না। অনিচ্ছায় আঘাত করে ফেলেছি, সেই 'আড়িটাড়ি' ভেঙে যাবার পরেও, তাতেই সেন্টিমেন্ট বা মানসিকতা অথবা অন্যায়বোধ এবং এই অবস্থাটি ঝেড়ে ফেলতে পারলে খানিকটা হালকা কিংবা আবার সমান সমান হওয়া যায়—এইসব জটপাকানো চিন্তা থেকে ওকে বলে দিলুম।

চুপ করে আছে গোবিন্দ। এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল। দেওয়াল-আলমারি খুলে কৌটো বের করল একটা। কফির কৌটো। এক মুঠো কফি হাতে নিয়ে এগিয়ে এল আমার কাছে। বলল,—"খাবে?"

না। কফি নয়। খালি কৌটোয় গোল-মরিচ। কালো কালো মুঠো-ভর্তি।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি হবে খেয়ে?"

ওর জবাব,

—"কিছুই না। খাবার জন্যে খাওয়া। জিভ, গলা জ্বলিয়ে বুক বেয়ে নেমে যাবে। দারুণ!"

—"পেলে কোথায়?"

—"সুপার মার্কেতে পাওয়া যায়। চাখবে?"

ওর হাত থেকে একটা গোলমরিচ তুলে মুখে দিলুম। ঝাঁঝ লাগল। ঝালও। মদের সঙ্গে ঝাল খেতে ভালোই লাগে। ঝাল বা নোন্‌তা। দেশে 'বাংলা' খেতে গেলে কখনো কখনো কাঁচালঙ্কা চিবিয়ে খেতুম। অথবা, কাঁচা পেঁয়াজ। কিছুই না পেলে নস্যির মতো এক টিপ নুনেও এক পাইট বাংলা নেমে যেত গলা বেয়ে।

মুঠোভর্তি গোলমরিচ একবারে কাউকে মুখে পুরতে দেখেছো, বউ? খালি গোলমরিচ! সঙ্গে কিছু নেই! মুখে দিয়ে বেশ তৃপ্তি করে চিবোতে লাগল গোবিন্দ। জ্বলুনি এবং আরামের এক-আধটা 'উঃ' 'আঃ' শব্দ।

ওর চোয়াল নড়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পুরোনো গোবিন্দকে মনে পড়ে গেল। মেয়ে-ন্যাকড়া গোবিন্দ। কলেজের ক্যান্টিন বলতে জগাদার ক্যান্টিন। ক্যান্টিনের রান্নাঘরের পাশে এক ফালি উঠোন। সেখান থেকে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে মেয়েরা ওপর তলায় উঠে যেত। অর্ডার দিত টেবিলে বসে। টেবিল-বেঞ্চি পাতা ক্যান্টিন ঘরের ভিড় এড়াতে মাঝেমধ্যে আমরা সেই এক ফালি উঠোনে চলে যেতুম।

বসবার চেয়ার-টেবিল কিছু থাকতো না বলেই, কাঠের বাক্সে বসে চা খাচ্ছিলুম করুণাময়ের সঙ্গে। প্লেটে ঢেলে আদ্ধেকটা চা এক চুমুকে শেষ। চারমিনার ধরাচ্ছিলুম। তখনই, স্পষ্ট মনে পড়ছে, গোবিন্দ এসেছিল। সঙ্গে ক্রাফ্‌ট সেক্‌শনের দুটি মেয়ে। ভারতী বা জগদম্বা—যা খুশি নাম হতে পারে ওদের। যেহেতু গোবিন্দকে আমরা বিশেষ পাত্তা দিতুম না, তাই গভীর আলোচনায় মেতে ছিলুম দু'জনে, অবশ্যই, ভারতী বা জগদম্বাদের এক পলক দেখে নিয়ে।

ওরা তিনজনে বোধহয় ঘুগনি-টুগনি কিছু খেয়েছিল। খেয়ে, মেয়ে দুটি একটু এগিয়ে যেতেই গোবিন্দর গলা,—"জগাদা, দু'চামচ গুঁড়ো দিন।"

দরজার পাশে, উনুনের সামনে বসে জগাদা রান্নায় ব্যস্ত। ভালো করে তাকিয়ে দেখেছিলুম, চামচ-টামচ নয়, এক মুঠো শুকনো লঙ্কার লাল গুঁড়ো গোবিন্দর হাতে দিয়েছিল জগাদা। ঠিক আজকের মতো চানাচুর খাবার ভঙ্গিতে সেই গুঁড়ো লঙ্কা চিবোতে চিবোতে মেয়ে দুটির সঙ্গে চলে গিয়েছিল গোবিন্দ। জগাদার কাছে হাত পেতে চাওয়ার ধরনে মনে হয়েছিল, ও এমনি লঙ্কার গুঁড়ো প্রায়ই চেয়ে খেত। করুণাময় আর আমি হাসাহাসি করেছিলুম মনে আছে।

গোবিন্দ আমার ভাবনার খবর জানে না। গোলমরিচ চিবিয়ে বলল,

—"সেদিন সন্ধ্যেবেলা মিশেল ওর এক বান্ধবীকে নিয়ে এসেছিল ঘরে। ওদের চা বানিয়ে দিতে না দিতেই 'একোলে'র চার বন্ধুও এসে হাজির। প্রায় একই সঙ্গে আমার হাসপাতালের সিস্টার—"

বলতে গিয়ে থেমে গেল। থেমে, বোকার মতো তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

বলে ফেললুম,

—"তোমার হাসপাতাল মানে? ঠিক বুঝলুম না, গোবিন্দ!"

ও সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। বলল,

—"আমার, মানে, এখানকার হাসপাতাল। আমাকে প্রায়ই যেতে হয় কিনা—"

কি যেন বলতে চাইছে না গোবিন্দ। ওর ফুসফুস বা ক্ষুদ্র অন্ত্রে কি সব জটিল রোগ আছে, বলেছিল। চিকিৎসাও করাচ্ছে, জানতুম। কিন্তু, এর মধ্যে লুকোবার কি থাকতে পারে, কে জানে? নতুন কোনো জটিলতা। না কোনো গোপন অসুখ।

কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই কথা ঘুরিয়ে দিল,

—"যা বলছিলুম! আমার ঘরে ছটা গেলাস আর চারজোড়া কাপডিশ ছিল। দু'দিন আগেই তোমাকে আমি গেলাস আর এক জোড়া কাপডিশ দিয়েছিলুম। একোলের বন্ধুদের সামনে প্রেস্টিজের ব্যাপার। তাছাড়া, মিশেলের সেই বান্ধবীও সেদিন প্রথম এসেছিল ঘরে। গেলাসে চা দিতে একটু লজ্জা-লজ্জাই করছিল। আসলে, সেই লজ্জা ঢাকতে বলে ফেলেছিলুম যে এক পুরনো বন্ধুকে কাপডিশ, গেলাস আর হীটারটা ধার দিয়েছি। কথার পিঠেই বলে ফেলেছি। মিশেলের বান্ধবীটি আবার এখানকার দু' চারজনকে ভালো করেই চেনে। ওর কাছ থেকেই সম্ভবত মেজোঁর বাসিন্দারা তোমার খবর এবং সেই সঙ্গে টিপ্পনী-সমেত আমার ঘরে চায়ের কাপ কম থাকার কথা শুনে থাকবে।"

চুপ করে শুনছিলুম। ও সামান্য থেমে এক চুমুক জিন খেয়ে নিল। তারপর বলল,

"তোমাকে ছোট করবার ইচ্ছে আমার সেদিনও ছিল না এখনো নেই। তবু সেই পুরনো ক্রটিটুকু নিয়ে তুমি যদি আবার আমাকে লজ্জা দিতে বা অপমান করতে চাও তো করো!"

বলে, ম্লান হাসল,

—"আমার আর কিছুই যায় আসে না।"

হতাশ ভঙ্গিতে হাত ওল্টালে শেষ কথা কটির সঙ্গে মানিয়ে যেত। তা না করে, খুব নিস্পৃহ গলায়, ক্লাসের সব পড়া-জানা বাধ্য ছাত্রের মতো কেটে কেটে উচ্চারণ করল।

আবার বললুম,

—"ঠিক আছে, বাপু। বললুমই, ইচ্ছে করে জেনেশুনে বলি নি এখন! চাও তো একটা ঘুষি মারো চোয়ালে—" বলে মুখটা ওর দিকে এগিয়ে দিলুম।

টেবিলের কাছে বসেছিল। আর একটু জিন ঢেলে গেলাস হাতে উঠে দাঁড়াল।

শব্দ করে হাসছিল। জল আনতে বোধহয় বেসিনের দিকে এগোচ্ছিল, ঠিক তখনই ঘটনাটা হল।

পেটে অথবা বুকে হাত চেপে ঝুঁকে পড়ল গোবিন্দ। গেলাসটা ওর হাত থেকে ছিটকে পড়ল, ভাঙল না। পানীয়টুকু ভিজিয়ে দিল মেঝে এবং কার্পেটের খানিকটা। ভয় পাইয়ে দেবার মতো বীভৎস একটা গোঙানির আওয়াজ তুলে গোবিন্দর কালো শরীর দুমড়ে মুচড়ে তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল। দু' হাতে বুক এবং পেট চেপে আছে। মাথাটা দুই হাঁটুর হাঁড়িকাটে যেন পিষে যাচ্ছে। কি-এক ভীষণ যন্ত্রণার একটানা অসহ্য শব্দ ছোটো ঘরটুকুর ভিতরে আবদ্ধ পশুর মতো আছড়ে পড়ছে। ঘুরছে চক্রাকারে। মেজোঁর ছত্রিশ নম্বর চেম্বারের দেওয়ালে।

কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। গোবিন্দ পড়ে যাবার আগেই হাতের গেলাস টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়িয়েছি। দু'হাত বাড়িয়ে ধরতে পারলুম না ওকে। পড়ে গেল। ভীষণ যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। গলাকাটা কালো রোগা কোনো পশুর মতো গড়াচ্ছে সারা ঘরময়। বেশ ভয় পেয়ে গেছি। ওর গায়ে হাত রাখতেও সাহসে কুলোচ্ছে না।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি হয়েছে? কি হল, গোবিন্দ? অমন করছো কেন?"

দলা পাকিয়ে দাপাচ্ছে গোবিন্দর শরীর। বুক পেট চেপে ধরে আছে দু' হাতে। একবার কার্পেটটা খামচে ধরবার চেষ্টা করল। মুখ দেখা যাচ্ছে না। ঘাড় ভেঙে যেন হাঁটুর মধ্যে ঢুকে বুক ছুঁতে চাইছে। সারা গায়ে ঘাম। কোনো কথা বলছে না বা বলতে পারছে না। ওর সমস্ত রোমকূপ থেকে ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠে আসছে একটানা গোঁ গোঁ আওয়াজ।

পাশে বসে পড়লুম হাঁটু মুড়ে। কি করা উচিত ভাবতে না পেরে এতো অসহায় লাগছে। নিজের অস্বস্তি বলে বোঝানো যাবে না, বউ। এই সমস্ত

সময় মানুষের নিজের ওপর যে রাগ হয়, তার বর্ণনা নিজেই নিজের কাছে দিতে পারে না। ভূতের মতো ভয়, রাগ, অসহায়তা নিয়ে বোধহয় দীর্ঘ সময় চলে গেল। একটু শক্ত, স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় গোবিন্দর ঘামে ভেজা পিঠে আলতো হাত রাখলুম। বললুম, খুব নরম কাঁপা কাঁপা স্বর বেরোলো গলা থেকে,

—"পেট কামড়াচ্ছে, গোবিন্দ ? জল দেব ? জল খাবে একটু ?"

কাত হয়ে গড়িয়ে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেল শোধরি ! বোবা মানুষ কথা বলার চেষ্টা করলে যেমন করুণ অপার্থিব আওয়াজ বেরোয়, তেমনি 'আঁ-আঁ' করে কি যেন বলল। কাছে এগিয়ে গেলুম আবার। জিজ্ঞেস করলুম,

—"জল দিই একটু ?"

গোঙানির মধ্যেই বোধহয় জবাব দেবার চেষ্টা করল, বুঝতে পারলুম না। ইস্ ! নিশ্চয়ই অসহ্য কষ্ট হচ্ছে বেচারার। কিসের যন্ত্রণা, কি রকম ব্যথা ওর ? চোখের সামনে এই দৃশ্য, এই রকম যন্ত্রণার আওয়াজ বেশিক্ষণ চোখ মেলে দেখা বা কান পেতে চুপচাপ বসে শোনা অসম্ভব। ওর পিঠে হাত রাখলুম আবার। ভিজে টস্‌টস্ করছে। যতটা আত্মীয়তা, সান্ত্বনা এবং স্নেহ মেশানো যায়, সব একসঙ্গে জড়ো করে আস্তে আস্তে বললুম,

—"কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে গোবিন্দ ? কোথায় ব্যথা ?"

উত্তর নেই।

নিজেকে এত অপদার্থ লাগছে যে, রাগে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে গোবিন্দকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, 'কিছু একটা বল ? আমি কি করতে পারি তোমার ব্যথা কমানোর জন্য সেইটুকু বলে, তারপর যত ইচ্ছে চেঁচাও আবার—আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না ! গরুর মতো বসে আছি—'

আরো আস্তে, ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললুম,

—"কি চাই, গোবিন্দ ? কি চাই, বল, আমি এনে দিচ্ছি !"

বিকৃত গলায় ওর গোঙানির মধ্যে যেটুকু বুঝলুম, তা হল,

—"ওষুধ—আলমারিতে—"

কথা কটি বুঝতে পেরে যে কি সোয়াস্তি হল ! আহ্। যেন, আমিই প্রচণ্ড ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলুম, ব্যথা সেরে গেল। একটা কিছু করতে পারব এখন—যেন চাঁদ পাওয়া গেল হাতে। এক লাফে উঠে দাঁড়ালুম। প্রায় ছুটে গিয়ে দেওয়াল আলমারি খুলে ফেললুম। কোথায় ওষুধ, কোথায় ওষুধ ? খুঁজতে খুঁজতে দুটি তাকের ইস্ত্রি করা জামা-কাপড় ওলোটপালোট হয়ে গেল। কিছু

কাগজ-পত্র, বই ছিটকে পড়ল মেঝের ওপরে। নেই। কোনো ওষুধ নেই এখানে। এক টানে নিচের দেরাজ খুলে ফেললুম। টুং-টাং, ঠন-ঠনাৎ শব্দ হল। দেরাজ ভর্তি নানা আকারের ছোট-বড় ওষুধের শিশি, কৌটো। হেঁচকা দ্রুত টেনে খোলার জন্যে সব গায়ে গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। এখনো দুলছে গোবিন্দর মতো। প্রায় আট-দশটা শিশি। পাঁচ ছ'টি কৌটো। টিউব কতগুলো। ঘাবড়ে গেলুম আবার। কোন্‌টা ? কোন্ শিশিটি এখন গোবিন্দর এই অসহ্য যন্ত্রণা কমাবে ? বোকার মতো অকারণেই শিশিগুলির ওপরে হাত বুলিয়ে দিলুম! চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"কোন্ শিশি ? কি ওষুধ গোবিন্দ ?"

কে কার কথা শোনে! সারা ঘরময় যন্ত্রণার আওয়াজ হেঁটে বেড়াচ্ছে। এক মুহূর্তও কান পেতে রাখা যায় না। মনে হল, আর দু চার মিনিট এমনি পাশবিক শব্দ শুনতে হলে আমি পাগল হয়ে যাবো। এক্ষুনি দরজা খুলে পালিয়ে যাই! ছোট্ট ঘরটির মধ্যে দমবন্ধ বাতাস থেকে পালিয়ে বাঁচি। কিংবা, কাউকে ডেকে আনি বাইরে থেকে। নিচে নাচ চলছে এখনো। কেউ না থাকলেও ফিরোজ আছে। কানাই হালদার আছে ঘরে। একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ এক শাস্তি। গোবিন্দর জন্যে কষ্ট ছাপিয়ে ভয় আক্রমণ করছে স্নায়ুকে। পরের মুহূর্তেই ভয় ছাপিয়ে মানুষটার জন্যে কষ্ট। বাইরে বেরিয়ে কাউকে ডেকে আনতে আনতেই যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়! টানটান সোজা হয়ে শুয়ে থাকে গোবিন্দর ঠাণ্ডা শরীর। নেশা আমার কেটে গেছে। তবু, মন বা মস্তিষ্ক এই অবস্থার মধ্যে মোটেই 'সুস্থ' বলা যাবে না। কোন্ শিশি, কোন্ ওষুধ ভাবতে ভাবতে পুরো দেরাজটাই টেনে বের করে আনলুম। দু' হাতে ধরে ওষুধপত্রের দেরাজটি নামিয়ে নিয়ে এলুম গোবিন্দর কাছে। অথবা, গোবিন্দর মতো দেখতে সেই দলা পাকানো কুণ্ডলিটির কাছে। দ্রুত গলায় বললুম,

—"এই যে। সব ওষুধ নামিয়ে এনেছি গোবিন্দ। কোন্‌টা ? কোন্ ওষুধ চাই, বলো!"

গোঁ গোঁ শব্দের মধ্যেই বিকৃত উচ্চারণ করল শোধরি,

…"গোলাপ—আঁ—গোলাপী ক্যাপসুল। দুটো।—"

ক্যাপসুলের শিশি সাধারণত ছোটোই দেখেছি। ছোটো সাইজের শিশিগুলো থেকে গোলাপী ক্যাপসুলের শিশিটি খুঁজে পেতে দেরি হল না। দুটি ক্যাপসুল হাতে নিয়ে দেখি, আমার আঙুল, হাত কাঁপছে তিরতির। বললুম,

—"নাও। এই নাও ?"

ওর মাথার চুলের কাছে খোলা হাতের চেটোয় ওষুধ নিয়ে ডাকলুম আবার, অনুরোধ করার মতো,

—"মুখ তোলো, গোবিন্দ। একটু মুখ তোলো! খেয়ে নাও ওষুধ। আমি জল আনছি।"

ভীষণ কষ্টে সামান্য মাথা তুলল। চোখ বোজা। কালো মুখে গভীর দাগের মতো রেখাগুলি বীভৎস কোনো পোর্ট্রেট মনে করিয়ে দিল। দাঁতে দাঁত চেপে আছে। অন্ধকার চামড়ায় ঘামের চকচকে ফোঁটাগুলি কাঁপছে। কোনো রকমে ছোট্ট এইটুকু হাঁ করতে পারল। মুখে পুরে দিলুম ক্যাপসুল দুটো। উঠে জল নিয়ে ফিরে এসে দেখি, আবার যে-কে-সেই। তেমনি হাঁড়িকাঠে মাথা। দুমড়ে পড়ে আছে। তেমনি আওয়াজ কাঁপছে শরীর জুড়ে।

গলা তুলে বললুম,

—"গিলে ফেলেছো ওষুধ! জল চাই না, জল ?"

কতক্ষণ সময় কেটে গেছে, জানি না। মনে হল, অনন্তকাল। ঘড়ির হিসেবে বড়জোড় মিনিট দশেক। টানটান না হলেও, গা হাত পা ছেড়ে গোবিন্দ কাৎ হয়ে পড়ে আছে কার্পেটে। কখন, কি ভাবে আমার কোলে ওর মাথা রেখেছে, মনে পড়ছে না। গোঙানির শব্দ নেই। হুহু করে শ্বাস ফেলছে এখন। কাজ দিয়েছে ওষুধে। যন্ত্রণার গোলাপী ওষুধে।

পাথরের মতো বসে আছি। নড়ছি না একটুও। খুব আস্তে শ্বাস নিচ্ছি, ফেলছি। পাছে, গোবিন্দর ব্যথা অথবা ব্যথার সেই ভয়ঙ্কর শব্দ আবার শুরু হয়!

ওগুলো কি ঘুমের ক্যাপসুল ? গোবিন্দ কি ঘুমিয়ে পড়ল!

ঘরের অবস্থা দেখলে হঠাৎ মনে হতে পারে, একটি ছোটোখাটো লড়াই হয়ে গেছে এখানে। শূন্য গেলাস পড়ে আছে। কার্পেটের খানিকটা জায়গা ভেজা। ওষুধ খোঁজার সময় আলমারির একগাদা কাগজপত্র, কতগুলো এক্সরে প্লেট ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছে নিচে। পড়ে আছে। টেবিলের পায়ার কাছে দলা-পাকানো গোবিন্দর তোয়ালে। কার্পেট উঁচুনিচু, অবিন্যস্ত। যন্ত্রণার সময় বার কয়েক খামচে ধরেছিল গোবিন্দ।

ও কি ঘুমিয়ে পড়ল! একবার ভাবলুম, এখন উঠে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলে হয়। গোবিন্দ ঝিমিয়ে পড়তেই মিশেলের ভাবনা ছুটে এল। রাতের পর রাত এই ঘরে থেকে গেছে মিশেল। গোবিন্দর ব্যথা কি আজ হঠাৎ হল ? না।

তাহলে ওই গোলাপী ওষুধ ওর জানার কথা নয়। নিশ্চয়ই মাঝে মধ্যে এমন যন্ত্রণায় ভোগে গোবিন্দ। মিশেল কি জানে? স্বাভাবিক। এলোমেলো কথা ভাবতে ভাবতে মিশেলের জন্য দুশ্চিন্তা হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এল আবার। একলা, অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে গেছে মেজেঁাতে আমি ছিলুম না বলে। ষণ্ডা-মার্কা কতগুলো আলজেরিয়ান মিশেলের ক্ষুধার্ত শরীরটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে না তো! শনিবার শেষরাতের কিছু মাতাল পশুর মধ্যে মিশেলের বুনো সুশ্রী মুখটি কল্পনা করে শিউরে উঠলুম।

নিচু গলায় বললুম,

—"গোবিন্দ। তুমি খাটে উঠে ঘুমোও। আমি যাই। মিশেলের একটু খোঁজ নিতে হবে।"

কোনো সাড়া নেই ওর। আমার কোলে মাথা রেখে যেমন পড়েছিল তেমনি রইল।

নেশার পরে এখন ঘুম ঘুম ভাব। খিদেও পেয়েছে। গা ছেড়ে দেবার মতো ক্লান্তি। পায়ের বুড়ো আঙুল নাড়াতে গিয়ে ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। ঝিঁঝি ধরেছে। গোবিন্দর মাথা রাখার জন্যে, একই ভাবে এতক্ষণ বসে জঙ্ঘা থেকে শুরু করে পুরো ডান পায়ে অবশভাব।

তারপর, আস্তে আস্তে অভদ্র কাপুরুষের মতো দার্শনিক হয়ে গেলুম। আমার কোনো দোষ নেই, বউ। আমি কি করতে পারি? একা কতকগুলো দস্যু মাতাল বা আলজেরিয়ানের সঙ্গে আমার কিছু করবার নেই। ওরা ইচ্ছে হলে প্যারিসের নির্জন ফুটপাথে আমার লাশ ফেলে রেখে মিশেলকে ধর্ষণ করতে পারে। একা মিশেলের খোঁজে যাওয়া নিতান্তই বোকামি।

ফলে, সেই রুক্ষ, বিষণ্ণ বুনো ফুলের মতো মুখটি সরল এবং ভীত চোখ মেলে একটা ইণ্ডিয়ান কাপুরুষের দিকে চেয়ে রইল। এবং নিজের প্রতি ঘৃণা, অসহায় রাগ সরিয়ে ফেলতে অন্য একটি মুখ খুঁজতে লাগলুম।

খুঁজতে খুঁজতে, খুঁজতে খুঁজতে আর একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা। মিশেল কি খুব ছোটোবেলায় এই মেয়েটির মতো দেখতে ছিল! রুক্ষ চুল, কচি মুখে কেমন ভীত অথচ উজ্জ্বল দুটি চোখ বসানো। নাম বোধ হয় প্যাটরিসিয়া। ছোট্ট তো? খুব বাচ্চা! বছর তিন-চার বয়েস। তাই, ওর বাবা ওর নাম বলেছিল প্যাট্। বাবাটিকে তুমি চেনো, বউ। ছোটোখাটো একটি ঝুঁকে-পড়া ল্যাম্পপোস্টের মতো চেহারা। হাত পা কাঠি কাঠি। পায়রার মতো বুক।

মাটি থেকে সাড়ে ছ' ফুট উঁচুতে রোগা অথচ উজ্জ্বল মুখটি। চোখে পণ্ডিতমশাই গোছের নিকেলের চশমা। নিকেল কিংবা রুপোর। জেরি। জেরি শীটস্ ও টুল। যার কাছে আমি ঋণী। এই মুহূর্তেও ঋণী। প্যারিসে আসবার জন্যে ওর দেওয়া উড়োজাহাজের বাতাস-টিকিট আমার বাক্সে যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে রাখা। ওর স্টকহোমের ঘরে এবং আপিসে আমার দুটি তেল রঙ ছবি শোভা পাচ্ছে। জেরির কাছে আমি হয়তো সারা জীবন ঋণী থাকবো। কিন্তু, ওর যে নরম মনটিকে আমি ওর অজান্তে শ্রদ্ধা করেছিলুম, সেটি মরে গেল গত সপ্তাহে। ওর অজান্তেই। তার জন্য অবশ্য জেরিকে দোষও দেওয়া যায় না। কারণ, আমার অথবা তোমার মতো পৃথিবীর যাবতীয় দু' পেয়ে জীব-জন্তুর মতোই জেরি ও' টুলও সুখ খুঁজছে। সুখ, আহা সুখ! যা পাওয়া যায় না অথচ খুঁজতে হয়। 'সুখ' শব্দটি 'মুখে'র সঙ্গে এতো মেলে এবং এতো হাস্যকর ব্যাপার, ভাবা যায় না। এক একটি মুখ যেন সুখ সাজিয়ে বসে আছে আমার কিংবা তোমার জন্যে। যদু কিংবা মধুর জন্যে। ওরে, এ মুখে পাওয়া গেল না! চ, অমুক মুখ দেখি। ওখানে নিশ্চয়ই আমার জন্যে সুখ সাজানো আছে। কী সুখ, কী সুখ! মন এবং হুঁশ আছে এই জাতীয় দু'চারজন মহা শক্তিমান মানুষ ছাড়া সুখ তো কেউ পায় না, বউ! কারণ 'আমি এখন সুখে আছি' কথাগুলোই ভুল। যেহেতু, সাময়িক অর্থে 'সুখ' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হাস্যকর। তৃপ্তি বা আনন্দ অথবা খুশি—এই সব বলা যায় যখন তখন। কিন্তু সুখ? দক্ষ অভিনেতার কোনো চরিত্র রূপায়ণের মতো যা নিজে সে কখনোই নয়। সেই চরিত্রটির কতো কাছাকাছি যাওয়া যায় তারই চেষ্টা। সুখের পেছন পেছন দৌড়ে, আঁচড়ে হাতড়ে যতটুকু পাওয়া যায়। যা পাওয়া গেল, তা-ই চিবোতে চিবোতে আবার 'খাজা কিংবা লুচির' মতো তার পেছনে দৌড়! সুখের পেছনে দৌড়োনোর নামই কি শান্তি? না, জীবন। কে জানে, বউ! ওসব মহাজনেরা ভাববেন। আমার ভাবনা এইটুকুই যে আমাদের সকলের মতো জেরিও সুখ খুঁজতে খুঁজতে ওর প্যাট্‌কে হারিয়ে ফেলল।

আমেরিকার বস্টন শহরে জেরির বাবা তাঁর একমাত্র ছেলের জন্য অঢেল সম্পত্তি রেখে মারা গেলেন। সচরাচর এই জাতের একমাত্র ছেলেরা বাপের জন্যে কালো শোকের চিহ্ন মুছে অথবা নাপিতের হাতে মাথা মুড়িয়ে সরাসরি উচ্ছন্নের সরল পথ ধরে অলিম্পিক দৌড় দেয়। গোড়া থেকেই হিসেবি ছেলে জেরি কিন্তু নিজের জন্যে জটিল পথ বেছে নিল। ছোটোখাটো ব্যবসায় হাত পাকিয়ে চলে এল সুইডেনে। গোটা ইউরোপের বাজার বুঝে 'তৈরি পোশাকে'র বাণিজ্যে ঢুকে

পড়ল। আমাদের দেশের তাঁত জেরির কোম্পানীতে আসতে লাগল। তারপর, ফ্যাশানদার পোশাক সেজে হুহু করে বিকোতে লাগল সুইডেন, জার্মানি, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্সের বাজারে। রাতারাতি না হলেও, পাঁচ বছরের মধ্যে জেরির সুইডিশ ক্রাউনের অঙ্ক ব্যাংকের হিসেবে ফেঁপে ফুলে ইউরোপের অন্যান্য পোশাক ব্যবসায়ীদের চোখ টাটিয়ে দিল।

এরই মধ্যে বস্টনের এক প্রেমিকা মারিয়াকে বিয়ে করে ফেলেছে জেরি। ওদের দু'জনের মধ্যে নিশ্চয়ই তোমাদের সেই তথাকথিত ভাষায় 'ভালোবাস্‌সা' ইত্যাদি ছিল। কিন্তু, পাশ্চাত্যের অবস্থা তো আমাদের মতো নয়! আমরা দিবারাত্র চুলোচুলি, ঝগড়া, মারামারি এবং অশান্তির অথৈ জলে ডুবে মরতে মরতেও ভালোবাস্‌সা-প্রেম-পীরিতির প্লাষ্টিকের ফুলের তোড়াটি চার হাতে তুলে জলের ওপরে রাখার চেষ্টা করি আজীবন। বর-বধূ থেকে সোয়ামী-ইস্ত্রী হয়ে মিন্‌সে-মাগীতে পৌঁছোই আমরা। তবু ছাড়ান নেই! লোকে কি বলবে? 'বে' হয়েছে না আমাদের! জন্ম-জন্মান্তরের, কি বলে গিয়ে, সেই 'নিবিড়-বন্ধন' কী কাটানো যায়!

নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি চরমে ওঠবার আগেই জেরিরা অথবা মারিয়ারা মেনে নেয় তাদের 'ভালোবাস্‌সা' ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো, এবং।...

সেই 'এবং'টির আগেই ওদের দু'জনের ছোট্ট মেয়েটির নাম প্যাট্‌। সে কোনো ভালোবাসাবাসির খবর রাখে না, অথচ ন'টে গাছের শ্বাস নিয়ে পৃথিবীর আলো দেখে ফেলে। প্যাট্‌ তিন বছরে পা দেবার আগেই ওদের ডিভোর্স হল। জেরি আর মারিয়ার। জেরির সঙ্গেই থাকার অধিকার পেল প্যাট্‌। কোর্ট থেকে অবশ্যই। মারিয়াকে ছেড়ে থাকা অসম্ভব ছিল না জেরির পক্ষে। কিন্তু, প্যাট্‌? প্যাটের জন্যে পাপা রইল। পাপার জন্যে প্যাট্‌।

মারিয়ার খবর আর কিছুই জানি না আমি। তবে প্যাটের ছবি দেখেছি। যেদিন বম্বের পাঁচ-তারকাওয়ালা হোটেলে আমার এ রাজ্যে আসার টিকিট ঠিক হয়ে গেল, সেদিন অথবা সেই সন্ধ্যায় জেরি আমাকে একটি অনুরোধ করেছিল। ওর মন তখন নরম, দুর্বল। প্যাটের জন্যে কি করতে পারা যায়, ভেবে অস্থির। ওর নরম মনে ওর গরীব-দুঃখী অথবা একলা শিশুর জন্যে অনেকখানি কপাট হা হা করে খোলা। সেইজন্যেই, সেদিন আমাকে ওর ক্যামেরায় তোলা ছবি দেখিয়েছিল অনেকগুলি। কচি একটি ধবধবে শিশুর সাদা-কালো রঙীন ছবি। একটার পর একটা দেখিয়েছিল আমাকে,

—"ছ্যাখো শিল্পী, স্নানের টাবে কেমন করে বসে আছে! জল নিয়ে খেলতে অ্যাতো ভালোবাসে—! এই, এই দেখো। বাগানের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে ওর সোনালী চুল কি রকম উড়ছে এলোমেলো! ভালো না?"

—"হ্যাঁ। ভারি সুন্দর। কি নাম বললে?"

উত্তেজিত খুশিতে ঝলমলে গলায় জেরি কথা বলছিল,

—"প্যাট্। আমার প্যাট্। এই দেখো, ও তখন এক বছরের, এতোগুলো বেলুনের মধ্যে কেমন জবুথবু হয়ে বসে আছে। মিষ্টি মিষ্টি। ছবিটা তোলার ফ্ল্যাশ্ বাল্বের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেছিল।—"

বলতে বলতে জেরির গলায় হাসি। আবার বলছে,

—"ওর দ্বিতীয় জন্মদিনের ছবি—"

আমাকে কথা বলবার সুযোগই দিচ্ছিল না জেরি। অবশ্য, মানুষের এইসব ফেলে-আসা সময়ের কথা শুধু শুনে যাওয়ার অপেক্ষা রাখে। সহৃদয় শ্রোতা পেলেই হল।

—"এটা আসলে রঙিন তুললে ভালো হতো। টুপি আর পুরো স্যুটটার রং একেবারে পিংকি-পিংকি। আর এইটে দেখ, কেমন বোকা বোকা লাগছে আমাকে, তাই না? আসলে আমার কোলে চেপে যা দুষ্টুমি করছিল না, ভয় হচ্ছিল, পড়ে না যায়। আট মাসের প্যাট্—দুটো দাঁতে হাসি হচ্ছে—দারুণ না?"

হ্যাঁ, দারুণ, জেরি। মনে মনে বললুম, তার চেয়েও দারুণ ভালো লাগছে তোমাকে। প্যাটের জন্যে তোমার শিশুদের মতো ব্যাকুলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার হৃদয়ে এক শ্রদ্ধার আসনে বসে পড়েছো তুমি।

—"শিল্পী। প্যারিসে বসে তোমার ইচ্ছে মতন ছবি আঁকতে আঁকতে এক ফাঁকে আমার প্যাটের একটা পোর্ট্রেট করে দেবে? ও ভীষণ জীবন্ত। প্রচণ্ড প্রাণ নিয়ে বুনো পাখির মতো ও পৃথিবীতে এসেছে। ওর একটা প্রাণবন্ত ছবি তুমি আমাকে এঁকে দেবে? অয়েল পেইটিং। যে ছবি দেখে, আমার যদি কোনো কষ্ট থাকে, তা যেন ভুলে যেতে পারি। দেবে? প্যাটের মুখ, প্লীজ?"

চার পাঁচটি ফোটো বেছে রেখেছিলুম সেদিন আমার কাছে। জেরিকে শ্রদ্ধার আসনে তুলে, মাথা নেড়ে জানিয়েছিলুম, দেবো। নিশ্চয়ই দেবো, জেরি।

সেই জেরি, সেই প্যাটরিসিয়ার পাপা সুখ খুঁজতে খুঁজতে প্যাটকে হারিয়ে ফেলল।
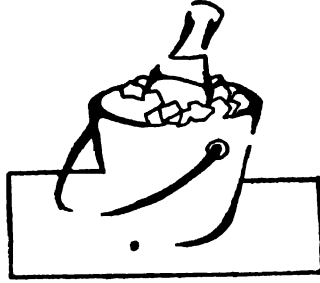
—"মুখ চাই মুখ? আপনার পোর্ত্রে করে দেবো, মাদাম? সাদাকালো অথবা রঙীন?"

মহিলাটির প্রায় কানে কানে বললুম। ওর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে হাঁটছি। দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিরে তাকালো আমার দিকে। পরনে ম্যাক্সির মতো পোশাক। ঠিক ম্যাক্সিও নয়, গোড়ালি ঢাকা পড়ে না। গলার কাছে, নিচের দিকে ফুলকাটা ফুলকাটা। ঠোঁটে ফরাসী ভদ্রতার হাসি।

আবার বলে উঠলুম,

—"মুখ এঁকে দিই আপনার—"

মহিলা চোখ টিপে থামিয়ে দিল আমায়। বলল,—"নোঁ! মেরসি।"

তারপর, গলায় তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে বলল,—"তিন চারবার তোমাদের এই মোঁমাত্রে পোর্ট্রেট করিয়েছি—একবারো মেলাতে পারে নি। ফুঃ—।"

তাড়াতাড়ি মুখটির রেখা, গঠন আর ত্বকের রং চোখ দিয়ে চেটে নিলুম। না! এমন তো দুরূহ পোর্ট্রেট কিছু নয়। আসলে, চট করে যে ব্যাপারটি বুঝলুম, তা হল, সুন্দরীর বয়েস কম্‌সে কম চল্লিশ। চামড়া টেনে, বলিরেখা ঢেকে ঢুকে, বুক বাগিয়ে নিজেকে পঁচিশের বেশি কল্পনা করতে চান না। এঁর বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকলে অবাক হবার কিছু নেই। অথচ সাদা যুবতীটি সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! এবং, সেইজন্যেই হয়তো মোঁমাত্রের শিল্পীরা এর পোর্ট্রেট মেলাতে পারে নি। অর্থাৎ, এর মনোমতন মেলাতে পারে নি।

সঙ্গে সঙ্গে আমি যতটা সম্ভব বিলিতি কায়দায় বিনীত হেসে নিবেদন করলুম,

—"পোর্ত্রে না মিললে একটি ফ্রাঁ-ও দেবেন না, মাদাম।"

অল্প ভুরু কাঁপিয়ে আশ্চর্য কৌশলে এক পলকের জন্যে মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুললো। বললো—"আমি মাদাম নই! মাদমোয়াজেল।"

ও হরি, তাই বলো। তা চল্লিশ ছুঁয়েও যদি 'মাদমোয়াজেল' অর্থাৎ কুমারী থেকে থাকো, তবে তো তোমার পোর্ট্রেট মেলানো একটু শক্তই হবে! দেখা যাক! নিজের কুমারীত্বের প্রতি জোর দেওয়ার জন্যেই কে জানে, আবার বলে উঠলো :

"মাদমোয়াজেল দ্যুরোঁ। জীনেত দ্যুরোঁ।"

—"বেশ তো, মাদমোয়াজেল, আমি আপনাকে পোর্ট্রেট মিলিয়ে দেবই।"

সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত বাড়িয়ে বলল,—"বাজি?"

হাত মিলিয়ে হাসিমুখে বললুম—"বাজি।"

—"কি বাজি?"

খুব চালাক সেজে চটপটে গলায় আগের কথাটিই আবার বলে দিলুম,

—"না মিললে কোনো পারিশ্রমিক দিতে হবে না আপনাকে। মিললে একশো ফ্রাঁ।"

মহিলাকে বসবার চেয়ার এগিয়ে দিলুম। হেসে ফেলল। দাঁতগুলো নকল নয় তো? এতো পরিষ্কার ঝকঝকে দাঁত তো ফরাসীদের হবার কথা নয়। জীনেত বলল,

—"ও তো দামের কথা হল! বাজি কি?"

—"আমার সময়।"

ঠোঁট উল্টে জীনেতের জবাব,

—"বাহ্! আমার সময়ের বুঝি দাম নেই?"

সেলসম্যানের ঘাবড়ে যাওয়া চলে না। তাড়াতাড়ি বললুম,

—"ছিঃ। কি বলছেন আপনি! আপনার সময়ের দাম আমার সময়ের থেকে অনেক বেশি।"

বোর্ড বাগিয়ে ধরে বললুম,

—"তাহলে শুরু করে দিই!"

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে আলতো হাতে চেপে চেপে মুখের কল্পিত ঘাম মুছে নিল। বলল,

—"কিন্তু বাজি কি?"

হাল ছেড়ে দিলুম। কারণ, সময় বয়ে যায়। কত খদ্দের মুখ নিয়ে ঘুরে

বেড়াচ্ছে। মোঁমার্ত্রের মরশুম ট্যুরিস্ট টানছে দলে দলে। এ মহিলা যদি পাগল, থুড়ি, পাগলী হয়, তাহলে এর সঙ্গে আমার সময় নষ্ট করা মানে, অন্য একটা পাকা খদ্দের হাতছাড়া করা। গত ক'দিন যে হারে মুখ এঁকে রোজগার করেছি, আজ তার তুলনায় কিছুই নয়। এগারোটা বাজে। মোটে একটি খদ্দের পেয়েছি।

হাই তোলার মতো বললুম,

—"মাদমোয়াজেল দ্যুরেঁা। আপনি কি সত্যি সত্যিই আপনার পোর্ট্রেট আঁকাতে চান?"

ব্যাগ থেকে ইতিমধ্যে একটি ছোটো আয়না বেরিয়েছে। নিজের মুখের দিকে লক্ষ্য রেখে বলল,

—"আমাকে 'জীনেত' বললে কম সময় এবং অক্ষর ব্যবহার করতে হবে।"

'কেস' তো অন্যরকম ঠেকে! বুঝতে পারছি না ঠিক। অথচ, হয় এর পোর্ট্রেট করে পয়সা বাগাই, নয়তো বাপু বিদেয় হও! অন্য মুখ খুঁজি।

জীনেত বললে,

"তাছাড়া, আমি কি এখানে ইয়ার্কি মারতে বসে পড়েছি, মনে হচ্ছে?"

সোজা হয়ে বসলুম। নিজেকে সামলাবার জন্যে অবশ্যই। কারণ, মোঁমার্ত্রের মেলা বসার পর থেকে আজ অবধি আমার 'নিশ্চিত' সুনাম হয়েছে। যাঁদের মুখ এঁকেছি, তাঁরা নিশ্চয়ই গিয়ে বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনদের বলেছেন আমার কথা। দু'তিন জন এখানে এসে 'ইণ্ডিয়ান পেইন্টারে'র খোঁজ করে আমাকে দিয়ে পোর্ত্রে করিয়ে নিয়ে গেছেন। সাদা-কালা মুখ চল্লিশ ফ্রাঁতে আঁকতে শুরু করেছিলুম। এখন দাম বাড়িয়ে খদ্দের বুঝে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন করে দিয়েছি। রঙীন একশো।

খদ্দের লক্ষ্মী। সুতরাং সবিনয়ে বললুম,

—"আমাকে ভুল বুঝবেন না। মানে, বাজি ধরে পোর্ট্রেট কখনো আঁকি নি। তাই—"

আয়নায় চোখ রেখে ঠোঁটে লিপস্টিক বোলাচ্ছে। হাসতে হাসতে বলল,

—"ভীতু কোথাকার। আত্মবিশ্বাস নেই!"

এবার মনে মনে চটে গেলুম। জিদ চেপে গেল। আঁতে ঘা বলে কথা। মৃদু হেসে বললুম,

—"আপনার রঙীন পোর্ত্রে করে দিচ্ছি। না মেলাতে পারলে, আপনার মডেলিঙের সময়ের দাম হিসেবে একশো ফ্রাঁ দেবো আপনাকে।"

খুব খুশি এবার। সঙ্গে সঙ্গে লিপস্টিক, পাউডারের কৌটো, আয়না ব্যাগে ভরতে ভরতে বলল,

"ঠিক আছে। রাজি।"

বোর্ড কোলে ধরে হাল্‌কা বাদামি প্যাস্টেল হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"আর পোত্রে´ মিললে ?"

ব্যাগ থেকে ফরাসী সেন্টের শিশি বেরুলো। শরীরে স্প্রে করতে করতে জীনেতের চট-জবাব,

—"মিললে, তোমার পারিশ্রমিক একশো ফ্রাঁ তো দেবই। আর 'লা তুর্‌ দার্জঁ'তে ডিনার খাওয়াবো। ফুল কোর্স্‌!"

বোর্ডের দিকে চোখ ছিল। কথাটি শুনেই, আমি জানি, আমার চোখ বড় হয়ে গেছে এবং হাঁ করে এক পলক হলেও পাগলীটির দিকে তাকিয়ে থেকেছি। কারণ, কে দ্য লা তুরনেলের রেস্তোরাঁ 'লা তুর্‌ দার্জঁ' এলাহি ব্যাপার! বাইরে থেকে দেখেছি! নোৎরদাম ক্যাথিড্রেলের কাছে এই হোটেলে একজনের শুধু ডিনার খাবার দাম কম করেও একশো ফ্রাঁ, মানে, দেড়শো টাকার ধাক্কা। তাছাড়া মদের বিল আলাদা। একশো ফ্রাঁ ক্যাশ রোজগার এবং স্বর্গরাজ্যের বিলাসী হোটেলে দেড়শো টাকার খাবার—হে নারী!! তোমার পোর্ট্রে´ট আমাকে মেলাতেই হবে!

সেইদিন জেরি এসেছিল। প্যাটের পাপা জেরি ও'টুল লণ্ডন থেকে প্যারিসে। এবং আমার খোঁজে মোঁমার্ত্রে´।

মাদমোয়াজেল জ্যুরেঁার ছবি শেষ করে বোর্ড সমেত মাটিতে প্যাকিং বাক্সে হেলান দিয়ে রাখতেই প্রায় লাফ দিয়ে উঠেছিল মহিলা। চেয়ারের পিঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আর নড়নচড়ন নেই। হাঁ করে নিজের দিকে তাকিয়ে ছিল। জেনেশুনে, ভেবেচিন্তেই ওর মুখের লুকানো অথচ একেবারে অদৃশ্য নয় এমন সব বলিরেখা আমি এড়িয়ে গেছি। এই চেহারাটি ইচ্ছে করেই ওর চোখের সামনে তুলে ধরেছি যাতে বেচারি অন্তত দশ বছর আগের নিজেকে খুঁজে পায়।

আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে আমায় দেখল। আপন মনেই বলল যেন, আমি শুনতে পেলুম,

—"ত্রে বিয়ঁ্যা! খুব ভালো এঁকেছো আমায়। এক্কেবারে আমি যা ছিলুম, যা থাকতে চাই—"

বলেই, সামলে নিল বুঝি,

—"মানে, যা আছি।"

তারপরে শুরু হল পাগলামি। খুশিতে আমায় গায়ের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চক্-চক্-চকাস করে দুই গালে এবং ঠোঁটে চুমু খেল। খেতে খেতেই বলল,

—"তুমি দারুণ। অসাধারণ। জেনি, জিনিয়াস।"

আমার গলা ছেড়ে দিয়ে একটু সুস্থ হল। আশেপাশে দেখার প্রয়োজন নেই। হাসি মুখে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলল আবার। আয়না, লিপস্টিক, আই-লাইনার বের করে প্রসাধন করতে বসল। আমায় চুমু খেতে গিয়ে লিপস্টিক নিশ্চয়ই ঠোঁট থেকে কমে গেছে। পাছে মুখের রেখা এক-আধটা লেপ্টে বেরিয়ে গিয়ে থাকে!

গালে পাউডারের পাফ বোলাতে বোলাতে বলল,

—"হেরে গেলুম, ইণ্ডিয়ান। তোমার কাছে আমি হেরে গেলুম।"

বলে, করকরে একশো ফ্রাঁর একটা নোট আমার দিকে এগিয়ে দিল। আবার বললে,

—"সন্ধ্যে সাতটা লা তুর দার্জঁ। মিনিট পাঁচেক আগেই আমি যাবো। তোমাকে টেবিল খুঁজতে হবে না।"

নোটটি পকেটে গুঁজে রুমাল দিয়ে গাল ঠোঁট মুছতে মুছতে বললুম,

—"সত্যি সত্যিই খাওয়াচ্ছেন নাকি?"

পুরুষদের মতো সামান্য বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। কোমরে হাত রেখে বলল,

—"ধমনীতে জাত ফরাসী রক্ত। কথা দিয়ে কথার খেলাপ করতে শিখি নি। বাজি হেরেছি। ডিনার তোমার দাবি বা ন্যায্য পাওনা।"

বলে, চোখ টিপে জিজ্ঞেস করলে,

—"ইণ্ডিয়ান যুবক, আগে থেকে অন্য কোথাও রঁদেভু নেই তো?"

পকেটের ভেতর একশো ফ্রাঁর নোটে বাঁ হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুল বুলিয়ে সাহস পেয়ে গেছি। আমিও চোখ টিপে দিলুম। বললুম,

—"ফরাসী সুন্দরী। তুমি থাকতে আর কোথাও রঁদেভু আমার থাকতেই পারে না।"

নিজের সদ্যযুবতী মুখ হাতে নিয়ে কায়দামাফিক আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলে গেল,

—"সন্ধ্যে সাতটা। লা তুর্ দার্জঁ।"

শিল্পী, দর্শক, ট্যুরিস্ট, খদ্দের গমগম করছে চারপাশে। বেলা দুপুর। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। তবু সারা আকাশে সাদা মেঘের আলো। বাদল-বৃষ্টির ব্যাপার নেই। অভ্যেসের মেঘ। ছেঁড়া ছেঁড়া। ধীর পাখায় অলসভাবে ঠাণ্ডা বাতাস কেটে চলেছে।

বন্ধুদের জন্যে চোখ ফেরাতেই, আশ্চর্য দৃশ্য। যিশু, দেনিস এবং মঁসিয় কোর্তোয়া পাশাপাশি হেঁটে আসছে গম্ভীর মুখে। এতো গম্ভীর মুখ এবং তিনজনের একসঙ্গে মার্চ করে আসার ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, আক্রমণ করতে আসছে। তিন জোড়া চোখ যেন গিলে খাবে আমায়। বোর্ডে নতুন কাগজ পিন দিয়ে লাগাচ্ছি আর হাসিমুখ করবার চেষ্টা করছি। কি ব্যাপার বোঝা মুশকিল।

ওরা কাছে এগিয়ে আসতেই বোকা-বোকা হেসে জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি ? কি ব্যাপার ? মারবে নাকি ?"

তিনজনে এগিয়ে এলো আরো। জবাব দিল না। হাতে বোর্ড নিয়ে হুতোমের মতো দাঁড়িয়ে আছি। কিছু বোঝবার বা ভাববার সময় না দিয়ে ঘিরে দাঁড়াল আমাকে। দেনিস ডান পাশে। মঁসিয় কোর্তোয়া বাঁয়ে। যিশু আমার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ল।

তারপরেই, একসঙ্গে তিনজনের কোরাস গলায় প্রশ্ন, তাতে তালে, ছন্দ মিলিয়ে বলা যায়,

"সাতটা কিংবা সাড়ে সাতটায়,

ম্যাক্সিম নাকি লা তুর্ দার্জঁ ?"

এক পা পিছিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"তার মানে !!"

জবাবে ওরা তিনজনে ঠোঁট মিলিয়ে আবার গাইল। একই সুর, একই ছন্দ,

—"সাতটা কিংবা সাড়ে সাতটায়, ম্যাক্সিম নাকি লা তুর্ দার্জঁ ?"

বোঝো অবস্থা !

'ম্যাক্সিম' আরেকটি সেরা হোটেল। ওরা কি আমাদের দু'জনের কথা শুনতে পেয়েছে ? কিন্তু, এদের তিনজনের কেউই তো কাছাকাছি ছিল না তখন।

যেন কিছুই হয় নি, এমনি ভাব দেখিয়ে বললুম,

—"কি বলছো তোমরা ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মাথামুণ্ডু !"

গম্ভীর মুখে পরামর্শ দেবার মতো যিশু বললে,

—"যাবার সময় পকেটে একটু অ্যান্টিসেপ্‌টিক্ লোশন আর তুলো নিয়ে যেও।"

ওর কথা শেষ হতে না হতেই দেনিস আলতো দু' আঙুলে আমার চিবুক নাড়া দিল। জিভে চুক্-চুক্ শব্দ করে মাথা দুলিয়ে ভারিক্কি গলায় বললে,

—"অ্যান্টি টিটেনাস্ ইঞ্জেকশন একটা নিয়ে যেতে পারলে নিশ্চিন্দি—"

হোহো করে হেসে উঠল তিনজনে। আমার দিকে দেখছে আর হেসে গড়িয়ে পড়ছে। চারপাশের মানুষজন অবাক। ঘুরে ঘুরে এদিকে দেখছে। পাক্কা এক মিনিট বাদে বেদম হয়ে জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে লাগল ওরা।

জিজ্ঞেস করলুম,

—"এবার বলো, ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার কথাবার্তা কি শুনতে পেয়েছো তোমরা ?"

মুখে জবাব না দিয়ে তিনজনে মাথা নেড়ে জানাল, না।

মঁসিয় কোর্তোয়া তাঁর সরু গলায় বললেন,

—"আর কি! আপনার তো হিল্লে হয়ে গেল মশায়! যাকে বলে গিয়ে, জামাই-আদরে থাকবেন!"

দেনিস বললে,

—"ক' দিন—থুড়ি, মানে, ক' রাত—সেইটেই প্রশ্ন!"

নিজেদের মধ্যে ঠারে-ঠোরে কথা বলছে। আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে।

যিশু বললে,

—"আমার কপালে তো ভাই, সাকুল্যে দেড়টি রাত্তির!"

মঁসিয় কোর্তোয়া আমায় বললেন,

—"আমি মশায় এসব কিছু জানি না। বুড়ো হয়ে গেছি তো, জামাই আদরের কপাল কোথায়! তবে হ্যাঁ, এরা দুটিতে সুখ পেয়েছে।"

দেনিস সঙ্গে সঙ্গে বললে,

—"কেন? উনি? উনি তো সব্বাইকে টেক্কা দিয়ে ন' সন্ধ্যে ম্যাক্সিম। ন' দিন-রাত্তির জামাই—"

বলে, আঙুল তুলে যাকে দেখাল, আমি তো অবাক। লিয়ঁ! দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের। থার্টি-টু অল-আউট করে হাসছে। যেন, এখানে কি আলোচনা হচ্ছে সবই ওর জানা। লিয়ঁকে আমি আজ অবধি হাসতে দেখি নি।

সারাক্ষণ গম্ভীর, চুপচাপ্ ! সেই মানুষ, তার লম্বাটে মুখে গালভরা হাসি নিয়ে তাকিয়ে। ওর এমন, কি বলে সেই, 'অভূতপূর্ব' মুখ দেখে আমারও প্রায় হাসি পাবার যোগাড়। অথচ, ভেতরে প্রশ্ন ঘুরছে! কি ব্যাপার? এ-সবের মানে কি? কোনো গূঢ় রহস্য নয় তো?

দেনিস লিয়ঁকে দেখিয়ে বলছে, হেসে হেসেই,

—"ঈস্! এখন আবার হাসি হচ্ছে! দশ দিনের দিন যখন ফিরে এলে, চাঁদু, মুখের ছ' জায়গায় স্টিকিং প্লাস্টার সাঁটা! প্রেমের পরাণ পঞ্চা তেলি!—"

লিয়ঁ কোনো কথাই শুনতে পাচ্ছে না, অথচ ঘাড় নেড়ে জানাচ্ছে যেন, সবই বুঝতে পারছে ও।

আমার দিকে ফিরে দেনিস বললে,

—"আমি টেনেটুনে চারদিন, ভাই। রোজই লা তুর্ দার্জে তুমুল পানাহার!"

যিশু বললে,

—"আমার সন্ধ্যে ছুটি ম্যাক্সিমে। কী স্কচ্! কী খাবার!"

বিরক্তিতে প্রায় ধমক দিয়ে উঠলুম,

—"উফ্! বলি, তোমরা একটু থামবে?"

তিনজনেই চুপ করে, মুখে মুচকি হাসি মেখে আমার দিকে চেয়ে রইল।

গোড়ায় ভেবেছিলুম, ডাঁট দেখিয়ে নেমন্তন্নের খবরটি এদের দেব। এখন হয়েছে উল্টো! এরাই আমাকে প্রায় ঘাবড়ে দেবার তাল করেছে। ঘটনা কি বোঝবার জন্যে পুরোপুরি সারেণ্ডার করাই ভালো, ভেবে দেখলুম।

যিশুকে বললুম,

—"মাদমোয়াজেল হ্যরেঁাকে তোমরা সবাই চেনো মনে হচ্ছে। আসলে, বাজি হেরে সন্ধ্যে সাতটায় লা তুর্ দার্জ্ঁতে খাবার নেমন্তন্ন করেছেন।"

দেনিস বললে মাথা দুলিয়ে,

—"উঁহু-উঁহু! শুধু খাবার নয়! খাবার-দাবার এবং আবার-আবারের নেমন্তন্ন!"

ফের হেঁয়ালি!

চটেমটে বলে দিলুম,

—"ছাখো, তোমরা যদি সোজাসুজি কথা না বলো, তা হলে আমি কিছুই শুনতে চাই না।"

বলে, বোর্ড হাতে নিয়ে হাঁটা দিলাম। যিশু আমায় থামিয়ে দিয়ে হাসল। কাঁধে হাত রেখে বলল,

—"ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই। বঁ কুরাজ, দোস্ত্! লড়ে যাও। ভালো পোশাক পরে একটু সেজেগুজে যেও—দামী রেস্তোরাঁ তো।"

দেনিসও পিঠ চাপড়ে হাসল। বলল,

—"তবে, হ্যাঁ। ওই তুলো এবং লোশন কিন্তু নিতে ভুলো না। পারো তো অ্যান্টি-টিটেনাস্‌টা—"

মঁসিয় কোর্তোয়া চোখ টিপলেন। খ্যা খ্যা করে হাসতে হাসতে চলে গেল ওরা।

বুদ্ধু ভুতুমের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। কি ব্যাপার রে বাবা! এদের কোনো কথারই তো হদিশ পেলুম না। ঝুট্‌-ঝামেলা নেই তো! বিদেশে অচেনা পাগলীর পাল্লায় পড়ে বিপদ ডেকে আনছি কি না কে জানে! দূর! যা থাকে বরাতে! দেখা যাবে সন্ধ্যেবেলা। বিনি পয়সায় অত বড় হোটেলে ডিনার—কোনো কারণেই সুযোগ হাত-ছাড়া করা উচিত নয়। ডিনার মানেই স্কচও নিশ্চয়ই থাকবে সঙ্গে। বন্ধুরা একটু রসিকতা তো করবেই। মেয়েটির সঙ্গে রঁদেভুর কথা নিশ্চয়ই শুনে ফেলেছে ওরা। কিন্তু, ওই তুলো, লোশন আর অ্যান্টি-টিটেনাসের ঘটনাটা মাথায় ঢুকছে না। পাড়ায় নিয়ে গিয়ে ধোলাই খাওয়াবে না তো! সত্যি সত্যিই হয়তো জীনেতের মাথার ঠিক নেই। হয়তো আসবেই না ওখানে। আমি একা গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বোকা হয়ে ফিরে আসবো—বন্ধুরা হাসাহাসি করবে—

এই সব ভাবছিলুম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সেদিনই জেরি এসেছিল। ওর ছোট মিষ্টি মেয়ে চার বছরের প্যাট্‌কে হারিয়ে মোঁমার্ত্রে এসেছিল জেরি ও'টুল।

প্রথমে চিনতেই পারি নি জেরিকে! কেতাদুরস্ত কোট-প্যাণ্ট-টাই, মাথায় ফেল্টের টুপি-পরা ভদ্রলোক অল্প ঝুঁকে চোস্ত ফরাসীতে অভিবাদন জানিয়ে কুশল প্রশ্ন করলেন,

—"বঁ জুর মঁসিয়। কোমঁতালে ভু? সাওয়া!"

মেজাজ গোলমেলে ছিল। জীনেতের নেমন্তন্ন নিয়ে বন্ধুদের ঠাট্টা-ইয়ার্কির কিছু হদিশ পাই নি। ওরাও কিছুই ভেঙে বলে নি। ভূরিভোজের সময় হয় নি দুপুরে। ইচ্ছেও ছিল না বিশেষ। সন্ধ্যেবেলার ফুলকোর্স এবং ফোকোটে পাওয়া ডিনারের আশায় খিদে বাড়াচ্ছিলুম, বলা যায়।

আলুভাজা দিয়ে কালো কফি খেয়ে খদ্দেরের পর খদ্দের ধরেছি। বেলা তিনটের মধ্যেই আজ চার-চারটে মুখ হয়ে গেছে। আড়াই শো ফ্রাঁ গজগজ করছে পকেটে। পঞ্চম খদ্দের ধরে ফেললুম।

বিচিত্র পোশাক-পরা এক বুড়ো। বড়দিনের সাণ্টা ক্লজের মতো মাথায় সেই লাল টুপি। সাদা বর্ডার দেওয়া লাল কোট। প্যাণ্টও নিচের দিকে চাপা, হাঁটুর ওপরে ঢোলা। লাল রং। স্লেজ গাড়ি আর উপহারের থলেটি ছাড়া একেবারে জলজ্যান্ত সান্তা ক্লজ। তুলোর মতো দাড়ি ফুরফুর হাওয়ায় উড়ছে। এ বুড়ো যখন আসরে ঢুকেছে তখন থেকেই ঘুরে ঘুরে দেখছে অনেকে। দেখার মতোই ব্যাপার তো? মে মাসে কে কবে সান্তা ক্লজের কথা ভাবতে পারে? কারণ, সান্তা মানেই ক্রীসমাস। সবে বৃষ্টি থেমে সূর্য উঠেছে। এমন সময় রোদের মধ্যে ক্রীসমাসের কথা কার মাথায় আসবে! তাই, প্রায় সকলেই মজার বুড়ো দেখতে চোখ ফিরিয়েছে। যাদের পাশ দিয়ে হাঁটছে, তারা ঠাট্টা ইয়ার্কি ছুঁড়ে দিয়ে হাসাহাসি করছে। কে যেন ঘণ্টার শব্দের মতো করে টিন বাজালো। হোহো করে হেসে উঠল সেই দলের লোকেরা। সান্তার

ভ্রূক্ষেপ নেই। হেঁটে আসছে। পা' টলছে এপাশে ওপাশে। আপনমনে হেলে ছুলে হাঁটা।

ওদিককার মুখ আঁকিয়েরা প্রায় প্রত্যেকেই মাতাল বা পাগল বুড়োকে খদ্দের বানাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পাত্তা পাচ্ছে না কেউ। সমস্ত ভিড়, জটলা পেরিয়ে, চারপাশের অজস্র রং এবং হাসাহাসির মধ্যে দিয়ে লাল-সাদা ছোট্ট পাহাড়টির মতো এগিয়ে আসছে বুড়ো মানুষটি!

দেনিস হাসতে হাসতে পেট চেপে বসে পড়েছে! লিয়ঁ গম্ভীর-মুখে ছোট্ট একটি হাঁ করে তাকিয়ে। যিশু বোধ হয় দু'বার বললে,

—"মুখ চাই, মঁসিয় ? আপনার পোর্ত্রে ?—"

জবাব নেই। বেখেয়াল হেঁটে আসছে সান্তা। পেছনে কুচি কুচি ছেঁড়া সাদা কাগজ শূন্যে ছুঁড়ে দিল কেউ। তিরতির কেঁপে কেঁপে নেমে আসছে ওগুলো। বুড়োর টুপি, কাঁধ ছুঁয়ে মাটিতে এসে পড়েছে। এক আধটা সাদা কুচি লাল কোটের হাতায়, বুকের কাছে লেগে থাকলো। ডিসেম্বরের তুষারপাত নাকি!

আমার প্যাকিং বাক্সটির ওপরে বসে সিগারেট খাচ্ছিলুম। মজা দেখছিলুম বুড়োর। পেছন পেছন কয়েকটি বাচ্চা হাততালি দিচ্ছে। বিদেশী ট্যুরিস্টদের ছিলে-পিলে হবে, কারণ, ইংরিজিতে গান গাইছে,

'হে! জিংগ্‌ল্ বেল্‌স্ জিংগ্‌ল্ বেল্‌স্,
জিংগ্‌ল্ অল্ দ্য ওয়ে।
স্যাণ্টা ক্লজ্ ইজ্ কামিং অ্যালং
অন্ এ ওয়ান্-হর্স ওপ্‌ন্ স্লে।'

আমার পাশ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে হল, সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। দু'হাতের অঞ্জলি পেতে একেবারে বুড়োর মুখোমুখি। বললুম,

—"সান্তা ক্লজ! আজকের এমন বড়দিনে আমার জন্যে কি এনেছেন?"

ব্যস, মুখ তুলে ঢুলু ঢুলু চোখে আমায় দেখল এবং এক-দাড়ি হেসে ফেলল।

আবার বললুম, হাত পেতেই আছি,

—"বড়দিনের সান্তা ক্লজ, কি এনেছেন আমার জন্যে?"

লাল কোটের পকেট হাতড়ে মুঠো ভর্তি দশ ফ্রাঁর নোট বের করল। যেন অন্যায় হয়ে গেছে, এইভাবে জিভ কেটে একটু হেসে আবার পকেটেই রেখে দিল

ওগুলো। চট্ করে হাত দিল মাথায়। টুপি তুলে ডান হাতে উল্টো করে ধরল। মাথাজোড়া টাক। আট দশটা কাগজের গোলাপ টুপির মধ্যে। একটা আমার হাতে দিয়ে হাসিমুখে বলল,

—"তুমি ঠিক ধরেছো, বিদেশী! আমি যেমন সান্তা ক্লজ, এই গোলাপগুলো তেমনি ফুল।"

বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছনের বাচ্চাদের হাতে একটা করে ফুল দিল। নিজের জন্য একটি রেখে আবার পরে ফেলল টুপি। ছেলেরা মহাখুশি। অল্পক্ষণের জন্যে থেমেছিল। আবার হইচই করে গান জুড়ে দিল।

ফুল সোঁকার ভঙ্গি করে বললুম,

—"আমি কিন্তু দারুণ সান্তা ক্লজ আঁকতে পারি। আপনি মডেল হবেন?"

মুখ থেকে ভক্‌ভক্ মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। আমার কাঁধে হাত রেখে বলল,

—"বলো কি হে! তুমি সান্তা ক্লজ আঁকতে পারো, আর আমি মডেল হবো না।"

ব্যবসা মাথায় রেখে হাসিমুখে বললুম,

—"আপনাকে দেখে রঙিন সান্তা ক্লজ অর্থাৎ আপনার পোর্ট্রে যদি বানিয়ে দিই, কি দেবেন আমায়?"

—"কি চাই বলো?"

—"বেশি কিছু না। আমার পারিশ্রমিক একশো ফ্রাঁ।"

—"ব্যস্?"

বলে, পকেট থেকে নোটের গোছা বের করছিল, বাধা দিয়ে বললুম,

—"আগে এই চেয়ারে চুপচাপ শান্তশিষ্ট মডেল হয়ে বসুন, ছবিটা আঁকি, তারপর দেবেন পয়সা।"

—"বাহ্। তুমি তো খুব ভালো ছেলে গো!"

বসতে বসতে সান্তা খুশির গলায় জানিয়ে দিল।

বোর্ড বাগিয়ে ধরে একবার চারপাশে চেয়ে দেখলুম। ছেলেরা এখন আমার পেছনে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে বুড়ো দেখছে। সবচেয়ে ছোট্টটি, বছর তিনেক হবে, কচি দু'হাতে কাগজের ফুলটি ধরে আপ্রাণ গন্ধ সোঁকবার চেষ্টা করছে। ওকে দেখে সান্তার চোখে কী গভীর তৃপ্তি! যেন, চোখ ছলছল করছে। আমায় বললে,

—"ছাখো, ছাখো বিদেশী। এই বয়সে ওর বোঝার ক্ষমতা নেই—কে

সত্যি কে মিথ্যে! কি কাগজ, কি প্রকৃতি! সবকিছুতেই সমান সুখ। আহা!"

তারপর নিজের মনেই যেন বললে,

—"দূর ছাই, আমি কেন এইসব বুঝতে পারি!"

অপরিচিত মুখ-আঁকিয়েরা দূর থেকে আমায় দেখছে। আড়ে আড়ে। ওদের মুখের হাসি অথবা সান্তাকে দেখে সেই মজার ভাব যেটুকু হয়েছিল, এখন আর তা নেই। ঈর্ষা কি চোখে ওদের?

আরো দূরে, রেস্তোরাঁর কাছাকাছি যিশু, দেনিস, লিয়ঁ, মঁসিয় কোর্তোয়া সারা মুখে হাসি নিয়ে হাততালি দেবার ভঙ্গি করছে। মাথা ঝাঁকিয়ে বাহবা জানাবার ভঙ্গি করছে। কোনো শব্দ নেই। পৃথিবীর বন্ধুরা শব্দ দিয়ে, চিৎকার করে জানায় না কিছু। শব্দহীন হৃদয়ের হাত বাড়িয়ে সমস্ত শরীর ছুঁয়ে যায়। ওদের চারজনের দিকে আমি বোধহয় দু'তিন সেকেণ্ডের বেশি তাকাই নি। চোখ সরিয়ে আনতে আনতে বুক ভরে গেছে। এইসব মনের অবস্থার কথা যিশুকে, দেনিসকে, লিয়ঁ বা মঁসিয় কোর্তোয়াকে আমি কি ভাবে বলব? নানান্ স্বাদু জিনিস খেয়ে পেট ভরলে ঢেঁকুর তুলে বলতে পারো, পেট ভরে গেছে। মন ভরলে বলা যায় না কিছু বউ! শুধু, চোখ শালা ঝাপ্সা হয়ে আসে।

সান্তা বললে,

—"চেয়ার সরিয়ে আমি মোঁমার্ত্রের মেঝেয় শোবো, শিল্পী! তুমি ঘুমন্ত সান্তার ছবি আঁকতে পারবে?"

বিপদে পড়ে গেলুম!

এখানে এমন প্রশস্ত জায়গা নেই যে, মডেলকে শুইয়ে দেওয়া যায় এবং তারপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার মুখ আঁকা যায়!

তাড়াতাড়ি বলে দিলুম,

—"ঘুমন্ত সান্তার মুখ চাই তো?"

বুড়ো মাথা নেড়ে জানাল,

—"হ্যাঁ।"

সঙ্গে সঙ্গে বললুম,

—"কিছু ঘাবড়াবেন না। টান হয়ে বসে থাকুন আপনি। আমি সান্তার মুখ এঁকে দিচ্ছি আপনাকে দেখে। ছবি শেষ হলে দেখবেন, সান্তা শুয়ে আছে।"

ঢুলন্ত বুড়োর মুখ মিলিয়ে, টুপি, জামার বুক অবধি সাদা দাড়ির তিন পাশে লাল প্যাস্টেল ঘষে ঘষে মোটামুটি বুড়োকে সান্তা বানালুম। বোর্ড-সমেত ছবিটি কাৎ করে দেখিয়ে বললুম,

—"সান্তা ক্লজ! দেখুন, মে' মাসে আপনি কেমন ঘুমিয়ে আছেন!"

বুড়ো ঘাড় কাৎ করে মিনিট খানেক দেখে হাততালি দিয়ে উঠল ছেলে-মানুষের মতো। খুশিতে ডগমগ। রোল করে ছবিটি হাতে তুলে দিলুম। গুণে গুণে একশো ফ্রাঁ আমায় দিয়ে জড়ানো গলায় বললে,

—"ডিসেম্বরে দু'হাতে সব বিলিয়ে যায় সান্তা ক্লজ। বাকি বছর কেউ পোঁছে না আমায়। তাই, মে মাসে সান্তা ক্লজ নিজের ঘুমন্ত মুখ কেনে।"

কেমন ভার ভার গলায়, যেন কান্না চেপে বললে শেষের কথা ক'টি।

অপরাধীর মতো বললুম,

—"আমি কি কিছু অন্যায় করেছি, সান্তা ক্লজ?"

বাঁ হাতের পিঠে শুকনো চোখ রগড়ে হাসল। আমার চিবুক ধরে সামান্য নাড়া দিয়ে বললে,

—"না, খোকাবাবু—ঠিকই করেছো তুমি। সান্তার ঘুমন্ত মুখ তুমি ছাড়া আর কেউ আঁকতে পারতো না। গড্ ব্লেস্!"

বলে, টালমাটাল পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে মেলার চত্বর থেকে বেরিয়ে গেল। চারপাশের হাসি ঠাট্টা, ছেলেদের গান হাততালির মধ্যে আপন মনে হেঁটে চলে গেল বুড়ো। ওর চলে যাওয়া দেখছিলুম, কাঁধের কাছে যিশুর গলা,

—"উনি কে, জানো, দোস্ত্?"

যিশুর দিকে ফিরে বললুম,

—"হ্যাঁ। মে মাসের সান্তা ক্লজ!"

যিশু হাসল।

একটু থেমে বলল আবার,

—"উনি হলেন ম'সিয় জিলব্যার দলান। বয়েস প্রায় সত্তর। মালটি-মিলিয়নেয়ার। দেখলে না, মোঁমার্ত্রের সব মুখ-আঁকিয়েরা কেমন ওঁকে ছেঁকে ধরেছিল। কয়েকটি বিখ্যাত গ্যারেজ এবং দুটো বিরাট ওয়াইন কোম্পানির মালিক। তা ছাড়া, প্যারিসের চারপাশে ছড়িয়ে আছে ওঁর বিশাল জমিজমা, ক্ষেতখামার এবং ডজনখানেক পোলট্রি ফার্ম। ম'সিয় দলানের ঠিক ঠিক ক'টা গাড়ি এবং বাড়ি প্যারিসে আছে, নিজেই হয়তো হিসেব করে বলতে পারবেন না।"

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"তা এরকম পাগলের মতো পোশাক পরে ঘোরেন কেন? এখন কি ক্রীসমাস যে, সান্তা ক্লজ সাজতে হবে?"

হেসে জবাব দিল যিশু,

—"শীত-বৃষ্টির পরে যখন প্রথম রোদ ওঠে প্যারিসে, সারা শহরে সূর্যের আলো পাকাপোক্তভাবে দিনকে দিন করে রাখে, সেই সময় হঠাৎ এক সুন্দর সকালে মঁসিয় দলান সূর্যের নাম করে রোদ ওঠার আগেই আনন্দের চোটে প্রচুর মদ খেয়ে ফেলেন। এবং আপন মেজাজমাফিক পোশাক পরে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। গাড়ি নেই, ড্রাইভার নেই। পায়ে হেঁটে প্যারিসের নানান্ জায়গায় ঘুরে বেড়ান। মোঁমাত্রে, আইফেল টাওয়ারে। স্যেন নদীর বুকে ভাড়াটে নৌকোয় অথবা শাঁজেলিজের চওড়া রাস্তায়।"

পকেট থেকে গোলওয়াজের প্যাকেট বের করল যিশু। দু'জনে দুটি সিগারেট ধরালুম। যিশু বললে,

—"বছর দশ বারো হয়ে গেছে, শুনেছি, এইভাবেই নাকি উনি সূর্য বন্দনা করেন। ফি বছর একবার।"

জিজ্ঞেস করলুম,

—"গেল বছর কি পোশাক পরেছিলেন?"

—"পিরাতের পোশাক।"

বুড়োকে কিছুতেই জলদস্যুর পোশাকে কল্পনা করতে পরাছিলুম না। বললুম,

—"সান্তা ক্লজের মতো নিশ্চয়ই মানায় নি!"

যিশু বললে,

—"তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, ইণ্ডিয়ান। একেবারে মধ্যযুগের জলদস্যু সর্দার যেন মোঁমাত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।"

জিজ্ঞেস করলুম,

—"ওঁর দাড়ি কি আজকে আসল ছিল?"

—"অবশ্যই। উনি কোনো মেক্-আপের ধার ধারেন না।"

একটু থেমে আবার বললে যিশু,

—"গেলবার ওঁর পোর্ত্রে করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। পিরাত মানে জলের দস্যু তো? ভারি সুন্দর কথা বলেছিলেন, মনে আছে, 'বৃষ্টির একঘেয়ে জলকে যে হরণ করে তার নাম সূর্য, তাই, আমি জলদস্যু সেজেছি।' যদিও,

শব্দের অর্থটি একটু ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, তবু, শুনে বেশ মজা পেয়েছিলুম। মোঁমার্ত্রের অনেককেই উনি চেনেন। তবে, এই দিনটি বোধহয় কাউকেই চিনতে পারেন না প্রচুর মদ খেয়ে ফেলার জন্যে অথবা চিনতে চান না আর কাউকে, একমাত্র সূর্য ছাড়া।"

সিগারেটে লম্বা টান দিল যিশু। ধোঁয়া গিলে ফেলে কথা বলতে লাগল আবার। কথার সঙ্গে সঙ্গে হালকা নীল ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে হাঁ-মুখ থেকে, নাক থেকে।

—"তুমি এবারে ওঁর মুখ এঁকে অনেকেরই চক্ষশূল হয়েছো, ইণ্ডিয়ান। তা ছাড়া, আমাদের ছোট্ট হুল্লোড়ে দলটিকে বেশ কিছু মুখ-আঁকিয়েরা মনে মনে ঈর্ষা করে, আমি জানি। একটু সাবধানে থাকতে হবে। কারণ, তুমি একেবারে অবিশ্বাস্য কপাল করে এসেছো, দোস্ত্।"

মঁসিয় দলানকে নিয়ে কৌতূহল শেষ হয় নি আমার। যিশুর কথা ভালো মতো মাথায় ঢুকল না। জিজ্ঞেস করলুম,

—"মঁসিয় দলান তার আগের বছর কি সেজেছিলেন?"

হোহো করে হেসে ফেলল যিশু। হাসতে হাসতে বলল,

—"রেড ইণ্ডিয়ান। খালি গা। মাথায়, কোমরে নানান্ রঙের পালক গুঁজে—সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! প্রায় পাগলের মতো হেসেছিল সারা মোঁমার্ত্র্। আমাদের দেনিস তো হাসতে হাসতে বিষম-টিষম খেয়ে, বমি করে একাকার কাণ্ড! তবু, হাসি থামে না।"

বুড়োর বিশাল চেহারাটি রেড ইণ্ডিয়ানের বেশে কল্পনা করে আমিও হাসলুম। বললুম,

—"সেবারে কে করেছিল ওঁর পোর্ত্রে?"

—"অন্য দলের শিল্পী। গীয়ম্।"

বলে, উল্টোদিকে কাফের দরজার দিকে আঙুল তুলে দেখালে যিশু,

—"ওই যে, সেই নওজোয়ান!"

দেখি, ষণ্ডামার্কা এক আলজেরিয়ান বগলে ড্রয়িং বোর্ড চেপে ধরে বিকৃত মুখে আলুভাজা চিবোচ্ছে।

যিশু বললে,

—"গেল বছর মঁসিয় দলানের পোর্ত্রে করার সুযোগ আমি নিজেই জুটিয়ে-ছিলুম বলে, ও এবং ওর দলের সব আমার ওপরে খাপ্পা। তার ওপরে, এবারেও আবার তুমিই পেলে ওঁকে।"

কি কায়দায় সান্তার সঙ্গে ভাব জমিয়েছি বলতেই খুশির হাসি ছুঁড়ে পিঠ চাপড়াল যিশু,

—"মহা শেয়ানা তুমি, ইণ্ডিয়ান!"

বললুম,

—"মঁসিয় দলানকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হল আমার।"

অনেকখানি শ্বাস ফেলে যিশু বললে,

—"নিঃসঙ্গই বলা যায়! এ রাজ্যে বেশী বয়েসের সব মানুষই প্রায় নিঃসঙ্গ।"

—"উনি কি সেলিব্যাতের্?"

—"ঠিক উল্টো। তিন-তিনটে বিয়ে। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স। দ্বিতীয়া মারা গেছেন। তৃতীয় পক্ষের বয়েস এখন পঞ্চান্ন-ষাট। ছেলেমেয়ে সারা প্যারিসে ছড়িয়ে আছে কুল্লে বোধহয় তেরো কি চোদ্দটি। চোদ্দ নম্বরকে তুমি চেনো।"

আমি চিনি? সান্তা ক্লজের ছেলেমেয়েকে? বলে কি যিশু! হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"যাহ্! কি বলছো? আমি চিনি ওঁর ছেলেকে?"

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে খদ্দের ধরতে চলল যিশু। ওর পথ আটকে কপট রাগের গলায় বললুম,

—"ভালো হবে না কিন্তু, বলে দিচ্ছি! সেই সকাল থেকে আমার পেছনে লেগেছো। সমানে 'হিচকক্' দিয়ে যাচ্ছো। জীনেতের সঙ্গে আজ সন্ধ্যের রঁদেভু নিয়ে কি উদ্ভট রসিকতা করলে বুঝলুম না। এখন আবার—"

আবদারের সুরে প্রশ্ন করলুম,

—"মঁসিয় দলানের কোন্ ছেলের কথা বলছো, আমি চিনি?"

মুচকি হেসে যিশুর জবাব,

—"শুধু চেনো নয়, যথেষ্ট দোস্তি আছে! ছেলে নয়, মেয়ে। মাদাম ঈভলীন দ্যুপোঁ।"...

তার একটু বাদেই জেরি এসেছিল।

আমার সিগারেট শেষ হতেই ঘুরে তাকিয়ে দেখি, লম্বু সাহেব! খদ্দের ঠাউরে ছবি আঁকার কথা জিজ্ঞেস করতে যাবো, জেরি বললে,

—"বঁ জুর মঁসিয়!—"

নীল, ঢিলেঢালা গেঞ্জি গায়ে ভারতবর্ষে দেখা সেই হিপিকে চিনতেই পারি নি।

গলার আওয়াজ এবং চোখে পণ্ডিতমশাই গোছের চশমা দেখে ধরে ফেললুম। দু'হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরলুম জেরিকে। ও আমার চেয়ে এত লম্বা যে, গলা জড়িয়ে ধরার প্রশ্নই ওঠে না। দু' বগলের তলা দিয়ে হাত গলিয়ে আলিঙ্গন।

জেরি হাসছে। বলছে,—

—"চিনতে পারো নি তো!"

দু'জনে ছাড়াছাড়ি হয়ে বললুম—

—"কি করে চিনবো বলো? এমন কেতাদুরস্ত স্যুট-বুট-টাইতে তোমাকে তো দেখি নি আগে! তাছাড়া পাঁচ মাস হয়ে গেছে, শেষ দেখেছি তোমাকে হিপির পোশাকে।"

ঘুরে দাঁড়াল জেরি। ডান হাত বাড়িয়ে বলল.

—"আলাপ করিয়ে দিই। মিস্ করিন্ ফ্রিস্ক্—"

এতক্ষণে খেয়াল করলুম ওর পেছনে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। বেশ দেখতে। প্রায় আমার সমান লম্বা। টুকটুকে আপেল রঙের করিন্ ফ্রিস্ক্। সুইডেনের মেয়ে। চোখের মণির সঙ্গে রং মিলিয়ে হালকা সবুজ বুকখোলা কোট গায়ে। মুখে ভারি মিষ্টি হাসি। বয়েস কুড়ি-পঁচিশের বেশি নয়।

হাত মেলালুম। নতুন শেখা শব্দ উচ্চারণের মতো করিন্ বলল,

—"গুড্ মর্নিং।"

বলেই জিভ কেটে জেরির দিকে তাকাল।

জেরি হেসে ওকে বোধহয় সুইডিশ ভাষায় ভুল শুধরে দিল। লজ্জা পেতে গিয়ে মেয়েটি আমার দিকে ফিরে আবার বললে,

—"সরি! গুড্ আফ্টারনুন।"

বিকেল প্রায় চারটে তখন। জেরি বলল,

—"চলো। তোমাদের ফরাসী মতে একটু 'পোঁত কাফে নোয়া' খাওয়া যাক।"

রসিকতা করেই 'তোমাদের' শব্দটি ব্যবহার করল। আমি লুফে নিয়ে বললুম,

—"খাঁটি ফরাসীদের পকেটে পয়সা থাকলে, এমন সুন্দর রোদের বিকেলে তারা বন্ধুদের ফরাসী শ্যাম্পেন খাওয়ায়। সুতরাং, চলো, শ্যাম্পেন খাওয়াবো তোমাদের।"

জেরি, সেই জেরিই আছে আমার চোখে। তখনো।

ভুরু নাচিয়ে বললে,

—"এখানে রোজগারপাতি ভালোই হচ্ছে, বলছো!"

হেসে জানালুম, হ্যাঁ।

আমার পিঠ চাপড়ে বলল,

—"তাহলে, ঠিক আছে। চলো। তোমার প্যারিসে রোজগারের পয়সায় শ্যাম্পেনই খাওয়া যাক।"

রেস্তোরাঁর দিকে হাঁটতে হাঁটতে ও বলতে লাগলো, লণ্ডন থেকে প্যারিসে এসেছে দুপুরবেলা। এসে, আমার পাঠানো ঠিকানা হাতড়ে মেজোঁন্দ্যল্যান্দ্-এ পৌঁছে খবর পেয়েছে, আমি এখানে।

—"তোমাদের স্বর্গরাজ্যে তো বেশ জমিয়ে নিয়েছো, হে! বলি, আসল ছবিটবি কিছু আঁকছো?"

টেবিলে বসে শ্যাম্পেনের অর্ডার দিয়ে বললুম,

—"আটটা ছবি শেষ করেছি। তবে, গ্যালারী এখনো পাই নি।"

গেলাস হাতে তুলে জেরি বললে,

—"চিয়ার্স! পেয়ে যাবে। গ্যালারী তুমি পেয়ে যাবে। আমি জানি, আমার ঘোড়া কখনো 'ফেল' করে না। সারা প্যারিসে তুমি হইচই বাধিয়ে দেবে, বলে রাখলুম।"

মেয়েটি বললে, ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে,

—"জেরি বলেছে, আপনি অসাধারণ শিল্পী। আপনার শিল্পী জীবনের জন্যে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। চিয়ার্স।"

উৎসাহের চোটে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলুম,

—"চলুন। আপনাদের আমার নতুন ছবি দেখাই। আমার দেশের ক্ষুধা, দারিদ্র্যের ছবি। আমি যেভাবে দেখি, তাই এঁকেছি। চলুন, নিয়ে যাবো।"

জেরির দিকে ফিরে বললুম,

—"আজ আর এখানে কাজ নেই। অনেক রোজগার হয়েছে একদিনের পক্ষে। বেশি পয়সায় আমার আবার বদহজম হয়। তার ওপরে, এখানকার অনেক শিল্পীরই নাকি চোখ টাটাচ্ছে—"

জেরি বাধা দিল। বলল,

—"একটি কাজ বাকি আছে, শিল্পী।"

জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি ?"

জবাবে ও করিনের গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। ঘুরে বললে আমায়,

—"করিন দারুণ মেয়ে। আশ্চর্য প্রাণ আছে ওর মধ্যে। দেখছো না কি 'লাইভ্‌লি' !"

বলে, আবার আদর করল মেয়েটিকে।

আমি ভাবছিলুম, ঠিক এই ধরনের কথাই যেন কোথায় শুনেছি ? কোথায় শুনেছি ? কে বলেছিল ?

করিন যেন বা লজ্জায় মাথা অল্প নিচু করল। এক ফালি হাসি ছুঁড়ে দিল আমায়।

জেরি বললে, ঘোষণা করবার মতো,

—"আগামী কুড়ি তারিখে করিনের সঙ্গে আমার বিয়ে, শিল্পী।"

মনে পড়েছে বউ ! মনে পড়েছে, কোথায় শুনেছিলুম প্রায় একই সুরে কথাগুলি। জেরিই বলেছিল। ওর প্রাণের মেয়ে প্যাটের বর্ণনা দিতে গিয়ে—। ভেতরে ভেতরে কেমন কুঁকড়ে গেলুম যেন।

গাল টেনে হেসে, মাথা ঝুঁকিয়ে বললুম,

—"কনগ্র্যাচুলেশন্‌স !"

মেয়েটি মিষ্টি করে হাসল। বলল,

—"থ্যাংক্‌ ইউ, ইণ্ডিয়ান !"

জেরি বললে,

—"সন্ধ্যে সাতটার প্লেনে আমাদের স্টকহোমে ফিরে যেতে হবে, ভাই।"

আমি অবাক,

"সে কী ! আমার ছবিগুলো দেখবে না ?"

—"এ যাত্রা হবে না ! তুমি আমাদের বিয়েতে এসো। হানিমুন করতে প্যারিসেই আসবো, ভাবছি। তখন দেখবো।"

তারপর জেরি যা বলল, আমি শুনতে পেলুম, 'আমার চার বছরের কন্যা প্যাট্রিসিয়া ও'টুল গত কয়েক মাস যাবৎ হারাইয়া গিয়াছে। গায়ের রং ফরসা। উচ্চতা তিন ফুট দুই ইঞ্চি। যে কোনো বাগানের পটভূমিকায় ওর সোনালী চুল এলোমেলো উড়িতে থাকে। ফোটো তুলিতে গেলে ফ্ল্যাশ বাল্‌বের আলোয় ভয় পাইয়া কাঁদিয়া ফেলে। যে কেহ সন্ধান পাইয়া নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করিলে পুরস্কৃত করিব। মেয়েটির পরনে—'
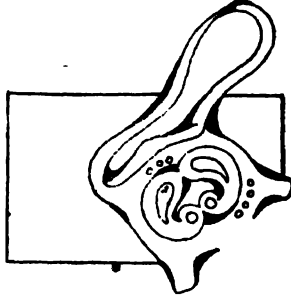
জেরি বললে,

—"তোমার তো খুব বেশি সময় লাগবে না, করিনের একটা 'লাইভ্‌লি' পোর্ট্রে্ট এঁকে দাও, শিল্পী!"

হিসেব করলে এবং ঠিকঠাক মিললে হয়তো দেখা যাবে, তুমি যেহেতু 'ক'য়ের কাছ থেকে যা' আশা করেছিলে, তা পাও নি বা পাচ্ছো না, তাই 'খ' পেয়ে ভাবলে 'খ' মানেই সুখ। 'ক'য়ের মতোই তুমি 'খ'কেও বিশ্বাস করলে, বউ। পৃথিবীর একটি মুখের নাম যদি তীর্থংকর হয়, তো, সেই মুখই তোমাকে তৃপ্তি আনন্দ এবং সবচেয়ে অসম্ভব শব্দ 'সুখ' দু'হাতের মুঠোয় তুলে ধরবে তোমার জন্যে, এই আশায় তুমি ভাবলে এমন মুখের ছবি তুলে রাখা দরকার। 'এইখানে-দিবারাত্র-ফোটো-তোলা হয়'তে গিয়ে তোমরা দু'জনে মিলে হয়তো ছবি তুলিয়ে রেখেছো নিজেদের। তোমার সুখের আশার ছবি। তারপর, এখন, ফোটোর দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তেমনি বিশ্বাস, তেমনি আশা করেই তুমি বলবে,

—"তোমার একটা ছবি আমার চাই।"

আমি লজ্জা পেয়ে যাবো এবং দু'জনে মিলে খুব বোকা-বোকা একটা ছবি' তুলিয়ে নেব। এ রাজ্যে আসবার আগে সেই 'অশোক স্টুডিও'তে এই ব্যাপারটাই হয়েছিল, মনে আছে।

মারিয়ার সঙ্গে ডিভোর্স না হয়ে গিয়ে থাকলে, আজ, এখন জেরি মারিয়ারই একটি পোর্ট্রে্ট্‌ করতে বলতো আমাকে। মারিয়া নেই, তাই প্যাট্। 'প্যাটের একটা প্রাণবন্ত ছবি তুমি এঁকে দেবে? যে ছবি দেখে, আমার যদি কোনো কষ্ট থাকে, ভুলে যেতে পারি যেন—!'

মারিয়া নয়, প্যাট্ নয়, তীর্থংকর নয়, আমি নই। সুখ। আপন আপন সুখের ছবি খুঁজে মরি প্রত্যেকে আলাদা আলাদা।

ভালোমানুষের গলায় জিজ্ঞেস করলুম,

—"প্যাট্ কেমন আছে?"

—"কে? ও, প্যাট্! আমার মেয়ের কথা বলছো?"

পাকা ব্যবসায়ীদের মুখের রেখার ধাতই অন্য। মনের কষ্ট, ক্ষতি, লাখ টাকা লোকসানের খবরেও নড়েচড়ে না। যেমন-কে-তেমন। ওইসব মুখে অপ্রস্তুত ভাব ফোটাবার জন্যে যেন রেখাদের সৃষ্টিই হয় নি। নির্বিকার মুখে অল্প হেসে কথা শেষ করল জেরি,

—"ভালোই আছে। তবে, এই বয়েসে একটু সমবয়সী সঙ্গী-সাথীর দরকার তো,—। ভাবছি, ওকে একটা ভালো বোর্ডিং হাউসে পাঠাব।—"

বলে, করিনকে সাক্ষী রাখার মতো বললে আবার,—"সমবয়সী বাচ্চাদের সঙ্গে হইচইয়ের মধ্যে লেখাপড়াটাও শিখতে থাকবে।"

আমি টের পেয়ে গেছি, প্যাটের সেই মুখের আর তেমন দরকার নেই জেরির। তুমি এঁকে দিলে নিশ্চয়ই নেব! তবে, যে আগ্রহে, যে আদরে, যত্নে তাকে রাখতুম,—আজ বোধহয় আর ততটা পারবো না। ভাতে বা রুটিতে আমার খিদে মেটে বলেই যে, ডাল দিলে নেবো না, তা তো হতে পারে না জীব-জগতে। ডাল পেলে নিশ্চয়ই চাই। নাহলেও, সুখের জন্যে যে পেট নিরন্তর খালি, সেখানে এখন ভাতটুকু আমার চাই-ই চাই। ভাতের নাম করিন ফ্রিস্ক্!

—"প্যাটের পোর্ট্রেটের কথা বলেছিলে ভারতবর্ষে থাকতে। চাই না?"

সাধাসিধে প্রশ্নটির জবাবে, জেরি বেচারী একটুও বিচলিত হল না। ঘুঘু সেলস্‌ম্যানের মতো আগ্রহে বলল,—"হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চাই! বাহ্, চাই না মানে? তবে, ইয়ে, কি বলে গিয়ে, আমার করিনের ছবিটা চট্‌পট করে দাও আজকে। প্লেন ধরতে হবে তো? সাতটায় ফ্লাইট্। প্যাটের পোর্ট্রেট একটা ধীরে-সুস্থে বানিয়ে রেখো, সময়-সুযোগ মতো এসে নিয়ে যাবো—।"

জেরি সেই শ্রদ্ধার আসন থেকে ধপ্ করে পড়ে গিয়ে, গা-হাত-পায়ের ধুলো ঝেড়ে আমার সামনাসামনি এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে, বক্‌বক্ করে প্রায় এক নিশ্বাসে অনেকগুলো অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে লাগল, যেন, পাছে ওর গায়ে-লাগা ধুলো আমার চোখে পড়ে যায়।

বললুম,

—"করিনের ছবি কি রকম চাই? সাদাকালো না রঙিন?"

শ্যাম্পেনে শেষ চুমুক এবং ফিঁয়াসের ঠোঁটে ভালোবাসার চুমু খেয়ে খুব সুখী পুরুষের গলায় জেরি জানাল,

—"অবশ্যই রঙিন!"

যদিও, এই মিষ্টি মেয়ে, যার মুখের নাম করিন সে তো কোনো দোষ করে-নি! জেরির সঙ্গে ওর প্রেম ইত্যাদি হয়েছে। দু'জনের দু'জনকে নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। দু'জনেই স্বাভাবিক নিয়মমাফিক মনে করছে, একে অন্যের কাছ থেকে যা-চাই-তাই পেয়ে যাবে। অ্যাড্জাস্ট্মেন্টের দেওয়ালের মধ্যে আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিংয়ের আশা। এই দুটি মন্থন করে উঠে আসবে সুখ। জেরিকেও ঠিক একই কারণে, কোর্ট-কাছারি দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না। কিন্তু প্যাট্! প্যাট্ কি দোষ করেছে? প্যাটের পাপা, পাপাই থাকবে। কিন্তু সে পাপা কি থাকবে? মারিয়াহীন সেই 'প্যাট্-বলতে-পাগল' পাপা কি আর থাকবে, না আছে! পাল্টে গেছে জেরি। ওর ভাবী বধূ করিনের প্রতি, কোনো রাগ বা বিদ্বেষ কিছুই নয়, তবু করিনের ছবি আমার আঁকতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু, কি করে বলবো জেরিকে? অমি যে ওর কাছে ঋণী। এই মুহূর্তে, এখানে আমার অস্তিত্বের জন্য ঋণী।

বললুম,

—"তেল রঙে চাই, না প্যাস্টেলে?"

যেহেতু কেউ কারুর ভাবনার কথা, মনের কথা জানে না, তাই, জেরিও টের পেল না আমি কি অনিচ্ছায় ওর বাগদত্তার পোর্ট্রেট্ করতে বাধ্য হচ্ছি। ঋণ না থাকলে ওকে হয়তো সোজাসুজি বলে দিতে পারতুম, মাপ করো ভাই, করিনের ছবি আমার আঁকতে ইচ্ছে নেই। আগে প্যাটের ছবি, তারপর করিন।

ও বললে,

—"তেল রঙের করতে পারলেই ভালো জমত। কিন্তু, তুমি তো এই এক-দেড় ঘণ্টা সময়ে তা পারবে না! চলো, প্যাস্টেলেই হয়ে যাক্!"

পা টেনে টেনে আমার প্যাকিং বাক্সটির কাছে ফিরে এলুম। চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললুম করিনকে।

মেয়েটি তেমনি মিষ্টি হেসে বলল,

"—থ্যাংক্ য়্।"

বলে, বসে পড়ল।

মনে মনে বললুম, তুই আমার ওপর রাগ করিস না। তোর ছবি আমার আঁকতে ইচ্ছে করছে না মোটেই। জোর করে আঁকতে হবে তো, মেলাতে পারবো কিনা জানি না। আমায় ক্ষমা-ঘেন্না করে দিস্, ভাই। আমার আঁকা মুখ মিলল কিনা, তাই নিয়ে ভাবিস না। ছাখ্, জেরি বেচারাকে সুখী করতে পারিস কিনা, আজীবন। তোর জন্যে সাধের প্যাটকে খুইয়েছে। তোর মুখের দিকে মুখ তুলেছে, সূর্যের দিকে সূর্যমুখীর মতো। সুখের আশায় তুইও ওর দিকে মুখ তুলেছিস। তোকে আমি চিনি না। মনেপ্রাণে চাইছি, দু'জনে সুখী হও। কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছি না প্যাট্কে। ওর গলার স্বর আমি শুনি নি কখনো। তবু, যেন, বাগানের ব্যাক্গ্রাউণ্ডে সোনালী চুল হাওয়ায় উড়ছে। কোনো কচি কণ্ঠস্বর বলছে, আমার মুখ আঁকবে না, শিল্পী! আমার পোর্ট্রেট্ তো তোমার আগে আঁকার কথা।

কোলে বোর্ড রাখতে রাখতে এইসব ভাবছিলুম। কিছুই না জেনে, না শুনে আমার নিজের সঙ্গে লড়াইয়ের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দিলে যিশু। যিশু আর ঈভলীন। কোত্থেকে প্রায় দৌড়ে এসে দাঁড়ালো দু'জনে।

ঈভলীন হাত ধরে টেনে তুললো। বলল,

—"একটু দরকার ছিল, ইণ্ডিয়ান।"

ততক্ষণে যিশু আমার ড্রয়িং বোর্ড ছিনিয়ে নিয়েছে।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল জেরি। অবাক গলায় বললে,

—"এরা কারা? কি ব্যাপার?"

ওদের দু'জনকে আলাপ করাতে যাবো, ঈভলীন প্রায় গায়ের জোরে টানলো আমায়। বেশ দ্রুত গলায় বললে,

—"শিগগীর চলো আমার সঙ্গে—"

মনের মধ্যে লড়াইয়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যে আনন্দ হল, তাতে এই প্রথম, আজকে এখন ঈভলীনকে খুব কাছে টেনে এনে গভীরভাবে চুমু খেতে ইচ্ছে করল।

জেরিকে বললুম,

—"কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। শুনে আসছি এক্ষুনি।"

ঈভলীন হাত ধরে টানছেই। ঘুরে ওকে জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি হয়েছে ? এমন টানাটানি করছো কেন ?"

ঈভলীনের চোখেমুখে ভয়, উৎকণ্ঠা। ব্যস্তভাবে জেরিকে বলে দিল,

—"মাপ্ করুন। একে আমার ভীষণ দরকার। এক্ষুনি। বিপদে পড়েছি একটু।"

যিশু আমার বোর্ড্ বাগিয়ে ধরে, আমারই প্যাকিং বাক্সের ওপরে বসে পড়েছে। দ্রুত গলায় আমায় বলল,

—"যাও হে। খুব দরকার। ঘুরে এসো।"

মুখ ফিরিয়ে মৃদু হেসে জেরিকে নিজের নাম জানালে,

—"আমি পিয়ের ভ্যালমি।"

ঈভলীন হাত ধরে সমানে টানছে! 'না' বলতে পারছি না। ওর সঙ্গে দু 'পা' এগিয়ে মুখ ঘোরালুম। জেরিকে বললুম,

—"এক্ষুনি আসছি। এরা আমার ভীষণ বন্ধু।—"

জেরি খুব গম্ভীর মুখে বলল,

—"করিনের পোর্ট্রেট করে দিয়ে বন্ধুত্বের আড্ডায় গেলে ভালো হত না!"

আরো এক পা টেনে নিয়েছে ঈভলীন।

জেরিকে দেখিয়ে যিশুকে বললুম,

—"জেরি। ও আমার বন্ধু না হলে আমি প্যারিসে আসতেই পারতুম না।"

ঘুরে করিনকে বললুম,

—"একস্‌কিউজ মি! আসছি এক্ষুনি।—"

করিনের হাসিমুখ নেই। কেমন অপমান আর রাগ কোলে করে বসে আছে যেন। পরে, যিশুর মুখে শুনেছিলুম, ও খুব ভুরু কুঁচকে যিশুকে জিজ্ঞেস করেছিল,

—"এই অসভ্য মেয়েটি কে?"

কিছুই বুঝতে পারে নি, এমনিভাবে যিশু বলেছিল,

—"কার কথা বলছেন, ম্যাডাম!"

করিনের নাক সিঁটকানো জবাব,

—"ওই যে মহিলা ইণ্ডিয়ানকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল!"

কি বলবে যিশু! ওর কিছু বলবার নেই। কারণ, ঈভলীন আমাকে কি-ভাবে সাহায্য করেছে, করছে, ও জানে কিছুটা। জেরির দিকে তাকিয়ে বলল,

—"ইণ্ডিয়ান আপনার খু-উ-ব বন্ধু ?"

ক্ষুব্ধ গলায় জেরির জবাব,

—"ইণ্ডিয়ানরা যে অ-সভ্য, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

যিশু গোলওয়াজের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে জেরিকে বললো,

—"খাবেন ?"

জেরির মুখ গম্ভীর। রাগ-রাগ গলায় বললো,

—"আমি সিগারেট খাই না। ধন্যবাদ।"

করিন সুন্দরী উঠে দাঁড়িয়েছে।

যিশু তাড়াতাড়ি বলল,

—"ও কি, উঠছেন কেন? বসুন! ইণ্ডিয়ানের হয়ে আমি আপনার পোর্ট্রেট করে দিচ্ছি। খদ্দের হিসেবে নয়। ইণ্ডিয়ানের বন্ধু হিসেবে। বসুন। কি রকম মুখ চাই, রঙিন না সাদাকালো ?"

জেরি করিনের হাত ধরে মুখ ফিরিয়ে যিশুকে বলল,

—"ধন্যবাদ। আমরা ফোটোগ্রাফারের কাছে যাব এবং রঙিন ছবি তুলিয়ে নিতে পারবো। চলো করিন।"

দু' পা হেঁটে আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে। থুতু ছেটাবার ধরনে বলেছে,

—"আপনার ইণ্ডিয়ান দোস্তকে বলে দেবেন, কৃতজ্ঞতা বলে একটা সাধারণ ব্যাপার সভ্য জগতে চালু আছে, যেটা জংলীরা জানে না।"

খানিক দূর অবধি পায়ে পায়ে ওদের সঙ্গে হেঁটে গেছে যিশু। বোঝাবার চেষ্টা করেছে, যে, ভীষণ দরকারেই ইণ্ডিয়ানকে ঈভলীন টেনে নিয়ে গেছে। একটু অপেক্ষা করে গেলেই সব কার্যকারণ জানতে পারবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কোনো কথাই কানে তোলে নি জেরি। নতুন প্রেমে হাবুডুবুখোর জেরি প্রেমিকার হাত ধরে গট্‌গট্ করে চলে গেছে মোঁমাত্র্ থেকে। প্যারিস থেকে। যেতে যেতে অনেক দূর। আমার স্মৃতি-বিস্মৃতির সীমানায় ঝাপসা হয়ে গেছে জেরির মুখ। ক্ষমা চেয়ে, অবস্থার কথা জানিয়ে কয়েকটি চিঠি দিয়েছিলুম। রাগে, অভিমানেই বোধহয় জবাব দেয় নি। শোধ করতে পারি নি ঋণ। ওর কাছে আজীবন ঋণী থাকলেও আমি দুঃখিত নই। কারণ সাধারণ সুখ-সন্ধানী মানুষের মধ্যে জেরিও একজন। পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে জন্ম দেওয়ার জন্যে প্যাট্ নিশ্চয়ই ওর কাছে ঋণী থাকবে সারাজীবন। ও যদি ছোট্ট এবং সারা পৃথিবীতে ভীষণ একলা একটি রক্তের শিশুকে তার একান্ত প্রয়োজনীয়

আসন থেকে সরিয়ে আপন সুখের আশায় অন্য কাউকে সেখানে বসাতে পারে, তবে জেরিকে শ্রদ্ধার আসন থেকে নামিয়ে এনে ভুলে যেতে আমি একটুও লজ্জা পাবো না। মন বড় ছোটো আমার, বউ! ক্ষমা-ঘেন্না করতে শিখি নি বলে মাঝে মধ্যে নিজের ওপরেই ঘেন্না ধরে যায়। কিন্তু কি করে অস্বীকার করবো যে, আমিও সাধারণ মানুষের পালের মধ্যে একজন। আমিও সুখ খুঁজছি। তফাত বোধ হয় এইটুকুই যে, আমি তোমাদের মতো বলতে পারি না, 'বেশ সুখে আছি, ভাই।' আমি জানি, আমি সুখে নেই। কেন, তা জানি না। আসলে সুখ কাকে বলে তাই-জানি না। সেইজন্যেই পরশপাথরের মতো সুখ আমিও খুঁজে মরি। এবং সে কথা বলতে আমার লজ্জা নেই।

যথেষ্ট অনিচ্ছায় হলেও করিনের ছবি আঁকতে বসে অমন করে উঠে আসতে খারাপ লাগছিল। তবু ঈভলীন বা যিশুকে তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না। কয়েক মুহূর্তের জন্যে দোটানায় পড়েছিলুম। যে আমাকে প্যারিসে আসার বাতাস-টিকিট উপহার দিয়েছে, তাকে বেশি গ্রাহ্য করবো, না, যারা আমাকে এখানে শ্বাস টেনে টিঁকে থাকতে সাহায্য করেছে, করছে, তাদের কথা শুনবো? ঠিক তখনই, ঈভলীন বললে, "একটু বিপদে পড়েছি।" ঈভলীন বিপদে পড়ে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে। তার মানে, ওর এখন আমার সাহায্যের দরকার। এক ধাক্কায় ঈভলীনের হাত ছাড়ানো যেতো কি, বউ! ঈভলীনের? জেরি তো তেমন কোনো বিপদে পড়ে নি। প্যাট্‌কে ভুলে আপন ফিঁয়াসের ছবি আঁকাতে এসেছে। বিপদের কোনো ব্যাপারই নেই।

আমাকে টানতে টানতে শিল্পীদের চত্বরের বাইরে নিয়ে এল ঈভলীন। পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে হাঁটছিলুম। জেরি কি যেন বলছে যিশুকে। রেগে গেছে, মনে হচ্ছে। করিন উঠে দাঁড়াল।

ঈভলীনকে বললুম,

—"কি ব্যাপার? কি এমন বিপদে পড়েছো?"

আগের মতোই ব্যস্তভাবে বলল,

—"বলছি।"

যিশুও উঠে দাঁড়াল। হাত-পা নেড়ে, যেন কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে ওদের।

বললুম,

—"এক মিনিট, ঈভলীন। আমি ওদের একটু বুঝিয়ে আসি। ওরা চটে গেছে বোধহয়।"

বলতে বলতে দেখি, করিনের হাত ধরে হাঁটতে শুরু করেছে জেরি।

চট্ করে ঈভলীনের হাত ছাড়িয়ে বললুম,

—"চলে যাচ্ছে ওরা। এক্ষুনি আসছি—"

বলে, দৌড়োতে যাবো, ঈভলীন শক্ত করে আমার ডান হাতের কব্জি চেপে ধরল। পরিষ্কার গলায় জানিয়ে দিল,

—"ওরা আবার আসবে। কিন্তু তুমি যদি এখন আমার কথা না শোনো, তবে তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

পারিপার্শ্ব মাথায় থাকা সত্ত্বেও লোভ সামলাতে পারলুম না।

দুষ্টুমির গলায় জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি সম্পর্ক আছে, এখন?"

হাসলো ঈভলীন। বলল,

—"সুখের সম্পর্ক।"

—"তার মানে?"

—"বলছি। এসো—"

রেস্তোরাঁর মধ্যে টেনে আনল আমাকে।

টেবিলে বসতে বসতে জেরিকে আর খুঁজে পেলুম না। হারিয়ে গেল জেরি। যিশুকেও দেখতে পাচ্ছি না আর। ঈভলীনের না হয় আমাকে দরকার পড়েছে। কিন্তু যিশু আমার বোর্ড ছিনিয়ে নিল কেন? পুরো ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে, কোনো প্রশ্নের জবাবই ঠিকঠাক মাথায় এল না।

হঠাৎ কি বিপদে পড়ল ঈভলীন? আমা হেন হরিদাস কোন্ উপকারে আসবে ওর?

এ সব কৌতূহল একটু পাশে সরিয়ে রাখলাম। কারণ ও নিজেই বলবে এখন। তাই আবার জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি সম্পর্ক, বললে না?"

ওকে কি সামান্য উত্তেজিত দেখাচ্ছে? নাকি চোখের ভুল! কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে ও অমন বারবার বাইরে তাকাচ্ছে কেন?

আমার প্রশ্নটি শুনে গাঢ় চোখ মেলে আমার দিকে তাকালে তুমি। যেন বললে, শুনতে পেলুম,

—"জানো না! আমি তো তোমার স্ত্রী। তোমার বউ। মন, আত্মা এবং শরীরের গুহ্যতম, গভীরতম প্রদেশে আমাদের সম্পর্ক লেখা হয়ে আছে।
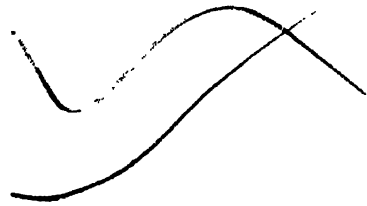
মা-বাবা, ছেলেমেয়ে, ভাই-বোন-বন্ধুর সঙ্গে যে সম্পর্ক হতে পারে না, সেই সম্পর্ক তোমার-আমার। আমার অতীত হয়তো তোমার চোখে আমাকে ছোটো করে রেখেছে। আমি তা জানি। তুমি যতোই বলতে, যতোই বলো, যে, আমার ফেলে আসা সময় তোমাকে বিরক্ত করে না, অসুখী করে না—আমি জানি, তুমি এ সব কথা জোর করে নিজের ওপর আরোপ করতে চাও। তোমার গায়ের চাদরের খুঁটের সঙ্গে যখন আমার আঁচল বাঁধা হচ্ছিল, তখন ভাবছিলুম, 'ফেলে-আসার' মতো আমার কিছু না থাকলেই ভালো ছিল। আমার অভিজ্ঞতা কষ্ট দিচ্ছে তোমাকে। তোমরা পুরুষ। তোমাদের অভিজ্ঞতার দাম আলাদা। আমি বা আমরা যে পরিবেশে জন্মেছি, বড় হয়েছি, সেই সামাজিক পরিবেশের ইতিহাস এই বিংশ শতাব্দী ফুরিয়ে এলেও পাল্টায় নি। তাই, আমি বা আমরা মায়ের পেট থেকে পড়েই অমোঘ নিয়মের মতো বিশ্বাস করতে শিখে গেছি,—বাবা ছাড়া আমাদের মায়ের আর কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কতো নারীসঙ্গের অভিজ্ঞতা তোমার আছে, তোমার মুখ থেকে সে গল্প শোনবার জন্যে আমার শ্রুতি বা মন মোটেই উৎসুক ছিল না। আমাদের পূর্ব পুরুষরা যা বলে গেছেন, সেই কথাগুলিই আমার কানে বাজছিল। নারীরা পুরুষের অলংকার। একটি পুরুষ, নারীর জীবন। নারীর অহংকার। সেই তীর্থকেও আমি একটি এবং একমাত্র পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করেছিলুম। ও আমার মধ্যে তেমনি বিশ্বাসই প্রবেশ করিয়েছিল। যে অপমান আমি ভুলতে পারি না, পারবো না। তাই তোমার জন্যে কষ্ট হয়। পায়ে পায়ে সাতপাক তোমার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে পুরুতঠাকুরের মন্ত্র শুনছিলাম। ঠোঁট মিলিয়ে উচ্চারণ করছিলে তুমি। অর্থ কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। শুধু নিজেকে বড় অপবিত্র মনে হচ্ছিল। রান্না করে পাতে দেবার আগে যেমন মাছের আঁশ, পিত্ত জাতীয় আবর্জনা শরীর কেটে টেনে টেনে ফেলে দেওয়া হয়, তেমনি, তখন আমি মনে-প্রাণে আমার সমস্ত অপ্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা টেনে টেনে ছিঁড়ে সেই যজ্ঞের আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছিলুম। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। তাই, যেন বাপের বাড়ি ছেড়ে আসতে হবে, এই দুঃখে চোখে আঁচল চেপে কাঁদছিলুম। সেখানে বাবা-মা, দাদা বা তীর্থ কারুর কথা ভেবেই কষ্ট পাচ্ছিলুম না। আমার অভিজ্ঞতার ওপর রাগে, ক্ষোভে ঘুরে ঘুরে কাঁদছিলুম। তোমার কথা অনুযায়ী, সব সাধারণ মানুষ-মানুষীর মতোই আমিও সুখ চাই। আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত সুখ তোমার মুখের মধ্যেই নিহিত আছে।

আমার আপন মনের চোখে তোমাকে যেন সুখী দেখতে পাই—তাতেই আমার সুখ—"

কে বললে কথাগুলি। আমি ভাবলুম, না তুমি বললে বউ? নাকি, আমি ভাবলুম, তুমি বললে! না। তুমি নও, এ তো ঈভলীন। কারণ, ঈভলীন হাসছে।

হঠাৎ হঠাৎ মাম্‌দোবাজির মতো গুলিয়ে ফেললেও ও যখন হাসে, একেবারে ঘুম থেকে জেগে উঠি। টের পাই, এ তো আর কেউ হতেই পারে না—শুধু ঈভলীন।

হেসে বললো,

—"অমন করে গিলে খাচ্ছো কেন?"

আমি অবাক,

—"গিলে খাচ্ছি!"

আবার হাসল,

—"হ্যাঁ। চোখ দিয়ে।"

লাজুক হেসে সামলে নিলুম। কমসেকম মিনিটখানেক ওর নীল চোখের মধ্যে ডুবেছিলুম। বললুম,

—"সম্পর্ক খুঁজছিলুম!"

এবারে শব্দ করে হেসে ফেলল ও। বললো,

—"পেয়ে তো গেছোই।"

চমকে উঠলুম মনে মনে।

—"কি?"

—"এতক্ষণ ঠিক যা ভাবছিলে, তাই।"

বলে কি ও? থট্ রিডিং-ফিডিং না কি সব আছে, তাই জানে নাকি ঈভলীন!

বললুম,

—"কি ভাবছিলুম বল তো?"

সঙ্গে সঙ্গে ওর জবাব,

—"আমাদের সুখের সম্পর্কের কথা!"

বলেই, দরজার বাইরে এক পলক দেখে নিল।

মন ঝাড়া দিয়ে টান হয়ে বসলুম। দূর! আমার মনের কথা কেউ জানে না। ঈভলীনই বা জানবে কোত্থেকে। সবাই যদি আমরা পরস্পরের মনের কথা জানতে পারতুম ঠিকঠাক, তাহলে তো প্রলয় হয়ে যেতো। অথবা সেই আশ্চর্য অসম্ভব শব্দ 'সুখপাখি'র সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যেতো। হ্যাহ্।

বললুম,

—"কি বিপদের কথা বলছিলে, তাড়াতাড়ি বলে ফেলো, অনেকক্ষণ হিচকক্ দিয়েছ।"

ওয়েটারকে তুটো লাল ওয়াইনের অর্ডার দিয়ে টেবিলে রাখা আমার হাত স্পর্শ করল। চোখের ইশারায় আমাকে বাইরে তাকাতে বলল,

—"ওই গ্যাখো—!"

কি দেখাতে চাইছে ও, কিছু বুঝলুম না। মোঁমার্ত্রের মেলার প্রায় আধখানা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। নতুন কিছু বা অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না। বিকেলের রোদ পড়ে সারা চত্বর খুশিতে, রঙে ঝলমল।

বললুম,

—"কি দেখব ?"

শ্বাস ফেলার শব্দে কথা বলল ঈভলীন,

—"তুমি যেখানে বসে ছবি আঁকো, সেই প্যাকিং বাক্সের কাছে—"

চেয়ে দেখি, তিন-চারটে ফরাসী খদ্দের দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। বললুম,

—"শাঁসালো খদ্দের মনে হচ্ছে, ঈভলীন। একটাকে গিয়ে পাকড়াই, চলো !"

ঈভলীন আমার হাত চেপে ধরে কানে কানে বলল,

—"সেইজন্যেই তোমাকে ধরে নিয়ে এলুম। ওদের খদ্দের ঠাউরে তুমি নিজে ধরা পড়ে যেতে। ওরা পুলিসের লোক !"
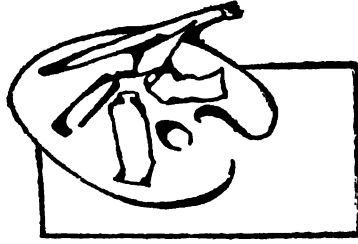
ঈভলীন আর একবার আমাকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল। ঈভলীন আর যিশু।

গীর্জার পাশ থেকে উঠে আসছিল ঈভলীন। কয়েক গজ আগে আগে হাঁটছিল তিনজন লোক। সাদামাটা পোশাক। একটু দ্রুত পায়েই দৌড়োচ্ছিল যেন। বাঁ পাশের মানুষটিকে পেছন থেকে কেমন চেনা-চেনা লাগল মনে একটা খট্‌কা নিয়ে ঈভলীনও পা চালিয়ে দিল জোরে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ধরে ফেলল ওদের। ফুটপাথ নেই। রাস্তার ডানদিক ঘেঁষে চলেছে ওরা। পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ঈভলীন। সঙ্গে সঙ্গে যা ভেবেছিল, তাই। পুলিস অফিসার মঁসিয় শাজাল। বাড়িতে দু'একবার দেখেছে ঈভলীন। কত্তার ছোটবেলার বন্ধু নাকি! খুব সিরিয়াস কর্তব্যপরায়ণ ধুরন্ধর ব্যক্তি। সঙ্গের দু'টি লোক যে কনস্টেবল তাতে আর সন্দেহ নেই। মঁসিয় শাজালের দিকে ওদের সমীহভরা চাউনি এক পলক দেখলেই বোঝা যায়।

তিনজনকে চোখের কোলে দেখে নিয়ে ঈভলীনের মনে হল, শাজাল কি এখন ওকে চিনতে চাইছে না? মথা নিচু করে গম্ভীর মুখে হাঁটছে। ডিউটিতে আছে। পুলিসি ভাষায় হয়তো কোনো 'গোপন অভিসারে'।

ছ্যাঁৎ করে মনে পড়ল, ইণ্ডিয়ানের তো কাজের পারমিট নেই। পয়সা রোজগারের জন্যে কাজ করতে করতে ধরা পড়লে অবধারিত হাজতবাস। ও তো এখন পুরোদমে, বলতে গেলে প্রায় দু'হাতে, মুখ এঁকে চলেছে মোঁমার্ত্রে। পরের মুহূর্তেই আবার ভাবল ঈভলীন, দূর্‌! মোঁমার্ত্রের খবর আর কজন পুলিস রাখে। শ'য়ে শ'য়ে শিল্পী। অত খদ্দের! মরসুমের এই ভিড়ের মধ্যে কে আর এক পেতি ইণ্ডিয়ানের খোঁজ করতে যাচ্ছে! তবু, বলা যায় না। সাবধানের মার নেই। গত ক'দিন যে রেটে মুখ এঁকেছে ইণ্ডিয়ান, রোজগার করেছে, তাতে

পিয়েরের দলের ওপর যদি কারো হিংসে হয়? ইণ্ডিয়ানের পারমিট না থাকার খবরও হয়তো অজানা নেই। যদি কেউ ছোট্ট একটি বেনামী টেলিফোনে পুলিসকে খবর দিয়ে থাকে?

মুখ ফিরিয়ে হেসে, প্রায় গায়ে পড়ে ঈভলীন কথা বলল,

—"মঁসিয় শাজাল না। বঁজুর।"

মাথা আর না তুলে উপায় কি। ভদ্রতা বলে কথা! শাজাল মুখ তুলে বাঁ গালে তিন সেন্টিমিটার হেসে বললে,

—"বঁ জুর, মাদাম। সাওয়া!"

—"সাওয়া মঁসিয়! মেরসি! এ তল্লাটে হঠাৎ? কি ব্যাপার? ছবি কিনবেন নাকি! কোনো বন্ধু-টন্ধুর বিয়ে বুঝি?"

ওদের তিনজনের সঙ্গে একেবারে 'কুইক মার্চের' ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে ঈভলীন। হাঁটার কদম দ্রুত, স্বচ্ছন্দ হলেও, কথা বলতে গিয়ে যেন একটু হোঁচট খেল শাজাল। থেমে থেমে বলল,

—"হ্যাঁ—মানে, ইয়ে—। মানে, ঠিক তা নয়, আসলে, কি বলে গিয়ে,—আমার বন্ধুটি কেমন আছে? মঁসিয় দ্যুপোঁ?"

—"ভালো। ভালোই আছে।"

তারপর, আবার ঈভলীনের প্রশ্নবাণ,

—"তা, কার বিয়ে বললেন না?"

শাজালের পা থামল হঠাৎ। সঙ্গে সঙ্গে বশম্বদ সেপাইদেরও। হতবুদ্ধির চোখে তাকিয়ে শাজাল বলল,

—"বিয়ে? কার বিয়ে?"

শব্দ করে হেসে ফেলল ঈভলীন,

—"তা আমি কি জানি? আমি ভাবলুম, বুঝি কারো বিয়েতে উপহার-টুপহার কিনতে চলেছেন মোঁমার্ত্রে!"

সামলে নিয়েছে পুলিস-সায়েব। খুক্ খুক্ আলতো কাশির শব্দে গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল,

—"না। কেনাকাটা কিছু নয়। ডিউটিতে। মাঝে মধ্যে আমাদের টহল দিতে হয় তো? কোথায় কোন্ বিদেশী ফ্রান্সের আইন সরকারকে ফাঁকি দিয়ে কাজের পারমিট ছাড়াই মোঁমার্ত্রে ছবি আঁকতে বসে গেছে, ফরাসী ফ্রাঁ লুটছে—এসব একটু নজর রাখতে হয় বইকি!"

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াতে চায় নি ঈভলীন। এক দৌড়ে ছুটে গিয়ে ইণ্ডিয়ানকে মোঁমাত্র্ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু, কথা বলতে বলতে হঠাৎ দৌড়ই বা দেয় কি করে? ইণ্ডিয়ানের জন্যে ভয়, দৌড় লাগাবার ইচ্ছেকে অনেক কষ্টে সামলে হেসেছে ঈভলীন,

—"তা তো বটেই। তা তো বটেই।"

আবার চারজনে পা ফেলে হাঁটছে। ঈভলীনের পায়ের জোর বেড়ে গেছে এখন। ও কি দু' কদম এগিয়ে হাঁটছে নিজের অজান্তেই? সতর্ক হয়ে আস্তে হাঁটার চেষ্টা করছে। মনে মনে ভাবছে, ও নিজেই যেন এখন এই তিনটে অলপ্পেয়ে পুলিসের হাতে বন্দিনী। এদের সঙ্গে সঙ্গেই মোঁমার্ত্রে পৌঁছোতে হবে। পৌঁছে ইণ্ডিয়ানকে ধরিয়ে দিয়ে শুধু বোকার মতো চেয়ে চেয়ে দেখবে এরা শিল্পীকে ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছে থানায়। রাগে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে ঈভলীনের। হাত কামড়াতে চাইছে।

উত্তেজনা সামলে বলেছে,

—"এ-পাড়ায় বড় একটা দেখি না তো আপনাদের! মানে, ধড়াচূড়ো পরা কনস্টেবলরা মাঝে-সাঝে ঘুরে যায়। তবে, আপনাদের মতো জাঁদরেল অফিসার-টফিসার, বিশেষ করে সাদা পোশাকে ডিউটিতে চলেছেন মোঁমার্ত্রে—ভাবতেও ভালো লাগে!"

কী যে খারাপ লাগছে, ঈভলীন তা বলে বোঝাতে পারবে না।

সামান্য খুশী হয়ে শাজাল বললে,

—"মাঝেমধ্যে উটকো খবর এলে অভিসারে বেরোতে হয় বইকি!"

ইণ্ডিয়ান নিশ্চয়ই এখন খদ্দের নিয়ে বসে কাজ করছে আপনমনে। পকেটে হাতকড়া ঢুকিয়ে যমদূতগুলো যে ওর সন্ধানেই ছুটেছে, বেচারা জানেও না সে খবর! দূর থেকেই ওকে বিদেশী বলে চিনে ফেলা যাবে। সোজা এগিয়ে গিয়ে কাজ করার পারমিট, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখতে চাইবে এরা! ঈশ্! ভাবতে ভাবতে সবকিছু ঘুলিয়ে যাচ্ছে ঈভলীনের মাথার মধ্যে।

মঁসিয় শাজাল এবার পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, হাঁটতে হাঁটতেই.

—"তা মাদাম, আপনি এ পাড়ায় কি মনে করে? একলা একলা? বেড়াতে চললেন, না, ছবি-টবি কিনবেন?"

পরদেশী শিল্পীর বিপদের দুশ্চিন্তাতেই মাথা জুড়ে ছিল। অন্যমনা হয়ে পড়েছিল ঈভলীন। ঢোক গিলে জবাব দিল,

—"আঁ! না, না। আমি আবার কী কিনব। প্রায়ই চলে আসি তো এখানে। শিল্পীরা নতুন কি ছবিটবি আঁকছে, সেই সব ঘুরে ঘুরে দেখি আর কি। তাছাড়া, আমার কিছু বন্ধু-বান্ধব মুখ আঁকে এখানে। কত্তার কোম্পানীর খুচরো কাজ-কম্মও করে দেয় ওরা। ফ্রী লান্স্!—"

শাজাল হাসল। বলল,

—"ও। তাই বলুন! আমি ভাবলুম আপনিও বোধহয় কাউকে 'অ্যারেস্ট' করতে চলেছেন।"

'অ্যারেস্ট' শব্দটা ধক্ করে কানে লাগল ঈভলীনের। ইণ্ডিয়ানের সরল, ছেলেমানুষী, বাদামী রঙের মুখটি দেখতে পেল এক পলক। পাদরির মুখে থুতু ছিটিয়ে পুলিসের তাড়া খেয়েছিল সেবার। ব্রীজের তলায় কেমন সাদা হয়ে গিয়েছিল শিল্পীর মুখ।

জবাব দিতে কয়েক সেকেণ্ড দেরি হয়ে গেল। বলল,

—"কেন?"

প্রশ্নটির কোনো কারণ নেই তেমন। শাজালের কথা ঈভলীন শুনেছে ঠিকই। কিন্তু, ওই 'অ্যারেস্ট' শব্দটি ছাড়া বাকি সব মাথার ভেতর অবধি পৌঁছোয় নি। অথচ, কথার পিঠে কথা না বললে, চুপ করে থাকলে, পলিস মানুষের ঘ্রাণে কোন্ সন্দেহ লাগে, কে জানে! তাই, ভাসাভাসা শোনা কথাগুলোর পিঠে 'কি বললেন' জিজ্ঞেস না করে, 'কেন' প্রশ্নটি আন্দাজে ছুঁড়ে দেওয়া চলে। 'কেন' কিংবা 'আচ্ছা' অথবা 'তাই বুঝি।' এসব হঠাৎ হঠাৎ কথার পিঠে খেটে যায়। আনমনা থাকলেও সামনের জন চট্ করে ধরতে পারে না। 'কেন'র উত্তরে কিছু একটা বলতে থাকেই।

শাজালের বেলাতেও 'কেন'টি লেগে গেল। বললে,

—"যে রকম ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছেন আপনি! আমাদেরও হার মানিয়ে দিচ্ছেন!—"

বলে, আবার হাসল শাজাল।

আর একটু হলেই প্রায় ধরা পড়ে যাবার মতো থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ঈভলীন। দু' পা পিছিয়ে, লজ্জার হাসি হেসে সামলে নিল। বলল,

—"আমি না, কিছুতেই আস্তে হাঁটতে পারি না। হয়, শুয়ে-বসে থাকবো চুপচাপ, নয়, দ্রুত হাঁটবো। ঢিকুর ঢিকুর হাঁটি-হাঁটি পায়ে চলা আমার পোষায় না।"

এরপরে অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও ব্যাটার বলে দেওয়া উচিত ছিল যে, 'ঠিক আছে, আপনি আপনার মতো হাঁটুন, আমরা পেছনে আছি—', তাহলে কোনো বাক্যব্যয় না করে দৌড় দিত ঈভলীন। তা না, উলটে পুলিসের জবাব হল,

—"তাড়ার কি? আপনার মতো সম্মানিতা মহিলাকে 'এস্কর্ট' করে পৌঁছে দিচ্ছি, চলুন—।"

আগড়ুম বাগড়ুম কথা বলছে, শুনছে আর মনে মনে ছক কেটে চলেছে ঈভলীন। কি করে ঠেকানো যায় এগুলোকে? অন্তত মিনিট কয়েক! তার মধ্যেই উড়ে গিয়ে ইণ্ডিয়ানকে সাবধান করে দেওয়া যাবে।

মেলার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা কদম কদম। বাঁদিকে ছবির দোকানপাট। দেওয়ালে, শো-কেসে ড্রয়িং, পেইন্টিং, নানান কিউরিও সাজানো। এলোপাথাড়ি হাঁটতে হাঁটতে টুরিস্টের দল দুমদাম এক-একটা খুদে দোকানে ঢুকে পড়ছে। খুঁটিনাটি জিনিস দেখছে। ওদের মুখের ভাবসাবের দিকে উজ্জ্বল চোখে নজর রাখছে দোকানী। কোন্ ছবিটায়, কোন্ জিনিসে, কোন্ টুরিস্টের চোখ আটকালো! যেখানেই বেশিক্ষণ চোখ আটকে থাকবে সেখানেই দোকানীর আশা।

এখন রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে ঈভলীন। পুলিস তিনটির সঙ্গে এক এক পা এগোচ্ছে, আর ভয়ের পাথর বুকের মধ্যে একটি একটি করে জমছে। ভারি হচ্ছে। অসহ্য অস্থির লাগছে নিজেকে। ভয়ংকর অসহায়। হঠাৎ ইচ্ছে করল, তিনজনের সামনে ঘুরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে ওদের পথ আটকে দেয়। বলে,

—"দোহাই মঁসিয় শাজাল! আর এগোবেন না। দুটো মিনিট দয়া করে দাঁড়িয়ে থাকুন, আমি এক দৌড়ে গিয়ে ইণ্ডিয়ানকে সরিয়ে আসি, তারপরে যান। শুধু যান নয়, আমি সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবো আপনাদের। গিয়ে, যাকে ইচ্ছে ধরুন, হাতকড়ি লাগান।"

পরের মুহূর্তেই দুনিয়াসুদ্ধু সব পুলিসের মুণ্ডুপাত করছে ঈভলীন। তারপরেই আবার অন্যরকম ভাব। গভীর শ্রদ্ধায় ডান হাতের আঙুলে কপাল, বুক, দুই কাঁধ এবং ঠোঁট স্পর্শ করছে। শিশুদের মতো বিড়বিড় করে ডাকছে,

—"হে যিশু! শিল্পী পুলিসের হাতে পড়লে ওর এখানে আর প্রদর্শনী করা হবে না। ওকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেবে আইন। আমাদের এই স্বর্গরাজ্যে ইণ্ডিয়ানের সব স্বপ্ন-সাধ চুরমার হয়ে যাবে। হে ভগবান, এখন যেন ওর কোনো

খদ্দের না থাকে। ওর খিদে পাইয়ে দাও, কিংবা একটু তেষ্টা! ওর বোর্ড্-টোর্ড্ নিয়ে আলুভাজার দোকানে অথবা রেস্তোরাঁয় চলে যাক। প্রভু, আসছে সপ্তাহে পর পর সাতদিন আমি গীর্জায় যাবো প্রার্থনা করতে। ইণ্ডিয়ানকে ধরিয়ে দিও না—"

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়, ঈভলীন দেখল, ভগবান একটি কালো বিদেশীকে রঙ্গমঞ্চে পাঠিয়ে দিলেন। লোকটির হাতে বড়-সড় প্ল্যাস্টিকের থলে। মোঁমার্ত্রের মেলা থেকে এদিকে হেঁটে আসছিল। বাঁ পাশের একটা ছবির দোকানে হঠাৎ ঢুকে পড়ে ঈভলীনকে মুক্তি দিল।

লোকটিকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে শাজাল। সেপাইদের কি বলল চাপা গলায়। ঈভলীনের মনে হল, পুলিসি নাক বিদেশীর ওই বড়-সড় থলেটির গন্ধ শুঁকতে চায় বোধহয়।

ঈভলীনের দিকে ফিরে সামান্য মাথা নোয়াল শাজাল। বলল,

—"পার্দ, মাদাম। আপনি এগোন। এই দোকানে একটু কাজ খুঁজে দেখি। বিদেশীকে একটু বাজাতে মন চাইছে।—"

আর দাঁড়ায় ঈভলীন!

হাঁপ ছেড়ে এক গাল হাসল। খুশির চোখে ভুল বকার মতো অকারণেই মস্ত এক ধন্যবাদ দিয়ে ফেলল শাজালকে,

—"মেরসি। মেরসি মঁসিয়!"

অত বড় ধন্যবাদ পাবার কারণ খুঁজে না পেয়ে দুটি সেদ্ধ আলুর চোখে তাকাল দারোগাসাহেব। সেদিকে ভালো করে দেখতে-না-দেখতেই খাঁচাখোলা পাখির পাখনায় উড়াল দিয়েছে ঈভলীন। উড়ে উড়ে প্রথমেই যিশুর কাছে।

যিশু তখন একটি খোকা-খোকা গোলপানা বুড়োর মুখ নিয়ে ব্যস্ত। ফোটোগ্রাফার 'ক্লিক্' করবার আগে 'একটু হাসুন' বললে যে ধরনের হাসি ফোটে, সেই ধাঁচের হাসি ঠোঁটে মেখে কাঠ হয়ে বসে আছে বুড়ো। নট্ নড়ন-চড়ন, নট কিচ্ছু! বসার ধরন দেখে ভাবা চলে, প্যাণ্টের ভেতর ইয়াব্বড় খিরাখরে আরশোলা ঢুকে গেলেও, বুড়ো শুধু মনে মনে পোকাটিকে বকে দেবে, 'কি, হচ্ছে কি! অসভ্য কোথাকার—', ভুরু কোঁচকাবে না, মুখের হাসি থাকবে যেমন-কে-তেমন।

বুড়োকে এক নজর দেখে নিয়ে যিশুর কানের কাছে মুখ নামিয়ে আনল ঈভলীন। দ্রুত, চাপা গলায় বললে,

—"পিয়ের, পুলিস আসছে। ইণ্ডিয়ানকে সরাতে হবে, শীগগির—"

ঈভলীনের কাছে আগের ঘটনা শুনতে শুনতে ওয়াইনে চুমুক দিলুম। হেসে জিজ্ঞেস করলুম,

—"অ্যাতো ঘাবড়াবার কি ছিল, বাপু? তোমরা মেয়েরা প্রেমিকের জন্যে একটুতেই দিশেহারা হয়ে পড়ো!—"

চোখ পাকিয়ে ঈভলীনের জবাব,

—"হুঁ হ্! প্রেমিক বীরপুরুষকে আমার খুব মনে আছে! পাদরি আর পুলিসের জুতোর শব্দে তো ভিরমী খাবার যোগাড় হয়েছিল!"

গম্ভীর গলা করে বললুম,

—"কি দুর্ভাগ্য ভাবো! সেই পুলিসওয়ালারাই আবার আমার পেছনে তেড়ে এল। অথচ, কাছেপিঠে না আছে নদী, না আছে ব্রীজ। এমন কি তোমার পিঠও কোনো দেওয়ালে হেলান দিয়ে নেই, যেখানে লেখা—দৈহিক মিলন নিষিদ্ধ, শনি-রবি বাদে।—"

কেমন লজ্জার হাসি মেখে কপট রাগের গলায় ঈভলীন বলল,

—"ধ্যেৎ! পাজি কোথাকার!"

বললুম,

—"অথচ, আজ শনিবার।"

চোখের কোলে তাকিয়ে যেন দুষ্টুমি করল,

—"সেই ব্রীজের তলায় যেতে খুব ইচ্ছে করছে বুঝি আবার?"

বললুম,

—"চলো না! ঘুরে আসি!"

ঠোঁট উলটে ঈভলীন বললে,

—"ঈশ্! শেরি-শেরি! সোনামণির শখ কতো!"

—"কেন?"

—"দেশে বউ আছে, সেটা ভুলে গেছো?"

—"উঁহু! কিন্তু, তাতে কি হয়েছে?"

—"আমি বিবাহিতা। মাদাম দ্যুপোঁ!"

হালকা গলা থেকে হঠাৎ নেমে এসে ঈভলীনের এমন গম্ভীর স্বর চমকে দিল আমাকে। চোখের দিকে চেয়ে দমে গেলুম। আমার চোখে ওর সমুদ্রের নীল ফেলে বসে আছে। সমস্ত পারিপার্শ্ব, পুলিস, ভয় ভুলে গিয়ে আস্তে আস্তে বলে দিলুম,

—"হঠাৎ হঠাৎ ভুল হয়ে যায়।"

দুটো সমুদ্র কি আমার চোখের মধ্যে ডুবে গেল? নাকি, আমিই তোমার মধ্যে ডুবতে ডুবতে তোমায় খুঁজতে লাগলুম। হালকা সুরে মিষ্টি করে কেটে কেটে ইংরিজিতে উচ্চারণ করলে,

—"টু এ্যর ইজ্ হিউম্যান্। টু ফরগিভ্,—ডিভাইন্!"

ঈভলীনকে বুঝতেই পারলুম না, যিশু ঢুকে পড়ল রেস্তোরাঁয়। আমার পাশে চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল,

—"উফ্, কি বুড়োরে বাবা!"

ঈভলীন বললে,

—"কে?"

যিশুর জবাব,

—"ওই যার ছবি আঁকতে আঁকতে উঠে গিয়ে ইণ্ডিয়ানকে সরিয়ে দিলুম!"

জিজ্ঞেস করলুম,

—"কেন? কি হল?"

যিশু বললে,

—"তোমার বন্ধু জেরিকে তো কিছুতেই থামানো গেল না। সাধ্য-সাধনা করতে করতে প্রায় গীর্জা অবধি গেলুম। শুনল না। চলে গেল। ফিরে এসে খদ্দেরটির সামনে বসলুম। উনি তেমনি কাঠ হয়েই বসেছিলেন। তোমার বোর্ড্‌টি পাশে উপুড় করে রেখে ওঁর আদ্ধেক আঁকা পোর্ট্রেটট হাতে তুলে নিতেই খুব গম্ভীর মুখে বললেন, 'আবার সাবান লাগাতে হবে!'—কিছুই না বুঝে উজবুকের মতো জিজ্ঞেস করলুম, 'কিসের সাবান, মঁসিয়? ঠিক বুঝলুম না!' এইবারে নড়ে-চড়ে সত্যি সত্যিই হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'আমার দেশে, স্কটল্যাণ্ডে, মাঝেসাঝে শখ করে আমি সেলুনে দাড়ি কামাতে যাই। আপনি আধা-ছবি এঁকে উঠে যাবার পর থেকে এতক্ষণ অবধি একটা কথাই ভাবছিলুম, যেন আমি সেলুনে বসে আছি! একদিকের গাল কামিয়ে নাপিত বাইরে চলে গেল দরজার সামনের জমা বরফ সরাতে। ফিরে এসে কি দেখবে, বলুন?—' বলে, হ্যা হ্যা করে কোমর দাপিয়ে হাসলেন ভদ্রলোক। হাসতে হাসতে নিজেই জবাব দিলেন,—'দেখবে, আমার কামানো এক গালে দাড়ি গজিয়ে গেছে, আর এক গালের সাবান শুকিয়ে খড়ি। হ্যা হ্যা হ্যা'—"

বলে, ওয়াইনের অর্ডার দিল যিশু। ঈভলীন হেসে গড়িয়ে পড়ছে। আমিও হাসছি।

যিশু বললে,

—"স্কট্‌ল্যাণ্ডের বুড়োর সঙ্গে হাসতে তো পারলুমই না। উলটে, অপরাধীর মতো ওঁর মুখটি এঁকে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললুম, 'সরি, আমাকে আদ্ধেক দাম দিয়ে দেবেন।' স্কট্ বলে কথা! বুড়ো অম্লান বদনে আমার কথা রেখে, পঁচিশ ফ্রাঁ হাতে গুঁজে চলে গেল। শালা!"

আমাদের হাসি থামলে জিজ্ঞেস করলুম,

—"পুলিসের সঙ্গে আলাপ-টালাপ হল?"

যিশু বললে,

—"হুম্! ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখতে হবে, দোস্ত্। পুলিস অফিসারের এখানে আসাটা খুব হালকাভাবে নিলে চলবে না। ভেবে দেখতে হবে।"

দাড়িতে হাত বুলিয়ে কি যেন চিন্তা করতে করতে বললে যিশু। ঈভলীন আর আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে আছি।

যিশু বললে,

—"তোমার হাতযশই যত গণ্ডগোলের মূল। তার ওপর আবার খদ্দের ধরবার কায়দা!"

অপরাধীর মত কাঁচুমাচু মুখে বসে রইলুম।

যিশু আবার বললে,

—"কিছু মুখ-আঁকিয়েরা তোমার ওপর এবং তোমার জন্যে আমাদের ওপর চটে গেছে। শালারা জেলাস! তোমার কাজের পারমিট নেই, এই সন্দেহে

ভর করে পুলিসকে বেনামে টেলিফোন করে দিয়েছে কেউ। ঠিক ভেবে পাচ্ছি না, লোকটা কে?"

ঈভলীন বললে,

—"গিয়ম নয় তো? কিংবা ওর গ্রুপের অন্য কেউ।"

জোরে জোরে মাথা নেড়ে যিশু বললে,

—"অসম্ভব! গিয়মরা যতই আমাদের ওপরে খাপ্পা হয়ে থাক, কাপুরুষের মতো পুলিসকে মাঝখানে টানবে না। অন্য কেউ।"

গম্ভীর মুখে ভাবতে বসে গেল যিশু।

কেমন যেন মনে লাগল আমার। যত ঝামেলা এরা পোহাচ্ছে, সব আমার জন্যেই। আমি সরে দাঁড়ালেই আর এই সব উট্‌কো উৎপাতের মধ্যে যেতে হবে না ওদের।

আস্তে আস্তে বললুম,

—"একটা কথা বলি, ভাই। কিছু মনে কোরো না। ভাবছি, কাল থেকে আর এখানে আসবো না। মুখ আঁকতে অন্তত নয়। শত হলেও বে-আইনী ব্যাপার। কাজের পারমিট যোগাড় করাও যখন বেশ মুশকিল এবং সময়সাপেক্ষ, তখন—"

যিশুর মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল। রাগ-রাগ ভাব। বোঝাবার চেষ্টা করলুম,

—"তা ছাড়া, তোমাদের অসুবিধায় ফেলছি। কাজের ক্ষতি করছি—"

এইবার রাগে ফেটে পড়ল যিশু। আমাকে রীতিমতো চমকে দিয়ে টেবিলে থাপ্পড় মেরে বলল,

—"আলবত্ অসুবিধেয় ফেলেছো! একশোবার কাজের ক্ষতি করছো—লজ্জা করে না বলতে—"

আমি একেবারে চুপ করে গেলুম।

চড়া গলা খাদে নামিয়ে চাপা রাগের শব্দ বেরুলো,

—"বেশি পাকামো করতে হবে না। তুমি এখানে ছবি আঁকবে কি আঁকবে না, তা নিয়ে আমরা ভাবব। শোনো হে, যেদিন প্রথম তোমায় দলে ডেকেছিলুম, দোস্ত্ বলে গ্রহণ করেছিলুম, সেদিন থেকে তোমার দায়-দায়িত্ব আমাদের। তোমার আশা-হতাশা, মান-অপমানের শরিক আমরা।"

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিজের মনেই গজগজ করল,

—"হুঁহ্! পোর্ত্রে আঁকবেন না। আমাদের অসুবিধায় ফেলেছেন। দয়া দেখাচ্ছেন আবার! ছোটোলোক কোথাকার।"

ঘুরে, মুখ ভেংচে জিজ্ঞেস করল আমায়,

—"বলি, খাবেটা কি? এখানে এক্সপোজিশনটা কে করবে? আমার ঠাকুরদাদা!—যত্তোসব!"

ঈভলীন মধ্যিখানে পড়ে বলল,

—"আহা, পিয়ের! শুধু মিছে ওকে বকছো কেন? ও তো অন্যায় কিছু বলে নি—"

ঈভলীনকেও ধমকে থামিয়ে দিল যিশু,

—"তুমি থামো, মাদাম! ওর হয়ে সালিশী করতে হবে না। ওকে বকছি না আমি। রাগ হচ্ছে শুধু এই ভেবে যে, আমরা ওকে লড়িয়ে-কমরেড, কাছের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে ভালোবেসে ফেলেছি—উনি তবু নিজেকে দূরে দূরে ভাবছেন। আমাদের ওপর দয়া দেখিয়ে উনি চলে যাবেন! হুঁহ্! এসব পাকা পাকা কথা শুনলে মাথা গরম হয়ে যায়—"

ও এতদূর চটে যাবে, আমি বুঝতেই পারি নি। ওরা আমায় এতখানি বুক পেতে ভালোবাসে, ভাবতে ভরসা পাই নি। আমি তোমাকে কি দেবো, যিশু? আমার তো কিছুই নেই। আমি তো তোমাদের মতো ভালোবাসতেও শিখি নি বোধহয়! সহায়-সম্বলহীন তোমাদের এই ইণ্ডিয়ানের দিতে পারার ক্ষমতা কিছুই নেই। শুধু, অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করছি। তোমার অপরিসীম স্নেহ-ভালোবাসা রাগ-অভিমানের পোশাক পরে এসে মন ভরিয়ে দিচ্ছে আমার। বোবা চোখে হাঁ করে আমি তোমায় দেখছিই, দেখছিই—।

প্রায় আদেশের ভঙ্গিতে বলে দিল যিশু, গুরুজনদের মতো,

—"খবরদার! মোঁমার্ত্রে রোজগারের ব্যাপারে তোমার কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। আমাদের অসুবিধে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। নিজের ছবির কথা ভাবো, কাজ দেবে। এখন, চুপচাপ যা বলছি শুনে যাও। কালকের দিনটা তুমি এখানে আসবে। তবে, ছবি আঁকবে না। দেখি, একটু খোঁজ-খবর করতে পারি কিনা, পুলিস ডাকার ব্যাপারে। পরশু থেকে আবার নিয়মমাফিক দু' হাতে মানুষের মুখ আঁকবে, যদ্দিন না অন্তত প্রদর্শনীর পয়সা জমে যায় পকেটে। ঠিক আছে?"

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ, ঠিক আছে।

একটু থেমে আবার বলল,

—"ব্যস্! এ প্রসঙ্গে এই আমার শেষ কথা।"

তারপর, হাত বাড়িয়ে একেবারে হালকা স্বরে সিগারেট চাইল,

—"দেখি, একটা ধোঁয়া দাও।"

সিগারেট ধরিয়ে দিলুম ওকে।

ঈভলীন হেসে বললে,

—"আমি জানি, ইণ্ডিয়ান, পিয়েরের কথায় তুমি কিছু মনে করো নি, কারণ, তুমি জানো, ও তোমাকে বোধহয় নিজের মতোই ভালোবাসে।"

ঘুরে হেসে যিশুকে দেখে বলল,

—"আমাদের পাগ্‌লা পিয়ের!"

লজ্জা পেয়ে একটি বোকা হাসি হেসে দিল যিশু। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আড্ডার মেজাজে বলল,

—"সবাইকে হারিয়ে পুরস্কার পাবার মতো মঁসিয় দলানের মুখ আঁকতে পেরেছে বলেই, মনে হয়, ঈর্ষা-অপমানের জ্বালায় পুলিসে টেলিফোন করে দিয়েছে কেউ!"

ঈভলীন সঙ্গে সঙ্গে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল,—"কে? পাপা এসেছিল নাকি আজকে?"

যিশু বললে,

—"হ্যাঁ। শুধু এলে তো অ্যাতো গোলমাল হত না! এ বছর উনি আমাদের এই পাকু-বন্ধুটির খদ্দের হয়েছেন।"

ঈভলীনের চোখে-মুখে খুশি ছড়িয়ে পড়ল। আমার দিকে তাকিয়ে বললে,

—"বাহ্!"

বলে, তাকিয়ে থাকল।

সবিনয়ে হাসবার চেষ্টা করলুম।

ঈভলীন বললে,

—"কী সেজেছিল পাপা? কিসের পোশাক এ বছর?"

যিশু বললে,

—"আন্দাজ করো দেখি?"

চোখ ঘুরিয়ে একটু ভেবে নিল ঈভলীন। হেসে বলল,—"জাদুকর নাকি? মাজিসিয়ঁ!"

বলে, যিশু এবং আমার দিকে তাকাল্প পর পর। দু'জনেই মাথা নাড়লুম,

—"উঁহু!"

—"তবে, আরব? সেই সাদা ঘোমটায় মাথা ঢাকা, ঢোলাঝোলা আলখাল্লা! কালো চশমা চোখে?"

—"উঁহু!"

—"তবে কি?"

তিনজনেই খুশি খুশি মুখে ছেলেমানুষী খেলা। বললুম—"আন্দাজ!"

হাল ছেড়ে দিল ঈভলীন,

—"জানি না, বাপু! কোনোদিন আমরা পাপার কল্পনার সঙ্গে দৌড়ে পারতুম না। এখনো পারি না। বলোই না, সিল্-ভু-প্লে!"

যিশুকে ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইলুম, বলে দেবো?

ঈভলীন ফিরে যিশুর দিকে তাকাবার আগেই ও আমায় চোখ টিপে জানিয়ে দিল, না! আর একটু সবুর করো!

ঈভলীনকে বলল,

—"ও জুজ্! সিল্ ভু প্লে!"

আমাদের দু'জনকে দেখে নিয়ে ঈভলীনের ছেলেমানুষী রাগ,

—"ধ্যৎ! তোমরা ভারি বাজে লোক! বলোই না!"

যিশুর মতো আমিও বললুম হেসে হেসে—"লাস্ট গেস্! প্লীজ্!"

আমার দিকে চেয়ে রেগেমেগে বলে দিল, যেন,—"অ্যাস্ট্রোনট্ কিংবা ইণ্ডিয়ান পেইন্টার!"

যিশু বললে,

—"সান্তা ক্লজ।"

ঈভলীন চট্ করে ঘুরে জিজ্ঞেস করল,

—"কি? কি বললে?"

বললুম,

—"সান্তা ক্লজ।"

আমার দিকে শূন্য চোখে চেয়ে থেকে ঈভলীন বোধহয় ওর বাবাকে কল্পনায় দেখল। হাসল। শব্দ করে হোহো হেসে ফেলল। হাততালি দিয়ে মঁসিয় দলানের সেই ছোট্ট মেয়েটি বলল, সান্তাকেই বলল যেন,

—"ও পাপা! ফাঁত্যাস্তিক্! এই রোদের মধ্যে সান্তা ক্লজ! ভাবাই যায় না। দারুণ, পাপা দারুণ!"

হাততালির শব্দে ওয়েটার চলে এসেছে। দু'-একজন খদ্দের অবাক চোখে এই টেবিলে দেখছে।

তাড়াতাড়ি ওয়েটারকে বলে দিল ঈভলীন,

—"শ্যাম্পেন!"

আমার দিকে ফিরে খুব উত্তেজিত খুশিতে বলল,

—"পাপা জানে না, তুমি আমার, মানে, আমাদের বন্ধু। আসছে মাসে ওর জন্মদিন। তোমায় নিয়ে যাবো। আলাপ করিয়ে দেবো। খুব ভালো লাগবে তোমার।"

মাথা নেড়ে বললুম,

—"ওঁকে আমার ভালো লেগেছে, তুমি আলাপ করিয়ে দেবার আগেই।"

নিজের উচ্ছ্বাসে এত ব্যস্ত ছিল, আমার কথা ঠিক ধরতে পারে নি ঈভলীন। একটু আহত স্বরে বললে,

—"যাবে না তুমি ওঁর জন্মদিনে?"

—"একশো বার যাবো! সান্তা ক্লজের জন্মদিন বলে কথা!"

বরফের বালতিতে শ্যাম্পেন নিয়ে এল ওয়েটার। যিশু ঈভলীনকে গম্ভীর মুখে বলল,

—"তার আগে, আজ সন্ধ্যায় ইণ্ডিয়ানের কোথায় যাবার নেমন্তন্ন সে তো তুমি জানোই না এখনো!"

সান্তা, জেরি, পুলিস ইত্যাদির হুড়োহুড়ির মধ্যে ভুলেই গিয়েছিলুম। যিশুর কথায় মনে পড়ল।

ঈভলীন বললে,

—"কোথায়?"

মুচকি হেসে ভুরু নাচাল যিশু। আমার দিকে তর্জনী তুলে সেই ছড়ার ছন্দেই সুর বসালো,

—"সাতটা কিংবা সাড়ে সাতটায়,

লা তুর দার্জঁ! লা তুর দার্জঁ!"

গালে হাত রেখে গোল গোল চোখে আমায় দেখল ঈভলীন—যেন এক দ্রষ্টব্য বস্তু। বললে,

—"ও বাবা! লা তুর দার্জঁতে নেমন্তন্ন? সে তো পেল্লায় ব্যাপার, ইণ্ডিয়ান! কিসের পার্টি?"

সঙ্গে সঙ্গে যিশুর জবাব,

—"হুঁহুম্ বাবা! পার্টি-ফার্টির ভিড়ভাট্টা নয়। দু'জনে একা একা—"

ওকে থামিয়ে দিয়ে ঈভলীনকে বললুম,

—"দুদ্দুর! একা-টেকা কিছু নয়। আসলে, ভদ্রমহিলার মুখ নাকি মোঁমার্ত্রের শিল্পীরা কেউ মেলাতে পারে নি এর আগে। বাজি ধরে মিলিয়ে দিলুম। তাই, সাদামাটা বাজির খাওয়া খেতে যাবো।"

টেবিলে ঝুঁকে পড়ে মহা উৎসাহে জিজ্ঞেস করলে ঈভলীন,

—"কে ইণ্ডিয়ান? কে সেই সুন্দরী?"

যিশু তেমনি ইয়ার্কির গলায় হেসে বলে দিল,

—"মঁসিয় কোর্তোয়া, দেনিস লিয়ঁ, আমি—এমন কি, তুমিও সেই সুন্দরীকে দেখেছো।"

ঈভলীন জেরা করতে আরম্ভ করল আমাকে,

—"মহিলা কি খুব মেক-আপ করে?"

—"তা একটু করে বলা যায়।"

—"সারাক্ষণ সদ্য যুবতীটি থাকতে চায়—এমন মেক-আপ?"

—"অত বুঝি না! তবে, যুবতী থাকতে কে না চায়!"

—"এসে বললো, যে, ওর মুখ এখানে কেউ মেলাতে পারে নি?"

—"সেই রকমই তো বলল, মনে হচ্ছে!"

যিশুর দিকে ফিরে ঈভলীন জিজ্ঞেস করল,

—"জীনেত দ্যুরেঁা নাকি?"

আমি অবাক! অবাক শুধু নয়, হতভম্ব! এরা সবাই ওকে চেনে-জানে, অথচ ও যখন মোঁমার্ত্রে ছিল, কেউই তো এসে 'হ্যালো' বলে নি। তার ওপর, সব বন্ধুরাই কেমন ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলেছে,

—"অ্যান্টিসেপ্টিক নিয়ে যেও।"

দেনিস বলেছে,

—"অ্যান্টিটিটেনাস—"!

ঈভলীনও যেন কেমন করুণা করবার চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। এপাশে ওপাশে মুণ্ডু নাড়িয়ে দিগ্‌গজের মতো জিভ দিয়ে শব্দ করল,

—"চুক-চুক-চুক! বেচারা!"

বললুম,

—"তুমি ওকে চেনো কি করে?"

পাল্টা প্রশ্ন করল ঈভলীন,

—"যাচ্ছো নাকি নেমন্তন্নে?"

অবাক গলায় বললুম,

—"যাবো না কেন? বাহ্! বাজির খাওয়া—"

যিশু ঈভলীনকে বললে,

—"ওকে অকারণে নার্ভাস কোরো না। ঘুরে আসুক। এ রাজ্যের অভিজ্ঞতা নানাভাবেই তো ওর হওয়া দরকার!"

হঠাৎ, কে জানে কেন, ঈভলীনকে বললুম, তেমন কিছু না ভেবেই,

—"জীনেতের সঙ্গে ডিনারে গেলে কি তোমার আপত্তি আছে?"

ও কি জোর করে হাসল? ঠিক বুঝলুম না। বললে,

—"কি আশ্চর্য! আমি আপত্তি করবো কেন! তা ছাড়া, আমার আপত্তিতে তোমার কি এসে যায়!"

মনে মনে একটু ভয় পেয়ে গেছি জীনেত সম্পর্কে! সবাই চেনে, সবাই জানে, অথচ কোনো ব্যাপার এরা আমার কাছে লুকোচ্ছে। ভেবে হদিশ পাচ্ছি না। পাচ্ছি না বলেই দমে যাচ্ছি ভেতরে ভেতরে। ঈভলীনের দিকে ঝুঁকে পড়লুম,

—"তুমি বারণ করলে আমি যাবো না। তুমি আমায় লা তুর দার্জতে খাওয়াবে?"

উজ্জ্বল চোখে সঙ্গে সঙ্গে ঈভলীনের জবাব,

—"একশোবার খাওয়াবো।"

যিশু এক ভগবানের মতো হাত তুলে ঈভলীনকে বললো,

—"কেন ওকে আটকাচ্ছো, মাদাম? প্যারিসের একটা চরিত্র, একটা দলের মানুষী তো চিনবে?"

ঘাবড়ে গেলুম! দল বলে কেন যিশু? জীনেতের আবার দলবল আছে নাকি?

যিশুকে বললুম, মনের ভয় চেপেচুপে অবশ্যই,

—"কোন দলের জীনেত?"

যিশুর অমলিন হাসি। আবার অভয়ের হাত তুলে বললে,

—"রাজনৈতিক দল-টল নয়। গুণ্ডা-বদমাশও নয়। ভদ্রমহিলা সামান্য ভিন্ন রুচির বললে ভুল হবে না। এবং এ দেশে ওঁর মতো রুচিসম্পন্না মানুষী অনেক আছেন। তাই বলছিলুম—। ভয়ের কিছু নেই, ইণ্ডিয়ান।"

—"বেশ্যা-টেশ্যা নয় তো?"

ঈভলীন বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল। যিশু ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল,

—"বেশ্যা হলে আমরা হয়তো যেতুমই না। বেশ্যা হলে ওর কত রেট তোমাকে বলে দিত। সবচেয়ে বড় কথা, বেশ্যা হলে ও তোমাকে দামী হোটেলে নেমন্তন্ন করতো না। তুমি ওকে করতে!"

হক কথা। জীনেতকে নিয়ে ভাবনায় আরো জট পাকিয়ে গেল।

ঘুরে দেখলুম ঈভলীনকে। বোধহয়, চোখের ভুল, কেমন শুকনো লাগল মুখটি। বললুম,

—"কি ব্যাপার আমাকে একটু বলোই না! মহিলাটি কে?"

যিশু বলল,

—"ভুয়ো! ঘাবড়ে গেছ ইণ্ডিয়ান! চোখের ভেতর ভয় দেখতে পাচ্ছি!"

—"মোটেই না!"

মাথা নিচু করে কিছু কি ভাবছে ঈভলীন? টেবিলে চোখ রেখেই বললে,

—"যাও, ইণ্ডিয়ান ঘুরে এসো। আমাদের আবার ভুলে যেও না!"

'আমাদের' বললো, না 'আমাকে'!

মুখ তুলে আবার বলল,

- "ফিরে এসো অভিজ্ঞতা নিয়ে। তাড়াতাড়ি।"

লড়াইয়ে যাবার আগে বাড়ির ছেলেকে বুঝি এমনি করে বিদায় দেয়! কে জানে? তরোয়াল-বন্দুক হাতে তো লড়াইয়ে যাই নি আমি! তবে, ঈভলীনের গলার স্বরে যেন আপনজন বিয়োগের ভয়। ভালো নয়, ঈভলীন। ভালো কথা নয়।

যিশু ওর পিঠে একটা মৃদু চাপড় দিয়ে হাসল। 'ধরে ফেলেছি'র মতো গলা করে বলল,

—"জেলাসি, জেলাসি! জালুজি ঈভলীন। হুঁহুম্! ভালো লক্ষণ নয়, মাদাম! আমরা, মানে, আমি, লিয়ঁ কিংবা দেনিস-টেনিস যখন জীনেতের নেমন্তন্নে গেছি, তখন তো এমনি করে বলো নি, বাপু! বলি, আমরা কি তোমার পর হয়ে গেলুম? হেসে হাততালি দিয়ে আমাদের বলেছো, 'যাও, যাও! মূর্তিমান জিগোলো সব—মজা লুটে এসো'! "

কি একটা শব্দ বললো যিশু? ধরতে পারলুম না। বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি বললে? কি গোলো? মানে কি ওর?"

যিশুর কথা হেসেই যেন উড়িয়ে দিল ঈভলীন।

আমার কথার জবাব দিল যিশু,

—"রঁদেভুতে যাও! সব বুঝে-শুনে আসবে। যদি কিছু বাকি থাকে, ফিরে এলে আমরা বুঝিয়ে দেব, খোকাবাবু!"

বলে, উঠে দাঁড়াল। বোর্ডটোর্ড রেখে হঠাৎ বেরিয়ে গেল। মুখে বলল,

—"ঘুরে আসছি। এক মিনিট্।"

ঈভলীন আমার দিকে চেয়ে আছে এখন। পলক পড়ছে না চোখে। কয়েক মুহূর্ত ওকে দেখে নিয়ে অল্প হাসলুম। ডান হাতে ওর শ্যাম্পেনের গেলাস। বাঁ হাত টেবিলে ফেলে রাখা। টেবিলের কালো কাচে ওর অন্ধকার মুখের প্রতিবিম্ব। ফর্সা মেয়ে ঈভলীন কেমন কালো এবং উল্টো হয়ে আমায় দেখছে। সোজাসুজি আমার দিকে চেয়ে আছে বলে কাচে ওর চোখ দেখা যায় না। গলা, চিবুক, ঠোঁটের দু' পাশে গাল। তার নিচে কপালের রেখা। সব ঈভলীনের। সমস্তই কালো এখন। টেবিলে ফেলে-রাখা ওর ফর্সা ডান হাতের পিঠ এবং সরু আঙুলগুলি ঢেকে দিলুম। মুখ তুলে চেয়ে মৃদু চাপ দিলুম আমার এই রুক্ষ বাদামী হাত দিয়ে। গলার স্বর নিজে নিজেই অন্য রকম হয়ে গেল, যখন বললুম,

—"তুমি কি রাগ করবে, আমি যদি জীনেতের নেমন্তন্ন রাখতে যাই?"

গোলাপী ঠোঁটের পাপড়ি মেলে ধরল আস্তে আস্তে। ঈভলীনের এই হাসির অর্থ আমি আজও বুঝি না। এমন অসহ্য হাসি বুক কাঁপিয়ে দেয়। ও যদি এখন বলে, তুমি যেও না। আমি যাবো না। ও যদি এখন বলে, তুমি শুধু আমার সঙ্গে যাবে। আমি যাবো। আমি যাই।

ঈভলীন বললে,

—"তুমি কিচ্ছু বোঝো না, ইণ্ডিয়ান! তুমি বড় বোকা। কচি খোকাবাবু!"

বললুম,

—"তুমি শুধু একবার 'না' বলো। আমি যাবো না।"

অল্প মাথা দুলিয়ে, এক সেকেণ্ডের জন্যে দুটি চোখের পাতা বুজিয়ে হাসিমুখে বলে দিল,

—" 'যাও' বলবো না। বলবো, ঘুরে এসো।"

চোখ খুলে এক চুমুকে শেষ করে দিল গেলাস। বলল,

—"তবে, খুব একটা দরকার ছিল না যাবার। কারণ, তুমি যা খুঁজে মরছো, তা তুমি পাবে না!"

—"কি খুঁজছি আমি?"

—"সুখ। আমি তোমাকে সুখী দেখব বলে বসে আছি, আমার ইণ্ডিয়ান।"

উঠে দাঁড়িয়ে সোজা কাউন্টারের দিকে হাঁটতে লাগল। বিল মেটাতেই বোধ হয়।

ওর শেষ কথাগুলির প্রত্যেকটি অক্ষর টেবিলের কাচের ওপরে দাঁড়িয়ে নাচতে আরম্ভ করল। ঠিক ছোটো ছোটো চড়ুই পাখির মতো। নাচতে নাচতে গায়ে গায়ে জড়িয়ে দলা পাকিয়ে গেল অক্ষরগুলো। আমি চিনতেই পারলুম না।
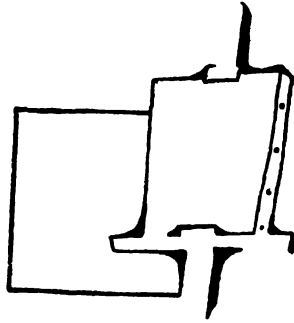
যিশুকে ফিরে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালুম। কাছে এসে আমার পিঠে হাত রাখল যিশু। বলল,

—"তোমাকে এক্ষুনি একটা উপহার দেব। কথা দাও, সেটি কাল সকালের আগে তুমি খুলে দেখবে না!"

বললুম,

—"কি উপহার?"

—"সেটাই তো কাল সকালের আগে তুমি জানবে না। কথা দাও।"

—"কিন্তু, কি জন্যে উপহার হঠাৎ?"

—"সন্ধ্যেবেলা তোমার রঁদেভুর জন্যে শুভকামনাসমেত—।"

মাথা নেড়ে হাসলুম,

—"ঠিক আছে। কথা দিলুম কাল সকালে দেখব। দাও।"

ব্রাউন কাগজে মোড়া ছোট্ট একটি প্যাকেট হাতে ধরিয়ে দিল যিশু। কুড়ি সিগারেটের প্যাকেটের মতো দেখতে।

আঙুলের চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,—"সিগারেট ?"

হাঁ-হাঁ করে উঠল যিশু,

—"এই, এই ! করো কি ? চাপ দিও না রাত ফুরোলে খুলে দেখো।"

ঈভলীন বিল মিটিয়ে ফিরে এল। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললুম,

—"তুমি যতোটা আমাকে কচি খোকাবাবু ভাবো, ততটা আমি নই। দেশে অন্তত একশো মেয়ের সঙ্গে বিছানায় বেড়িয়ে এসেছি, মাদাম।"

ঈভলীন হেসে উঠল। কানে কানে বলল,

—"তোমার সেসব দৌড় বোঝবার মতো বোধবুদ্ধি আমার হয়েছে, মঁসিয়। তবে, ভুলে যেও না, ভারতবর্ষ আর প্যারিসে এখনো দূরত্ব অনেক। এখানে তুমি আজও কচি খোকা।—"

তারপর, আমার গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে গলা তুলে বলল,

—"গুডলাক। ঘুরে এসো।"

যিশুও বললে, কপট অসন্তোষ দেখিয়ে,

—"যদিও এমনভাবে কানে কানে কথা বলা অসভ্যতা, তবুও, বঁ কুরাজ, মনামি। আভোয়া।"

গালে হাত বুলিয়ে বললে,

—"তবে, দাড়িটা অন্তত কামিয়ে যেও, দোস্ত্!"

ড্রয়িং বোর্ড, থলেটি যিশুর জিম্মায় রেখে ওদের বিদায় জানালুম। হেঁটে হেঁটে চলে এলুম 'গার-দ্যু-নর'। নাকের কাছে হাত তুলে জ্যাকেটের গন্ধ শুঁকলুম। দুর্গন্ধ ঠিক নয়, বোঁট্কা স্যাঁৎসেঁতে বা তেলচিটে গন্ধ। আসল রঙটাই ময়লা জ্যাকেটের। সুতরাং কতদূর ময়লা হল, চট করে বোঝবার উপায় নেই। শৌখিন সেলুনে ঢুকে তিন দিনের বাসি দাড়ি কামিয়ে নিলুম। খসে গেল পাঁচ ফ্রাঁ, প্রায় আটটি টাকা। এক ফ্রাঁ বখশিশও দিয়ে দিলুম নাপিত ভায়াকে। ওকে 'নাপিত' বলবে কোন্ শালা।

মেট্রোয় চেপে সোজা অদিয়ঁ। বিকেল সাড়ে ছটা। রোদ নেই। অথচ আজ যে রোদ ছিল প্রায় সারাদিন, রাস্তার লোক দেখলেই তা বোঝা যায়। চারিদিকে রঙিন পোশাকের ছড়াছড়ি। শীত-বৃষ্টির ধূসর ভাব নেই বললেও চলে। সব রেস্তোরাঁর সামনে, ফুটপাথে টেবিল-চেয়ার পেতে বসে গেছে মানুষ-মানুষী।

হাসি-ঠাট্টা, হুল্লোড়ের শব্দে সারা প্যারিস খুশির গয়না পরে নিয়েছে। স্তেন নদীর গায়ে গায়ে হাঁটতে লাগলুম।

লা তুর দার্জ । সাতটা বাজতে দশ। জীনেত এখনো নিশ্চয়ই এসে পৌঁছোয় নি। কাচের দেওয়াল পেরিয়ে হোটেলের ভেতরকার চেহারা, সাজগোজ দেখেই দুশ্চিন্তা হল, আমার এই বীভৎস পোশাকে ঢুকতে দেবে তো!

একটু সরে এসে রাস্তার দিকে চেয়ে সিগারেট ধরালুম। দু'চার টান দিতে না দিতেই বিশাল একটি কালো গাড়ি এসে ঠিক দরজার সামনে দাঁড়াল। বেড়ালের মতো নিঃশব্দে। শেভ্রলেই বোধহয়। হেডলাইট থেকে পেছনের নম্বর-প্লেট পর্যন্ত লম্বায় প্রায় একটি সরকারী বাস। দামী হোটেলের ঝকঝকে গেটবয় দৌড়ে এসে পেছনের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। সম্মান দেখাতে সামান্য ঝুঁকে। কালো গাড়ি থেকে ফেনার মতো সাদা এক সম্রাজ্ঞী রাস্তায় আলতো পা' রেখে বেরিয়ে এলেন।

সন্ধ্যে উতরে গেছে বলা যাবে না। অথচ দিনের সেই উজ্জ্বলতা নেই আর। আকাশের নীলও প্রায় অন্ধকারের মতো গাঢ়। দেওয়াল ঘেঁষে একটু আড়ালে দাঁড়িয়েছিলুম, যাতে গেটবয়টির নজরে না পড়ি। কারণ, ও যদি দেখে একটা ভিখিরি—নোংরা পোশাকের লোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল এবং সেই লোকটাই হোটেলে ঢুকে গেল, তাহলে, নাক সিঁটকে অবাক হতে পারে। ওকে অবাক করবার ইচ্ছে আমার নেই। তা ছাড়া দামী এক মহিলার সঙ্গে নামী-দামী যাকে বলে গিয়ে, 'পশ' একটি হোটেলে ঢোকবার জন্যে ওঁত পেতে গেটের সামনে অপেক্ষা করছি—এতে সম্মান খুব বাড়বে না। আসলে, ওই সাহেব নাপিতকে দিয়ে দাড়ি কামিয়ে তাকে বখশিশ দেবার পর এই মানসিকতাটি তৈরি হয়েছে। গেটবয় হলেও আমার চেয়ে পোশাক-আশাকে একশোগুণ দুরস্ত বলেই মানুষটি আমাকে এক পলক হলেও ঘেন্নার চোখে দেখবে, এটা হজম করতে পারছিলুম না অবচেতনায়। অথচ ওর নাম জানি না, চিনি না, ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, ছিল না, থাকবার কারণও বিশেষ দেখি না। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে করতে ভাবলুম কমপ্লেক্স? হবেও বা!

এই রকম মাটিতে লুটিয়ে-পড়া ছড়ানো সাদা পোশাকে জীনেতকে চিনতে ভুল হতেই পারে! তবু, যেহেতু মুখটি আমার আঁকা, তাই এখন স্বপ্নের সম্রাজ্ঞীর মতো দেখালেও ওকে চিনে ফেলতে বিশেষ অসুবিধে হল না।

জ্বলন্ত সিগারেট জুতোর চাপে নিবিয়ে দিলুম। ভেবে দেখলুম, হ্যা হ্যা করে

এক্ষুনি এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কিনা। ওজন কমে যেতে পারে! গাড়ি দেখেই বোঝা যায়, মহিলার অগাধ পয়সা-কড়ি। আমি ওর তুলনায় ফোতো কাপ্তেন! ওকে ভেতরে ঢুকতে দিয়ে, রয়ে সয়ে এমন কি একটু দেরি করে দেখা দিলেও ক্ষতি নেই। গমক বজায় রাখতে হবে তো! আর একটা গোলওয়াজ ধরিয়ে ফেললুম। মোটামুটি আট থেকে দশ মিনিট মতো লাগে একটা সিগারেট পুড়তে। এটা শেষ হলে, ধীরে-সুস্থে জীনেতের কাছে যাবো।···

—"জল! একটু জল দেবে?"

চমকে উঠলুম বাংলা শুনে!

কোথায় জীনেত? কোথায় কি? ঝিমুনি আসছিল। কি ভাবতে ভাবতে কোত্থেকে কোথায় পৌঁছে গিয়েছিলুম। গোবিন্দর মাথাটি কোলে নিয়ে ওর ঘরে বসে আছি। শেষ রাতে মেজোঁর ঘরে।

জল চাইছে গোবিন্দ।

—"দিচ্ছি!"

বলে, দু' হাতে ধরে ওকে আমার কোল থেকে উঠে বসতে সাহায্য করলুম,

—"একটু উঠে বোসো। আমি নিয়ে আসছি!"

খাটের পায়ায় হেলান দিয়ে বসল গোবিন্দ। অনেক যন্ত্রণার পর ম্লান হাসল আমার দিকে চেয়ে। চিবিয়ে চিবিয়ে জড়ানো গলায় বলল,

—"তুমি না থাকলে, আরো অনেক বেশি কষ্ট হতো ভাই!"

গোবিন্দর ভার আমার উপর নেই আর। তবু আমি উঠে দাঁড়াতে পারছি না। ডান পায়ে ঝিঁঝি ধরে পুরোপুরি অবশ। একটু টান করবার চেষ্টা করছি আর সারা পায়ে ঝনঝন বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। দু' হাত, হাতের আঙুল, মাথা, এমন কি, ডান পায়ের অবধারিত সঙ্গী বাঁ পায়ের কিছুই হয় নি। প্রায় আধ ঘণ্টা-টাক গোবিন্দর মাথার ভার সয়ে ইনি একেবারে শরীর থেকে যেন আলাদা হয়ে গেছেন। কড়ে আঙুলের আলতো টোকা সইতেও রাজী নন। শব্দহীন ঝংকার তুলে আপত্তি জানাচ্ছেন! হাসি পেয়ে গেল।

গোবিন্দ বললে,

—"কি হল?"

হেসেই বললুম,

—"কিছু না। এই, ঝিঁঝি ধরেছে একটু। এক সেকেণ্ডে ঠিক হয়ে যাবে। উঠে, জল দিচ্ছি তোমায়।"

গোবিন্দ নিজেই উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গী করল। বলল,

—"ঠিক আছে। তুমি বোসো। আমি নিজেই নিয়ে নিচ্ছি।"

হাত ধরে বারণ করলাম।

জোর-জবরদস্তি বুড়ো আঙুল নাড়তে লাগলুম খুব ধীরে ধীরে। চিমটি কেটে, মৃদু চাপড় দিয়ে পা টানটান করে ফেললুম। এই রকম সাময়িক আশ্চর্য অস্বস্তির জন্যে হাসি পাচ্ছে। যন্ত্রণা নয়, ব্যথা নয়, একেবারে অন্য রকম অসুখ। গোবিন্দর মতন পাশবিক ব্যথা-যন্ত্রণার পর আমার এই ঝিঁঝি-ধরা খুব সাধারণ-ভাবেই হাস্যকর অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স। চোখে মুখে হাসির সঙ্গে বিরক্তি কুঁকড়ে ওর দিকে তাকালুম। বেচারা! বন্ধুর পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে, হাসি পাবারই কথা। গোবিন্দও হাসছে। কিন্তু ক্লান্ত ম্লান মুখে সামান্য হাসির রেখাটি কেমন করুণ দেখাচ্ছে।

'ধুত্তোর' বলে উঠে দাঁড়িয়ে মনের জোরে পা ঝাড়া দিতেই আস্তে আস্তে টের পেলুম, হ্যাঁ, আছে! এই তো আমার সবেধন নীলমণি ডান পা! আছে!

কার্পেটের কোণে গোবিন্দর গেলাস কাত হয়ে পড়েছিল। তুলে, বেসিন থেকে জল ভরে এনে ওকে দিলুম। কত্‌কত্‌ শব্দে সব জলটুকু খেয়ে ফেলল গোবিন্দ। খেয়ে, চোখ বুজে দীর্ঘ সময় ধরে তৃপ্তির শ্বাস ফেলল,

—"আহ্‌!"

তারপর, গেলাস সমেত হাত বাড়িয়ে যা বলল, তাতে আমি চম্‌কে উঠলুম, না ভয় পেলুম, না রেগে গেলুম—নিজেই বুঝতে না পেরে কয়েক সেকেণ্ড ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকলুম হাঁ করে।

ও তখন আবার বললে,

—"কি দেখছো কি হাঁ-করে? দাও, খানিকটা মাল দাও ঢেলে!"

বললুম,

—"তোমার ওই প্রচণ্ড ব্যথার পর আবার মদ খাবে এখন?"

হেসে হাত ঝাঁকাল গোবিন্দ,

—"দুদ্দুর! কিস্যু হবে না ওতে! দাও।"

একবার ভাবলুম, বলে দিই, 'না, দেব না'। পরের মুহূর্তেই মনে হল, মাসীমা, ঠাকুমা বা গুরুজন সাজবার আমার দরকারটা কি? তোমার ব্যথা, শালা, তুমি বুঝবে, আমার বয়েই গেল! শুধু, ওই অসহ্য যন্ত্রণার মুখ আমি দেখতে চাই না আবার।

বোতলে তিন-চার পেগ আছে। এগিয়ে দিলুম টেবিল থেকে।

এক হাতে গেলাস অন্য হাতে বোতল নিয়ে খাটে উঠে বসল গোবিন্দ। জুত করে দেওয়ালে হেলান দিয়ে, পা ছড়িয়ে। কে বলবে, এই লোকটাই আধ ঘণ্টা আগে কী ভয়ঙ্কর শব্দে গলাকাটা জন্তুর মতো কাত্‌রাচ্ছিল।

ওকে আরামে বসে পড়তে দেখে অন্যভাবে খোঁচা দিতে ইচ্ছে হল। মিশেলের ঠোঁটের কোণে রক্তাক্ত কেটে যাওয়ার দাগটিই বোধহয় আমার অজান্তে আমাকে খুঁচিয়ে দিল এখন।

বললুম,

—"মনে হয় না, অমন যন্ত্রণা-ব্যথা শুধু শারীরিক অত্যাচারের ফল। একটা সরল পরদেশি মেয়েকে কব্জায় পেয়ে তার ভালোবাসার সুযোগ নিয়ে যখন-তখন অসম্মান, মারধোরের ফলও সেই সঙ্গে জড়িয়ে। তোমার মন-টন নেই বলেই হয়তো দৈহিক কষ্ট হয়ে সেইসব পাশবিকতা ফিরে আসে তোমার শরীরে। সুতরাং, তোমার মৃত্যু বা ব্যথাট্যথার সঙ্গে মদের তেমন সম্পর্ক নেই বোধহয়। খাও। ঢেলেঢুলে, জমিয়ে খাও, ইচ্ছে মতন। আমাকেও দাও দেখি খানিকটা।"

বলে, টেবিলে রাখা আমার গেলাসের তলানিটুকু এক চুমুকে শেষ করে দিলুম। ওর পাশে বসে বাড়িয়ে ধরলুম খালি গেলাসটি।

মদটুকু ভাগাভাগি করে ও বলল, নিজের সঙ্গেই কথা বলছে যেন,

—"সেই জাপানী 'বুমে'র দিন, দোতলার বাথরুমে তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল, আমি জানি।"

বলে, হাসল।

বড় এক ঢোক গিলে ফেলে, হাতের মধ্যে ঘোরাতে লাগল গেলাসটা। বলল,

—"তোমাকে আজ কিছু কথা, মানে, আমার হৃদয়ের গোপন কথাই বলে ফেলব, ভাবছি। মেজোঁর কাউকে, দেশে আমার বাবাকেও আর এসব কথা বলার কোনো মানে নেই আর। মেজোঁর কেউ বুঝবেই না, বা গুরুত্ব দেবে না। তুমি সেন্‌সিটিভ্‌, তুমি বোঝার চেষ্টা করবে। মিশেল জানে না। ওকেও বলি নি, তাই ও পারে নি। তুমি হয়তো ভেবেচিন্তে আমাকে ক্ষমা করতে পারবে। বাবাকে বললে, বুড়ো বয়সে, শুধু অকারণে কষ্টে ভুগবেন।—"

সামনের দেওয়ালে শূন্য চোখ মেলে চেয়ে থাকল।

বেসিন থেকে জল মিশিয়ে আনলুম গেলাসে। ওকে বললুম,

—"জল চাই সঙ্গে ?"

আমার দিকে না ফিরে, সামান্য মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল, না।

ওর পাশে চুপচাপ বসে পড়লুম আবার।

দু'-এক ঘণ্টার মধ্যেই প্যারিসের রাত শেষ হয়ে যাবে। নেশা-ঘুম-খিদে সব চটকে একাকার। নিচের 'বুমে' নাচটাচ বোধহয় শেষ এতক্ষণে। ফিরোজ, কানাই যার যার ঘরে কম্বলের তলায় আরামে ঘুমুচ্ছে এখন। প্যারিসে অথবা পৃথিবীর যে সব রাজ্যে রাত এখনো ফুরোয় নি, সেখানে কে কে অথবা কত মানুষ-মানুষী আলাদা আলাদা আপন কারণে বা প্রয়োজনে এখনো যন্ত্রণায় জেগে আছে, আমি জানি না। আমি জানি, আমার গায়ে গা ঠেকিয়ে একটি কালো মানুষ দেশি-ছাপ-মারা, দেশের গন্ধ-মাখা অল্প চেনা বা অচেনা চেহারা নিয়ে নিজের গোপন কথা, মনের শব্দ ভাবছে। দূরে কোথাও, এই মায়াবী শহরেই, রুক্ষ, বুনো অথচ সুশ্রী একটি মুখ হয়তো যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ক্ষুধার্ত, ধর্ষিতা মিশেল কি তার উলঙ্গ, রক্তাক্ত, শরীর নিয়ে শীতের দেশের ফুটপাথে ঘুমিয়ে পড়েছে ?

তাড়াতাড়ি মন ফিরিয়ে গোবিন্দর দিকে তাকালুম।

এ কি! ও তো কাঁদছে! দেওয়ালে হেলান দেওয়া মুখ। গেলাস নিয়ে হাতটি কোলের ওপর রাখা। চোখ বুজে আছে গোবিন্দ। চোখ বন্ধ করে থাকলেও, জল কেন বেরিয়ে আসে, বোঝা দায়। বিংশ শতাব্দীর যে কোনো পশুর কালো মুখে চক্‌চকে ফাটলের মতো জল। দুই গাল এবং নাকের দু' পাশের উপত্যকা বেয়ে শীর্ণ নদীর স্রোত। ওর চোখের জল যদি উষ্ণ হয়, তবে, উষ্ণ স্রোত। ওর চোখের জলে যদি নুন মেশানো থাকে, তাহলে, উষ্ণ-নোনা জল। নুনের জ্বালায় বন্ধ চোখের ফাটল ভেঙে ফোঁটা ফোঁটা বেরিয়ে আসছে। চিবুকের দু'পাশে এসে জড়ো হচ্ছে। এক মুহূর্ত চক্‌চকে ফোড়ার মতো ঝুলে থেকে, হাত-পা ছেড়ে দিয়ে পড়ে যাচ্ছে ওর কোলে। কোলের গেলাসে।

নীট জিনের সঙ্গে উষ্ণ-নোনা জল মিশিয়ে আমি খাই নি কখনো। তাই, কেমন লাগবে বুঝতে পারলুম না। তবু, নিতান্তই মানুষিক প্রবৃত্তির জন্যেই বোধহয় ডানহাত গোবিন্দর মুখের কাছে পৌঁছে গেল। যে হাতে বহু মারামারি করেছি, ঈভলীনের নরম আঙুলে মৃদু চাপ দিয়েছি, ছবি আঁকছি এবং যে হাত দিয়ে এই গোবিন্দর পিঠেই একটি জোর থাপ্পড় মেরেছিলুম, সেই মানুষের হাতই ওর গাল, চোখের কোল কেমন দ্বিধাহীন মুছিয়ে দিল।

আস্তে আস্তে বললুম, খুব নরম গলায়,

—"কি কথা বলবে বলছিলে! বলে ফেলো। হালকা লাগবে।"

চোখ মেলে চেয়ে এক ঢোকে গেলাস শেষ করল গোবিন্দ। বাঁ হাতের পিঠে টেক্সাস ছবির নায়কের ধরনে ঠোঁট মুছতে মুছতে চোখও মুছে নিল, টের পেলুম। যে কোনো সুস্থ, স্বাভাবিক লোকের মতো উঠে গেলাস রাখল টেবিলে। ধীরে ধীরে হেঁটে আলমারির কাছে এগিয়ে গেল। মেঝেয় এবং কার্পেটে ছড়ানো সব কাগজপত্র তুলে আনল খাটে। ফিরে গিয়ে, আলমারির থেকে সেই কফির কৌটো বের করে এক মুঠো গোলমরিচ হাতে নিতেই বলে ফেললুম,

—"এক্ষুনি আবার খাচ্ছো ওইসব!"

ঘুরে তাকিয়ে হাসল। কিছু বলল না। মনে মনে চটে গিয়ে আবার ভাবলুম, মাসীমা ঠাকুমা বা গুরুজন সাজবার দরকারটা কি আমার? যেই কাটা-পাঁঠার মতো ছটফটাতে আরম্ভ করবি—এক লাথি কষিয়ে বেরিয়ে যাবো!

গোবিন্দ খাটে এসে বসল। আমাদের দু'জনের মধ্যিখানে কাগজপত্র, ফাইল, এক্স্-রে প্লেটগুলি। একটা কালচে প্লেট হাতে তুলে গোবিন্দ বললে,

—"আমার পেট থেকে গলা অবধি তোলা ছবি। ছাখো!"

হাতে ধরিয়ে দিল। ওর গলা বা পেটে দেখবার কি আছে, না বুঝেও আলোর সামনে ধরে গভীর মনোযোগে দেখবার চেষ্টা করলুম।

ও হেসে বললে,

—"কি বুঝছো!"

ফিরিয়ে দিলুম ওর হাতে। বললুম,

—"কিচ্ছু না।"

ফরাসী নার্সিং হোম, হাসপাতালের কাগজগুলো ঘাঁটতে লাগল। ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা সাদা বড় খাম। তার ভেতর থেকে বড়সড় কাগজ বেরোল একখণ্ড। কলকাতার নামী ক্লিনিক-ল্যাবরেটারির ছাপ মারা কাগজ। এক-দুই-তিন নম্বর দিয়ে টাইপ করা অজস্র ডাক্তারী শব্দ, যার বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারা ভার। কতগুলো লাল শব্দ দেখিয়ে গোবিন্দ বললে,

—"এগুলো পড়ো। বুঝতে পারবে।"

মনে মনে বিড়বিড় করে আওড়ালুম। বুঝলুম—কচু!

দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে গোবিন্দ। আগের মতো পা ছড়িয়ে আরামের ভঙ্গি। চোখ বুজে বলল,

—"পড়ো। জোরে জোরে পড়ো, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

পড়লুম,

"হার্ট্।…সেপ্টাল ডিফেক্ট্ অফ এ মাইল্ড্ ভ্যারাইটি…লীডিং টু হার্ট্ এন্লার্জ্মেন্ট্ অ্যাণ্ড্ ফেইলিওর।…"

চোখ বুজে শুনছে গোবিন্দ। বললে,

—"বুঝতে পারছো না! আমার বিশাল হৃদয়ের গোপন খবর বলছে। পড়ো, দু' নম্বরটা পড়ো।"

—"রিউম্যাটিক এওটিক ভালভুলার ডিজীজ্…ডায়াফ্র্যামেটিক্ হার্নিয়া উইথ্ সিম্প্টম্স্ অফ্ হাইপার অ্যাসিডিটি অ্যাণ্ড্ আলসার…কার্ডিয়াক অ্যাস্থ্মা…! দূর, এসব কী গোবিন্দ? কিছুই বুঝতে পারছি না!"

চোখ না খুলেই হাসল। তারপর তাকাল আমার দিকে। বলল,

—"যাবার রাস্তার নাম-পরিচয়। আমার মরে যাবার রাস্তার!"

হেসে বললুম, কাগজটি ভাঁজ করে খামে ভরতে ভরতে,

—"দুঃখবিলাস ভালো গোবিন্দ! তবে, ভোর রাতে নয়! আমার ঘুম পাচ্ছে আবার। চলি।"

সঙ্গে সঙ্গে না হলেও, ভোর হবার আগেই গোবিন্দ আমার বুকে জোড়া পায়ে লাথি মারল। মাথা নিচু করে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। জেনে এলুম, ও আসছে মাসে দেশে ফিরে যাচ্ছে। মরতে যাচ্ছে। স্টাইপেণ্ডের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে চলে যেতে হয় ছাত্রদের। কারণ, তার ভাবী-মৃত্যুর জন্যে কারো মাথাব্যথা নেই। কত লোক মরে, বাঁচে। হরিদাস পাল অথবা গোবিন্দ শোধরির মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।

স্টাইপেণ্ড্ যোগাড় করে আসলে চিকিৎসা করাতে এসেছিল গোবিন্দ। নিখরচায় হাসপাতালে ছিল প্রায় ন' মাস। হৃদয় বড় হয়ে যায় ওর। হৃদয়ের আশেপাশে অজস্র জটিলতা। দু-দুটো অপারেশনেও জট ছাড়িয়ে মৃত্যু পেছোনো যায় নি। এখানে থাকতে পারলে, আবার ফরাসী সরকারের খরচায় হাসপাতালে চলে যেতো। ঘন ঘন শরীরের চামড়া কেটে এখানকার বিদ্বান ডাক্তাররা জট ছাড়িয়ে জীইয়ে রাখতে পারতো ওকে, হয়তো। ভিসা, স্টাইপেণ্ডের মেয়াদ ফুরোলে, আশা ফুরিয়ে যায়। গোবিন্দর মতো কেউ কেউ আগে থেকেই জেনে যায়—চলে যেতে হবে।

গোবিন্দ বললে,

—"মিশেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যখন একটা কাছের মানুষীকে পাবার আশা তৈরি করছে, তখনই, নথিপত্র, হাসপাতাল এবং ডাক্তারের কাছে খবর নিয়ে জানলুম, আমার ভিসা, স্টাইপেণ্ডের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে।"

একটু থেমে, আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলেছে, নিজের মনে মনেই যেন,

—"ও আমাকে ভালোবাসতে বাসতে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। আমার স্ত্রী হবার বড় বাসনা মিশেলের। ইণ্ডিয়ান শোধরির ঘরের বউ। ওকে সরাতে পারছিলুম না। অপমান করেছি, মেরেছি—কেঁদে-কেটে ও আমাকে ভালো-বেসেছে। তুমি বা তোমার ওই সুন্দরী বান্ধবী ঈভলীনের সাহায্য ছাড়া ওকে আমি সরাতে পারতুম না!—"

প্রচণ্ড লাথিটা হজম করে চুপচাপ বসে রইলুম।

ও বললে,

—"সেই জাপানী বুমের দিন কিন্তু ওকে আমি আঘাত করি নি। অন্য একটা যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে নেচে ওকে অপমান করতে চাইছিলুম। ও আমাকে ছাড়বেই না। ধাক্কা দিয়েছিলুম। পড়ে গিয়ে ঠোঁটের কাছে লেগেছিল।—"

ফিরে তাকিয়ে বলল,

—"ধন্যবাদ, ভাই। বাঁচিয়ে দিয়েছো আমাকে।—"

কাঁদছে গোবিন্দ। ঝরঝর করে কাঁদছে। এবার আর ওর চোখের কোল মোছাতে আমার হাত উঠল না। থম্ ধরে বসে থাকলুম।

একটু বাদে জিজ্ঞেস করলুম, খুব আস্তে আস্তে,

—"ওকে দেশে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেই পারতে! তোমার মৃত্যুর দিন তো তুমি জানো না।"

—"আমার বাবার সোঁদা ঘর পালপাড়ার ক্যাম্পে। বাবা গোঁড়া মানুষ। সহ্য করতেন না। আমার বড় হৃদয় নিয়ে আমি ওঁর আগেই মারা যাবো, উনি জানেন না। জানেন শুধু দেশে ফিরছি আসছে মাসে। বিলেত-ফেরত শিল্পী ছেলে দেশে ফিরছে, বড় চাকরি, সব দুঃখ ঘুচবে—সেই আনন্দে আছেন। মিশেলকে নিয়ে গোণাগুণতি দিন কয়েকের জন্যে ঘর বাঁধা যেত। কিন্তু, ও তো ওর স্বপ্নের ইণ্ডিয়ার কিছুই পেত না! আমার এতো কাছের মৃত্যুর পর ওর কি হতো?"

গোবিন্দকে এখন আর বলতে ইচ্ছে করল না, যে, মিশেল এখন, এই মুহূর্তে বেঁচে আছে কিনা জানি না। আমার খোঁজে আমার কাছে এসে, আমি না

থাকায়. এখন যদি ও কোথাও বিবস্ত্রা, ধর্ষিতা নারী হিসেবে পড়ে থাকে, তবে, গোবিন্দকে সে কথা জানিয়ে লাভ নেই। ও যে মরে যাবে দেশে ফিরতে ফিরতেই, তা আমি টের পেয়ে গেছি। ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় গোবিন্দর বাবা, সেই আমাদের রঘুপতির কোলে মৃত, দুঃখিত এক ছেলের নীল মুখ আমি কল্পনায় দেখতে পেলুম। যে-ছেলে তার বড়সড় হৃদয়টির জন্যে বিদেশ ছেড়ে, দেশ ছেড়ে চলে গেল।

পা টেনে টেনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম। দোতলার করিডোর ধরে হাঁটছি। নিঝুম ঘুমোচ্ছে মেজোঁন্দ্যল্যান্দ। শুধু আমার জুতোর বেতালা শব্দ গমগম করছে।

করিডোরের শেষে আমার ঘর। চোখ তুলে দেখলুম, মৃদু আলোয় আমার বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে গুটিসুটি বসে আছে মেয়েটি। আমার অপেক্ষায় ক্ষুধার্ত সারা রাত জেগে, দু' হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে। মুখ দেখতে না পেলেও চিনতে একটুও কষ্ট হলো না। মিশেল!
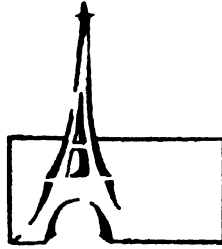
ছোট্ট বুনো পাখিটি তার পাখা এবং পালকের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে যেন। শূন্যে নিস্তব্ধ করিডোরের শেষে আমার বন্ধ ঘরের দরজায় পিঠ রেখে মিশেলের ঘুম। পিগাল থেকে ফিরে ওকে না পেয়ে নিজের ওপরে যত রাগ, ওর জন্যে যত দুশ্চিন্তা, ভয়, কষ্ট এতক্ষণ দানা বেঁধে পাথরের মতো জমছিল, সব জল হয়ে গেল। সমস্ত মনের ভার হাল্কা করে দিয়ে কেঁদে ফেললুম। ছেলেমানুষের মতো। বসে পড়লুম ওর মুখোমুখি। ও টের পেল না। তেমনি গুটিসুটি ঘুমোচ্ছে। মেজোঁর যে কোনো বাসিন্দা এখন দরজা খুলে হঠাৎ বেরিয়ে এলে অবাক হবে। ভাববে, এমন নিঝুম নির্জনে বসে এই সময় দুটো নারী-পুরুষ করছেটা কি। আদর নয়, চুমু খাচ্ছে না, জড়াজড়ি করে বসে নেই। যুদ্ধের দিন প্যারিসের শেষ রাতে এমন দৃশ্য অভিনব মনে হবে।

মিশেলের রুক্ষ চুলে হাত রাখলুম। ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে শ্বাসের শব্দে ডাকলুম,

—"মিশেল।"

হাঁটুর মধ্যে মুখ ডুবে আছে। ঘুম জড়ানো গলায় সাড়া দিল,

—"উম্!"

চুলে ঢাকা কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললুম,

—"আমি এসে গেছি মিশেল!"

আস্তে আস্তে মাথা তুলল। মুখটুকু শুকিয়ে আরো ছোটো, আরো করুণ, মনে হল। প্রথমে ভীত চোখে মেলে দেখল আমায়। তারপর চারপাশে শূন্য করিডোরে। ফিরে তাকাল আবার। চোখে ঘুম। ম্লান, ক্লান্ত হাসি ফুটলো ঠোঁটের কোণে। পৃথিবীর যে কোনো শিশুর নিষ্পাপ গলায় বলল ধীরে ধীরে,

—"আমার না, খুব খিদে পেয়েছে, ইণ্ডিয়ান।"

এমন করে বলল, চোখের জল সামলে রাখা দায়। ওর কপালে চুমু খেলুম। অবাক হয়ে একটু হাসল। হেসে, আমাকে ক্ষমা করে দিল বুঝি।

তর্জনী বুলিয়ে চোখের কোল মুছিয়ে দিতেই লজ্জা পাবার কথা মনে পড়ল। উঠে দাঁড়ালুম তাড়াতাড়ি। ব্যস্ত হাতে পকেটের চাবি খুঁজতে খুঁজতে বললুম,

—"এসো। ভেতরে এসো।"

ঘরে ঢুকে গায়ের কোট ঝুলিয়ে রাখল হ্যাঙারে। জুতো খুলে খাটের ওপরে গিয়ে বসে পড়ল। ঘরময় পেইন্টিং ছড়ানো। শুকনো আটটা ছবি দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা। নতুন তিনটে ভেজা এখনো। চিৎ হয়ে জর্জের দেওয়া কার্পেটের ওপরে শুয়ে আছে। টেবিল, চেয়ার এবং খাটটি ছাড়া মেঝেয় দাঁড়াবার জায়গাও নেই বললেই চলে। প্যালেট, তুলি, স্পাচুলা, তেলের ডিবে, রঙের টিউব— আমার মেজাজ মতো সারা ঘরে ছত্রাকার। আমার অনুরোধে, সারা সপ্তাহে শুধু একদিন এ ঘরে ঝাড়পোঁছ করে ফাম্ দ্য মিনাজ। বিছানার চাদর পালটে দেয়। আমার সঙ্গে বসে কফি খায় আর বকবক্ করে বুড়ি। বলে,

—"ছবি আঁকো। ঘর নোংরা কর। আমি কিসসু মনে করবো না। তুমি বড় মিষ্টি মানুষ গো, ইণ্ডিয়ান। উচ্ছন্নে যেও না। শিখতে আসে না, ছাই! মেয়েছেলে আর মদে ডুবে সব উচ্ছন্নে যেতে আসে এ বাড়িতে।"—

ঘুম ঘুম চোখে নতুন ছবিগুলো দেখতে লাগল মিশেল।

আপন আপন ঘরের বাইরে ছোট্ট ঝুল বারান্দাটিকে মেজোঁর বাসিন্দারা বলে

'অটোম্যাটিক ফ্রিজ'। গরম ঘরে কিছুই রাখা যায় না। ডিম, চীজ, চকোলেট বা বীয়ারের বোতল বারান্দায় রেখে দেওয়া চলে নিশ্চিত মনে। বাইরের ঠাণ্ডায় সব ঠিকঠাক থেকে যায় দিনের পর দিন। শীতবৃষ্টির সময় তো দুধ-দই, কাঁচা টমেটো, হ্যাম সপ্তাহের পর সপ্তাহ রেখে দিতুম। এখন, অতটা শীত নেই বাজারে। তাহলেও, ডিম-টিম দু-এক সপ্তা ভালোই থাকে। দরজা খুলে 'ফ্রিজে' এসে দাঁড়ালুম। শেষ রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া, শীত এখনো জ্যাকেট ছিঁড়ে চামড়ায় কাঁপুনি দিল। সুপার মার্শে পাওয়া কাগজের বাক্সে দুটি ডিম এক খণ্ড চীজ পড়ে আছে শুধু। ওগুলো ভেতরে এনে বন্ধ করে দিলুম দরজা।

গোবিন্দর হিটারে ডিম দুটো ভেজে কফি বসিয়ে দিলুম। চীজ, ডিমভাজা এবং কালো কফি খুব তৃপ্তি করে খেলো মিশেল।

খেতে খেতে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল,

—"কই, তুমি খাবে না ?"

অনেক আগে আমার খিদে পেয়েছিল এখন মরে গেছে। তাছাড়া, আর কিছু নেই ঘরে।

বলে দিলুম,

—"আমার খিদে নেই। খেয়েছি।"

এ সংসারে কখনো-সখনো কিছু ছোটখাটো মিথ্যে কথা বলতে যে কা ভালো লাগে, কী গভীর আরাম পাওয়া যায়! বুকের খাঁচার ভেতরে একটা সাদা কাকাতুয়া যেন গম্ভীর মুখে ঘাড় বেঁকিয়ে ঝুঁটি দুলিয়ে বলে ওঠে 'বাহ্, বেশ। ভালো!' কাকাতুয়ার ভারিক্কি আওয়াজ শুনতে শুনতে গরম কফিতে চুমুক দিলুম। বাহ্ বেশ! চেয়ারে বসে কোট-জুতো খুলে তুলে দিলুম টেবিলে।

জিজ্ঞেস করলুম,

—"তুমি নিচের 'রুম' থেকে সোজা এখানেই এসেছিলে ?"

—"আর কোথায় যাবো ? আজ তোমার কাছেই এসেছিলুম তো! দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শেষে বসে পড়লুম তোমার দরজায় হেলান দিয়ে।—"

গলায় কোনো অভিযোগ নেই। উলটে হঠাৎ যেন ভয়ে ভয়েই বললে,

—"তুমি রাগ করো নি তো, ইণ্ডিয়ান ?"

হেসে, মাথা নেড়ে জানালুম, না মোটেই না। একটুও নয়।

খাটের তলায় কাপ-ডিশ রেখে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল মিশেল! হাই তুলতে গিয়ে হাতের পিঠে মুখ আড়াল করল। তারপর মিষ্টি করে হেসে বলল,

—"এখন রাত কত ইণ্ডিয়ান ?"

সিগারেট ধরিয়ে দরজার কাচের বাইরে দেখালুম,

—"পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে ওই ছোট আকাশটুকুতে আলো দেখতে পাবে।"

তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে উঠে বসল মিশেল। পরিষ্কার বাংলা উচ্চারণে বলল,

—"রামকৃষ্ণ মিশন !"

ওর মুখে খাঁটি বাংলা শুনে হাঁ করে তাকালুম। ও গোল গোল চোখে নিজের ভাষায় ফিরে গেল,

—"আজ যাবো তো !"

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"প্যারিসে রামকৃষ্ণ মিশন আছে ? জানতুম না।"

খুব উৎসাহে আমাকে বুঝিয়ে বলবার মতো করে বলল,

—"আছেই তো ! শহরতলিতে। 'GRATZ'-এ। তুমি যাবে, ইণ্ডিয়ান ?"

—"আজ কি ব্যাপার ওখানে ? কোনো স্পেশাল কিছু ?"

ছেলেমানুষের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,

—"হ্যাঁ তো ! আমার বান্ধবী দ্যানিয়েল তিনশো রঙিন ছবি তুলে এনেছে। গেল বছর গিয়েছিল তো ভূপালে ! ওর গুরু আছে সেখানে। সারা ইণ্ডিয়া ঘুরে ঘুরে ছবি তুলেছে। আজ দেখাবে। যাবে তুমি ?"

ওর কথার সঙ্গে সঙ্গে মিশে গিয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নের দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় এবং কালীঘাটের মন্দিরের চূড়ো দেখতে পেলুম। সবুজ ময়দানে সাদা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। গাছের ছায়ায় চীনেবাদামওলা। রাতের চৌরঙ্গিতে মাতাল স্রোতের শব্দ, গঙ্গায় স্থির স্টীমারের ভোঁ, সেই সঙ্গে ফুটপাথে হাজার হাজার পুরোনো বইয়ের দিকে মুখ করে কফি হাউসের গুঞ্জন—এক, বড়জোর দুই মুহূর্তের মধ্যে শুনতে পেলুম পর পর। কী আসে যায়, কে অথবা কারা কত দূরে ! ঘুরে ঘুরে নাগরদোলা নামতে থাকে। হঠাৎই, হালকা হয়ে যায় শরীর, বুক।

—"আমায় নিয়ে যাবে মিশেল ? আমি যাবো দেখতে।"

—"নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো।"

মহাখুশি মিশেল। বললে,

—"তাছাড়া, আজ নাকি মিশনে ঠাকুরের ঘরে বসে তুমি মনে মনে যা চাইবে, তাই পাবে !"

— "বাহ্! খুব ভালো কথা!"

বড় বড় জিজ্ঞাসার চোখে চেয়ে বলল,

—"তুমি কী চাইবে, ইণ্ডিয়ান?"

দুম্ করে সুখ 'শব্দটি' বলতে গিয়ে হেসে ফেললুম,

—"মনের আরাম-টারাম কিছু একটা চেয়ে ফেলবো, দেখা যাক! তুমি কি চাইবে, মিশেল?"

প্রার্থনায় বসবার ভঙ্গিতে চোখ বুজে বলতে লাগল, গভীর আশা এবং বাসনা ওর প্রত্যেকটি কথায়,

—"ইণ্ডিয়ায় যেতে চাইবো। শ্বশুর-শাশুড়ি-সংসার থাকবে। কোনো ইণ্ডিয়ানের সন্তান বহন করব শরীরে। গাঢ় রঙের একটি শিশু আমার কোল থেকে উঠে থপ্‌থপ্ হেঁটে বেড়াবে। পড়ে যাবে। আবার ইণ্ডিয়ার ধুলো মেখে উঠে দাঁড়িয়ে সাদা ঝকঝকে দাঁতে হাসবে। অথবা কাঁদবে। আমি ফের কোলে তুলে নেবো—।"

নতজানু হয়ে বলতে বলতে কথা হারিয়ে ফেলল মিশেল। ঠোঁট কাঁপছে তির্‌তির্। দুই চোখের অন্ধকারের মধ্যে আপন ইচ্ছেমতোন স্বপ্ন দেখছে মেয়েটি। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলুম না। চোখ ঘুরিয়ে আমার স্বপ্ন-রাজ্যের সকাল দেখলুম।

প্যারিস ছাড়িয়ে আধঘণ্টা পেরোলে 'GRATZ'। মিশেলের মোটাসোটা ভ্যাবলা বান্ধবী ড্যানিয়েলের ছোট্ট গাড়িতে চারজন ভদ্রভাবে বসতে পারে। আমি জুটে গেছি ফাউ। মেজোঁ থেকে বেরোবার আগে বেশ জমিয়ে গরম জলে চান করে নিয়েছি। ঝরঝরে লাগছে। মিশেল বলেছিল,

—"এখন চান করে বেরোলেই ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

—"ইণ্ডিয়ার গরম রক্ত ভেতরে বইছে, আমার কিছু হবে না। তুমিও চান করে নাও, তাজা লাগবে।"

—"না বাবা! আমার অত সাহস নেই। ফিরে এসে বরং চান করবো। নিশ্চিন্ত মনে।"

মিশনের গেটের ঠিক উল্টোদিকে একটি রেস্তোরাঁ। ওরা গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। আমি নেমে গেলুম।

বললুম,

—"তোমরা এগোও। আমি আসছি। একটু সিগারেট কিনতে হবে।"

আসলে, সারারাত খালিপেটের খিদেটা টানটান করে চাগাড় দিয়ে উঠেছে আবার,

রেস্তোরাঁয় ঢুকে দেখি, একেবার ভোঁ ভাঁ! একটি খদ্দের নেই, ওয়েটার নেই, কাউন্টারও খালি। সাজানো টেবিল-চেয়ারে না বসে সোজা চলে গেলুম কাউন্টারে! শহরতলির অনেক দোকান বা হোটেলের সঙ্গে লাগোয়া থাকে মালিকের ঘর! ভাবলুম ডাক দিলে কেউ না কেউ এসে যাবেই। বীরের মতো কাউন্টারের উঁচু টুলে বসে গলা ছেড়ে ডাকলুম,

—"কে আছেন, মঁসিয়? কিছু খাবার চাই!—"

ওপাশে বোধহয় শুয়েছিলেন। ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কাউন্টারের ওপরে সামনের দু'পায়ে ভর দিয়ে আমার মুখোমুখি সমান সমান। রক্ত চোখ আর লক্‌লকে জিভ নিয়ে বিশাল এক বিদেশী কুকুর। অ্যালসেশিয়ান বোধহয়।

শূন্য দোকানে এত ভয় পেয়ে গেছি যে, কাঠ মুখে শুকনো হাসি টেনে ওর সঙ্গেই কথা বলবার চেষ্টা করলুম,

—"মানে, ইয়ে, কেউ আছে নাকি? আমি তো ঠিক, কি বলে গিয়ে, ইয়ে, —চোর নই—খদ্দের! মানে খিদে পেয়েছে কি না—"

কুকুরকে বরাবরই ভীষণ ভয়। তার ওপর এমন দশাসই মাংসখেকো কুকুর। 'ঘেউ' করে এক কামড়। উঠে দৌড় দিয়ে দরজা অবধি পৌঁছবার আগেই প্রভুর পছন্দ মতোন বাঙালী শরীরের যে কোনো অংশে ভীষণ কামড় বসে যাবে। রক্ত-মাংস, পেটে চোদ্দটা ইঞ্জেকশন! জনহীন জঙ্গলে বাঘের সামনে পড়লেও হয় আমি ভিরমি যেতুম অথবা কথা বলতুম, যে কোনো কথা,

—"কেউ আছে নাকি? কে আছেন মঁসিয়? কেউ শুনতে পাচ্ছেন?—"

সবই কুকুরটিকে বললুম! জোরে জোরে চেঁচিয়ে! আর কাকেই বা বলবো! চুপচাপ ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে যদি লাফ দিয়ে টুঁটি চেপে ধরে? অবশ্য শুনেছি, ভয় পেলে মানুষের গা থেকে নাকি গন্ধ বেরোয়। কুকুররাই পায় সেইসব গন্ধ-টন্ধ এবং আমোদিত হয়ে ঝাঁপ দেয়। আমার শরীর থেকেও এখন নিশ্চয়ই সেই অপয়া গন্ধ বেরোচ্ছে এবং এক বিঘত দূরের প্রভু মনে মনে 'টস' করছেন,— বাদামী চেহারার কোন্ অংশটি বেশি স্বাদু! তবু, চোরেরা আর যাই হোক, বীরের মতো চেঁচামেচি করে মালিককে ডাকবে না—এইটুকু সাধারণ শিক্ষা একটি অ্যালসেশিয়ানের থাকা উচিত—আশা করেই কথা বলেছি। যে কোনো কথা! প্রথমে বাংলায়, পরে ইংরেজী এবং শেষকালে ফরাসীতে। যেটা বোঝে।

জাপানী ভাষা জানলেও বাদ দিতুম না নিশ্চয়ই। উনি বিচারকের মতো চুপচাপ চেয়ে আছেন রক্ত-হিম-করা চোখে আর আমি উকিল-মোক্তার চেঁচিয়ে যাচ্ছি। যেন, হুজুরের সঙ্গে বহুকাল ঘনিষ্ঠ পরিচয়! হাসিমুখে সাহস টেনে কথা বলবার চেষ্টা চালালেও শীতকালের গিটকিরি গানের মতো নিজের গলা নিজেকেই ভীত করছিল। তখনই, 'হেঁ-হেঁ' করে বশম্বদ হাসির প্রকাশ, দাঁত-কপাটিও বলা যায়।

কত সেকেণ্ড, মিনিট জানি না, বছর কুড়ি পরেই বোধহয় পেছন থেকে দেওয়ালে লাগানো দরজা খুলে সাদা শুয়োরের বাচ্চা অথবা ঈশ্বরের মতো একটি ফরাসী ঢুকে কুকুরটাকে ধমকে মিষ্টি গলায় আমাকে বললে,

—"ব জুর, মঁসিয় !—"

দোকানে খালি একটা লোমশ এবং অবোধ যমদূত বসিয়ে রাখার জন্যে রাগে আর সেই যমদূতের কামড় থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দেবার স্বস্তিতে মানুষটির বাকি কথা শুনতেই পেলুম না। এক পলকের জন্যে ভাবলুম, এখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেও অসুবিধে নেই, মানুষ এসে গেছে পৃথিবীতে।

কুকুরটি আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ল আবার।

ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে কোনো রকমে বললুম,

—"একটু জল ! যে কোনো পানীয় !" আধ গেলাস ওয়াইন খেয়ে সুস্থ হলুম। বাগেত রুটির স্যাণ্ডউইচ্ কিনে চিবোতে চিবোতে মিশনের কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়লুম।

বেরিয়ে আসতে আসতে সন্ধ্যে হয়ে গেল।

দ্যানিয়েলের গাড়িতে বসে মিশেল জিজ্ঞেস করল,

—"কেমন লাগল ইণ্ডিয়ান ? ভালো না !"

বললুম,

—"ভালো। খুব ভালো।"

পর্দায় দেখা ভারতবর্ষের রঙিন ছবিগুলো চোখের সামনে ভাসছে এখনো। স্থির হলেও ছবি তো ! দেশের ছবি। আমার সব আত্মীয়-স্বজনেরা যেন পথে-ঘাটে, মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলকাতার ট্রামে-বাসে গায়ে গায়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাদের ঘামের গন্ধে অস্থির হয়ে মনে মনে গালাগাল দিয়েছি, তাদের কাছে ক্ষমা চাইলুম। ফেলে আসা দূরের পরিজন দেখার মতো সেইসব ঘরের ছবি।

ওপর তলায় আর একটি ঘরে শান্তি পেয়েছি বড়। বেলুড় দক্ষিণেশ্বরে গেছি প্রেম-পীরিত করতে। গঙ্গার ধারে বসে আধো-অন্ধকারে কবে কোন্ নারীকে চুমু খেয়েছিলুম, মনে পড়ল না। কিন্তু, আজ ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে ঢুকে মনে হল,

বেলুড় মঠের সীমানায় গিয়ে শুধু নারীকে চুমু খেয়ে ফিরে আসবার চেয়ে, আরো কিছু দেখবার-জানবার ছিল, আছে। কারণ, জুতো খুলে যে অন্ধকার ঘরে ঢুকলুম সেখানে শান্তি আছে। শান্তির ঘরে নিজেকে সমর্পণ করে নিজেকেই পাওয়া যায় বুঝি। ফাঁকা বিশাল গীর্জায় যেমন একা একা নিজেকে কিছু বলা যায়, এই ছোট্ট আবছা ঘরে ঠাকুরের একটি ছবি থাকা সত্ত্বেও সেদিকে না তাকিয়েই নিজের কাছে ভারি একলা হওয়া যায়। প্রায় আধঘণ্টা চুপচাপ আসনপিঁড়ি হয়ে বসে থাকতে যে কি ভালো লেগেছে, মিশেলকে বা কাউকেই হয়তো সেই আধঘণ্টার খবর দেওয়া যাবে না।

তারপর, বহু ভারতীয়, বিদেশীদের সঙ্গে বসে একগাদা দেশী খাবার খেলুম দুপুরে। নিরামিষ, তবু, দিশী তো! ডাল, ঘ্যাট, ভাত অমৃতের মতোন।

মেজোঁর সামনে গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললুম,

—"মিশেল কি বাড়ি যাবে, না, আসবে আমার সঙ্গে?"

এক দণ্ড ভেবে নেমে পড়ল মিশেল। বলল,

—"স্নান করে, তারপর যাবো। আমার ঘরে তো তোমাদের মেজোঁর মতো স্নানের ব্যবস্থা নেই!—"

ড্যানিয়েল আর তার দুই বন্ধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলুম।

ঘরে এসে আমার সবেধন নীলমণি তোয়ালেটি মিশেলকে দিয়ে বললুম,

—"তক্‌তকে ইস্ত্রি করা না হলেও, চলবে। কি বলো?"

ওর ধূসর প্যাণ্টের দিকে চেয়ে বললুম,

— "ইণ্ডিয়ান লুঙ্গি পরবে?"

চাপা খুশিতে বলল,

—হ্যাঁ। নিশ্চয়!"

আসলে ইণ্ডিয়ান কিছু হলেই হল!

ধোয়া, চেককাটা লুঙ্গিটি বের করে দিলুম। গেরুয়া পাঞ্জাবিটি ও নিজেই হাতে তুলে বলল,

—"এটা পরি?"

হেসে ঘাড় নাড়লুম।

স্নানের ঘর থেকে মিশেল যখন ফিরে এল, একেবারে অন্য রকম। হাতে তোয়ালে এবং দলাপাকানো ওর প্যাণ্ট-জামা। আমার লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরে ঠোঁটের কোণে লজ্জার হাসি। পাঞ্জাবিটি বেশ ঢিলেঢালা, বড়সড় লাগছে। শিশিরে ভেজার

'পর ভোররাতে ধবধবে তাজা কোনো বুনো ফুল আমার পোশাক পরে চেয়ে আছে।

বললুম,

—"খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে।"

অল্প মাথা ঝুঁকিয়ে বলল,

—"সত্যি বলছো! মেরসি।"

সাঁ জেম্‌স রাম ছিল আলমারিতে। ও স্নান করে ফিরে আসার মধ্যেই দু'পাত্তর পেটে চলে গেছে আমার। গেলাসে ঢেলে ওকেও একটু দিলুম।

ও বললে,

—"এসব খেতে আমার ভালোই লাগে না। ওয়াইন বা বীয়ার তবু খাই। এতে কেমন বিচ্ছিরি স্বাদ।"

এক চুমুকে পাঁচনের মতো সবটুকু খেয়ে মুখ বিকৃত করল। সেইসঙ্গে হাসির ভাব।

মেজোঁর ক্যানটিনে বীয়ার দিয়ে হ্যাম-অমলেট আর বাগেত খেয়ে ঘরে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। খাটে বসে কোমর অবধি কম্বল টেনে দেওয়ালে হেলান দিল মিশেল।

বলল,

—"তোমার কড়া মদ খেয়ে কেমন ঝিমঝিম করছে মাথা।"

চোখে-মুখে সেই সারক্ষণ জড়সড় ভয়ের ছাপ আর নেই এখন। হাসছে।

গেলাসে রাম ঢেলে আমিও খাটে বসে পড়লুম। ওর মুখোমুখি। কবে যেন বলেছিল, ওর বাসায় কেউ নেই। বাবা-মা, একটি ছোট ভাই প্যারিস থেকে অনেক অনেক দূরে থাকে। লিয়ঁতে। চাকরি করে, বেকার থেকে, বাসা পালটে পালটে এ শহরে মিশেলের সাত বছর পার।

অল্পক্ষণ খুঁটিয়ে দেখলুম ওকে। হঠাৎ মনে হল, মেয়েটিকে দেখতে দারুণ। আমারই পাঞ্জাবি পরে আছে। বুকের কাছে শুধু একটাই বোতাম লাগানো থাকায় চোখ আমার ওখানেই আটকে গেল। উপত্যকার শুরু দেখতে পাই। মিশেল কি অন্তর্বাস পরে আছে? না বোধহয়। ভাবলুম জিজ্ঞেস করে ফেলি?

এক্ষুনি ওর খোলা বুকের গঠন দেখতে ইচ্ছে করল। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি না, কেমন নরম, উষ্ণ কতখানি? মাথায় গুবরেটার গায়ে সাঁ জেম্‌সের ফোঁটা। কচ্ছপের মতো শক্ত পিঠে চিৎ হয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে।

মিশেল, তুমি আমাকে তোমার ওই বুনো সুন্দর অচেনা শরীরের ঘ্রাণ নিতে দেবে? সমস্ত শরীরের?
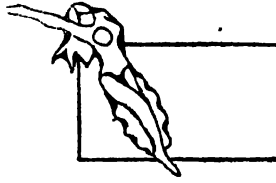
বোনটি আমাদের বিয়েতে এসেছিল। জব্বলপুর থেকে। তুমি ওকে দেখেছো, বউ। সেই যে বাসরঘরে খুব গিন্নীবান্নির মতো খবরদারি করছিল? তোমাকে শরবত এনে দিল! ভুল সুরে দু'তিনটে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়েছিল মনে আছে! মুখখানি মিষ্টি রয়ে গেছে আগের মতোই। চেহারা একটু ভারী হয়েছে এখন। সোয়ামীর ঘরে আরামে আছে। খায়-দায় ঘুমোয়।

তখন বোধহয় স্কুল ফাইনাল দিয়েছে, নাকি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে বোনটি। কলেজে আমার তৃতীয় বছর। দিন কয়েক হল প্রথম নিউড স্টাডির ক্লাস করেছি। সব ছাত্রদের মাথায় চাপা উত্তেজনা। মডেলের বসবার ভঙ্গি ঠিক করে মাস্টারমশাই ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন,

—"যাও তোমরা। স্টাডি করবার দরকার নেই। আজ শুধু স্কেচ্ করো।"

মাথায় বুকে দপদপ শব্দ। ঈজেলে দাঁড় করানো বোর্ড। যে যার বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে সাদা কাগজের দিকে তাকিয়ে আছি। মাথা সামান্য কাৎ করলেই মডেলকে দেখা যাবে। দেখতে এতো ইচ্ছে করছে, দেখবার জন্যে যাকে বলে গিয়ে 'প্রাণ আইঢাই' করছে—তবু ঘাড় কাৎ করতে পারছি না দু'ইঞ্চি। না বাঁদিকে, না ডানদিকে। লজ্জাই বোধহয়। গোটা একটি উলঙ্গ নারী তার আশ্চর্য শরীর নিয়ে বসে আছে, এই ভাবনাতেই কেমন গা' ছেড়ে দিচ্ছিল। অথচ, সেদিনই প্রথম টের পেয়েছিলুম, পুরোপুরি নগ্ন শরীর চাক্ষুষ দেখার মধ্যে যে উত্তেজনা, সামান্য কল্পনার সুযোগ থাকলে তার চেয়ে ঢের বেশি। রহস্যই বোধ হয় সবচেয়ে বড় আকর্ষণ মেয়েদের। একটু জানি, একটু বুঝি, আর একটু কল্পনার খোরাক। এই রকম, নাকি, এই রকম!

ঝাকুঝকে মনে নেই, তবু, কি যেন একটা খুঁজতে মায়ের ঘরে ঢুকে পড়েছিলুম দুপুরবেলা। নাটক নাকি স্পোর্টসের জন্যেই বোধহয় টিফিনে সেদিন ছুটি হয়ে

গিয়েছিল কলেজ। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, স্কুল ফাইনাল দিয়ে ঘরেই বসেছিল বোনটি তখন। দল বেঁধে দার্জিলিং যাবার কথা চলছে।

মায়ের ঘরের দরজা সাধারণ নিয়মে খোলাই থাকে। ভেজানো ছিল—সেদিন অতটা খেয়াল করি নি, ঠেলা দিয়ে ঢুকে পড়েছি।

ফি বছর বোনটি আমার হাতে রাখী বাঁধে। ভাই ফোঁটা দেয় কপালে। 'যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা' বলতে বলতে যদি কাঁধ থেকে ওর আঁচল খসে পড়ে হঠাৎ, তাহলে, তখন সেই অন্যরকম মানসিকতার ঘোরে আমি হয়তো কিছুই খেয়াল করব না। ওর কড়ে আঙুল আমার দুই ভুরুর মাঝখানে এগিয়ে আসবে ঘি চন্দন অথবা কাজল নিয়ে। কপালের অদৃশ্য বিন্দুতে শিরশির ভাব। আমি চোখ বুজে ফেলব। কিন্তু, ধরো যদি, বোনটি আমার তাড়াতাড়িতে স্নান করে ব্লাউজ পরতে ভুলে গিয়ে থাকে এবং শুধু ব্রা পরেই চলে এসে আমার কপালে ফোঁটা দেবার জন্যে হাত তুলে ফেলে, তবে কি আমি চোখ বুজে গণেশ অথবা কেষ্টঠাকুরের ফোটো দেখতে পাবো? আমি অন্তত পাই নি সেদিন।

আপনার বোনকে কেমন দেখতে? কুচ্ছিৎ!

মোটেই না, মশাই! দারুণ সুন্দরী!

সেই আমার সুন্দরী বোন সেদিন মায়ের ঘরে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে ছিল দাঁড়িয়ে। আমি ঢুকে পড়েছিলুম। ও টেরই পায় নি। এক ঝটকায় দেখতে পেয়েছিলুম কোমরে জড়ানো শাড়ির আঁচল মেঝেয় লুটোচ্ছে। ছোট্ট বোনটি আমার অসম্ভব যুবতী হয়ে গেছে হঠাৎ। সদ্য যৌবনে নিজেকে দেখতে কার না ইচ্ছে করে! তাছাড়া, ডানদিকে ঘরের কোণে ড্রেসিং টেবিল, তাই ও আমাকে দেখতেই পায় নি। আমার চোখের সামনে খোলা পিঠ এবং আয়নায় প্রথম যৌবন প্রতিফলিত। সেদিনকার সেই যে কৌতূহল অবচেতনায় সেই যে প্রথম চাপা বিচিত্র উত্তেজনা, সেদিনই কি গুবরে পোকাটা ঘিলুর রসে রসে জন্ম নিয়েছিল? বোঝা মুশকিল। সেদিন, সেই কয়েকটি মুহূর্ত আমি কিছুই বুঝি নি। উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় শব্দগুলি সদ্যজাত গুবরেটাকে লাথি মেরে পিষে ফেলতে চেয়েছিল অন্তত তিন-চার সেকেণ্ড পরে। কতটা ইচ্ছায়, কতখানি অনিচ্ছায় আমি চোখ সরিয়ে মাথা নিচু করে ঘর থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে এসেছিলুম এবং দরজাটি আবার ভেজিয়ে, টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিলুম, কিছুই মনে নেই। মনে পড়ে শুধু, বোনটিকে দেখতে বড় ভালো ছিল সদ্য যৌবনে।

ডাক্তারবাবু আমার মনের কথা জানলে, তালতলার চটি-পেটা করে আমাকে

হয়তো খুনই করে ফেলতেন। সেই চম্‌চম্‌খোর জমিদার বেঁচে থাকলে আমার মুখদর্শন করতেন না। সেই গ্রাম থাকলে, আমার তার ত্রিসীমানায় যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যেত।

সমাজ-সংস্কারকরা উচিত কথা বলবেন,

—"লম্পট! দুশ্চরিত্র! ভদ্দরলোকের ছেলে হয়ে বোনের যৌবন দেখে বেড়ানো হচ্ছে!"

কিন্তু, উচিতার্থে বিধিলিঙ্‌। কারণ তাঁরাই সাগ্রহে জানতে চাইবেন।

"কি হে!! তোমার বোনটি দেখতে শুনতে কেমন হল?"

— "সুন্দরীই হয়েছে হুজুর।"

—"বলি, বে'র বয়েস-টয়েস হল?"

—"আজ্ঞে যৌবনে পা' দিয়েছে সবে!"

জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে হ্যা হ্যা করে মাথা দুলিয়ে হুজুর বলবেন,

—"বাহ্‌! ভালো কথা। পাত্র-টাত্র খুঁজতে শুরু করে দাও হে!"

—"হে হে!"……

জীনেতেরও শরীর ছিল ভালো। মুখে বয়েস ঢাকতে মেক-আপ করলেও শরীরে ওর পাকা ফলের মতো যৌবন। আপেল রঙের চামড়ায় আমার অসাব্যস্ত হাত পিছলে যাচ্ছিল।

অঢেল মদ আর যথেচ্ছ খাবারের পর ও বললে,

—"চলো! নাচি গে' কোথাও! যাবে?"

রাত এগারোটা বেজে গেছে লা তুর দার্জ থেকে বেরোতে। চোখে চাওয়া, হাতের স্পর্শ, আলতো চুমুটুমু জাতীয় সনাতন উপক্রমণিকা ইত্যাদি সারা হয়ে গেছে ততক্ষণে। পৃষ্ঠা উলটে নাচের আসরে পৌছে গেলুম। আগে আসি নি এ তল্লাটে। বাড়ির গায়ে সাঁটা রাস্তার নাম পড়লুম, রু দ্যু রেন।

গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে চললুম দু'জনে। জীনেত বললে,

"এই সব জায়গায় গাড়ি নিয়ে আসতে চাই না। ড্রাইভাররা মালকিনের ব্যক্তিগত জীবন-টীবন সম্পর্কে উৎসুক হয়ে উঠতে পারে।"

ওর কোমর জড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললুম,

—"কি রকম?"

আমার পা' কি সামান্য টলছে! বোধহয়। হাঁটার তালে তালে জীনেতের

নরম শরীরের বাঁদিক আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে বারবার। তুলতুলে নিতম্ব। বুকের এপাশ। পেছন থেকে কোমর জাপটে হাঁটছি।

ও বললে,

—"ডিস্কোতে নাচতে যাবার খবর টের পেলে চাকর-বাকররা হাসাহাসি করবে।"

—"বাড়িতে তোমার কে কে আছে?"

—"একা। খুব একলা থাকি।" বলে, হাসল জীনেত।

কথার মধ্যে কিসের ইঙ্গিত বুঝতে পারলুম, আবার পারলুমও না বলা যায়। মধ্যরাতে কোনো মেয়ে যদি বলে, বাড়িতে একলা আছি, তাহলে, 'চলে এসোর' নেমন্তন্ন মনে মনে ভেবে নেওয়া যায়। কিন্তু 'খুব একলা থাকি' কেমন যেন ব্যথাট্যথা মেশানো। যেতে যেতে দেয় না যেতে!

বললুম,

—"একলা তো আমরা সবাই থাকি।"

আমার গালে একটা চুমু ছুঁইয়ে বলল,

—"এই কথাটি জেনে, বুঝে বা ভেবে তোমার কষ্ট হয় না?"

—"না তো! কেন হবে? সকলের যা কপাল, আমারও তাই! এই ভেবেই শান্তি।"

শব্দ করে হাসল জীনেত। বলল,

—"লটারির ফলাফল বেরোলে, কেউ কিচ্ছু পায় নি—এই রকম খবরে যেমন আরাম, সেইরকম বলছো?"

—"প্রায় তাই!"

চেয়ে দেখি খাঁচা। 'লা কাজ' ডিসকোয় ঢোকবার মুখে ও বললে,

—"তোমাকে দেখে মনে হয় না, খুব হালকা ধরনের শিল্পী তুমি। অথচ, কথাবার্তা যেন কেমন-কেমন!"

হেসে বললুম,

—"আসলে, তোমার জীবন কেউ সিরিয়াস্‌লি দেয় নি তোমাকে!"

আমার 'থুতনি' নেড়ে দিয়ে জীনেত বলল,

—"তোমার বিন্দুমাত্র নেশা হয় নি!"

হাসলুম,

"তাহলে, আরো একআধ পেগ হাণ্ড্রেড্‌ পাইপার্স্‌ খাওয়াবে নিশ্চয়ই!"

'লা কাজ'-এ ঢুকতে ঢুকতে কানের কাছে চেঁচিয়ে বলল,

—"একশো বার।"

ডিসকোর বাজনায় ব্রহ্মাণ্ডের আর কোনো শব্দ শোনা অসম্ভব।

দু'জনে জড়াজড়ি করে আধো-অন্ধকার 'খাঁচা'য় নেচে কুঁদে বেরিয়ে এলুম। রাস্তার খোলা হাওয়া লেগে প্রথম যে বোধের জন্ম, তা' হল, ফেনার মতো সাদা পোশাকের ভেতরে জীনেতের যে শরীর আছে, সেটি বড় স্বাদু। চুমু খেয়ে, বুকে-পিঠে-পেছনে হাতড়ে দেখেছি—ওটি আমার চাই। জীনেত কোথাও এতটুকু এমার্জেন্সির বাধা-নিষেধ আনে নি। গুবরে পোকাটি তার বিতিকিচ্ছিরি লিক্‌লিকে তিন জোড়া পায়ে মাথার ঘিলুকে ঘিরে আদিম নরখাদকের নাচ নাচছে। জঙ্গলের প্রাগৈতিহাসিক ঢাকের বাজনা বাজছে পোকাটার তালে তালে।

জীনেতের প্রকাণ্ড শোবার ঘরে ঢুকে বললুম,

—"কি পানীয় দেবে অতিথিকে?"

দেয়াল-ঘেঁষা 'বার' থেকে গেলাসে ঢেলে মদ নিয়ে এল।

বলল,

—"কুঁইয়্যাক।"

ওর হাত ধরে টেনে এনে খাটে বসলুম দু'জনে। 'বসলুম' না বলে, 'ডুবে গেলুম' বলা ভালো। কারণ, এত নরম বিছানায় কবে শুয়েছি মনে নেই, কোনো-দিন শুয়েছি কিনা হলফ করে বলতে পারব না।

সুখের শব্দের মধ্যে ডোবা শুরু হল আমাদের। জীনেত আমার ঠোঁট কখন কামড়ে দিল, টের পাই নি। প্রচণ্ড জ্বালায়, জিভে লোনা স্বাদ লাগতে বুঝলুম, আপন ঠোঁটের রক্ত চেটে নিচ্ছি। ডুবতে ডুবতে ভুলে গেলুম ঠোঁটের কথা, ব্যথার কথা। কারণ, এই নরম শরীর বড় ভালো!

আহ্লাদের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার খোলা পিঠে হাত বোলাচ্ছে জীনেত। আঁচড়ে দিল। খামচে ধরল গলার কাছে। উহ্-আহ্! অসহ্য জ্বালায় ভেসে উঠলুম। চাপা ধমকের মতো বললুম,

—"আহ্! লাগছে জীনেত!"

—"আহ্—হাহ্—!"

—"ভীষণ লাগছে!"

ডানহাতের কয়েকটা নখ আমার পিঠের চামড়ায় ঢুকিয়ে দিল জীনেত। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলুম,

—"এই! কি কচ্ছো কি?"

বাঁহাতের অনেকগুলো ধারালো নখ পিঠ ছিঁড়ছে বেড়ালের মতো। সহ্য করতে না পেরে প্রচণ্ড এক চড় কষালুম মেয়েটির গালে। উঠে বসলুম। ও আমাকে এলোপাতাড়ি চার হাত-পায়ে চড় ঘুষি-লাথি মারতে আরম্ভ করল।

আমি পুরোপুরি হতভম্ব, হতবাক। প্রেম করার এ কী ছিরি? একটু আগেই তো ভালো-লাগার হা-হুতাশ শুনতে পাচ্ছিলুম। বিছানায় বলদের মতো এমন মারধোর জীবনে খাই নি। হঠাৎ রাগে চড়টা কষিয়ে খুব খারাপ লাগছিল। শত হলেও মেয়ে তো! গায়ে হাত তোলা ঠিক পৌরুষের পর্যায়ে পড়ে না। ভাবছিলুম, ক্ষমা চেয়ে মিটমাট করে নেব। তার আগেই এলোপাতাড়ি আক্রমণ।

ক্ষ্যাপার মতো উঠে বসে পেছন থেকে নিজের গায়ের সঙ্গে আমাকে জাপটে ধরল জীনেত। ওর নরম বুকের উষ্ণতা আমার পিঠের জ্বালার সঙ্গে জড়িয়ে গেল। আদর-খেকো বেড়ালের গর্‌গর্‌ শব্দ করছে গলায়। কাঁধের কাছে মুখ, ঠোঁট ঘষটাচ্ছে। রাগ প্রায় কমে আসছিল আমার। বলা নেই, কওয়া নেই, ঘাড়ের কাছে কামড়ে দিল আচম্‌কা। আক্‌! উফ! এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালুম। অসম্ভব! আমার কাঁধের খানিকটা মাংস ওর বন্ধ দাঁতের কপাটের মধ্যে রয়ে গেল বুঝি, এমন জ্বালা। ক্ষত দেখতে পাচ্ছি না। হাত চলে গেছে ওখানে সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়। বেশ খানিকটা তাজা রক্ত নিয়ে ফিরে এল চোখের সামনে। ঘরের সিলিং থেকে মৃদু নীল আলো ফেটে বেরুচ্ছে। বাল্‌ব্‌ দেখা যায় না। হাতে-লাগা রক্ত কালচে ক্রিমসন্‌ দেখায়। ঘুরে তাকালুম। দেখি, বুক অবধি সাদা চাদর দু'হাতে চেপে ধরে আছে জীনেত। সমস্ত শরীর হাল্‌কা নীল আলোয় থরথর কাঁপছে। যেন, শ্বাস নিচ্ছে জোরে জোরে। ক্ষ্যাপা চোখে রাগ এবং ভয়। মেঝে থেকে প্যাণ্ট্‌, জামা তুলে পরে নিলুম। জ্যাকেটটা পিঠে চাপিয়ে হাঁটতে লাগলাম দরজার দিকে। পেছনে না তাকিয়েই বলে দিলুম,

—"ধন্যবাদ। চলি।"

শুধু আমার পিঠের ছেঁড়া চামড়ায়, মাথা এবং বুকের ভেতরে দপ্‌দপ্‌ শব্দ ছাড়া এদিককার সমস্ত পৃথিবী নিঝুম। দরজার কাছে পৌঁছে ফিরে দেখলুম। বালিশে উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে কাঁদছে জীনেত। খোলা ধবধবে নরম পিঠ, বিস্রস্ত চুল। জীনেতের সমস্ত শরীর ধিকিধিকি কাঁপছে আগুনের মতো অথবা আবদ্ধ জলে ঢিল পড়লে যেমন গোল গোল ঢেউ দ্রুত ছড়িয়ে যায়, তেমনি ছোট ছোট ঢেউয়ের মতো।

ঠোঁটে, বুকে, পিঠে অসহ্য জ্বালা নিয়েও আবার এগিয়ে গেলুম পালঙ্কের কাছাকাছি। ওকে স্পর্শ করতে নয়, সান্ত্বনা দেবার জন্যে নয়। শুধু বলতে যে, 'তোমার এসব পাগলামো হজম করবার ক্ষমতা বা ইচ্ছে আমার নেই।'

কি যেন বলছে জীনেত! চাপা গোঙানি এবং কান্না জড়িয়ে অস্পষ্ট কথা। বুঝতে পারছি না। আরো দু'পা এগিয়ে গেলুম। আবার আক্রমণের ভয়ে খুব সাবধানে অল্প ঝুঁকে কান পাতলুম,

—"চলে যাও! তোমরা সব চলে যাও। আমার কাউকে চাই না। মুখ মেলাতে পারো না। তোমরা কেউই আমার কেউ নও।—"

ফোঁপাচ্ছে, ঢেউয়ের মতো কাঁপছে জীনেত,

—"তোমাদের কারুর কাছেই কিচ্ছু চাই নি আমি। না মন, না ভালোবাসা। বাঁধতেও চাই নি কাউকে। শুধু একটু সুখ চেয়েছিলুম শরীর জুড়ে।"

মুখ তুলে তাকাল। সমস্ত প্রসাধন ধুয়ে-মুছে একাকার। কিছুই নেই। শুধু একলা বয়েস ওর সারা মুখ এখন মাকড়সার মতো জড়িয়ে ধরে আছে। সেই ভীষণ ভয়-পাওয়া ভয়ঙ্কর মুখ দেখে এক পা পিছিয়ে এলুম।

ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল জীনেত, বিশাল নিস্তব্ধ ঘরে ওর কান্না আমাকে আড়ষ্ট করে দিল,

—"যাও। বেরিয়ে যাও, ইণ্ডিয়ান। তোমাদের, পুরুষদের মুখ আমি দেখতে চাই না—!"

দরজা খুলে বেরিয়ে আসছি, শুনতে পেলুম, বালিশ চাপা গোঙানি, কান্নার শব্দে নিজের মনেই বিড়বিড় করছে, মাতালের মতো,

—"শুধু আমাকে ঠিকানা বলে দাও।—যে দেশে বয়েস নেই, সেই দেশের ঠিকানা বলে যাও, মানুষ।—"

ভোর রাতের প্রথম পাতাল রেলে চেপে ফিরে এসেছি দফ্যা রুশরো। গাড়ি বদলে সিতে। মেজোঁ অবধি হেঁটে আসতে আসতে সকাল হয়ে গেছে প্যারিসে। শরীরের রক্তাক্ত যন্ত্রণায় এবং জীনেতের কান্না, উদ্ভট ব্যবহারে এতোই বিহ্বল হয়ে ছিলুম, খেয়াল হয় নি। ঘরে ঢুকে জামা খুলতে, চাপ চাপ রক্ত দেখি জামার পিঠে, ঘাড়ে। আয়নার মুখ, গাল, কপাল নখের আঁচড়ে ফোলা ফোলা। প্যাণ্ট বদলে লুঙ্গি পরতে যাবো, হঠাৎ মনে পড়ল। পকেটে হাত দিতেই যিশুর দেওয়া উপহারের ছোট্ট প্যাকেটটি পেলুম। খুলে দেখি, কুড়ি সিগারেটের একটা খালি বাক্সের ভেতরে পেনিসিলিন মলমের টিউব, গোলাপী তুলো খানিকটা এবং ছোট্ট

ভাঁজ-করা কাগজ একখণ্ড। তা'তে লেখা, "কন্‌গ্র্যাচুলেশন্! এখন তোমার নতুন নাম, 'জিগোলো'। শব্দটির মানে কি, জানতে চেয়েছিলে। জিগোলো শব্দের আভিধানিক অর্থ—পেশাদার নাচের সঙ্গি (পুং), অলস এবং ধনীকন্যারা যাদের ভাড়া করতে পারে (অর্থ, মদ অথবা খাবার দিয়ে) !"

তারপর, সামান্য জায়গা ছেড়ে লেখা, "ভাই ইণ্ডিয়ান ! মহিলার জন্যে তোমার মতো আমারও কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু, কিছু করার নেই ! আমরা ওর এই অ-সুখের জন্যে দুঃখিত হওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারি না।—ইতি তোমার 'যিশু'।"···

এখন এসব কথা মনে পড়ছে কেন কে জানে! মিশেলের নরম বুকে চোখ ফেলে কোথায় কোথায় বেড়িয়ে এলুম। গুবরেটার গায়ে মদের ফোঁটা। জীনেতের একাকিত্ব, কষ্ট, অ-সুখের অনুভূতি তলিয়ে গেল, মাথা ঘিরে গুবরেটার দাপাদাপির শব্দে, প্রাগৈতিহাসিক বাজনার তালে তালে। মিশেল নামে একটি বুনো নরম শরীর আমার জামা-কাপড় প'রে, একা ঘরের ভেতরে আমার বিছানায় আমারই ইচ্ছের নাগালের মধ্যে বসে আছে।

বুকের দ্বিতীয় বোতামটি বন্ধ করল মিশেল। সামান্য ভীতমুখে হাসল। বলল,

—"কি দেখছো হাঁ করে ? সিগারেটটা কম্বলে পড়ল। তুলে নাও !"

তাড়াতাড়ি জলন্ত সিগারেট তুলে অ্যাশট্রেতে চেপে দিলুম। কম্বলে একটা নয়া পয়সার মতো ফুটো।
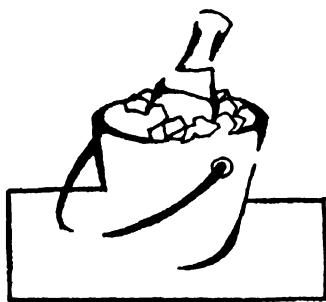
চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলুম,

—"সেই জাপানী বাড়িতে আমাদের প্রথম ঘনিষ্ঠতার কথা মনে আছে মিশেল ?"

ডান পাশে ঘাড় কাত করে জানালো, হ্যাঁ, আছে।

—"সব মনে আছে ?"

—"হুঁ!"

—"কি কি হয়েছিল, শুনি।"

—"সে সব পুরোনো কথা শুনে কি হবে, ইণ্ডিয়ান?"

এমন প্রাপ্ত-বয়স্কাদের মতো সচেতন গলা মিশেলের আমি কখনো শুনি নি আগে। অবাক লাগল। তবু বললুম,

—"বলোই না!"

—"শোধরি আমাকে অনেক লোকের সামনে 'বুমের' আসরে মেরেছিল সেদিন।—"

এই মুহূর্তেও গোবিন্দ বেঁচে আছে। তেতলার ছত্রিশ নম্বর ঘরে এখনো ওর নাম-ঠিকানা। ওর কথা মনে পড়তেই মিশেলকে বাধা দিলুম,

—"ও তোমাকে মারে নি। তুমি পড়ে গিয়েছিলে।"

-"হ্যাঁ। অন্য মেয়েদের সঙ্গে নাচবে বলে আমাকে ধাক্কা মেরেছিল। ওর শরীব ভালো ছিল না—আমি বারণ করেছিলুম, তাই—"

মিথ্যে বলে নি গোবিন্দ। আমার কাছে সাফাই গাইতে অথবা সেই ব্যথার পর আমার সামান্য সহানুভূতি আদায় করতে গল্প শোনায় নি কিছুই। তখন, শেষ রাতে সবই সত্যি মনে হয়েছিল ওর কথা। পরে, সারাদিন মিশেলের সঙ্গে থেকে মাঝে মাঝে কেমন আশায় ভুগছিলুম, হয়তো বেচারার সব কথা সত্যি নয়। হয়তো, ওর দুঃখ-বিলাস! এখন, নিশ্চিত জেনে গেলুম, ওর মৃত্যুকে ও দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে।

গোবিন্দকে মনে আনতে চাইছি না। ঘুরিয়ে দিলুম মিশেলের কথা। বললুম,

—"আহা, শোধরির ব্যাপার বলছি না। তোমার সঙ্গে আমার কি কি হয়েছিল সেদিন, মনে আছে?"

এইবার মিশেল অবাক চোখে তাকাল,

—"কি?"

অল্প এগিয়ে দু'হাতের অঞ্জলিতে ওর মুখটি ধরে চুমু খেলুম। ও বাধা দিল না। সাড়াও দিল না। চামড়ার পুতুলকে চুমু খেলুম যেন। বললুম,

—"তুমি আমাকে চুমু খেয়েছিলে। মনে পড়ছে?"

আস্তে ঘাড় কাত করে জানালো, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। তারপর, ঠোঁটের কোণে ম্লান হেসে বলল,

—"কেন খেয়েছিলুম, তোমার মনে আছে?"

ভাবছি, ভাবছি। কেন চুমু খেয়েছিল মিশেল আমাকে! ভালোবেসে, অত দ্রুত, চুমু-টুমু খেয়ে ফেলা হাস্যকর! তাছাড়া, গোবিন্দর সঙ্গে তখন ওর প্রচণ্ড প্রেম! মনে পড়েছে। বললুম,

—"তুমি যা' যা' আমাকে সেদিন বলেছিলে, সেইসব কথা আমি যাতে তোমার শোধরিকে বলে না দিই, সেইজন্যেই বোধহয়?"

হেসে ফেললুম,

—"তার মানে, আজ আর আমাকে চুমু খাবার তেমন দরকার নেই তোমার। কারণ, গোবিন্দর কাছে তোমার কোনো কথা লুকোতে হবে না!—"

মিশেল হাসল এবার। ঠোঁট খুলে, শব্দ করে। বলল,

—"না। আমি আর কাউকে ভয় পাই না, ইণ্ডিয়ান!"

ও যে ভয়ের কথা বলল, তা' এক রকম। আমি অন্যরকমভাবে বললুম,

—"আমাকেও ভয় পাও না?"

ঠোঁটে আলতো আর্দ্র মাখিয়ে হাসল আবার। বলল,

—"ভয় পেলে কি আর তোমার বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে থাকি সারারাত, নাকি, এখন এই রাত দুপুরে তোমার পোশাক পরে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকি তোমার খাটে!"

একজনের খাটে দু'জন শুয়ে পড়লে গায়ে গায়ে ঘন হয়ে শুতে হয়। মিশেল দেওয়ালের দিকে মুখ করে আছে। দু'জনের গলা অবধি কম্বল। ওর নরম মসৃণ পিঠে খুব ধীরে ধীরে হাত বোলাচ্ছি। অন্তর্বাস নেই। ইচ্ছে করলেই ওর পিঠের দেওয়াল পেরিয়ে আমার হাত ওপারে চলে যেতে পারে। পিঠের গন্ধ শুঁকলুম। না, সেই বুনোফুলের গন্ধটি পাচ্ছি না। মিশেলের গায়ে কারখানায় তৈরি সাবানের সুগন্ধ মানায় না। আঙুল দিয়ে খানিকটা জায়গা ঘষে ঘ্রাণ নিয়ে দেখলুম আবার, না, মিশেলকে পেলুম না। শুধু সাবান।

ও একটু কেঁপে উঠে বলল,

—"উঃ! সুড়সুড়ি লাগছে!"

হেসে, হাত বোলাতে লাগলুম আবার। পিঠে, ঘাড়ে, কোমরে। বললুম.

—"ক'জন পুরুষ-বন্ধুর, সঙ্গে এমনি বিছানায় শুয়েছো, মিশেল?"

—"কেন?"

—"এমনিই! শুনতে ইচ্ছে করছে!"

—"মনে করতে পারছি না।"

—"অনেক বুঝি সংখ্যায় ?"

—"হুঁ।"

ওর ঘাড় ছুঁয়ে, গাল বেয়ে ঠোঁট দুটিতে পৌঁছে গেল আমার হাত। দোতারায় টুং-টাং করবার মতো তর্জনী দিয়ে মিশেলের ঠোঁট বাজালুম। শব্দ হল না। জিজ্ঞেস করলুম,

—"শ'খানেক ?"

হাতের মধ্যে হেসে ফেলল মিশেল। ওর উষ্ণ শ্বাস, হাসি আমার তর্জনী হাত বেয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে গেল। জঙ্গলের প্রাগৈতিহাসিক লজ্জাহীন ঢাকের শব্দে গুবরেটার আদিম নাচ।

বললুম,

—"হাসলে কেন ?"

—"আমাকে দেখে মনে হয় বুঝি আমি একশো জনের সঙ্গে শুয়েছি ?"

—"মোটেই না !"

—"তবে ?"

—"তুমি ঠিক ঠিক জবাব দিলে না তো, তাই, আন্দাজে যা' ইচ্ছে বলে দিলুম।"

একটু চুপ থেকে ও বললে,

—"দু'জন।"

—"আমাকে নিয়ে ?"

আবার হাসল। হাসতে হাসতে গোটা শরীর-মুখ নিয়ে আমার দিকে পাশ ফিরল। বলল,

—"তুমি খুব আশাবাদী ইণ্ডিয়ান !"

বদমায়েসের মতো হেসে ওর ঠোঁটে চুমু খেলুম।

আবার বললে মিশেল,

—"শুধু শোধরি এবং আর একজন !"

—"কে সে ?"

—"তুমি চিনবে না। সেও ইণ্ডিয়ান। এই মেজোঁতেই ছিল।"

মনে পড়ল, ঈভলীনের মুখে শুনেছিলুম, মিশেলের আগের প্রেমিকের কথা, যে ওকে মিথ্যে আশা দিয়ে ভোগ-টোগ করে দেশে ফিরে গেছে। প্যারিসে পড়তে বা বেড়াতে এসে কয়েকটি রাত্রিযাপনের ফুর্তির জন্যে এমন সরল এবং ফরাসী যৌবন ফোকোটে পেয়ে গেলে এক-আধটা মিথ্যেকথা তো' নস্যি !

সোজাসুজি বলে দিলুম ওকে,

—"আমি কিন্তু তোমাকে বিয়েও করতে পারবো না, ইণ্ডিয়ায় নিয়ে যাবার ক্ষমতাও আমার নেই।" বলে ফেলে বেশ হালকা লাগল।

—"জানি।"

—"কি জানো?"

—"তুমি বিবাহিত এবং তুমি খুব ভালোমানুষ।"

আহ্! এই সমস্ত সময় নিজের প্রশংসা শুনতে যে কী ভালো লাগে! টর্চে নতুন ব্যাটারি ভরবার মতো! সঙ্গিনীর গভীর গভীরতর অপরিচিত অন্ধকার পথঘাট উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—"কে বললে?"

—"ঈভলীন।"

অসংখ্য ধন্যবাদ, ঈভলীন! তোমার সার্টিফিকেট কেমন হাতে-নাতে কাজে লেগে গেল! তোমাকে আমি আজও চিনতে পারলুম না। অথচ, তুমি আমাকে নিপাট ভালোমানুষ কোত্থেকে ঠাওরালে, তুমিই জানো! মের্‌সি বোকু, মাদাম!

মিশেল জিজ্ঞেস করলে,

—"দেশে তোমার আর কে আছে?"

—"ছোট্ট একটি ছেলে।"

বউ, কেন জানি না পট করে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। মনে মনে ঈভলীনকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে কি তুমি এসে পড়লে মামদোবাজির মতো। আর সঙ্গে সঙ্গে মিশেল-টিশেল, প্যারিস-গুবরে সব ছেড়ে-ছুড়ে, এই দেখ, তোমার পেটে কেমন কান পেতে আছি। পাবলিক টেলিফোনে ছ'টি নম্বর ঘুরিয়ে রিসিভার কানে লাগিয়ে রেখেছি। পয়সা ফেলতে হয় না। শুধু শুনবো তো'! তোমার নাভির গর্তে কান পেতে শুনতে পাচ্ছি তুমুল ঝড়ের শব্দ। দাপিয়ে, কাঁপিয়ে দূর দিগন্ত থেকে দামাল ছেলে ছুটে আসছে। কচি স্বর স্পষ্ট কানে এল আমার,

—"এই তো, বাবা। আসছি আমি! এসে গেলুম। তোমার নাম, তোমার শরীর-মনের সমস্ত স্নেহ-কোমলতা স্বপ্ন-সফলতা নিয়ে টগ্‌বগ্‌ ছুটে আসছি আমি সবুজ ঘোড়ায় চেপে।—"

বউ, তুমি সাবধানে থেকো। মাঝে মধ্যেই আজকাল আমি টের পাই, ভয় তার স্যাতসেঁতে পাঁশুটে মুখ নিয়ে শব্দহীন পায়ে পায়ে আমার চারপাশে ঘোরাঘুরি করে। গ্যালারী এখনো পাওয়া যায় নি। যোগাড় হয় নি প্রদর্শনীর টাকা।

শুধু দিন যায়। ছবি-টবি আঁকছি ঠিকই। তবু দিগেনদা জর্জ, জানী, অজস্র অচেনা পরাজিত মুখ আমার দিকে কেমন অদ্ভুত চোখে চেয়ে থাকে। তোমার এখন খুব কঠিন সময়, বউ। একটি প্রাণ, আমাদের তৈরি এক স্বপ্নের দায়িত্ব বইছো। খুব সাবধানে হাঁটাচলা করবে। কোথাও পিছলে পড়ে যেও না। ভারী জিনিসপত্র মোটেই বইবে না তুমি। ও আসছে। সবুজ ঘোড়ায় চেপে, দামাল ঝড়ের আকাঙ্ক্ষা আমার সব ভয় ভেঙে দিয়ে টগ্‌বগ্‌ ছুটে আসছে।...

মিশেল আমার বুকে হাত দিয়ে গালে ঠোঁট ছুঁয়ে রেখেছে। খুব অস্ফুটে কি যেন বলল। শুনতে পেলুম না। জিজ্ঞেস করলুম,

--"উঁ ?"

ঘরের অন্ধকারে ওর স্পর্শ ছাড়া কিছুই টের পাচ্ছিলুম না। দেখা যায় না কিছুই। এইবার, দমকা ওর সেই আপন গায়ের গন্ধটি পেলুম। ও বললে,

—"আমি তোমার কাছে খুব সামান্য একটি জিনিস চাইবো, দেবে ?"

চিত হয়ে শুয়ে আছি। মিশেল তার সমস্ত শরীর-মন নিয়েই হয়তো আমার পাশে। পুরোপুরি বুঝতে পারছি না।

আপন মনেই জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি ?"

—"আগে বল, দেবে ?"

—"আমার ক্ষমতায় কুলোলে, হ্যাঁ, দেব।"

একটু সময় চুপচাপ। আমার বুকে ভারি নরম আলতো হাত বোলোচ্ছে মিশেল। পাখির পালকের মতো হালকা। বলল,

—"তোমাদের দেশে যাবার আশায় আমি আর বন্ধু, সঙ্গি অথবা স্বামী খুঁজবো না। তিন বার ভালোবাসার সাহস আমার নেই আর। কোনো পুরুষকে নিয়ে ঘর করবার ইচ্ছেও ফুরিয়ে গেছে। শুধু সারা জীবনের জন্যে ছোট্ট কিছু চাইবো তোমার কাছে। খুব ছোট্ট, এই এতটুকু।—"

সজাগ হয়ে কান পেতে আছি। ওকে দেবার মতো কি আছে, ভেবে পাচ্ছি না। ছোটোখাটো পেইন্টিং ? কারো মুখ এঁকে দিতে হবে !

ও তেমনি ঠাণ্ডা অস্ফুট গলায় বলল,

—"শোধরির সঙ্গে সবকিছু ভেঙে যাবার পর থেকে আমি আর ওই সব ওষুধ খাই না ! দরকার হয় না।—"

আবার একটু সময় নিল। যেন কিভাবে বলবে, বুঝতে পারছে না। নিজেকে

গোছগাছ করে নিল। দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে নিল ওর বুকের সঙ্গে। ওর বুকে শরীরে স্রোতের শব্দ পাই। একটানা মৃদু শব্দ। খুব আদর করে আমার মুখে চুমু খেল মেয়েটি। তপ্ত, গভীর শ্বাস ফেলার মতো কথা বলল, ভিক্ষে চাইল বুঝি,

"ইণ্ডিয়ান, আমাকে একটি ছোট্ট এইটুকু শিশু উপহার দিয়ে যাবে ?"

দারুণ চমকে উঠলুম। হৃৎপিণ্ডের শব্দ কি তাল-মাত্রায় ভুল করল! ওকে জড়িয়ে রাখা হাত দুটি আমার আলগা হয়ে গেল আপনা-আপনি।

দেশে যাদের সঙ্গে এই সব ভালোবাসাবাসি করেছি, তারা তো শুধু একটি বিশ্বাস পুরোপুরি পেলেই খুশি। 'বিয়ে যখন আমাদের হবে না, তখন, দেখো, সাবধান! আমাকে যেন ফেলে চলে যেও না।'

মিশেল তো এখন সেই বিপদটুকুই ভিক্ষে চাইছে। মাথা খারাপ হয়ে গেল না তো মেয়েটার ?

বললুম,

— "পাগলের মতো কি বলছো মিশেল ?"

অন্ধকারেই বুঝতে পারলুম, ওর কোঁকড়া রুক্ষ চুল ঝাঁকিয়ে বলল,

—"না, ইণ্ডিয়ান। পাগলের মতো মোটেই নয়। আমি তোমার দেশের একটি বাদামী শরীর পেটে ধরতে চাইছি। ভিক্ষে চাইছি। তুমি ভালোমানুষ। তুমি একটি এইটুকু গাঢ় রঙের শিশু আমাকে উপহার দিয়ে যেতে পারো।—দেবে না!"

—"কিন্তু তা কি করে সম্ভব, মিশেল ? তুমি বিবাহিতা নও। শিশুটির বাবার নাম কী হবে ? কী হিসেবে ও সমাজে স্থান পাবে ? ওর জীবন কি দাঁড়াবে ভেবে দেখেছো তুমি ?"

খুব ভারিক্কি মায়ের গলায় জানিয়ে দিল,

—"আমি তো' ওর মা' হবো এ দেশে আর কিচ্ছু দরকার নেই। বলবো, আমার ভালোবাসার সন্তান। যে কোনো কল্পনার নাম রেজিস্ট্রি করে নিলেই হবে।"

মিশেলের মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না এখন। খুব ইচ্ছে করছে দেখতে। হাত বাড়িয়ে সুইচ্ টিপে দিলুম। আলো জ্বলে উঠতেই দেখি ইণ্ডিয়ান কোনো শিশুর জননী হয়ে মিশেলের চোখ ভর্তি জল। খুশিতে সমস্ত মুখ উপচে উঠছে ওর। সেই ভীরু লাজুক বুনো পাখির মুখ এমন উজ্জ্বল, এমন উচ্ছ্বাসে মমতাময়

হতে পারে আমি কল্পনাতেও দেখি নি কখনো। সকল সাধ-আশা ভাঙতে ভাঙতে এখন শুধু ওর স্বপ্নের ইণ্ডিয়ার ছোট একটি প্রাণ বহন করতে, পালন করতে, আদর করতে, ভালোবাসতে চাইছে।

ঘরের উজ্জ্বল আলোয় আমার দুই গাল ওর হাতের অঙ্গুলিতে চেপে ধরল। মুখ নামিয়ে আদর করল আমায়। চোখ ভরে ছিল। উষ্ণ একটি ফোঁটা আমার গালে পড়ল টের পেলুম।

ও বলছে,

—"তুমি আমার ভালোমানুষ ইণ্ডিয়ান। আমাকে এইটুকুন ছোট্ট উপহার দিয়ে যাও। ঠিক এমনি করে আমি ওকে আদর করবো, ভালোবাসবো। ইণ্ডিয়ান গন্ধ মাখা গাঢ় শরীর নিয়ে ও দু-পা তিন-পা হাঁটবে পড়ে যাবে, কাঁদবে, আমি কোলে তুলে নেব। প্লীজ—"

গুছিয়ে কিছুই ভাবতে বা বুঝতে পারছি না। প্রথমে ভেবেছিলুম ছেলেমানুষী। এখন মিশেলের জন্যে কি ভীষণ খারাপ লাগছে, কাউকেই বলে বোঝানো যাবে না। ওকে এই রকম বোধহয় কেউই দেখে নি। হাহাকারের মতো অবাস্তব চাওয়া। শূন্য হৃদয়ের কিছু তো পূর্ণ হোক।

—"কিন্তু শিশুটির বাবার নাম কি জানবে লোকে, শিশুটি নিজে ?"

ও এক মুহূর্ত ভাবল। বলল,

—"যা' হোক কিছু বলে দেব। সে চিন্তা কোরো না, ইণ্ডিয়ান। রেজেস্ট্রির সময় বলে দেব, মরে গেছে।"

—"তবু, কি নাম বলবে ভাবো আগে !"

—"যে কোনো নাম। ধরো, শোধরি। যে কোনো শোধরি।—"

তিনতলার ছত্রিশ নম্বর ঘরে আস্তে আস্তে টোকা দিলুম। মিশেল আমার হাত ধরে আছে। কাঁপছে থরথর। বৃষ্টিতে ভেজা পাখির মতো ভয়ে, উত্তেজনায়। বিশ্বাসে, অবিশ্বাসে। আশায়, হতাশায়।

গোবিন্দর সব কথা যখন ওকে বললুম, বিশ্বাস করে নি একটুও। রেগে খাট থেকে উঠে গেছে,

—"তুমি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছো, ইণ্ডিয়ান। ভিক্ষেই তো' চেয়েছিলুম। না দেবে, দিও না। অপমান করো না, প্লীজ্।"

গোবিন্দ দরজা খুলতে খুলতে বলল,

—"কে ?"

—"মিশেলকে তোমার ঘরে পৌছোতে এলুম।"

গোবিন্দ শোধরি এক রাতেই এগিয়ে গেছে অনেক। চোখ দুটো গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। ম্লান বিবর্ণ মুখটি খুশিতে অবাক,

"একি! এসো, কেমন আছো মিশেল?"

আমার দিকে ফিরে বলল—"ভেতরে এসো!"

হাত ধরে মিশেলকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, "তোমার কাছে দিতে এসেছি ওকে। যাবার আগে তোমার সব কথা ওকে বলবে, এই অনুরোধ। ওকে কাঁদতে দিও। বুঝতে দিও, তুমি ওকে ভালোবাসো। পারো তো, ওর ইচ্ছেমতন ছোটোখাটো উপহার রেখে যেও।—"

মিশেলের গালে আলতো চুমু খেয়ে বিদায় জানালুম। ও মাথা নিচু করে কাঁদছে। বললুম—"ভালো থেকো, মিশেল।"

কি আশ্চর্য কাণ্ড বউ, সুশ্রী একটি বুনো পাখিকে মৃত্যুর ঘরে পৌছে দিয়ে কি অসম্ভব আরাম লাগল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ঈশ্বরের মতো নিজের ঘরে ফিরে এলুম। মনে হল, কি ভালো, কি ভালো! পৃথিবীর সবকিছু বড় ভালো!

মাথায় কি আমার যন্ত্রণা হচ্ছে? ঠিক কোন্ জায়গাটায়? কপালের ওপরের দিকে, না, মাথার পেছনে? উফ্! যন্ত্রণাটা ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে, টের পাচ্ছি। সারা মাথা জুড়ে। বিশাল ভয়ঙ্কর ব্যথাটা অক্টোপাসের মতো পিষছে। চোখ খুলতে পারছি না। ডান হাত তুলে মাথায় একবার অন্তত ছোঁয়াতে চাইলুম। অসম্ভব। কে যেন পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে হাতে। টনটনে ব্যথা।

বউ, একটু হাত দিয়ে দেখ না মাথায়! একটু হাত বুলিয়ে দেবে না? কত যুগ পরে ফিরে এলুম! কত বছর পরে তোমার সঙ্গে দেখা! ছেলেটাকে একবার ডাকো। আমার ভার-ভার চোখের পাতা দুটো টেনে খুলে দিয়ে যাক। কত বড় হয়ে গেছে এখন! তোমার ধবধবে সাদা চুল, সাদা শাড়ি—। একি বউ, তুমি থান পরেছো কেন? চুলের মতো সিঁথিও ধবধব করছে! আহ্—!

—"রিলাশে, রিলাশে !—"

অনেক দূর থেকে কি বলছে কে ? ফরাসীতে। ভারি মিষ্টি গলা। না, এ তো তুমি নও! অন্য কেউ, অন্য কোনোখানে আমি। জোর করে অনেক চেষ্টার পর চোখ দু'টো বোধহয় অল্প একটু খুলতে পারলুম। এত অল্প যে, সত্যি সত্যিই খুলল কিনা বুঝতে পারছি না। তবে, ঘন জমাট অন্ধকার সরে গিয়ে ঘোলাটে ভাব এখন। কালীঘাটের গঙ্গায় ডুব দিয়ে চোখ চাইলুম যেন। ময়লা জলে সব ঝাপসা। কিছুই বুঝতে পারছি না। কিছু জিজ্ঞেস করলুম বুঝি। কি ? কাকে? অস্বচ্ছ জলকেই বোধহয়। জল কিংবা কুয়াশাকে। এই মুহূর্তে আমার কাউকে চাই না। কিছু মনে পড়ছে না। কিছুই দরকার নেই আমার। শুধু একটু হাতটাকে তুলতে দাও। হাত তুলে মাথায় রাখতে দাও। যন্ত্রণার অক্টোপাসটাকে সরিয়ে দিতে চাই। আহ্—!

—"রিলাশে, রিলাশে ইণ্ডিয়ান !—"

ঘোলা জল অথবা কুয়াশায় ভাসতে ভাসতে তরল মোমের মতো একটা মানুষের মুখ আমার চোখের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জিজ্ঞেস করলুম, কে ? গলা দিয়ে ঘড়ঘড়ে গোঙানির আওয়াজ বেরোলো শুধু। তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করে ভাবলুম, কার মুখ ? চেনা মুখ যেন ! আবার ঘোলাটে জলের ভেতর চোখ চাইতেই চিনতে পারলুম তোমাকে। দুই কানে অর্থহীন দপদপ শুনতে পাচ্ছি। তোমার চোখে-মুখে ভয় এবং দুশ্চিন্তা। আমার কি হয়েছে, বউ ? তুমি আমাকে অমনভাবে দেখছো কেন ? আমার জিব কেমন আড়ষ্ট হয়ে আছে। কথা বলতে পারছি না। গলা শুকিয়ে ভেতরে টেনে নিচ্ছে জিবটা। একটু জল দেবে না আমাকে ?

অল্প একটু হাঁ করলুম, তুমি ঝাঁঝালো মিষ্টি-মিষ্টি কি ঢেলে দিলে মুখে। জিবে সাড় ফিরতে বুঝলুম, জল নয়। ওয়াইন। ঘষা কাচের ওপারে তুমি নও, ঈভলীন। আরো এক ঢোক ওয়াইন গিলে ফেললুম। মনে পড়ছে। অনেক কথা মনে পড়ছে। অজস্র লাল নীল হলুদ বেলুন মালার মতো দুলছে। খুব সাজপোশাকের ভিড়ের এক একটি দৃশ্য আমার বন্ধ চোখের কালচে আলোর মধ্যে খাপছাড়া দেখতে পাচ্ছি। পুরোনো সিনেমা হলের ছেঁড়া পর্দায় কাঁপা কাঁপা বিজ্ঞাপনের স্লাইড। চারপাশে মৃদু গুঞ্জন। হাততালির শব্দ। বেশ দ্রুতলয়ে কি একটা বাজনা হতে হতে মিলিয়ে গেল। গেলাস ঠোকাঠুকির হাল্কা মিষ্টি ঠুনঠুন।

শুভ জন্মদিনের কোরাস গান।...

সান্তা ক্লজের জন্মদিন। গুচ্ছের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের ভিড়। বিশাল হলঘরে অজস্র শিশুরা কিলবিল করছে। ঝকঝকে রঙিন পোশাকে সান্তার উত্তর-পুরুষেরা হই-হল্লায় মেতে উঠেছে। সাদা উর্দি-পরা বেয়ারা-চাকরের দল ট্রে হাতে ভিড়ের ধাক্কা পিছলে সুন্দর ভঙ্গিতে হলের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের চলা দেখলে মনে হবে, পায়ে রবারের চাকা লাগানো। ট্রের ওপরে সাজানো নানান্ আকারের গেলাস। বীয়ার ভর্তি লম্বা গেলাস, পেটমোটা শ্যাম্পেন, মাঝারি গেলাসে হুইস্কি আর চৌকো বরফের টুকরো। সেই জাঁকজমকের মেলায় 'জন্মদিনের শিশু' একটি গাঢ় সবুজ রঙের খাটো প্যাণ্ট পরে, খালি গায়ে বুক অবধি ঝোলা সাদা দাড়ি এবং টাক মাথাটি গম্ভীরভাবে নেড়ে-চেড়ে সব তদারক করছিলেন। প্রচুর হাততালি এবং উল্লাসের শব্দের মধ্যে কখন সত্তর না বাহাত্তরটা রঙীন মোমবাতি এক ফুঁয়ে নিবিয়ে এলেন।

খুব খাতির করে ওঁর শোবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে,

—"ইণ্ডিয়ান খোকাবাবু, এসো। ওই ছ্যাখো, তোমার আঁকা সান্তা ক্লজ ঘুমুচ্ছে।"

মস্ত ঘরটির ঠিক মধ্যিখানে বজরার মতো পালঙ্কে সাদা বিছানা পাতা। চার-পাশের হালকা নীল রঙের দেওয়ালে দশ বারোটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। সবই পোর্ট্রেট। আবক্ষ। সমস্তই সান্তার চেহারা। ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে। এস্কিমো, রেড ইণ্ডিয়ান অথবা জলদস্যুর বেশে সান্তা ক্লজ। আমার আঁকা ছবিটি সত্যি সত্যিই আড়ভাবে টাঙানো রয়েছে। সুন্দর বাঁধানো ফ্রেমের মধ্যে মে মাসের সান্তা ক্লজ শুয়ে আছে যেন।

হই-হট্টগোলের মধ্যে বহু আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ঈভলীন। একজনেরও নাম বা মুখ মনে নেই আর। ঈভলীনের স্বামীর মুখটি আবছা মনে পড়ল। বেশ বয়েস। চল্লিশের ঘরে তো বটেই। পঞ্চাশই বোধ-হয়। রোগা লম্বা মুখটি। সামান্য কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কি? ঈভলীন বললে,

—"আমার কত্তা।"

এবং আমাকে দেখিয়ে,

—"আর এই আমাদের ইণ্ডিয়ান। তোমাকে বলেছিলুম না! ওকে একটু ফ্রি-ল্যান্স্ কাজকম্ম—"

ঈভলীনকে বকে দিতে ইচ্ছে করল। এখানে এসব বলার দরকারটা কি! ওর স্বামীর সামনে ভিখিরির মতো আমাকে এতো ছোটো করবে কেন ও? মনে মনে বললুম, আমার সঙ্গে না তোমার সুখের সম্পর্ক! কেন তুমি এইভাবে আমাকে ছোটোখাটো অ-সুখের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে লজ্জা দিতে চাইছো! ঈভলীনের চোখে তাকাতেই ও বোধহয় আমার মনের সব কথা টের পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে কথা ঘুরিয়ে দিল,

—"এখন অবশ্য ইণ্ডিয়ানের একেবারেই সময় নেই। মোঁমার্ত্রে সব্বার চোখ টাটিয়ে রাজার মতো ছবি আঁকছে।—"

বলেই আমার দিকে চেয়ে হাসল। যেন, 'কি, হল তো! এবার ঠিক আছে? অমন বকুনির চোখে আর তাকাতে হবে না'—!

মঁসিয় দ্যুপোঁ ঘুগু 'অ্যাড্‌ম্যান'-এর মতো আমায় দেখছিলেন। দামী লোক। মানুষ হয় তো খুবই ভালো। প্যারিসের উঁচু মহলে নিশ্চয়ই নামডাক আছে। কিন্তু কি জানি কেন, ঈভলীনের স্বামী বলেই কিনা কে জানে, খুব একটা গদগদ-ভাবে ওঁকে পাত্তা দিতে ইচ্ছে করছিল না। যদিও, ইভলীনের কত্তা বলেই ঠোঁটের কোণে আমার মৃদু হাসিটি ঝুলে আছে, টের পাচ্ছি। তবু, ওই দ্যাখন হাসি না দিলে তুমি অসন্তুষ্ট হবে তাই,

—"হেঁ হেঁ, কোথায় আর তেমন ছবি আঁকছি, হেঁ হেঁ—মাদাম দ্যুপোঁ আবার একটু বাড়িয়ে বলেন—"

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, কর্মখালির খবর দেবার মতো হঠাৎ,

—"মঁসিয় কি লেটারিং-কাটিং-পেস্টিং পারেন ভালো?"

—"না। সনাতন পারে!"

কোত্থেকে যে হঠাৎ কলেজের সনাতনকে মনে পড়ল, কাউকেই জিজ্ঞেস করে জানা যাবে না। কলকাতার কোন্ ঘুপসি বিজ্ঞাপন কোম্পানির টেবিলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সাবানের লেটারিং করছে, কে জানে! ফিনিশিঙের কাজে একেবারে পাকা হাত। বেচারা জানতেই পারলো না, এক্ষুনি এখানে থাকলে ভালো মাইনেয় ফরাসী কোম্পানীতে ডাঁটের চাকরি হয়ে যেত। এমনিই হয়। সারা পৃথিবীর নানান্ দেশে, নানান্ শহরে এমনি কত বিখ্যাত চেয়ার, সরেস চাকরি পড়ে থাক, মঁসিয় দ্যুপোঁরা খুঁজে বেড়ায় লোক। সনাতনরা হাজার মাইল দূরে নিখুঁত পাউডারের নাম লিখে দেড়শো-দুশো টাকায় ঘেমে নেয়ে ফুরিয়ে যায়।

—"কে?"

ঈভলীন ও মঁসিয় দ্যুপোঁ প্রায় একসঙ্গেই জিজ্ঞেস করল। আলটপকা সনাতনের নাম মুখ থেকে বেরিয়ে যেতেই খেয়াল হল, পাঁচ বা ছ' পেগ খাঁটি স্কচ চলে গেছে পেটে। বললুম,

—"কেউ নয়। আসলে, আমি পারি না বলেই অন্য এক বন্ধুর নাম মনে এল যে খুব ভালো কাটিং-পেস্টিং করতো।—"

মঁসিয় দ্যুপোঁ যেন একটু আগ্রহই দেখালেন,

—"কই সে ?"

ঈশ্! সনাতন! কি যে হারাচ্ছিস, জানতে পারলি না। প্যারিসের বিখ্যাত বিলিতি কোম্পানিতে তোর স্বপ্নের চাকরিটা আমার চোখের সামনে দিয়ে পিছলে চলে যাচ্ছে। তোর স্বপ্নের অসম্ভব মাগুর মাছ আমি ধরে রাখবো কোত্থেকে !

—"ভারতবর্ষে থাকে সে।"

—"অ !" বলে সনাতনের মাগুর মাছ পকেটে পুরে গেলাসে চুমুক দিলেন মঁসিয় দ্যুপোঁ।

খাওয়া-দাওয়ার পর কালো কফি খেয়ে নাচ শুরু হল। আবার মদ। শ্যাম্পেন হুইস্কি দেদার। ঈভলীনের সঙ্গে এক পাক নেচে টের পেলুম, পৃথিবীতে নাচের বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই। ঈভলীন হাসতে হাসতে বললে,

—"এখন আর তোমার দ্বারা নাচ হবে না, ইণ্ডিয়ান। যাও, বসে বসে আরো দু' পাত্তর গেলো গিয়ে, পিপে কোথাকার।"

কিন্তু সান্তা কই ! সান্তা ক্লজ গেল কোথায় ? যাঁর জন্মদিনে এমন উদ্দাম আসর তাঁকে দেখছি না। আলোকিত বিশাল হলঘরে কোথাও খুঁজে পেলুম না। ঘরের এক দিকের দেওয়ালটি পুরু কাচের তৈরি। কাচের ওপারে অন্ধকার। ঘরের সব রং আলো নাচ হুল্লোড়ের প্রতিবিম্ব নিখুঁত তুলছে কাচের গায়ে। বিশাল কালো আয়নার মতো। এ ঘর থেকে সরাসরি কাচের দেওয়ালের ওপাশে যাওয়া যায় না। দরজা নেই। অন্য দু'টো ঘর ঘুরে, উর্দি-পরা চাকরকে জিজ্ঞেস করে পৌঁছে গেলুম মস্ত টেরাসে ! ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া। দেখি, বড়সড় ডিভানের ওপরে সান্তা ক্লজ টানটান বসে আছে। তেমনি খালি গা, সেই সবুজ ছোট্ট প্যাণ্ট। পেছনে, দূরে কালো কংক্রিটের উলঙ্গ আইফেল টাওয়ারের কোমর থেকে চূড়া অবধি দেখা যায়। চূড়ার খুব কাছাকাছি অবাস্তব গোল চাঁদ স্থির হয়ে লেপ্টে আছে আকাশে। স্ট্যাচুর মতো বসে আছে সান্তা। দাড়ি,

কানের পাশে সাদা চুল অল্প হাওয়ায় দুলছে। চুলবিহীন মাথাটুকু জ্যোৎস্নায় রূপোলী এখন। সান্তার ডিভানের চারপাশে অজস্র রঙিন উপহারের প্যাকেট-গুলো স্তূপাকার হয়ে আছে। কাছাকাছি এগিয়ে দেখি, ওর কোলে ছোট্ট একটি শিশু ঘুমিয়ে পড়েছে। খেয়াল নেই সান্তার, কাচের দেওয়ালের দিকে চেয়ে আছে অপলক। ওপারে সেই হলঘর ভর্তি রঙিন বেলুন শ্যাম্পেন মাতাল মানুষ-মানুষীর হেলেদুলে নাচ। বাজনার শব্দ কাচ পেরিয়ে এখানে পৌঁছোয় না। নির্বাক ছায়াছবির মতো দুর্দান্ত উৎসবের ঘরটির সঙ্গে উপহারের বাক্স-ঘেরা, শিশু-কোলে সান্তা ক্লজ, আইফেল টাওয়ার অথবা জ্যোৎস্নার একেবারেই কোনো মিল নেই, সম্পর্ক নেই। যেন, দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ। প্রাকৃত, অপ্রাকৃত। লৌকিক, অলৌকিক। কোনটা কি নিজেই ঠিক করতে পারলুম না।

আরো কয়েক'পা এগিয়ে যেতে সান্তা অল্প মাথা ঘুরিয়ে আমায় দেখল। ডিভানের পাশের জায়গায় আমাকে বসতে বলল ইশারায়। উপহারের বাক্সগুলো ডিঙিয়ে ওর পাশে বসে পড়তেই ঠোঁটে আঙুল চেপে কানে কানে ফিসফিস করে বলল, "বেশি কথা বোলো না ইণ্ডিয়ান, সবাই রাগ করবে।"

ভার ভার গলা শুনে ওর দিকে তাকাতেই বুঝলুম, সান্তা ক্লজ বসে বসে কাঁদছিল। জলের ধারা শুকিয়ে আছে গালে।

না জিজ্ঞেস করে পারলুম না, খুব চাপা গলায় সান্তার জবাব,—"এখানে এখন আমার সঙ্গে, আমার চারপাশে যারা আছে।"

ঘুরে ভালো করে দেখলুম আবার। কেউ নেই টেরাসে। বললুম,—"কোথায় কে? কাদের কথা বলছেন?"

—"আকাশ, চাঁদ, আইফেল টাওয়ার প্রকৃতি, বাতাস, জ্যোৎস্না, আমার শৈশব, আমার বার্ধক্য।"

খোলা শ্যাম্পেনের বোতল থেকে এক ঢোক খেয়ে আমায় দিল বুড়ো। অলৌকিক, প্রায় শব্দহীন কথা বলল সান্তা,—"আমরা সবাই মিলে আমার জন্মদিন দেখছি। চুপচাপ ছাখো বসে বসে।"

কাচের দেওয়ালে তাকিয়ে সান্তা ক্লজের জন্মদিন দেখতে দেখতে আমারও কেমন সবকিছু অর্থহীন, অসত্য মনে হল।

বোতলটি শেষ করে খুব আস্তে মাটিতে নামিয়ে রাখল সান্তা, যাতে শব্দ না হয়। ফিসফিসে গলায় বলল,—"কি, হে শিল্পী, বন্ধ ঘরের উৎসবের চেহারা দেখে তোমার মনে হচ্ছে না যে, কোনো উৎসবই আসলে কারুর জন্যে নয়।"

বাতাসের শব্দ ছাড়া আর সব চুপচাপ।

আবার বললে সাস্তা,—"এরা সব আমার উত্তরপুরুষ। ওই যে, গুঁফো মোটা লোকটি গোলাপী সন্ধ্যের পোশাক-পরা প্রৌঢ়কে জাপটে ধরে নাচছে —ওটি আমার বড় জামাই এবং তৃতীয় পক্ষ। ছোটো মেজো বউমাকে নিয়ে ব্যস্ত, অনেকক্ষণ ধরেই আদর-টাদর করছে তালে-বেতালে। এরা সব আমার আত্মীয়স্বজন। উত্তরপুরুষ। অথচ আসলে এরা আমার কেউ নয়। সারা বছর কোনো খোঁজ নেয় না এ বুড়োর। এই দিনটা ডায়েরিতে লিখে রাখে, এইসব বাক্স-উপহার নিয়ে হাজির হয় সামাজিকতার খাতিরে। কাল সকালেই আবার ভুলে যাবে। কাল সকালে কেন, এখনই প্রায় ভুলে মেরে দিয়েছে ওরা —কার জন্মদিন যেন! আমার তৃতীয় পক্ষ এ বাড়ির অন্য মহলে থাকেন। পার্টি, ক্লাব-ট্লাব করেন। ন' মাসে, ছ' মাসে দেখা হয় বৈকি। নাহলেও কিস্সু এসে যায় না।"

বলে, যেন খুব ভয়ে ভয়ে হাসল সাস্তা, কেউ শুনতে না পায়! পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে নিল জ্যোৎস্না এবং অন্যান্য সঙ্গীদের। কোলের শিশুটির মাথায় হাত বোলালো পরম স্নেহে। জিজ্ঞেস করলুম,—"এটি কে মঁসিয় ?"

—"চাঁদের আলোয় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কাছে ডাকতেই কোলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল চুপচাপ।"

—"কার ছেলে ?

—"যদ্দূর মনে হচ্ছে, তোমার বান্ধবীর, ঈভের ছেলে !"

ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, ঈভলীনের ছেলে ? কোঁকড়া চুল, নিকষ কালো রং, বছর পাঁচেক বয়েস হবে! অবাক হয়ে সান্তার দিকে দেখলুম। ও হেসে বললে—"ওই ঈভটাই আমার কাছে তবু মাঝে মাঝে আসে যায়। সবার ছোটো মেয়ে তো! বুড়ো বাপের মায়া পুরোপুরি কাটাতে পারে নি।"

তারপর কোলের শিশুটিকে দেখে নিয়ে আবার বললে,—"দু' বছর হল পুষ্যি নিয়েছে, অরফ্যান হাউস থেকে। মেয়েটার সাত বছরেও ছেলেপুলে হল না! হবেও না বোধহয়। এই ঈশ্বরের সন্তানই এখন ওর পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করে, কোলে মাথা রেখে ঘুমোয়। ছোটো মেয়েটা বড় ভালো। অল্পেই অনেক খুশি হয়ে থাকে। বেচারী।"

ঈভলীনের ছেলের নাম বোধহয় সান্তা বলতে পারে নি। বলে থাকলেও এখন কিছুই মনে পড়ছে না আর। উজ্জ্বল রূপোলী জ্যোৎনায় শিশু কোলে

উপহারের বাক্সগুলো নিয়ে সান্তা ক্লজের ছবিও ঝাপসা। ঘোলাটে চোখের সামনে ঈভলীনের মুখ এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মাথার যন্ত্রণাটা বাড়ছেই, বাড়ছেই। হাত নাড়তে পারছি না। জড়ানো গলায় ফরাসীতে জিজ্ঞেস করলুম,—"আমার কি হয়েছে ঈভলীন ?"
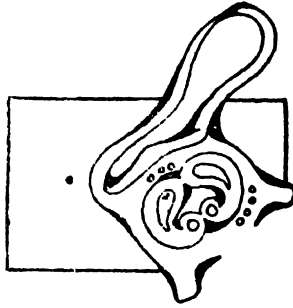
ভারী চোখের পাতা আবার বুজে আসছিল। ঘুম ঘুম। কেউ কি ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে আমাকে! ঘুমের ইঞ্জেকশন? অসহ্য যন্ত্রণার অক্টোপাসটা আমার মাথা গুঁড়িয়ে, পিষে খান্‌খান্‌ করে দিল। আহ্‌! পারছি না। আর পারছি না সহ্য করতে। আমি বোধহয় চিৎকার করতে চাইলুম। পারলুম না। ছিঁড়ে গেল মাথাটা।

—"খুব ব্যথা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ?"

কার গলা? কোন্‌ আপনার জন এমন সহানুভূতির সুরে কথা বলে? জোর করে চোখ টানটান করলুম। আহ্‌! ঘোলাটে গঙ্গার জলের মধ্যে যিশুর চিরন্তন মুখ। আমার যিশুখৃষ্ট হাঁটুমুড়ে বসে অপলকে দেখছে আমাকে। কি সুন্দর নীল চোখ! কি গভীর বেদনায় উদ্‌গ্রীব আমার ঈশ্বর! ওর চোখে চোখ পড়তেই কয়েক মুহূর্ত সমস্ত ব্যথা-যন্ত্রণা ভুলে গেলুম,

—"যিশু।"

—"হ্যাঁ, ভাই! কিচ্ছু ভয় নেই! আমরা তো সবাই আছি। আর একটু ঘুমিয়ে নাও দোস্ত্‌।—"

বলে, আমার বুকে হাত রাখল যিশু।

কলকাতায় নির্জন দুপুরে থালা-বাসন-কেরিওয়ালারা টেনে টেনে হাঁক দিয়ে যায়। শুনতে পাই আমি। ঠিক সেই রকম অনেকগুলো কণ্ঠস্বর বহুদূরে কোরাস গলায় সুর করে টেনে টেনে বলছে,

—"মু-খ চা-ই মু-খ—"

থালা-বাসনের মতো অজস্র মুখ সাজানো রয়েছে ওদের মাথার ঝুড়িতে। মেলায় শিশুরা যেমন তেমনি ভিড় করে পৃথিবীর সমস্ত খদ্দেররা যে যার নিজের মুখ কিনে নিতে লুটোপুটি লাগিয়ে দিয়েছে।…

মেলার নামটা কি যেন! দিনের পর দিন, কয়েক মাস ধরে অজস্র মুখ এঁকেছি আমি। যেখানে অনেকেই দিনে একটিও খদ্দের জোটাতে পারে না, সেখানে রোজ গড়ে প্রায় সাত-আটটি করে মুখ এঁকেছি। আঁকতে আঁকতে, আঁকতে আঁকতে…

সেদিন পাঁচটা রঙিন মুখ শেষ করেছি। দেনিস বললে,

—"অসম্ভব, ইণ্ডিয়ান। আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই। খাওয়াতে হবে।"

যিশু, লিয়ঁ, মঁসিয় কোর্তোয়া বললেন,

—"আলবৎ। তুমুল পানাহার চাই।"

হেসে বললুম,

—"বেশ তো!"

মঁসিয় কোর্তোয়া বললেন,

—"মোঁমাত্রে সবচেয়ে পুরোনো লোক আমি। নাগাড়ে পাঁচ-পাঁচটা রঙিন খদ্দের কটা শিল্পী পেয়েছে এর আগে, আমিও জানি না। সুতরাং—"

যিশু, লিয়ঁ, দেনিসের দিকে চেয়ে সরু গলা একটু চড়িয়ে শ্লোগান দেবার ধরনে বললেন,

—"ইণ্ডিয়ান পেইণ্টার—"

ওরা তিনজনে কোরাসে আওয়াজ তুলল,

—"জিন্দাবাদ!"

হেসে ফেললুম। আমার সুন্দরপনা খদ্দের ইটালীয়ান ভদ্রলোকও মিটিমিটি হাসছেন।

হাতের সবুজ প্যাস্টেলটি বাক্সে রেখে জ্যাকেটের দু' পকেট হাতড়ে যত নোট ছিল দেনিসের হাতে গুঁজে দিলুম। হাসতে হাসতে বললুম,

—"তথাস্তু! তোমরা খানাপিনার বন্দোবস্ত করো।"

দশ, কুড়ি, একশোর নোট মিলিয়ে প্রায় শ' পাঁচেক ফ্রাঁ হবে। যিশু হাঁ-হাঁ করে উঠল,

—"পাগলা নাকি, ইণ্ডিয়ান। অত টাকা কি হবে!"

বলে, দু'শো ফ্রাঁ গুণে নিয়ে বাকি আমার পকেটে ফের গুঁজে দিল,

—"কোন্ হোটেলে বসব সবাই, ঠিক করে ফেল।"

বললুম,

—"অনেক দিন অ্যানের হাতের রান্না খাই নি, কি বল বন্ধুগণ ?"

সব্বাই একসঙ্গে 'হুর্‌রা' দিল,

—"অ্যানের হাতের 'বীফ-স্তেক্' খাব।"

মঁসিয় কোর্তোয়া বললেন,

—"আর পেঁয়াজের স্যুপ।"

দেনিস জুড়ে দিল,

—"পেট ঠেসে বোর্দো ওয়াইন।"

যিশুকে এড়িয়ে দেনিসের পকেটে আরো পঞ্চাশ ফ্রাঁ গুজে দিলুম। বেচারার আজ একদম রোজগার হয় নি। কানে কানে বলে দিলুম,

"রেখে দাও। পরে, রাম খাইয়ে দিলেই চলবে।"

দেনিস ক্যাস্তেল যেন 'ও' বলতে গিয়ে হাঁ করে ফেলল। হাসতে গিয়ে হাসতে পারল না। বোকার মতো হেসে দিয়ে সামলে নিল। উজ্জ্বল চোখে এক পলক চেয়ে আমার পিঠে একটা থাপ্পড় দিয়ে বললে,

—"আমরা এগোই। সন্ধ্যে হয়ে এলো বলে। অ্যানীকে গিয়ে পাকড়াও করতে হবে তো।—"

ওরা চলে গেল। যিশু বললে,

—"এটা শেষ করে সোজা আমার ঘরে চলে এসো। সারাদিন তো খাবারও সময় পাও নি কিছু।—"

ইটালীয়ান ভদ্রলোকের পোর্ট্রেট যখন শেষ করলুম, তখন চত্বরের চারপাশে রাস্তার টিমটিমে বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। ভ্রমণকারীরা সব প্যারিসের রাত খুঁজতে নানান্ দিকে ছুটেছে। কেউ আলোর জাঁকজমক খুঁজতে, কেউ মোহিনী অন্ধকার। মোঁমার্ত্রের শিল্পীরা যে যার পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে নেমে গেছে পাহাড় থেকে। দু'চারজন তখনো খুটখাট রং তুলি গুছিয়ে রাখছিল। বাকি আসর ফাঁকা। কাফে-রেস্তোরাঁগুলোয় কিছু মানুষ-মানুষী আড্‌ডা দিচ্ছে। মাঝে মধ্যে হাসি-হল্লার শব্দ ভেসে আসছে হাওয়ায়।

বড় ক্লান্ত লাগছে আজ। খালিপেটে সেই সকাল থেকে কাজ করেছি। ভাবলুম, দুটো সসেজ দিয়ে একটু ব্র্যাণ্ডি খেয়ে নেওয়া যাক। চাঙ্গা লাগবে। ভারী পা' দুটোকে টেনেটুনে কাফের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

প্রচুর ঘুরে ঘুরে গ্যালারির আশা পাওয়া গেছে। প্রায় রোজই ঈভলীন এসেছে সন্ধ্যেবেলা। মোঁমাত্রে মুখ আঁকা সেরে বেরিয়ে পড়েছি দু'জনে মিলে। সাঁ মিশেল, সাঁ জার্মান দ্য-প্রে থেকে আরম্ভ করে মোঁপানাস, শাঁজেলিজে এলাকার সদর রাস্তায়, গলি-অলিতে চক্কর মেরেছি। হা-ক্লান্ত হয়ে কফি অথবা ওয়াইন খেয়েছি। আবার চক্কর। শেষকালে, গেল হপ্তায় 'বুলভার রাস্‌পাই' রাস্তাটির নাম আমি মনে মনে দিয়ে দিলুম, 'দুঃখু ভোলাবার আশ পাই'! কারণ, 'গ্যালারি এক্স্‌পোজিসিয়ঁ' আসছে মাসে আমাকে আশা দিয়েছে। মালকিন মাদাম দ্যুবোয়া নিপাট ভালোমানুষ। ছোটোখাটো গোলগাল গড়ন। রিম্‌লেস চশমা পরে আধো আধো ইংরিজি বলতে থাকেন। কথা শেষ হলে হঠাৎ নিজেই বোধ হয় বুঝতে পারেন যে, শেষের দিকটা একেবারে ফরাসী হয়ে গেল। লজ্জার হাসি হেসে আবার ইংরিজিতে পরের বাক্যটি শুরু করে দেন।

—"ছবি সব নিয়ে এসেছো?"

মাদাম দ্যুবোয়ার কথার জবাব ঈভলীনই দিল,

—"এখানে আঁকছে, সব নতুন ছবি।"

মাদাম অবাক,

—"কদ্দিন এসেছো এ রাজ্যে?"

গ্যালারি পাবার এই প্রথম আশা-ভরসা পেয়ে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা ক্ষণে ক্ষণে রং বদলাচ্ছে, টের পেলুম। একটু আগেই সবুজ ছিল, এক্ষুনি গোলাপী হয়ে গেল। আবার পাল্টে কমলা রং। প্যারিসে আমার প্রদর্শনী হবে। হাজার হাজার ফ্রাঁ-তে সব পেইন্টিং বিক্রি করে দিয়ে ধার-দেনা শোধ দেব। স্বর্গরাজ্যের সবাই আমার নাম জেনে যাবে। পিকাসোর মতো শুধু আমার সইয়ের দামই হবে কয়েক হাজার টাকা। লুভ্‌র্ মিউজিয়ামের সামনে সেই উঁচু বেদীটা শূন্য পড়ে আছে এখনো!—চোখে দেখবার নেই রং, রীতিমতন অনুভব করছি, আবার বদলে যাচ্ছে বুকের ভেতরে। কমলা মিলিয়ে গিয়ে হালকা আকাশের নীল হয়ে যাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা।

যথেষ্ট বিনীত গলায় জানালুম,

—"ছ' মাসের বেশি।"

—"ছবি ক'টা শেষ করলে?"

ঈভলীন বললে, আমি বলার আগেই,

—"পনেরোটা। দারুণ, দারুণ ছবি সব।"

মাদাম মৃদু হাসলেন।

ঈভলীনের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন,

—"ইণ্ডিয়ান তোমার কে হয় ?"

এক দণ্ড দেরি না করে ঈভলীনের জবাব,

—"শত্তুর !"

মাদাম হাসছেন মিটিমিটি। আমার দিকে একবার চোখ ঠেরে আবার বললেন ওকে,

—"কি রকম শত্তুর ? খু-উ-ব !"

মা-ঠাকুমার মতো হঠাৎ আমার গাল টিপে দিয়ে হাসতে হাসতে ঈভলীন বললে,

—"খু-উ-ব !"

পরদিন ঈভলীনের গাড়িতে চাপিয়ে তিনটে পেইন্টিং এনে দেখালুম মাদাম দ্যুবোয়াকে। মাদাম খুব খুশি। বললেন,

"ভালো ছবি। খুব ভালো ছবি।"

তারপর আশা দিলেন,

—"আসছে মাসের ছাব্বিশে থেকে তিন সপ্তাহ বোধহয় তোমার প্রদর্শনী এখানে করতে পারবে। পাকা খবর হপ্তাখানেকের মধ্যেই জানিয়ে দেব।"

উত্তেজনা যথেষ্ট চেপেচুপে স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইলুম,

—"পাকা খবরটি আজ দিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, মাদাম ?"

আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন,

—"না, বাছা ! অন্য এক মহিলা-শিল্পীর বুকিং আছে। উনি ক্যান্সেল না করা পর্যন্ত আমি তো কথা দিতে পারি না। তবে ঘাবড়াবার কারণ বিশেষ নেই। আমার যদ্দূর বিশ্বাস, উনি ক্যান্সেল করে দেবেন।—"

মনের আশাটিকে আরো পোক্ত করতে চাইলুম,

—"আপনার এমন বিশ্বাস কেন হল, যদি একটু বলতেন তাহলে বেশ জোর পাওয়া যেত মনে !"

দুঃখিতভাবে মাদাম বললেন,

—"পারিবারিক ঝামেলায় আছেন শিল্পীটি। যখন আমার গ্যালারি 'বুক' করেছিলেন, প্রায় বছরখানেক আগে, তখন কোনো গণ্ডগোল ছিল না। স্বামীর সঙ্গে আর নাকি বনছে না। ডিভোর্স-টিভোর্স নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে। ফলে বুঝতেই পারছো, ইণ্ডিয়ান—"

হাত উলটে অসহায়তা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস! অদেখা, অজানা সেই মহিলা-শিল্পীটির জন্যে মানবিক কারণে খারাপ লাগা উচিত। লাগছেও নিশ্চয়ই কোথাও! আবার আপন প্রয়োজনে, সেটাও নিশ্চয় মানবিক, মনে মনে ভাবছি, ডিভোর্স্ ইত্যাদির পারিবারিক ঝুট-ঝামেলা মহিলাটির যেন এক্ষুনি মিটমাট হয়ে না যায়। ওঁর বুকিংটি ক্যান্সেল্ করে দেবার পর, হে ধর্মাবতার, সংসারে ওঁদের শান্তি ফিরে আসুক!…

কাল বিকেলে ঈভলীনের সঙ্গে পাকা খবরটি আনতে যাবার কথা।

রেস্তোরাঁয় ঢুকে দেখি গীয়ম এবং তার গুটিকয় সাঙ্গপাঙ্গ টেবিল চাপড়ে আড্ডা দিচ্ছে। ওদের সঙ্গে সরাসরি আমার আলাপ হয় নি কোনোদিন। আবার ঝগড়াঝাঁটিও কিছু নেই। ওরা ভিন্ন দল। যিশু-লিয়ঁদের সঙ্গে বিশেষ বনিবনা নেই। ব্যস, এই পর্যন্ত।

গীয়মরা আমাকে দেখেও দেখল না। আমিও দূরের একটা টেবিলে গিয়ে বসলুম। আমাকে লক্ষ্য করেই মনে হল, ওই টেবিল থেকে একটা ফরাসী খিস্তি মাতাল গলায় কে যেন বাতাসে ছুঁড়ে দিল। পাত্তা দিলুম না। কক্‌টেল সসেজ ভাজা আর দু' পাত্র ব্র্যাণ্ডি খেয়ে উঠে পড়লুম। যিশুর বাড়ি যেতে হবে।

মোঁমার্ত্রের নির্জন চত্বরটি পেরিয়ে সরু রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলুম। ডান-দিকের ছোটোখাটো কিউরিওর দোকানগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। বাতিগুলো বেশ দূরে দূরে। গুমোট এবং আবছা অন্ধকার গলি দিয়ে ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবলুম, ঈভলীন এলো না কেন আজ! যদিও আজকে ওর আসবার তেমন কোনো কথা নেই। তবু সারাদিনে এক ফোঁটাও দেখতে না পেলে যে জিভের স্বাদটা একটু অন্যরকম ঠেকে তা' তো আর নিজের কাছে লুকিয়ে, 'জানি-না, বুঝি-না' করে কাটিয়ে দেবার মানে নেই! ও কাছাকাছি থাকলেই যেন একটা বল-ভরসা।

আর একটু এগোলেই বাঁদিকে গীর্জা। তারপর পাহাড় বেয়ে নেমে যাবার সিঁড়ি। পকেট থেকে সিগারেট বের করে দু' পায়ের মধ্যে ড্রয়িং বোর্ডটি চেপে ধরলুম। তিন-চারটে দেশলাইয়ের কাঠি নষ্ট হল বাতাসে। বোর্ডটি হাতে নিয়ে বাঁদিকের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালুম। কাঠির বারুদ বোধহয় মিইয়ে গেছে। মুখের কাছে এনে বার কয়েক হাহ্ হাহ্ করে দেশলাইয়ের খোলে ঘষা দিতে যাব, পেছনে জুতোর শব্দ। অনেকগুলো। খুব দ্রুত ছুটে আসছে। গলির আধো-

অন্ধকারে পেছন ফিরে তাকিয়ে কিছু বুঝে ওঠবার আগেই মাথাটা চৌচির হয়ে গেল যেন। ভীষণ ভারী কোনো লোহার রড অথবা পাথরের আঘাত। ঠোঁটের সিগারেট, হাতের দেশলাই, ড্রয়িং বোর্ড সব কোথায় কোথায় ছিটকে পড়ল কে জানে! চোখে অজস্র জোনাকির আলো-অন্ধকার! লক্ষ ঝিঁঝিপোকা কানের ভেতরে ঢুকে চিৎকার করছে।

বাঁ হাত বাড়িয়ে দেওয়ালটা খঁজলুম।

ডান হাতটা ঘুরিয়ে পিঠের সঙ্গে লাগিয়ে মুচড়ে দিল ওরা। আমি কি যন্ত্রণায় চেঁচিয়েছিলুম? মনে নেই। ওদের মুখগুলো কি ঘুরে দেখবার চেষ্টা করেছিলুম? মনে নেই।

শুধু কানের কাছে চাপা কর্কশ গর্জন মনে পড়ছে,

—"কশোঁ! বাত্যার।"

—"ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ড!"

—"শালা, শুয়োরের বাচ্ছা! বিদেশী কেলো ভূত। আমাদের মহল্লায় এসে, আমাদেরই পেটে লাথি মারবার তাল! ফের যদি এই পাহাড়ে উঠতে দেখেছি তো, জন্মের মতো মুখ আঁকা ঘুচিয়ে দেব, হারামজাদা।—"

মা'! মাগো! আমার ডান হাতটা কি পাথর দিয়ে গুঁড়িয়ে থেঁতলে দিয়েছে কেউ! আমি কি আর ছবি আঁকতে পারবো না কোনোদিন?...

ঈভলীন আমার চোখের কোলে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে বলল,

—"ছিঃ! কাঁদতে নেই ইণ্ডিয়ান! তুমি না পুরুষ মানুষ!"

যিশু বললে,

—"কিচ্ছু হয় নি দোস্ত। সব ঠিক হয়ে যাবে।"
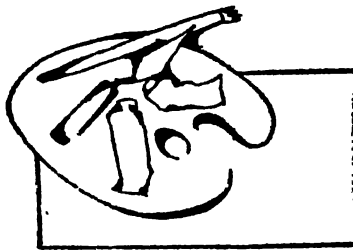
গ্যালারী এক্সপোজিসিয়ঁতে এমনি এমনিই একটা ফোন করেছিল ঈভলীন,

—'মাদাম দ্যুবোয়া! শুভ-সন্ধ্যা জানাচ্ছি। আমি ঈভলীন দ্যুপোঁ।'

ওপার থেকে মৃদু হাসির সঙ্গে জবাব এল,

—'শুভ-সন্ধ্যা মাদাম দ্যুপোঁ! ভালোই হয়েছে ফোন করেছো। তোমার শত্তুরটিকে জানিয়ে দাও যে, আসছে মাসের ছাব্বিশ থেকে গ্যালারী পাওয়া যাবে। প্রদর্শনীর কার্ড ছাপা হলে আমার অন্তত শ' পাঁচেক কার্ড চাই—'

সন্ধ্যে উৎরে গেছে। এখন কি ইণ্ডিয়ানকে মোঁমাত্রে পাওয়া যাবে? তবু একবার গিয়ে দেখা যাক্! খবরটা শুনিয়ে ওকে চমকে দিতে হবে! এইসব সাত-পাঁচ ভেবে উর্ধ্বশ্বাস গাড়ি চালিয়ে মোঁমাত্রে পৌঁছোলো ঈভলীন। গির্জার পাশ দিয়ে জনহীন আব্ছা গলি। বাঁদিকের দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। ডান দিকের দেওয়ালের ওপারে গাছের পাতায় বাতাস লেগে ফিরফির শব্দ। তা ছাড়া চারদিক নিঝুম! দূরে, মেলার গায়ে রেস্তোরাঁগুলো থেকে হঠাৎ হঠাৎ হাসির পাতলা কাঁপা আওয়াজ ভেসে আসছে।

হাওয়া এবং পাতলা হাসির মধ্যে কি যেন একটা বেতালা শব্দ শুনতে পেল ঈভলীন। দ্রুত পায়ে হেঁটে উঠছিল। খুব কষ্টের মৃদু গোঙানির শব্দ আশেপাশে কোথাও। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ঈভলীন। দেওয়ালের গা ঘেঁষে আধো-অন্ধকারে একটা মানুষ না? কাছে এগিয়ে যেতেই বোঝা গেল, উপুড় হয়ে কে পড়ে আছে পাথুরে রাস্তায়। মুখ দেখা যাচ্ছে না। পিঠের ওপরে ডান হাতটা দোমড়ানো। মাথার চারপাশে রক্ত গড়িয়ে কালচে হয়ে গেছে। কানের পাশ দিয়ে এখনো বোধহয় একটু একটু তাজা রক্ত বেরিয়ে আসছে। গোঙানির শব্দ নেই আর। মরে গেল না তো লোকটা?

আর একটু ঝুঁকে দেখতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ঈভলীন। এ কি! না! এ তো' ইণ্ডিয়ান!......

গতকাল সন্ধ্যেবেলার সব কথা বলছিল ঈভলীন। আমার আবার ঘুম পাচ্ছে। যিশু-ঈভলীনদের বন্ধু ডাক্তার জীল আমার মাথায় সাতটা না আটটা সেলাই দিয়েছে। ডান হাতে প্লাস্টার। অন্য যে-কোনো মানুষের হাতের মতো আমার পেটের ওপরে ভাঁজ হয়ে পড়ে আছে। যিশুর ঘরেই আমাকে সোজা নিয়ে এসেছে ঈভলীন। পার্টি-টার্টি কিছুই হয় নি। কাল সারারাতই নাকি আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলুম। দুপুরে ব্যথার চোটে খুব চেঁচামেচি করেছি বলে আবার ডাক্তার ডেকে আনা হয়েছে। ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে গেছে। এখনো বন্ধুরা সব আমায় ঘিরে বসে। এদের মুখে শুনে শুনে অদেখা জীলের একটা কাল্পনিক চেহারা মনের মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। চটপটে যুবক। সুন্দর মুখের গড়ন।

মাথাভরতি চুল। চোখে নিশ্চয়ই চশমা আছে। আমার চিকিৎসা করে গেছে, অথচ আমার সঙ্গে আলাপই হয় নি। ভাবতে অবাক লাগছে কেমন। ডাক্তার বলেছিল, 'পুলিস কেস'। পুলিসে খবর দেওয়া উচিত। ম সিয় কোর্তোয়ারও সেই মত। দেনিস, যিশু এমন কি লিয়ঁ পর্যন্ত ঘোর আপত্তি করেছে।

থেমে থেমে খুব কষ্টে জিজ্ঞেস করলুম,

—"আমার হাতটা কি একেবারে ভেঙে গেছে যিশু ?"

প্রত্যেকটি অক্ষর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যেন মাথার ভিতরে সমস্ত শিরাগুলি ছিঁড়ে যাচ্ছে।

ঈভলীনের ঠোঁট কাঁপছে, চোখ ছলছল করছে। সবাই আমার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ল।

—"কি ? কি বলছ, ইণ্ডিয়ান ! ব্যথা হচ্ছে ?"

আবার থেমে থেমে স্পষ্ট করে কথাগুলো বললুম।

যিশু তাড়াতাড়ি বললে,

—"না, না ! কিচ্ছু হয় নি ! ভয়ের কিছু নেই। জীল বলেছে, তিন-চার সপ্তাহের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

যিশুর স্যাতসেঁতে ঘরে দিন-রাত্তিরের ফারাক বোঝা ভার। বাতি জ্বললে দিন, না জ্বললে রাত। অ্যানীর বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিন কুড়ি পার করে দিলুম। মাথার ঘা' প্রায় শুকিয়ে এসেছে ডাক্তার জীলের নিয়মিত ড্রেসিং-এ। জীলকে দেখতে মোটেই আমার কল্পনার ছবির মতো নয়। খুব বোকা-বোকা হৃষ্টপুষ্ট দেখতে। পাতলা চুল, পোশাক-আশাক এবং হাঁটার ধরন দেখলে মনে হবে, বেশ বয়েস। তবে হাসিটি একেবারে ছেলেমানুষের মতো। যিশু ঈভলীনদের সঙ্গে যখন কথা বলে তখন বোঝা যায় ডাক্তারটি আমাদের সমবয়সী এবং যথেষ্ট বুদ্ধিমান। প্রায় সারা দিনই ঈভলীন আমাকে পাহারা দিয়েছে। রাতে অ্যানী আর যিশু। এর মধ্যে কবে যেন খুব তেষ্টায় ঘুম ভেঙে গেল মাঝরাতে। ঘরের মধ্যে হাঁটাচলার অনুমতি দিয়ে গেছে জীল। বাঁ হাতে ভর দিয়ে উঠতে যাবো, অন্ধকারে অ্যানীর গলা, খুব আস্তে চাপা হাসির শব্দে কথা বলছে,

—"তুমি তো থরথর করে কাঁপছিলে !"

যিশুও তেমনি চাপা গলায় বলল,

—"ঈশ্‌ ! আর তুমি যেন 'জোন অব আর্কে'র মতো নির্ভয়ে বাড়ি ঢুকেছিলে !"

ভেংচে দেবার ধরনে অ্যানী বললে,

—"আজ্ঞে না। তোমার মতো ভয় আমি মোটেই পাই নি!"

কিসের কথাবার্তা হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারলুম না। অ্যানী ওর বিছানা আমাকে ছেড়ে দিয়ে দু'জনে একসঙ্গে শোয়। আদরের শব্দ-টব্দ বা প্রেমের সংলাপ হলে না হয় বুঝতুম, জোর করে আবার ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করতুম। কিন্তু, এই মাঝরাতে এদের আলাপ-সালাপের ধরন-ধারণ কিছুই ঠাহর করতে না পেরে চুপচাপ শুয়ে থাকলুম। ফাঁক পেলে গলা-খাকারি দিয়ে উঠে পড়ব জল খেতে।

যিশুর ফিসফিস কথা,

—"আহা! ভয় তুমি মোটেই পাও নি, শুধু 'ভ্যাঁ' করে কেঁদে ফেলেছিল!"

হালকা হাসি বাজল অ্যানীর গলায়,

—"তা কি করব, আমার নতুন ফ্রকে কাদামাটি লেগে একশা! অত সুন্দর ফুলতোলা 'নোয়েলের' ফ্রক্ মা এক মাস ধরে বানিয়েছিল—কাঁদবোই তো। বেশ করবো।—"

যিশুও হাসছিল। অ্যানী বললে,

—"আর, তুমি বীরপুরুষ কেঁদে ফেললে কেন?"

—"বাঃ, আমার ডান পায়ের গোড়ালি মচ্‌কে গিয়েছিল না—কি যন্ত্রণা—উফ্!—"

অ্যানের আপত্তি,

—"উঁহু, মঁসিয়! আপনি পায়ের ব্যথার চেয়েও বেশী ভয় পেয়েছিলেন, আপনার বাবার হাতে মার খাবার চিন্তা করে! কি, ঠিক কিনা?"

চাপা হাসির শব্দের মধ্যে যিশুর কথা,

"মনে আছে তোমার! উফ্! কি ভয়ই না পেতুম বাবাকে তখন! একে তো ওকে না জানিয়ে সাইকেলটা বের করে এনেছিলুম। অত বড় সাইকেল, দু'পায়ে প্যাডেল পাই না! তার ওপর আবার তোমাকে বীরত্ব দেখাতে সওয়ারী বানালুম পেছনে—"

দু'জনে একসঙ্গে হাসছে। অ্যানী বলছে,

—"হ্যাণ্ডেলটা তো বেঁকেই গিয়েছিল—"

—"শুধু হ্যাণ্ডেল! রাস্তা থেকে অতখানি গড়িয়ে নিচের কাদায় পড়তে পড়তে দু'চারটে স্পাইক্ও ছিঁড়ে গিয়েছিল।—"

ছেলেবেলার গল্প হচ্ছে, বুঝতে পারলুম। ফেলে-আসা মধুর স্মৃতি। মনে পড়ল, প্রথম দিন যখন এই ঘরে এসেছিলুম, দু'জনে ছেলেমানুষের মতোই ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছিল, 'কে কার চেয়ে কত বয়েসে বড়' এই নিয়ে। যিশু বলেছিল, ওদের গ্রাম সেই লিয়ঁতে অ্যানীকে কোলে করে ঘুরে বেড়াতো। অ্যানী মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোর আপত্তি জানিয়েছিল,

—"আমি ছিলুম নাদুস-নুদুস্। ও যদি আমায় কোলে তোলার চেষ্টা করতো না, তা হলে, নিজেই লট্‌পটিয়ে পড়ে যেত!—"

আজকে হঠাৎ ওদের ছেলেবেলা মনে পড়ল কেন কে জানে।

দু'জনে একটু চুপ করে থাকলো! শুধু শ্বাসের শব্দ। সাইকেল থেকে পড়ে যাবার মতো, আরো কোনো ঘটনা বোধহয় মনে পড়ছে! ভাবলুম, এইবার আস্তে আস্তে উঠে অন্ধকারেই বাঁ দিকের তাক হাতড়ে জলের বোতলটা নামিয়ে নিই।

লম্বা শ্বাসের শব্দ এল। যিশু বললে,

—"অনেক কিছু ফেলে এসেছি আমরা লিয়ঁতে, আর পাওয়া যাবে না?—"

আবার একটু চুপ থেকে অ্যানী জিজ্ঞেস করলে,

—"কিন্তু তোমার বাবাকে একটা খবর দেবে না?"

যিশু যেন ক্লান্ত গলায় জানালো,

—"দিলেও উনি আসবেন না। আমি জানি।"

অ্যানী হালকাভাবে বলে দিল,

—"বাদ দাও। কাউকে দরকার নেই। মঁসিয় কোর্তোয়া আমায় গির্জায় নিয়ে যাবেন। বাকি সব বন্ধুরা তো রয়েছেই।—"

—"হুঁ। ঠিকই বলেছো, অ্যান্। আমাদেব চারপাশে বন্ধু-বান্ধবরাই তো আমাদের সব!"

হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে অ্যানী জিজ্ঞেস করলে,

—"এই! আমাকে অমন সাদা গাউন, সাদা ঘোমটায় কিরকম দেখাবে বলো তো?"

যিশু বোধহয় অ্যানকে চুমু খেলো। খেয়ে বলল,

—"একেবারে খাঁটি শাঁকচুন্নির মতো!" বলেই হাসতে লাগলো।

অ্যানীর কপট রাগ,

—"ঈশ্! কপালে তো এই শাঁকচুন্নি ছাড়া আর কেউ জুটলো না!—"

যিশু তখনো মৃদু শব্দে হাসছে।

গোটা ব্যাপারটি বুঝতে পেরে আনন্দে পেট গুরগুর করছে। এদের বিয়ে! গ্রাম ছেড়ে এসে পাকাপাকি ঘর-সংসার। কত্তা-গিন্নী হয়ে যাবে দু'জনে! কি দারুণ ব্যাপার! অন্য বন্ধুরা এখনো কেউ কিচ্ছু জানে না নিশ্চয়ই। আমিই প্রথম খবর পেয়ে গেলুম। হাততালি দিয়ে বলে উঠতে ইচ্ছে করল, শুনে ফেলেছি। সব কথা শুনে ফেলেছি তোমাদের—ডান হাতে প্লাস্টার জড়ানো ভুলেই গিয়েছিলুম খুশ-খবরে!

যিশু বললে,

—"ইণ্ডিয়ানের প্রদর্শনী ছাব্বিশে আরম্ভ। আটাশ তারিখে, রোববার তোমাকে বগলদাবা করে নিয়ে আসব গির্জা থেকে।"

খুশিতে উত্তেজিত গলায় কথা বলল অ্যানী,

—"কিন্তু, কিন্তু, ইয়ে, তোমার নিতবর কে হবে?"

আর থাকতে পারি নি। দুম্ করে বলে দিয়েছি,

—"আমি!"

দু'জনেই বোধহয় একটু হতভম্ব হয়ে গিয়ে এক সেকেণ্ড চুপ করে ছিল। তারপর বাতি জ্বালিয়ে অ্যানী তো আমাকে প্রায় মারে আর কি! কাছে এসে নাক চেপে ধরে বকতে লাগল,

—"পাজী!! দুষ্টু কোথাকার, কখন থেকে ঘাপটি মেরে শোনা হচ্ছে!"

এক হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলুম। হাসতে হাসতে বললুম,

—"ভাই যিশু, আমি কিন্তু তোমার নিতবর না হয়ে ছাড়ব না।—"

আমার নাক ছেড়ে অ্যানী বলল,

—"দুয়ো! এ জন্মে আর হবে না, দামড়া কোথাকার! তোমার না বিয়ে হয়ে গেছে!"

যিশু আমাকে জল খাইয়ে, বাতি নিবিয়ে দিয়েছিল। একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলেছিল,

—"দেখো দোস্ত, এক্ষুনি কাউকে কিছু বলতে যেও না যেন! তোমার হাত সারুক। পার্টি দিয়ে ঘোষণা করব।—"

আমি কাউকেই বলি নি। ঈভলীনকেও নয়।

দুর্ঘটনার পরদিন থেকেই গীয়ম উধাও। আমার কাছে সেই সন্ধ্যের খবর শুনে যিশু, লিয়ঁ, দেনিস ক্ষ্যাপার মতো গীয়মকে খুঁজে বেড়াচ্ছে রোজ। মোঁমার্ত্রে

আসে না। বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করে সেখানেও হানা দিয়েছে ওরা। কোনো পাত্তাই নেই, গীয়মের। গত কুড়িদিন রোজ রাত্রে ঘরে ফিরে যিশু বলে,

—"পেলুম না। আজও আসে নি শালা।"

আমি বলি,

—"যেতে দাও, যিশু। কি আর হবে!"

যিশুর গম্ভীর মুখ শক্ত হয়ে যায়,

—"সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। শুয়োরের বাচ্চার ডান হাতে প্লাস্টার না লাগিয়ে আমি ছাড়ছি না।—"

আজ এখনো ফেরে নি যিশু। ঈভলীন বিকেলে এসেছিল। সন্ধ্যে পার করে গেছে আমার কাছে বসে। পরশু গাড়ি নিয়ে আসবে। ওর গাড়িতে চেপে মেজোঁয় ফিরে যাবার কথা।

অ্যানী পেঁয়াজের স্যুপ আর ভাজা মাংস দুটো প্লেটে করে নিয়ে এলো। বললে,

—"তুমি খেয়ে নাও, শিল্পী। পিয়ের তো এখনো এলো না। রাত দশটা বাজে। তোমাকে আবার বড়ি খেতে হবে।"

স্যুপে চুমুক দিয়ে বললুম,

—"তুমি তা হলে কত্তার জন্যে অপেক্ষা করবে বলছো!"

চোখ পাকিয়ে ধমক দিল অ্যানী,

—"ধ্যৎ! ফাজিল কোথাকার! খেয়ে নাও চুপচাপ।"

দরজায় জোরে এবং ঘন ঘন ধাক্কার শব্দ। যিশু এলো বোধহয় এতক্ষণে!

অ্যানী উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল দেনিস আর ঈভলীন।

ছোট্ট প্যাসেজটুকু পেরিয়ে এসে তাক থেকে ওয়াইনের বোতল নামিয়ে আনল দেনিস। সোজা বোতলে মুখ লাগিয়ে ঢক্‌ঢক্‌ করে খানিকটা গিলে ফেলল। একটু লক্ষ করতেই দেখি ওর থুতনির কাছে সাদা ক্রসচিহ্নের ষ্টিকিং প্লাস্টার। কপালের নিচে পেয়ারার মতো ফুলে গিয়ে ডান চোখটি প্রায় ঢেকে দিয়েছে।

ঈভলীন দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। অ্যান দেনিসের কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে,

—"কী হয়েছে? কী হয়েছে, দেনিস? পিয়ের কোথায়?"

দেনিস খানিকটা ওয়াইন হাতে নিয়ে কপালের ফোলা জায়গায় ঘষতে ঘষতে দ্রুত গলায় বলল,

—"সব বলছি। শিগ্‌গির চলো আমাদের সঙ্গে!"

খাবার ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছি। বাঁ হাতে দেনিসের কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললুম,

—"আহ্‌! কি হয়েছে, বল না! কোনো গণ্ডগোল কিছু?"

দেনিস কাঁধ থেকে আমার হাত সরিয়ে বলল,

—"চুপটি করে শুয়ে থাকো, খোকাবাবু। অসুস্থ লোকের অত উত্তেজিত হতে নেই! চলো অ্যানী।"

বাঁ হাতে দেনিসের কোট চেপে ধরলুম। ও ঘুরে তাকাল। বললুম,

—"আমি যাবো।"

এক দণ্ড আমাকে দেখে নিল দেনিস। ঈভলীনের দিকে তাকাল। ঈভলীন আমার হাত ধরে বললে,

—"ঠিক আছে, ইণ্ডিয়ান। চলো!"
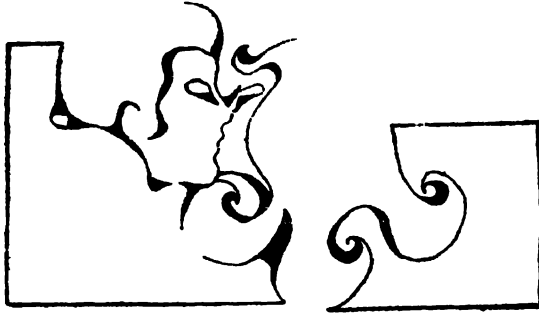
আজকের মতো পাততাড়ি গুটিয়ে দেনিস দেখল, চাঁদ উঠেছে। দুই বুড়ো-বুড়ি এবং কারখানার এক মজুরের পোর্ট্রে এঁকেছে সারাদিনে। ফোলা-ঝোলা বলিরেখা আর চোয়াড়ে মুখটির পর ঝকঝকে গাঢ় আকাশে মসৃণ চাঁদের চেহারাটি দেখতে ভারি ভালো লাগল। নিষ্পাপ শিশুটি যেন। ওই তো দুটো কুতকুতে সরল চোখ! চ্যাপ্‌টা নাকের নিচে একগাল হাসি! হাঁ করে, মুখ তুলে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকতেই গান পেল দেনিসের। যিশু এবং লিয়ঁকে সাংঘাতিক চমকে দিয়ে চন্দ্রাহত দেনিস ক্যাস্তেল স্বাভাবিক ভুল সুরে এক কলি গান গেয়ে ফেলল। ছোটোবেলায় শোনা চাঁদের স্তুতি।

প্রথম কলিটির ধাক্কা সামলে যিশু এগিয়ে এল,—"প্রাণের ভাই দেনিস আমার, দুঃখ কোরো না! তোমার দুঃখে ভয় পেয়ে বেচারি ডুবে যেতে পারে!"

দেনিস শুনল না। গাইল, চাঁদের দিকে চোখ রেখে অবশ্যই,—"মা তোমার জন্যে ময়দা গুলে পিঠে বানিয়েছে—"

যিশু বললে,

—"সে তো ভালো কথা। কিন্তু, পিঠে দিয়ে কি বোর্দো জমবে?" দেনিস কান দিল না। আরো মমতা মাখিয়ে, খুবই বিপজ্জনক ভুল সুরে চাঁদকে গেয়ে শোনালো,

—"তুমি তো পিঠে খেতে দারুণ ভালোবাসো—"

যিশু হাল ছেড়ে দিয়ে লিয়ঁর দিকে ঘুরে তাকাল। বলল,—"আর কোনো কথাই ওর কানে যাবে না এখন লিয়ঁ। বোতল ভরা বোর্দো নিয়ে এসো। এখানেই খোলা হাওয়ায় কাঠের বাক্সে বসে, মোঁমাত্রের চাঁদের নাম করে খেয়ে ফেলি।—"

সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফেরাল দেনিস। বিশাল গোলাপী ভালুকের মতো জাপটে ধরল যিশুকে,

—"গত জন্মের শালা আমার। এতক্ষণে একটা কথার মতো কথা বলেছো। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবার মতো তরল ঘোষণা"

এক এক বোতল ওয়াইন সেরে তিনজনে ফিরে আসছিল। দেনিস তখনো অদৃশ্য চাঁদকে গান শোনাতে থেকে থেকে হেঁকে উঠছিল। স্যাক্রে ক্যর গীর্জার গায়ের কালো পথে জ্যোৎস্না পড়েছে কাটা কাটা। পেছনে মেলার চত্বর এবং কাফেগুলো প্রায় শান্ত। মোঁমাত্র্ টিলার অনেক নিচে থেকে হালকা গুঞ্জন মাঝে মধ্যে হাওয়ায় ভর দিয়ে উঠে আসছে। তালে তালে পা ফেলে হাঁটছে তিনজন। চন্দ্রাহত দেনিসের বাঁ পাশে লিয়ঁ। ডানদিকে যিশু। দেনিসের মেজাজ বিগড়ে দেবার মতো জোরে হঠাৎ ওর বাঁ হাত থামছে দাঁড়িয়ে পড়ল লিয়ঁ। ছোঁড়াটাকে ধমকাবার মুখে চোখ পড়ল সামনে। দাঁড়িয়ে পড়েছে তিনজনেই। দুটো লোক বেসামাল পায়ে হেঁটে আসছে। অনেক দূরে এখনো। কিছুই না বুঝে ডান পাশে তাকাল দেনিস। চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে যিশুর। স্থির চোখে চেয়ে আছে সামনে।

লিয়ঁ কানের কাছে ফিসফিস করে বলল,—"গীয়ম।"

গত প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে যাকে খুঁজে খুঁজে এরা হয়রান, সেই বেজন্মাই হেঁটে আসছে। সঙ্গে আর একটা বেঁটে মতন কে! স্যাঙাত্ই হবে। দেনিসের শরীরে পুলকিত বিদ্যুৎ ছোটাছুটি আরম্ভ করল। বহুদিন প্রাণ ভরে, মনের সাধ

মিটিয়ে কুস্তি করা হয় নি। গাঁয়ে থাকতে আখড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনাসামনি হলে যেন রক্ত গরম হয়ে যেতো, সেইরকম লাগছে এখন। আপনা-আপনি দুই উরুর কাছে হাত চলে গেল দেনিসের। সামান্য ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তৈরি। কানের কাছে যিশু দাঁতে দাঁত চাপিয়ে বলল,

—"আজ শালা তোরই একদিন কি আমারই একদিন। ইণ্ডিয়ানের একটা হাত ভেঙেছিস, তোর ছবি-আঁকা আমি জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেবো।"

দেনিস ফিসফিস করে বললে,

—"পিয়ের, তুমি সঙ্গিটাকে সামলাও। আমি গীয়মকে দেখছি।" যিশু কড়া চোখে দেনিসকে এক পলক দেখে স্থির গলায় জানিয়ে দিল,

—"না। সঙ্গিটাকে তুমি ঠিক করো। গীয়ম আমার। যা' বলছি খেয়াল থাকে যেন।"

শত্রুপক্ষ হেলেদুলে টাল-মাটাল পা' ফেলে এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। লম্বা-চওড়া আবলুস রঙের গীয়ম। ডান গালে, কপালে, কাঁধে কাটা জ্যোৎস্না চকচক্ করছে। সঙ্গের মানুষটিকে চিনতে পারল দেনিস। মোঁমার্ত্রের ফরাসী শিল্পী ক্লোদ। এক দলের লোক। গত কদিন ক্লোদ হারামজাদাও মিথ্যে কথা বলেছে। অন্যান্য স্যাঙাতদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে অবাক হবার ভান করে জানিয়েছে,

"বাহ্! গীয়ম কোথায় তা আমি কি করে জানবো! আমি কি গীয়মের ঠিকুজি নিয়ে বসে আছি!"

দেনিস মনে মনে বলল, 'শালা! ইণ্ডিয়ানকে মারার দলে তুমিও ছিলে! আজ যাবে কোথায় সোনা? পেঁদিয়ে তোমার বাপের নাম আমি খগেন করে দেবো—'

এক-দুই এবং তিন পা' মেপে মেপে এগিয়ে গেল যিশু, লিয়ঁ, দেনিস। ওরা দেখতে পেয়েছে এদের। চিনেও ফেলেছে নিশ্চয়ই, নইলে, দাঁড়িয়ে পড়বে কেন হতবুদ্ধির মতো!

আবার এক-দুই এবং তিন পা।

ক্লোদ কি যেন বলল গীয়মকে বলেই, কিছুর মধ্যে কিছু নেই, পেছন ফিরে দৌড়! গীয়ম এক মুহূর্ত বুঝি ভাবল, পালাবে কি পালাবে না। তারপর, পেছন ফিরে ক্লোদের দৌড় দেখে নিজেও ছুটতে লাগল প্রাণপণ।

শত্রুপক্ষের হঠাৎ এমন পশ্চাদপসারণে দেনিস বোকা হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, 'এ-কী অন্যায় কথা!'

সঙ্গে সঙ্গে যিশু বলল,

—"ধরো ওদের।"

বলে ছুটল পিছন পিছন।

তিনজনে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছে। চাঁদকে, জ্যোৎস্নাকে সাক্ষী রেখে দেনিস গালভরা সব ফরাসী খিস্তি বুলেটের মতো ছুঁড়ে দিচ্ছে ওদের। কাজ হচ্ছে না কিছু। দু'জনের একজনও দাঁড়িয়ে পড়ছে না। আরো জোরে দৌড়োচ্ছে। —"শালা, শুয়োরের সন্তান। বাপের ঠিক নেই, গীয়ম। কাপুরুষের মতো পালাচ্ছিস। ইণ্ডিয়ান দোস্ত্‌কে একলা পেয়ে— ! হা-রা-ম-জা-দা—"

গায়ে-গতরে দেনিসের ওজন কম নয়। তার ওপরে মাল খেয়ে খেয়ে আরো ভারী হয়েছে। ভালো দৌড়াতে পারছে না। এবং যথেষ্ট হাঁপাতে হাঁপাতে এই প্রথম মনে হল, কেন যে অ্যাতো মদ খাই! দুশ্‌ শালা! ছুটতে এতো কষ্ট। উফ্‌! মুখে চেঁচাল, নিজের গতি বাড়াবার জন্যেই বোধহয়,

—"ধর্‌! ধর্‌ শালাদের—"

পাশের দেওয়ালে, নির্জন গলিতে পাচ জোড়া উর্ধ্বশ্বাসে জুতোর শব্দের প্রতিধ্বনি। যিশু আর লিয়ঁ গীয়মের কয়েক গজের মধ্যে পৌছে গেছে। দেনিস পেছন পেছন হাঁফাচ্ছে, ছুটছে, গালমন্দ করছে: বেমালুম ভুলে গেছে জ্যোৎস্না, চাঁদ ইত্যাদি। সামনে শত্রু পালায়, ধরতেই হবে ও ছুটোকে। বীর যোদ্ধারা কেমন করে দৌড়তো? নেপোলিয়ন বোনাপার্ট্‌। উনি কি এখন দৌড়ে গীয়মকে ধরে ফেলতে পারতেন। নেপোলিয়নকে মনে পড়তেই গীয়ার বদলে চার নম্বরে ছুটতে লাগল দেনিস। যেন, গীয়মকে ধরে ফেলতে পারলেই শাঁজেলিজের প্রশস্ত রাস্তায় আর একটা 'আর্ক-দ্য-ত্রিয়ঁফ্‌' তৈরি হবে কাল সকালে। দেনিস ক্যাস্তেলের নামে।

যিশু আর লিয়ঁ দু-পাশ থেকে প্রায় ধরে ফেলেছে গীয়মকে। গীর্জার সামনের প্রশস্ত সিঁড়ি এখন বাঁদিকে। এখান থেকে নিচের গাছপালা ডিঙিয়ে প্যারিসের অনেকখানি দেখা যায়। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় শহর, গাছ-গাছালি, সামনের অগুণতি সিঁড়ির ধাপগুলি যেন দম বন্ধ করে এই ছোটাছুটি লক্ষ্য করছে। কি হয়, কি হয়? বাঁদিকে বাঁক নিতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে তাকাল গীয়ম। প্রচণ্ড এক ঘুষি ঝাড়ল লিয়ঁর মুখে। এর মধ্যেই পা বাড়িয়ে ল্যাং মেরে দিয়েছে যিশু। তিনটে জিনিস একসঙ্গে দেখতে পেল দেনিস। অনেক দুরে, নিচে ডান দিকের গাছপালার মধ্যে ক্লোদ অদৃশ্য হয়ে গেল। যাকগে, নাটের গুরুকে তো ধরা গেছে!

ঘুষি খেয়ে লিয়ঁ ঘুরে পড়ল শান-বাঁধানো চত্বরে এবং একই তালে যিশুর ল্যাং খেয়ে গীয়মের বিশাল শরীর হুমড়ি খেল সামনের সিঁড়িতে।

ততক্ষণে পৌছে গেছে দেনিস। গীয়মের কোমরে এক মোক্ষম লাথি কষিয়ে দিয়েছে। খই ফুটছে মুখে,

—"ইতর, উল্লুক—"

তিন-চার ধাপ গড়িয়ে নেমে গেল গীয়ম। ঠিকমতো উঠে বসবার আগেই দেনিস তার সমস্ত ওজন নিয়ে লাফিয়ে পড়ল ওর ওপর। পেটের ওপর বসে সাঁড়াশীর মতো হাতে গলা চেপে ধরল ওর। গীয়ম পা ছুঁড়ছে। ওর বিশাল মুষ্টির দু-চারটে এলোপাতাড়ি ঘুষি খেয়ে দেনিসের থুতনি কেটে গেল, কপাল ফুলে ঢোল। খেয়াল নেই কিছু। কাল সকালে আর একটা 'আর্ক-দ্য-ত্রিয়ঁফ' তৈরি হবে শাঁজেলিজের প্রশস্ত রাস্তায়। ধস্তাধস্তি করতে করতে দু'জনে জড়িয়ে গড়িয়ে নেমে গেল আরো কয়েক ধাপ। গীয়মের নাকে-মুখে রক্ত। ওর বিশাল শরীরের এক ঝটকায় দেনিসকে নিচের দিকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দেনিস সামলাতে পারল না। গড়িয়ে নামতে লাগল। সেই ফাঁকে, দৌড় দেবার জন্যে বাঁদিকে পা বাড়াল গীয়ম। যিশু ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েক ধাপ ওপর থেকে। টাল হারিয়ে দু'জনেই পড়ে গেল। যিশু ওপরে, গীয়ম নিচে। গীয়মের মাথা ঠুকে গেল পাথরের সিঁড়ির কোণায়। রাগের চোটে দুমদাম আন্‌তাবড়ি ঘুষি চালাল যিশু। গীয়মের মুখে, বুকে, পেটে। চেঁচিয়ে বলল,

—"দেনিস, লিয়ঁ! শিগগির এসো। শালার ডান হাতটা যেমন করে হোক মুচড়ে দিতে হবে। প্লাস্টার লাগাতে হয় যেন—"

লিয়ঁ ওপর থেকে তর্‌তর্‌ নেমে আসছে। দেনিস উঠছে হাঁপাতে হাঁপাতে। গড়িয়ে অনেকটা নেমে গিয়েছিল। হঠাৎ চমকে উঠল দেনিস। ও কি! চিৎ হয়ে পড়ে থাকা গীয়ম দুটো পা শূন্যে ছুঁড়ছে। ডান হাত দিয়ে যিশুর আক্রমণ সামলাবার চেষ্টা করছে বেকায়দায় পড়ে। ওরই মধ্যে বাঁ হাতে জ্যাকেটের পকেট থেকে কি বের করল ওটা? চাঁদের আলোয় চকচকে বড়-সড় একটা ছুরি মনে হচ্ছে! হ্যাঁ, ঠিক তাই। চেঁচিয়ে যিশুকে সাবধান করবার আগেই, নিচের গাছপালা, শহরের খানিকটা এবং ওপরে জ্যোৎস্না আর গীর্জার নৈঃশব্দ্যকে ভেঙেচুরে কি ভয়ংকর চিৎকার করে উঠল যিশু!

—"কান পাতা যায় না এমন চিৎকার!" ফোলা কপালে আঙুল বোলাতে বোলাতে দেনিস বলছিল। ঈভলীন যথেষ্ট জোরে গাড়ি চালাচ্ছে। দেনিস

ওর পাশে। আমি আর অ্যানী পেছনে বসে দম বন্ধ করে শুনছিলুম। হাতের রুমাল দাঁত দিয়ে ছেঁড়বার চেষ্টা করছে অ্যান। ওর দিকে ফিরে দেনিস বলল,

—"হাসপাতালের ডাক্তার জীল মঁসিয় কোর্তোয়া, লিয়ঁ সবাই রয়েছে। ডান পাশের পাঁজর থেকে পেটের অনেকখানি ছুরি দিয়ে টেনে চিরে দিয়েছে শয়তান। কোন্ দিকে যে পালাল, খেয়াল করতে পারি নি! পিয়েরের অত রক্ত, ওইভাবে পড়ে যাওয়া—মাথার ঠিক ছিল না—উফ্!"

নীল জ্যোৎস্নায় রক্তমাখা যিশুর মুখ গীর্জার সামনে সিঁড়িতে পড়ে আছে—ভাবতেই সমস্ত-শরীর কেমন ঠাণ্ডা হয়ে এল। গলার কাছে অসম্ভব কি যেন দলা পাকিয়ে আটকে গেছে। সমস্ত হাঁ-মুখ শুকনো। পাথরের মতো জিভটাকে খুব কষ্টে নাড়লুম। ঠোঁট ভিজিয়ে গলা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করলুম। খড়খড়ে আওয়াজে জিজ্ঞেস করলুম,

—"খুব গভীর জখম?"

পেছনে না ফিরেই গম্ভীর জবাব দেনিসের,

—"হু।"

ঈভলীন সারাপথে একটি টুঁ শব্দও করে নি। সামনে চোখ রেখে ষ্টিয়ারিং ঘোরালো। চাকায় বিচ্ছিরি একটা কর্কশ আওয়াজ তুলে গাড়ি তীব্রবেগে বাঁ-দিকে বাঁক নিল।

দেনিস আবার বললে,

—"তবে, জীল বলেছে, বিশেষ ভয়ের কারণ নেই। হয়তো প্রচুর রক্ত দিতে হবে, এই যা।"

এক ফোঁটাও রক্ত দিতে হয় নি যিশুকে।

ঈভলীন খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে এসেছে। আমরাও পড়ি-কি মরি করে তিনতলায় উঠে এলুম। তবু, যিশুকে ধরা গেল না। তার আগেই ও নীল জ্যোৎস্নায় ভেসে ভেসে পৃথিবীর সমস্ত গীর্জায় পৌঁছে গেছে। আর কোনো মানুষের রক্তই ওর দরকার হল না।

হাসপাতাল, পুলিস ইত্যাদির ঝামেলা মিটিয়ে যিশুকে কবরখানায় আনতে আনতে পরদিন বিকেল গড়িয়ে গেল। ভালো করে কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। চারপাশের সব-কিছুই কেমন যেন অপরিষ্কার ঝাপসা মনে হচ্ছিল। সবই যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে। ওই তো, কালো একটি শবাধার, ধীরে ধীরে গর্তের মধ্যে নেমে যাচ্ছে। কি আছে ওর মধ্যে! কে চলে গেল? আমার যেন আর

কিছুই আসে যায় না। আমাকে ঘিরে খুব বৃষ্টি পড়ছে বুঝি। তুষার-বৃষ্টি? ভীষণ কুয়াশায় ভূতের মতো কতকগুলি মানুষ নিজেদের তৈরি একটা মাটির গর্তকে নিজেরাই মাটি ঢেলে ঢেলে কি আপ্রাণ চেষ্টা করছে বুজিয়ে দেবার। পারছে না। বিশাল একটা সাদা ক্রসচিহ্ন রক্ত-মেখে বার বার উঠে দাঁড়াচ্ছে।

কে যেন কাঁধে হাত রাখল। ফিরে দেখলুম লিয়ঁ। আমার দিকে না তাকিয়ে, কোনো কথা না বলে চুপচাপ কাঁধে হাত দিয়ে রেখেছে। কুয়াশা অথবা বৃষ্টি কিছুই নেই! পৃথিবীর আয়ু আর একটা দিন কমে গেল। মঁসিয় কোর্তোয়া এবং তাঁর পরিচিত পাদ্রী সাহেব পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আলো-অন্ধকারে হাতের বাইবেলের ওপরে ঝুঁকে বিড়বিড় করে কি যেন পড়ে শোনাচ্ছেন। আমি একটি মেয়ের গলা শুনতে পেলুম,

—"ও নম্ দ্যু প্যার—এ দ্যু ফিল্—এ দ্যু সাতেস্পিরি—আঁ সী—সোয়াৎ—ইল্—"

মেয়েটি কালো একটি বিয়ের গাউন, কালো ঘোমটায় মুখ ঢেকে একা একা গীর্জার অসংখ্য সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। নামতে নামতে, নামতে নামতে সিঁড়ি আর ফুরোয় না।

কানের কাছে কে যেন বাতাসের শব্দে ডাকল,

—"ইণ্ডিয়ান! দোস্ত্!—"

চমকে ফিরে দেখি কেউ নেই!

লিয়ঁ ও সরে গেছে কখন, টের পাই নি। দেনিসের সঙ্গে হাত লাগিয়ে মাটি ঢালছে গর্তে। অ্যানী ঈভলীনের কাঁধে মাথা রেখে বোধহয় কাঁদছে। আরো কারা সব রয়েছে ওদের চারপাশে। এখন চিনতে পারছি না। দূরে আইফেল টাওয়ার সোজা দাঁড়িয়ে। প্যারিস শহর, ফুটফুটে জ্যোৎস্না সবই তো ঠিকঠাক রয়েছে। নিজেকে এতো একলা লাগছে কেন?

সেদিনই তো আমার যন্ত্রণার মধ্যে বুকে হাত রেখে বলেছিল,

"ভয় কিসের, ইণ্ডিয়ান! আমি তো রয়েছি!"

কই, কোথায়? কেউ নেই এখন।

বুকের ভেতরে, সমস্ত শরীরে ঝড়ের মতো বাতাস হু-হু করে উঠল। আমার জন্যেই তোমাকে চলে যেতে হল। আমাকে ক্ষমা করে দাও, যিশু!

কুয়াশা অথবা দারুণ বর্ষায় সব-কিছু ঝাপসা হয়ে গেল আবার।

দেনিস কাছে এসে দু' হাত উলটে বললে,

—"চলো ভাই! তোমার যিশুখৃষ্টের সামনে দাঁড়িয়ে অমন করে কাঁদতে নেই। ওর আত্মাকে শান্তিতে থাকতে দাও।—"

বলতে বলতে ধুলোমাখা হাত দুটির মধ্যে নিজের মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলল দেনিস নিজেই।

তারপর, আমার এক ঈশ্বরের হত্যাকারীকে সমস্ত পৃথিবীর পুলিস কি অসম্ভব খুঁজতে শুরু করে দিল।
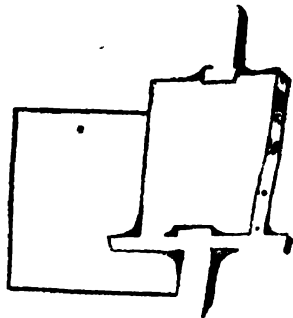
আরো একটি লোককে নাকি পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে সারা প্যারিস শহরে।

ঈভলীন বললে,

—"লুভ্র্‌ জাদুঘরের গায়ে, স্তেন নদীর লাগোয়া দেওয়ালে, তাছাড়া, যে কোনো বাড়ির দেওয়ালেই নাকি হিজিবিজি কেটে নোংরা করছিল। পুলিস প্রথমে ভেবেছিল দুষ্টু বাচ্চা ছেলেদের কাণ্ড। পরে, যেখানে-সেখানে একই ধরনের লেখা দেখে সন্দেহ করল, নতুন কোনো রাজনৈতিক দলের সাংকেতিক চিহ্ন-টিহ্ন নয় তো! কাগজে গত ক'দিন টুকরো খবরও বেরিয়েছিল, তুমি ছাখো নি?"

ঘরে, আমার টেবিল চেয়ারে বসে রাজ্যের ঠিকানা লিখছিল ঈভলীন। সাদা খামে আমার প্রদর্শনীর নিমন্ত্রণ-চিঠি ভরে নিচ্ছিল। তার ওপরে নাম-ঠিকানা। যিশু চলে যাবার কয়েক দিন পরেই হাতের প্লাস্টার খুলে দিয়েছে ডাক্তার জীল। তবু, কব্জি এবং আঙুলগুলোতে খিল ধরে আছে। নাড়ালেই ব্যথা-ট্যথা করে। মলম লাগাচ্ছি দিনে দু' তিনবার। ওতেই নাকি ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে।

বললুম,

—"খবরের কাগজ দেখা ছেড়ে দিয়েছি বহুকাল। দূর! ফরাসী পত্রিকায়

আমার দেশের খবর বলতে গেলে কিছুই থাকে না। গোড়ার দিকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজতুম, দেশের খবর, কলকাতার খবর। তোমাদের দৈনিকগুলোর লক্ষ লক্ষ শব্দের মধ্যে কোথাও ছোট্ট করে এতটুকু 'ভারতবর্ষ' বা 'কলকাতা' পেলে বর্তে যেতুম। আজকাল হাল ছেড়ে দিয়েছি। দেশ-বিদেশের কোনো খবরের জন্যে মনটা আর আগের মতো আনচান করে না। আসলে, কাগজ না-পড়াটাই এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।—"

মুখ তুলে একটু অবাক চোখে আমায় দেখে নিল ঈভলীন। অল্প হাসল। ভাঙা ইংরিজিতে বলল, "চিয়ার আপ্, ইয়াং বয়! দিনকে দিন কেমন যেন মিইয়ে যাচ্ছো তুমি। হাসো দেখি একটু। কই! অন্তত, এক ইঞ্চি হেসে দাও আমার নামে!"

হেসে বললুম,

—"তারপর, কি যেন বলছিলে, বল!"

—"বাহ্! এই তো! খ্যাখো দিকি হাসলে তোমাকে কি সুন্দর দেখায়!—"

খুশির গলায় জানিয়ে দিল ঈভলীন। তারপর মাথা নুইয়ে আবার নাম-ঠিকানা লিখতে লেগে গেল। মুখে বললে,

—"হ্যাঁ, তারপরে, যা বলছিলুম—মঁসিয় দিগেঁ পলের কথা—"

প্রায় চমকে উঠে বাধা দিলুম,

—"দিগেনদা?"

মুখ তুলে ঘাড় নাড়ল ঈভলীন,

—"হ্যাঁ। পরশু দিন ওদের বাড়িতে কার্ড পৌঁছোতে গিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।"

দিগেনদার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। ওঁর মুখটিও স্মৃতির দেওয়ালে ভাঙাচোরা কাচের টুকরোর মতন মনে পড়ল। মৃত সেই বাঙালী কবির গলায় আপন মায়ের চিঠি মুখস্থ শুনেছিলুম। সেই শেষ। আজ আবার ঈভলীন কি বলে!

গত সপ্তাহখানেক ধরে রোজ রাতে নাকি বেরিয়ে যায় দিগেনদা। দমিনিককে লুকিয়ে পুলিসের চোখ এড়িয়ে প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। পকেটে দমিনিকেরই তেল রঙের টিউব। যে কোনো গাঢ় রং। তাছাড়া, একটি মোটা তুলি, প্যাস্টেল অথবা চারকোল। দিনের বেলা শহরের পরিচ্ছন্ন যে কোনো

দেওয়াল, ফুটপাথ আঁকিবুকি-কাটা, নোংরা হয়ে থাকে। পুলিসের গোড়ার দিকের সন্দেহ ভুল। আসলে, ওগুলো কোনো ভারতীয় ভাষায় ছেলেমানুষী আবোল তাবোল লেখা।

—"কী লেখা, ঈভলীন ?"

—"আমি বুঝবো কেমন করে? আমি কি কোনো ইণ্ডিয়ান ভাষা জানি!"

—"তুমি নিজে দেখেছো ?"

মাথা নেড়ে জানাল ঈভলীন, হ্যাঁ, দেখেছে।

—"কোথায় ?"

—"লুভ্‌র্‌-এর দেয়ালে, স্তেনের গায়ে।"

একটু থেমে শ্বাস ফেলল,

—"সব পাগলামো! গত তিন দিন মঁসিয় পলের কোনো পাত্তাই নেই। বাড়িতেও ফেরে নি। পুলিস বা দমিনিক ধরেই নিয়েছে, পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। পাগলা গারদে ভরে দেবার জন্যে পুলিস ওঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বেচারা।"

জিজ্ঞেস করলুম,

—"তুমি কি গাড়ি এনেছো, ঈভলীন ?"

—"হুঁ। কেন ?"

—"তাহলে তোমার সঙ্গে একটু যেতুম। দেখে আসতুম, কি ভাষায়, কি লিখে তোমাদের প্যারিসের মতন এমন সুন্দর শহর নোংরা করেছেন দিগেনদা। নিয়ে যাবে ?"

অবুঝ ছেলের দিকে চেয়ে 'উফ্, তোমাকে নিয়ে আর পারি না, বাপু' গোছের মাথা নাড়ল ঈভলীন। হেসে বলল,

—"বেশ। যাবো। তবে, আর এই, একটা-দুই-তিন-চারটে ঠিকানা লেখা বাকি আছে। সেরে নিই। তারপর চলো।"

খামগুলোর ওপরে ঝুঁকে পড়ল আবার।

আমার প্রদর্শনীর জন্যে কী খাটুনিটাই খাটছে ঈভলীন! ওদের বিজ্ঞাপন-কোম্পানীর কপি-রাইটারকে দিয়ে কার্ডের ভাষা লিখিয়ে এনেছে। কমার্সিয়াল আর্টিস্টকে ধরে ডিজাইন, লে-আউট বানিয়েছে। সবই আমাকে এনে দেখিয়ে গেছে। তারপর, ব্লক করানো, ছাপানো, এখানে-সেখানে কার্ড পৌঁছে দেওয়া—

সব করছে নিজে নিজেই। পনেরোটি তৈরি ছবির চারপাশে প্রয়োজনমতো কালো এবং সাদা ফিতে লাগিয়েছে। প্রথমে বলেছিল,

—"ফ্রেম করিয়ে ফেলি।"

হিসেব কষে দেখলুম, দু-তিন হাজার ফ্রাঁর ধাক্কা।

বলে দিলুম,

—"না। দরকার নেই, ঈভলীন। চতুর্দিকে এতো ধার-দেনা! ফ্রেমের দরকার নেই। বিক্রি হলে, আপন গুণেই বিক্রি হবে ছবি।"

তর্ক করেছে,

—"আহা, গ্যালারীতে একটা 'শো' বলে তো কথা আছে!"

—"দরকার নেই। পয়সা নেই।"

আমার ডান হাতে মলম ঘষতে ঘষতে থেমে গেছে ঈভলীন। চোখে চোখ রেখে গাঢ় গলায়, গভীর আশ্বাসের শব্দে বলেছে,

—"আমি তো রয়েছি, ইণ্ডিয়ান!"

ছুটতে ছুটতে যিশু এসে দাঁড়িয়েছে দু' হাত বাড়িয়ে। কতবার এমনি দু' হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে ও। এখন আর পারে না। আস্তে আস্তে সাদা ক্রশচিহ্নের মতো মিলিয়ে যায়। সেই কবরখানা থেকে আসার পর আমরা আর কেউই ওকে নিয়ে কোনো কথা তুলি নি। যিশুর নাম পর্যন্ত মুখে আনি নি কেউ। কারণ, মনে হয়, আমরা কয়েকজন খুব যত্নে টের পাই, ও আলাদা আলাদা এবং একা একা আমাদের প্রত্যেকের অতল গভীরে সাদা একটি ক্ষতচিহ্নের মতো প্রবেশ করেছে। রয়ে গেছে সেখানেই। আর কোনোদিন উঠে আসবে না। আমরা মুখ ফুটে কেউই বলতে পারব না কোনোদিন,

—"কি দারুণ ভালো ছিল কেউ। কি অসম্ভব বন্ধু ছিল একজন।"

ঠিক যেমন এক্ষুনি ঈভলীন বুঝতে পারলো, ওর কথা শুনে যিশুকে মনে পড়ল আমার। তাই, একটু চুপ থেকে আস্তে আস্তে বলল,

—"আমার মনের কথাই বলেছি, ইণ্ডিয়ান! আমি তো রয়েছি এখনো।"

তবুও, আর কতো ঋণের বোঝা বাড়াবো, বলো তো! সাহসের শেষ সীমায় এসে বুক বড় কাঁপে আজকাল। যদি একটিও ছবি বিক্রি না হয়!

তাই সেদিন ঈভলীনকে প্রায় ধমক দিয়ে, কষ্ট দিয়েছি, জানি। ফ্রেমের বদলে কালো অথবা সাদা ফিতে দিয়ে ছবির চারপাশ ঢাকা হয়েছে। সবই করেছে ও

একা একা। আমি হয়তো এক হাতে যেটুকু সম্ভব সাহায্য করেছি। ও বারবার সাবধান করেছে,

—"দেখো, ব্যথা লাগে না যেন। ডান হাতে এখন কিছুই করতে যেও না। শিল্পীর ডান হাত। বড় দামী, ইণ্ডিয়ান! বড় আদরের!"

হালকা উলের জ্যাকেট আর ট্রাউজার পরে টেবিলে ঝুঁকে আমার মতো এক অখ্যাত-অনামী শিল্পীর প্রদর্শনীর কাজ করছে এখন। কালো, খোলা চুলে বাঁ দিকের গাল প্রায় আড়াল হয়ে গেছে। প্রোফাইলে অল্প একটু কপাল, নাক এবং ঠোঁট দেখা যায়। ঈভলীনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হুহু করে জ্বর এল গায়ে। কাঁপিয়ে দিল সমস্ত শরীর।

জ্বর বললে,

—"তুমি ওকে চেনো?"

মনে মনে কাঁপতে কাঁপতে বললুম,

—"কই, না তো!"

জ্বর ঠাঠা করে হাসল আমার শিরা উপশিরায়, মস্তিষ্কের জটের ভিতরে। বলল,

—"ও ছাড়া তোমার কে আছে?"

বুঝলুম, মনে মনে বললুম,

—"তুমি ছাড়া কেউ নেই আমার।"

ঈভলীন উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

—"চলো।"

বললুম,

—"আমার সঙ্গে কিন্তু আর একজন যাবে!"

ঈভলীন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল,

—"কে?"

—"আমার ভয়।"

ও কথা বলল না। ঠোঁটের কোলে ভারি মিষ্টি করে হাসল। দু' পা এগিয়ে, এতগুলো মাস, নাকি, বছর পেরিয়ে খুব কাছে এল। চোখের পাতা নামিয়ে চুমু খেল আমাকে। ছোট্ট করে, সামান্য আদর। বলল,

—"তোমার সঙ্গে যে যাবে ভাবছিলে, এই ছাখো, খেয়ে ফেললুম তাকে।"

তাড়াতাড়ি দরজার দিকে হেঁটে গেলুম। বললুম,

—"চলো।"

ফুরফুরে বসন্তের হাওয়া। বেশ রাত হয়েছে। গাড়ির কাচ নামিয়ে ঈভলীনের ডান পাশে বসে আছি। আরাম লাগার মতো খুব সামান্য শীত-শীত করছে। আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে ঈভলীন। যেন, বেড়াতে বেরিয়েছি। হাঁটা পথের লোকজন কমে এসেছে এ'পাড়ায়। হুশ্ হুশ্ করে এক একটি গাড়ি আমাদের বাঁ পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। চাঁদ নেই, জ্যোৎস্না নেই, মেঘ নেই আকাশে। গাঢ় নীল পটভূমিতে কালো আইফেল টাওয়ার তেমন স্পষ্ট দেখা যায় না। লুভ্র্-এর কাছাকাছি পৌঁছে ঈভলীন বললে,

– "ওই ছাখো!"

তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে ফুটপাথে চার-পাঁচটি পুলিস দেখতে পেলুম। পায়চারি করছে। ফুটপাথের গায়ে লম্বা টানা দেওয়াল। দেওয়ালের ওপারে সামান্য উঁচু জমিতে মিউজিয়ামের বিশাল দালানগুলো অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে।

ওদিকে দেখতে দেখতে ঈভলীনকে জিজ্ঞেস করলুম,

—"কই? দিগেনদা কোথায় কি লিখেছেন?"

খুব ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিল আমাদের গাড়ি। ঈভলীন বললে,

—"দেওয়াল নোংরা হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছো না!"

রাস্তার আলোয় ভালো করে তাকালুম। গ্রামে মাটির ঘর, উঠোন যেন গোবরজল দিয়ে নিকোনো। দিগেনদা কি লিখেছেন বা এঁকেছেন বোঝা যাচ্ছে না। টানা দেওয়ালে কাঁচা তেল রঙে লেখা অক্ষর সব লেপে-পুঁছে দিয়ে গেছে সরকারের লোক। কোথাও লাল রং, কোথাও নীল। পুঁছতে গিয়ে দেওয়ালময় ধেবড়ে গেছে আরো।

বললুম,

—"কিছুই তো পড়া যাচ্ছে না। তুমি একটু গাড়ি দাঁড় করাও। দেখি পাঠোদ্ধার করা যায় কিনা?"

একেবারে ফুটের গা ঘেঁষে গাড়ি থামাল ঈভলীন। বলল,

—"খবরদার নামবে না। পুলিসের বিরক্তিকর জেরা শুরু হয়ে যাবে।"

বলতে বলতে দুই প্রভু এগিয়ে এলেন,

—"উই, মাদাম! আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারি কি?"

ঈভলীন হেসে জবাব দিল,

—"না, মঁসিয় ! ধন্যবাদ। পাগলের কাণ্ড দেখছিলুম।"

এমন ঘষে ঘষে লেপে দিয়েছে সরকারের লোক, একটি রেখাও বোঝা যায় না দিগেনদার। কৌতূহল বেড়ে গেল আরো। কি লিখেছে ? কি বলতে চেয়েছে দিগেনদা প্যারিসের দেওয়ালে ?

ঈভলীনকে বললুম,

—"আর কোথায় দেখেছো ?"

গাড়ি চলতে শুরু করল। ঈভলীন গীয়ার বদলে বলল,

—"তিন চার জায়গায় দেখেছি। আর্ক-দ্য-ত্রিয়ঁফে-ও ছিল। সবই মুছে দিয়েছে এরা।"

তারপর, হঠাৎ মনে পড়ল যেন, এমনিভাবে বলল,

—"চলো দেখি। নদীর গায়ে ঘুরে আসি।"

ওপরের রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম। স্রেন নদীর অন্ধকার জলের দু'পাশে সরু পায়ে চলার পথ। দিনের বেলায় পা ঝুলিয়ে বসে এখানে মাছ ধরে অনেকে। সামান্য দূরে, ওপরে সেই ব্রীজটি দেখা যাচ্ছে, যেখানে ঈভলীনের সঙ্গে শরীরে শরীর জড়িয়ে দমবন্ধ করে দাঁড়িয়েছিলুম। বাঁ পাশের কালচে পাথরের অমসৃণ দেওয়াল নদীর সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। ঈভলীন বললে,

—"আছে। এখানে এখনো আঁকিবুকিগুলো রয়েছে। ওই যে।"

মোটা তুলি দিয়ে সাদা এবং হলুদ রঙে যেন বাচ্চা ছেলের লেখা। ল্যাম্প্‌পোস্টের আবছা আলোয় এক ফুট মতো এক একটি অক্ষর। এক লাইনে টানা লেখা, আমার মায়ের ভাষায়,

—"আবার আসিব ফিরে এই বাংলায়। হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে—"

বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছে আমার। এ কি লিখেছে দিগেনদা ! এ কী সাংঘাতিক কথা ! সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে এই ফরাসীদের শহরে জীবনানন্দের কবিতার লাইন পড়ে চোখ ফেটে জল আসে বুঝি। ভালো করে চেয়ে দেখলুম কাঁচা তেল রঙে লেখা বাংলা অক্ষরগুলো থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রঙ নেমেছে বিন্দু বিন্দু। চোখের জল গাল বেয়ে নেমে আসছে যেন। সাদা এবং হলুদ চোখের জল।

—"কি হল, ইণ্ডিয়ান ! এগোও, ওই দিকে আরো আছে !"

ভয়। ভীষণ ভয় আমার শিরদাঁড়া বেয়ে মাথার ঘিলু অবধি উঠে আসছে। আর এগোতে ভরসা পাচ্ছি না। দিগেনদার কান্নার শব্দগুলি আমাকে অজগরের মতো জড়িয়ে ধরছে। একটু বাতাস! ঈভলীন, এক মুঠো বাতাস চাই হৃৎপিণ্ডে। ও আমাকে হাত ধরে টানল। কয়েক পা' এগিয়ে বলল,

—"ওই দ্যাখো! আরো!"

দেখলুম। ঝাপসা চোখে যা লেখা দেখলুম তাতে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল,

—"আমাকে নিয়ে যাও এখান থেকে সরিয়ে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না, ঈভলীন।"

আমাকে উদ্দেশ করেই যেন দিগেনদা প্রথম ভাগ লিখে রেখেছেন স্তেন নদীর দেওয়ালে,

—"সে আসে। আমি যাই। কাক ডাকিতেছে। গরু চরিতেছে। জল পড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে।"

আমি কাকের ডাক শুনতে পেলুম। নবান্নের অজস্র কাক ডাকছে। আমার মাথার ওপরে চক্রাকারে ঘুরছে আর ডাকছে।
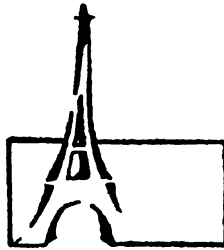
মঁসিয় কোর্তোয়া, লিয়ঁ এবং দেনিস আমাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। চোখে কৌতূহল, ঠোঁটের কোণে হাসি। সব মিলিয়ে তিনজনের মুখেই একটা খুশির ভাব। নিবিষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ওরা ধুতিপরা দেখছে।

ভোরবেলায় সব পেইন্টিংগুলো ঈভলীনের গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে এসেছি গ্যালারীতে। মাদাম দ্যুবোয়ার সঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পছন্দ মতোন সাজানো হয়ে গেছে ছবিগুলো। দেওয়ালে জায়গা না হওয়ায় মেঝের ওপরে স্ট্যাণ্ড পেতে দুটি ছবিকে দাঁড় করানো হয়েছে। দেশের কোনো গ্যালারীতে এই রকম স্ট্যাণ্ডের চল আছে কিনা আমার জানা নেই। দেখি নি কখনো।

চারটে নাগাদ ঈভলীন বললে,

—"কি গো, মেজোঁয় যাবে না একবার ?"

বললুম,

—"কেন ? এখন আবার মেজোঁয় কেন যাবো ? ছ'টায় ওপেনিং। তাছাড়া ওখানে আর কি আছে আমার এখন। হাড়-পাঁজর সবই তো এখানে দেওয়ালে টাঙানো।"

গত ক'দিন ভয়-মেশানো যথেষ্ট উত্তেজনা রক্তের মধ্যে ছুটোছুটি করছিল। প্যারিসের মতো শহরে আমার ছবির প্রদর্শনী। শিল্পীর স্বর্গরাজ্যে আমার অভিসার। সকল আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ বুঝি সত্যি-সত্যিই সফল হল। শহর জুড়ে হই-চই, পত্র-পত্রিকায় মাতামাতি, ছবি নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি! এই সব ভাবতে ভাবতে বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্। হবে কি হবে না? আশা এবং নিরাশায় কাঁপছিলুম। নতুন অভিনেতা মঞ্চে ঢোকবার আগে যেমন উত্তেজিত থাকে, তেমনি অবস্থা ছিল মনের। এখন সব শান্ত। ভাবলেশহীন হৃদয় মস্তিষ্ক নিয়ে শুধু অপেক্ষা। অভিনেতা মঞ্চে ঢুকে পড়েছে। উঠে গেছে পর্দা। শুরু হয়েছে অভিনয়। সামনের ফ্লাড্ লাইটে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে না, দর্শক আছে কিনা! থাকলে, শুধু হাততালির অপেক্ষা এখন।

ঈভলীন বললে,

—"সে না হয় বুঝলুম। কিন্তু, নিজের দিকে শেষ কবে তাকিয়ে দেখেছো, খেয়াল আছে?"

বোধহয় দিন দশেক দাড়ি কামাই নি। দিগেনদার হাতে লেখা জীবনানন্দের কবিতার লাইন অথবা 'বর্ণপরিচয়ে'র শব্দগুলো প্যারিসের দেওয়ালে দেখবার পর এই ক'টা দিন কেমন ঘোরের মধ্যে কেটে গেছে। ঈভলীনই তাড়া দিয়েছে এসে, 'এখানে যাও, ওখানে যাও' অথবা 'চলো, আমি সঙ্গে যাচ্ছি।' কখনো ও আমার পোশাকের মতো, কখনো আমি ওর ছায়ার মতো গায়ে গায়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। ও শুধু আমাকে ঠেলে পাঠিয়েছিল আমাদের দূতাবাসে। একা। বন্ধুটিকে টেলিফোনে খবর দিলুম,

—"আগামী ছাব্বিশে আমার প্রদর্শনী।"

দূতাবাসের বন্ধুটি শুনে খুব খুশী,

—"বাহ্! খুব সুখবর। আমাকে কিছু কার্ড দিয়ে যান, অন্যান্য দূতাবাসের গণ্যমান্যদের নিমন্ত্রণ করে দেব'খন।"

—"কত কার্ড আনবো বলুন ?"

একটু ভেবেই যেন জবাব দিলেন,

—"গোটা চল্লিশেক নিয়ে আসুন।"

অথচ, বেচারি বন্ধুটি আমার একটি কার্ডও বিলি করবার জন্যে গ্রহণ করতে পারেন নি। খাম থেকে খুলে বের করে দেখেই আঁতকে উঠেছেন, যেন সাপে ছোবল দিল,

—"এ কি মশাই ?"

আমি অবাক,

—"কেন, কি হ'ল ?"

ছাপানো নেমন্তন্ন-চিঠিটা পড়ে আবার খামে ঢুকিয়ে ফেরত দিলেন। খুব গম্ভীর মুখে জানালেন,

—"আপনার প্রদর্শনীর ব্যাপারে আমাদের তো কিছুই করা সম্ভব নয়। পারলে, সময় থাকলে আপনার এই এক্সপোজিশন বন্ধ করবারই চেষ্টা করতুম।—"

—"কেন, কি ব্যাপার হ'ল, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

—"আপনি খুঁজে-পেতে আর বিষয়-বস্তু পেলেন না। খিদের ছবি। ভারত-বর্ষের খিদে। কি কাণ্ড! আমি ভাবলুম, বেশ ভালো, সুন্দর সীন-সিনারি, ফুল-টুল এঁকেছেন।—"

—"সিন্-সিনা-কি বুব্লা বু' ছবি আমি আঁকতে পারি না, স্যার!" মনে মনে খানিকটা অসন্তুষ্ট হ'য়ে, একটু ব্যঙ্গ না করে পারলুম না।

বন্ধুটি বললেন,

—"তাই বলে—আমাদের দেশের খিদে! কী সাংঘাতিক ব্যাপার!"

সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"ঠিক আছে। কিছুই করতে হবে না আপনাকে। শুধু অন্যান্য দূতাবাসে কয়েকটা কার্ড অন্তত পাঠিয়ে দিন।"

—"পাগল নাকি। চাকরি চলে যাবে, মশাই! আমাদের মূল কাজই হ'ল ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সৌন্দর্য বিদেশীদের চোখে বড় করে তুলে ধরা। সেখানে, অফিসিয়ালি আপনার এই 'খিদের প্রদর্শনীতে ওদের নেমন্তন্ন করি আর ওরা সব হাসাহাসি করুক মুখ টিপে।"

বন্ধুটি তাঁর নিজের তরফের কথা ভেবে দেখলে, ঠিকই বলেছেন হয়তো। কিন্তু

ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার আগে আমিও না বলে পারলুম না, হাসতে হাসতে অবশ্যই,

—"কিন্তু, স্যার, আপনি কি মনে করেন সাগরপারের কোনো দেশই আমাদের খবর কিছু জানে না ?"

মাথা নেড়ে ভদ্রলোকের এক কথা,

—"জানুক না জানুক, আমাদের তা ঢাক ঢোল পিটিয়ে জানানোর নীতি নেই।"

আমার দিকে না তাকিয়ে টেবিলের কাগজপত্র ঘাঁটতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন উনি। মুখে বললেন,

—"সরি, এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারলুম না।"

বাসি দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে দূতাবাসের নিরুপায় বন্ধুটির কথা মনে পড়ল। ঈভলীন বললে,

—"জেল-পালানো কয়েদীর মতো এক গাল দাড়ি নিয়ে আবার হাসি হচ্ছে।"

তারপর, বকে দেবার ধরনে বললে,

—"যাও শিগগীর। বাড়ি গিয়ে চান করে নাও। দাড়ি কামিয়ে একটু পরিষ্কার জামা-প্যাণ্ট পরে ভদ্র হয়ে এসো।"

কাছে এসে জামার কলারের কাছে ঝুঁকে পড়ে যেন গন্ধ শুঁকলো,

—"বাবা রে! কে বলবে, এই মানুষটার আজ প্রদর্শনী। মনে হচ্ছে, পচা নর্দমায় ডুব দিয়ে উঠে এলো। যাও শিগগির।"

হেসে বললুম,

—"তোমায় একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছে, ঈভ্!"

নাকে রুমাল চেপে দু' পা পিছিয়ে গেল। বাঁ হাতের তর্জনী তুলে বললে,

—"খবরদার না।"

আমি হাসছি মিটিমিটি,

—"বেশ, তুমিই খাও তাহলে আমাকে!"

মাদাম দ্যুবোয়া তখনো এক-আধটা ছবি জায়গা বদল করে দেখছেন। আমার কথায় হেসে ফেললেন। ঈভলীনকে বললেন, ঠাট্টার গলায়,

—"খেয়ে ফেলো, মাদাম। শুভ দিনে, তোমার শত্তুর খেতে চাইল,—চুমু বই তো নয়!—"

ঈভলীনও হেসে ফেলল এবার। বললে,

—"ঠিক আছে। তবে, আমি কিন্তু নাকে রুমাল চেপে খাবো। এবং তারপরেই তুমি দৌড়ে মেজোঁতে গিয়ে 'চেঞ্জ্' করে আসবে, কেমন?"

এগিয়ে গেলুম। হাত রাখলুম ওর কাঁধে। করুণভাবে মিনতি জানালুম ছবিগুলো দেখিয়ে,

—"এদের ছেড়ে আমার যেতে ইচ্ছে করছে না এখন। প্লীজ্! তবে, তুমি যদি তোমার গাড়িতে গিয়ে এক ছুটে আমার ফর্সা জামা-কাপড় নিয়ে আসো তো আমি নিশ্চয়ই বদলে নেব এখানে।"

তাতেই রাজী হয়ে ও চাবি নিয়ে চলে গেল। কি মনে হতেই বলে দিলুম,

—"স্যুটকেসের একেবারে তলায় আমাদের দিশি একজোড়া সাদা পোশাক আছে দেখবে। তাই নিয়ে এসো। আর, ভাঁজের মধ্যে একটি দশ ফ্রাঁর নোট পাবে। সেটাও এনো।"

ও ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিল,

—"তোমার দশ ফ্রাঁ চাই?"

—"না। আমার ওই নোটটি চাই। আজকে পকেটে রাখবো।"

মোঁমার্ত্রের বন্ধুরা এসে পড়বার একটু পরেই ফিরে এসেছে ঈভলীন। ধুতি-পাঞ্জাবি এবং একটি বিখ্যাত ফরাসী সেন্টের শিশি নিয়ে। যিশুর সই-করা দশ ফ্রাঁর নোটটি ও দেখেই চিনতে পেরেছে। আমার হাতে তুলে দেবার সময় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল ঈভলীন। দেনিস ওরা কিছুই বুঝতে পারে নি বোধহয়। আমরা দু'জনে এক সঙ্গে আলাদা হয়ে এক মুহূর্তে অনেক সময় পেরিয়ে ঘুরে এলুম। যিশু। মোঁমার্ত্রে প্রথম দিন মুখ-আঁকা। প্রথম রোজগার। ঈভলীনই ভাগা-ভাগি করবার সময় এই নোটটিতে যিশুকে সই করতে বলেছিল। সই করে কেমন উপহার দেবার ধরনে দু'হাতের অঞ্জলিতে ধরে আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল যিশু—পরিষ্কার সেই চেহারা সেই দৃশ্য দেখতে পেলুম আবার। আমি আর ঈভলীন এক সঙ্গে আলাদা আলাদা।

নিচের ঘরে নেমে এলুম আমরা চারজন। নিচের ঘর বলতে এই গ্যালারীর দু'নম্বর ঘর। রাস্তার সঙ্গে সমতল ঘরটিতে আমার ছবিরা দর্শক-ক্রেতার অপেক্ষায় রয়েছে। এ ঘরটি মাটির তলায়। মাদাম দ্যুবোয়ার আপিস বলা যায়। এক কোণে টেবিল চেয়ার এক জোড়া। কাগজপত্র। টেলিফোন। ঘরের লাগোয়া বাথরুম। হাত-মুখ সাবান দিয়ে ধুয়ে এসে ধুতি পরছি। এরা তিনজন হাঁ করে দেখছে আমাকে।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসার সময় দেনিসের হাতে সেন্টের শিশিটি ধরিয়ে দিয়েছে ঈভলীন। বলেছে,

—"যাও। কনেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে ভদ্র বানিয়ে নিয়ে এসো।"

হাতে শিশি নিয়ে দেনিস তৈরি। পোশাক পরা হলেই সুগন্ধ ছিটিয়ে দেবে গায়ে। লিয়ঁ সাবান-তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে। মঁসিয়ে কোর্তোয়ার হাতে আমার পাঞ্জাবি ও ঈভলীনের চিরুনি।

কোঁচা গুঁজতে গুঁজতে ওদের তিনজনের দিকে তাকালুম ভালো করে। তিন জোড়া চোখে বিস্ময়, খুশি উপছে পড়ছে। একটু কষ্ট, খুব সামান্য ঈর্ষার আভাসও আছে নাকি।

যেন, সোনাগাছির পাখিপাড়ায় ময়নার বিয়ে! গীতা, সন্ধ্যারাণী, টিয়া—সব প্রাণের সখীরা ময়নাকে সাজিয়ে দিচ্ছে। দেশলাইয়ের কাঠিতে চন্দন লাগিয়ে টিপ পরাচ্ছে গীতা। চুল আঁচড়ে দিচ্ছে সন্ধ্যারাণী। টিয়া ওকে জড়িয়ে ধরে বলছে,

—"হ্যাঁ লো! আমাদের একেবারে ভুলে যাবি, তাই না!"

—"না! ভুলবে না! তোমার মুখ মনে করে সোয়ামীকে জাপটে ধরবে, হতচ্ছাড়ি!" হাসতে হাসতে ফোড়ন কাটছে একজন।

—"এ কি আজকের পিরিত লা! জন্ম-জন্মান্তরের!"

বয়স্কা কেউ মনে মনে হয়তো আশীর্বাদ করে বলছেন,

—"যা' বাছা। সংসার করগে যা। সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে চিতেয় উঠিস। এই পাঁকে আর ফিরে আসিস না যেন!"

বিস্ময়, খুশী, সখী-হারানোর ব্যথা, এমন কি হয়তো অবচেতনায় সামান্য ঈর্ষা। সমাজে, জাতে উঠে গেল ময়না! তবুও, সব মিলিয়ে 'ময়না যেন আর এখানে ফিরে না আসে।' ময়না যেন সুখী হয়।

কিন্তু, ময়নারা কি সুখী হয়, বউ?

আমি কি সুখী হবো!

আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই গ্যালারীর দরজা খুলে যাবে। সফল হবে কি আমার প্রদর্শনী! দাম কি পাবে আমার স্বপ্নের, সাধের ছবিরা?

পাবে। নিশ্চয়ই পাবে। এরা তো আমার ভালোবাসার সন্তান। স্নেহের, আকাঙ্ক্ষার বড় আদরের। আমাকে যে খ্যাতনামা শিল্পী হতে হবে। হতে

হতে, হতে হতে···লুভ্র্ জাদুঘরের সামনে একটি সুন্দর বেদী শূন্য পড়ে আছে। বহু দেনা শোধ হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। আরো, আরো ছবি। আপোসহীন লড়াই করতে করতে—

সেন্টের শিশির বোতাম টিপে পিস্‌পিস্ শব্দে খানিকটা তরল সুগন্ধ স্প্রে করে ছিটিয়ে দিল দেনিস। বললে,

—"এই ক্যাব্‌লা ইণ্ডিয়ান। কি দেখছো হাঁ করে!"

জায়গা মতো ফিরে এলুম আবার। হেসে বললুম,

—"না। কিছু না।"

মঁসিয় কোর্তোয়া উদ্বিগ্ন মুখে বললেন,

—"শরীর খারাপ করছে না তো।"

লিয়ঁ শুধু এক দৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে, চুপচাপ। লিয়ঁ যেমন বরাবর, ঠিক তেমনি।

মেঝেয় লুটোচ্ছে ধুতির কোঁচা। নিচের দিকে আলতো হাত বুলিয়ে গোলাপী ভালুকের মতো ছুঁচোলো মুখে দেনিস জিজ্ঞেস করলে,

"এই ইণ্ডিয়ান পোশাকের নামটি কি, খোকাবাবু?"

—"ধুতি।"

—"বাহ্! ধুতি, ধুতি, ধুতি!"

তিন রকম সুরে তিন বার উচ্চারণ করল শব্দটি। তারপর, বাঁ-পকেট থেকে কোঁইয়াকের ছোট্ট একটি পাঁইট বের করল। এক মোচড়ে ছিপি খুলে আমার মুখের কাছে এগিয়ে ধরল,

—"তোমাদের ওই 'দুতি'র নাম করে কোঁত্ শব্দে গিলে ফেলো এক ঢোক। চাঙ্গা লাগবে!"

মঁসিয় কোর্তোয়ার চোখ বুঝি ছলছল করছে। বললেন,

—"আ ভোত্র্ সাঁতে। নার্ভাস হবার কিছু নেই, ইণ্ডিয়ান। সব ভালো, সব ঠিক-ঠিক হবে। দারুণ নাম হবে তোমার।"

দেনিস বললে,

—"আ ভোত্র্ সাঁতে। সব ছবি বিক্রি হয়ে যাক।"

লিয়ঁ অল্প হেসে মাথা দোলালো।

ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে ক্রুশচিহ্নের মতো সাদা দুটি হাত আমার দিকে বাড়িয়ে যিশু বললে,

—"ভয় নেই, দোস্ত্! যা হবার তা হবে। তুমি তো দুর্জয় শিল্পী। ভয় কিসের! বঁ কুরাজ!"

যিশু বলল না, 'আমি তো রয়েছি ইণ্ডিয়ান'!

এদের সকলের দিকে চেয়ে, শরীর-মন ভার হয়ে আসছে। দু'গাল বেয়ে জল নেমে আসছে চোখ থেকে। নিঃশব্দে। লিয়ঁ তোয়ালে দিয়ে নিজের হাতে আমার মুখ মুছিয়ে দিল আবার। তবু, চোখ শালা শুকোতে চায় না।

এক ঢোকে অনেকখানি কোঁইয়াক গিলে ফেলে কাশতে লাগলুম। তিন জনের মুখে মুখে দু'বার ঘুরেই খালি হয়ে গেল পাঁইট।

ওপরে সিঁড়ির মুখে ঈভলীনের গলা,

—"কি করছো তোমরা এতক্ষণ ধরে। উঠে এসো। দরজা খুলতে আর কয়েক মিনিট বাকি। বাইরে কিছু নিমন্ত্রিতরা এসে গেছেন। তাড়াতাড়ি এসো।"

পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে, চুল-টুল আঁচড়ে ওপরে উঠে এলুম। মাদাম দ্যুবোয়া এবং ঈভলীন দুজনে গোল গোল অবাক চোখে আমাকে দেখছে। আপাদমস্তক খুঁটিয়ে। হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে উঠল ঈভলীন। কাছে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। অভিভূত গলায় বললে,

—"তুমি যেন কোনো ইণ্ডিয়ান সম্রাটের মতো সেজেছো! কি আশ্চর্য সুন্দর লাগছে তোমাকে। তুমি সম্রাট হও, শিল্পী।"

মাদাম দ্যুবোয়া বললেন,

—"তোমার চার পাশে ফ্রেম লাগিয়ে দিলেই একেবারে ছবির মতো লাগবে। এই পোশাককে কি বলে? ইণ্ডিয়ার পোশাক?"

লজ্জা এবং বিনয় মিশিয়ে বললুম,

—"ধুতি-পাঞ্জাবি। ইণ্ডিয়ার বিখ্যাত শহর কলকাতায় আমরা এমনি পোশাক পরে ঘুরে বেড়াই।"

দেনিস কানের কাছে মুখ এনে বলল,

—"সম্রাটের সাজ যেন খুলে না যায়, দেখো। ঢিলে-ঢালা তো! তাহলে, কোনো ফরাসী-সুন্দরী সব ছবি-টবি ভুলে তোমাকেই কিনে নিতে চাইবে!—"

হাসি-মস্করায় মনটাকে হালকা রাখতে চাইলুম।

মাদাম ত্যুবোয়া ঘড়ি দেখে বললেন,

—"গুড্ লাক, ইণ্ডিয়ান। পৃথিবীর সমস্ত দামী ছবির খদ্দেররা, বিদগ্ধ সমালোচকরা যেন এই গ্যালারীতে আসেন। দরজা এবার খুলে দিচ্ছি। রাস্তায় কাচের ওপারে বেশ কিছু নিমন্ত্রিতরা অপেক্ষা করছেন।"

বলে, দরজার দিকে এগোলেন মাদাম।

ঈভলীন আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে বলল, কানে কানে,

—"অনেক শুভেচ্ছা। দেখো, তোমাকে নিয়ে প্যারিস মেতে উঠবে। সব ছবি বিক্রি হয়ে যাবে তোমার।"

বাইরে নিমন্ত্রিতরা ছাড়াও অনেক রবাহূত মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন দেখতে পেলুম। ভুরু কুঁচকে, জিজ্ঞাসু চোখে অপেক্ষা করছেন দেগা, মাতিস ভ্যানগগ্, গগ্যাঁ, লোত্রে। পিকাসোকেও ভিড়ের মধ্যে দেখলুম। বিড়বিড় করে যেন বলছেন,

—"দেখি, তোমার ক'টা পায়রা, ইণ্ডিয়ান? গুণতে এলুম।"

আশা-হতাশায়, ভয়ে-উত্তেজনায় কাঁপছি বোধহয়। ঈভলীন আমার হাত আরো শক্ত করে ধরল। মাথার ওপরে অজস্র পাখি উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। নিঃশব্দে চক্রাকারে ঘুরছে ওরা। শুধু পাখার শব্দ শুনতে পাই। ওপরে চোখ তুলে তাকাতে ভরসা নেই। ওরা কি কাকের দল না পায়রা!

প্রদর্শনীর শেষ দিন।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গ্যালারী বন্ধ করছেন মাদাম ত্যুবোয়া। আমরা সবাই বাইরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি।

অল্প দূরে, রাস্তার মোড়ে 'লা দোম্' 'লা রোতোঁদ' রেস্তোরাঁ। রাস্তায় টেবিল-চেয়ারে বসে খদ্দেররা হল্লা করছে। নানা রঙের সাজপোশাকে নারী-পুরুষের দল। লাল ডোরা কাটা বিশাল ছাতাগুলো এখনো বন্ধ হয় নি। পেছনে, বুলভার রাসপাইকে দু'ভাগে ভাগ করেছে সারি সারি অচেনা গাছ।

চেস্টনাট, চেরী গাছই বোধহয়। পাতায়-ফুলে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বসন্তও শেষ হয়ে এল। গ্রীষ্মে পা রাখছে প্যারিস। শহরে এখন দীর্ঘ ছুটির সময়। শহরবাসীরা যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। কেউ পাহাড়ে, কেউ দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রে। সূর্যের নিচে কেউ চিৎ হয়ে শুয়ে থাকবে, কেউ উপুড় হয়ে। নড়বে না, চড়বে না। রোদ পোয়াবে। শীতের ফ্যাকাসে চামড়ায় রং ধরাবে। বাদামী হয়ে ফিরে আসবে আবার।

প্যারিসিয়েঁরা রোদের খোঁজে চলে গেলেও শহর খালি থাকে না। দিক্‌বিদিক থেকে স্বর্গে ছুটে আসছে মানুষ-মানুষী। আইফেল টাওয়ারের কালো পাঁজরার হাড়ের ভেতরে গিসগিস করছে ক্যানাডা, আমেরিকা, সুইডেন, জার্মান অথবা জাপানী ট্যুরিস্টের দল। মোঁমার্ত্রের মরশুম এখন তুঙ্গে। প্যারিস খালি থাকে না। কোনো জায়গা থেকে বাতাস হঠাৎ সরে গেলেও পাশের বাতাস ছুটে আসে। ভরে দেয় শূন্যতা। ঝড় হয় তখন। অখ্যাত, অনামী, মূল্যহীন এক ইণ্ডিয়ান পেইন্টারের বুকের ভেতরে এখন ঝড় বইছে। ভীষণ ঝড়। সমস্ত ফুল-পাতা উড়ে যাচ্ছে সেই ঝড়ে। শরীরের শিরা-উপশিরাগুলো শুকনো গাছের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হুহু হাওয়ায় মৃদু মৃদু দুলছে ডালপালা। রুক্ষ, শুকনো, প্রচণ্ড এক একটা গাছের মতো লাগছে নিজেকে।

গত তিনটে সপ্তাহ তো শুধু গ্যালারী আঁকড়েই পড়েছিলুম। গ্যালারী এক্সপোজিসিঁয়। ঝড়-তুফানের সমুদ্রে নৌকোর মতো। প্রচুর দর্শক এসেছে। অজস্র মুখ। এক একটি সুন্দর মুখ গ্যালারীতে ঢুকেছে। মনে হয়েছে, কী সুন্দর, কী ভালোমানুষ তোমরা। কেউ এক পাক চক্কর মেরে বেরিয়ে গেছে। কেউ হয়তো খুব মনোযোগের সঙ্গে ছবি দেখেছে। ঘাড় দুলিয়ে আমাকে ছোট্ট একটি স্মিত হাসি ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেছে। বেরিয়ে যাবার সময় সেই সব ভালোমানুষদের সুন্দর মুখগুলি কেমন ভাঙাচোরা, 'ডিস্টর্টেড' মনে হয়েছে আমার। কী কুৎসিত, কী বিচ্ছিরি মুখ তোমাদের!

সেই জার্মান বুড়িটির ভারি সুন্দর মায়ের মতো মুখ মনে হয়েছিল, যখন ঢুকলেন গ্যালারীতে। গুটি গুটি হেঁটে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি ছবি বড় যত্ন করে দেখলেন। কাছে গিয়ে, পিছিয়ে এসে, চশমা খুলে ক্যাটালোগে ছবির নাম-দাম খুঁজে। খুব যত্নে, খুব তৃপ্তি করে। আহা, কি সুন্দর মুখ মনে হয়েছিল বুড়ির। ভালো করে দেখা হয়ে গেলে, আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

ভাবলুম, জিজ্ঞেস করবেন, 'অমুক ছবিটির সঙ্গে প্রেম হয়ে গেছে আমার, কিনে নিতে পারি কি আমি?'

দুরু দুরু বুকে, এক গাল হাসি নিয়ে বললুম,—"নমস্কার।"

অল্প মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন,

—"নমস্কার। তুমিই কি শিল্পী?"

লাজুক হেসে জানালুম,

—"হ্যাঁ।"

ঘাড় দুলিয়ে আর একবার গোল ঘুরে দেওয়ালের ছবিগুলি দেখে নিলেন।

বেশ্যাদের মাসীর মতো জিজ্ঞেস করলুম লজ্জাহীন—"কোনটি তোমার পছন্দ হল মাদাম?"

মাদাম সে কথার জবাব না দিয়ে উল্টে আমায় জিজ্ঞেস করলেন,

—"তুমি তো ইণ্ডিয়ার শিল্পী, তাই না?"

মাথা নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ।

তারপর থেমে থেমে সামান্য বিকৃত উচ্চারণে দুটি শ্রদ্ধেয় নাম শোনালেন আমাকে,

—"ওবোনীন্দ্রনাথ তেগোর, নন্দলাল বোস তোমার কেমন লাগে?"

আমি তো হকচকিয়ে গেছি। বলেন কি মহিলা? এ দেশের সাধারণ জনতার তো ওঁদের নাম জানার কথা নয়। তার মানে হল, এ বুড়ি খাঁটি একটি শিল্প-রসিক। আমার দেশের, আমার পূর্ব-পুরুষদের যখন চেনে, তখন এঁকে আধ লিটার বেশি বিনয় দেখালে ক্ষতি নেই। গদ্‌গদ গলায় বললুম,

—"ওঁরা তো প্রাতঃস্মরণীয় শিল্পী!"

—"হুঁ।"

বলে, মাথা নেড়ে কি ভাবলেন।

বললুম,

—"আপনি ওঁদের ছবি দেখেছেন?"

এইবার আমার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকলেন খানিকক্ষণ। আস্তে আস্তে বললেন,

—"ওঁদের ছবি শুধু আমি দেখেছি নয়, ওঁদের ছবির ভেতর দিয়ে আমি তোমাদের ইণ্ডিয়াকে দেখেছি।"

জিজ্ঞেস করলুম,

—"আপনি কি গেছেন আমাদের দেশে ?"

—"না। তবে, বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা মিষ্টি-মধুর ছবি অনেক দেখেছি জীবনে। দু'একটি অরিজিন্যাল, কিছু প্রিন্ট্ আমার ঘরের দেওয়ালের শোভা বাড়িয়েছে। ওদের মধ্যে দিয়েই মনোরম, স্নিগ্ধ, আধ্যাত্মিক ধ্যানমগ্ন তোমাদের সেই স্বর্গরাজ্যের সঙ্গে আমার গভীর পরিচয়।"

নদীর এপারের মতো মনে মনে নিশ্বাস ছেড়ে বললুম,—"ভারতবর্ষকে আপনি স্বর্গরাজ্য মনে করেন ?"

—"মনে করি না, জানি। ওখানে যাবার বড় ইচ্ছে। হয়ে উঠছে না। তবে, শিগগীরই যেতে হবে।"

মনে মনে বললুম, হে বিদেশিনী! তোমাকে আমি চিনি না। ওপারে সুখের বিশ্বাসকে ভেঙে ফেলতে আর এই বৃদ্ধ বয়েসে যেও না। মিষ্টি মধুর-পিটুলিগোলা ছবি কিনে ঘর সাজাও। স্বস্তিতে থাকো শেষ জীবনে। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। পৃথিবীর কোনো দেশই স্বর্গরাজ্য নয়। আপন কল্পনায় যে রাজ্যের সৃষ্টি হয়, তারই নাম 'স্বর্গরাজ্য'। তোমার সুখের ভাবনাকে এখন আর ভাঙতে যেও না, বিদেশিনী।

আসলে, আমি টের পেয়ে গেছি, এই মহিলা আমার একটি ছবিও কিনবে না। গ্যালারীতে ঢোকবার সময়কার সেই সুন্দরপনা বুড়ির মুখটি ক্রমশ 'ডিস্টর্টেড' হতে শুরু করেছে আমার চোখে।

বুড়ি বললে,

—"তুমি এইসব ভয়ানক কুৎসিত ভূতের ছবি আঁকো কেন ?"

আমার ছবি কিনুক না কিনুক, অকারণে ওর কল্পনাকে ভাঙতে চাইলুম না। থলথলে মুখটির দিকে চেয়ে কষ্ট হল। সামান্য হেসে বললুম,

—"আমাদের আধ্যাত্মিক ধ্যানমগ্ন দেশে ভূত-প্রেতও কিছু আছে, মাদাম!"

একটু বোধহয় খুশি হল। বলল,

—"খিদে-টিদে কি ব্যাপার, ইণ্ডিয়ান ?"

ঈশ্! তাই যদি বুঝতে বুড়ি মা, তাহলে, নুন দিয়ে ফেনা-ভাত আর গুড় দিয়ে শুকনো রুটি যে কি অমৃতের মতো লাগে টের পেয়ে যেতে।

বললুম,

—"আহা! বলি, ভূত-প্রেতেরও পেট বলে একটা ব্যাপার আছে, মাদাম!

ওদেরও তো একটু কেক, অ্যাপেলের চাটনি অথবা বীফ্-স্তেক খেতে ইচ্ছে করতে পারে! না কি বলেন?"

হাসিমুখে বলল,

—"বাহ্! তুমি তো মজার শিল্পী!"

ভাসমান খড় আঁকড়ে ধরতে চাইলুম যেন, হেসে হেসেই বললুম,

—"তা, এক-আধটা কিনবেন নাকি ভূতের ছবি?"

ঠোঁট বেঁকিয়ে চোখ বড় করে মাথা কাঁপালো। বললো,—"ওরে বাবা! ভূতদের আমার বড় ভয়।—"

বলে, বিকৃত মুখে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

এমনি সব ভালোমানুষ-মানুষীরা ভারি মিষ্টি স্বর্গীয় মুখ নিয়ে ঢুকেছে গ্যালারীতে। অধীর আগ্রহে দম বন্ধ করে ওদের লক্ষ্য করেছি। মুখের ভাব, বৈচিত্র্য। ওদের সামান্য 'অঙ্গুলি-হেলনে' আমার সব ভয় ভেঙে যেতে পারতো। কিন্তু গত তিন সপ্তাহ ধরে ওরা শুধু একের পর এক বিকৃত ভাঙাচোরা মুখ নিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে। সারারাত জেগে বসে রইল মাসী। মেয়েগুলোর গতি হল না। চারপাশে পোড়ারমুখো সকাল এসে গেল। ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে লাগলো মাসীকে দেখে। কোনো পত্র-পত্রিকায় এক ছত্র খবর ছাপা হল না। মাসী বললে,

—"শুয়োরের সন্তান সবাই!"

বলে, পা' ছড়িয়ে কাঁদতে বসলো।...

কিন্তু আমি এখন কি করি বল তো, বউ?

মাদাম দ্যুবোয়া এতক্ষণ ধরে কি তালা লাগাচ্ছেন গ্যালারীতে! ঘুরে তাকিয়ে বলতে যাবো,

—"অতো ক'ষে তালা লাগাতে হবে না, মাদাম! ও ছবি চোরেও নেবে না..."

দেখি, পেছনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সকলে আমার জন্যই যেন অপেক্ষা করছে। আমার দিকেই অপলক চোখে চেয়ে আছে ওরা। মঁসিয় কোর্তোয়া, দেনিস, লিয়ঁ, মাদাম দ্যুবোয়া এবং ঈভলীন। অসুস্থ রুগীর দিকে আপনজনেরা যেমন উদ্বিগ্ন চোখে, নিঃশব্দে চেয়ে থাকে, তেমনি।

আমি বোধহয় হাসবার চেষ্টা করলুম। সৌজন্যের হাসি নাকি! যেন, কিছুই হয় নি। অথবা, কিছুই হবার ছিল না। কারণ, কিছুই হয় না। আসলে তা'

নয়। গাল টেনে হাসির ভাব করে ওদের যেন বোঝাতে চাইলুম, যা হয়েছে, সবই ঠিকঠাক হয়েছে। এই রকমই তো হবার কথা। সমস্তই তো স্বাভাবিক নিয়মমাফিক বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের হিসেব। উনবিংশ, অষ্টাদশ, আরো আরো পিছিয়ে যাও, দেখবে একই ইতিহাস। শিল্পী, কবির জ্বালা-যন্ত্রণা-পরাজয়ের ইতিহাস। এক আধজন তার সময়েই কপালগুণে, সুষ্ঠু প্রচার ক্ষমতার গুণে হয়তো ছিটকে উঠে গেছেন উর্ধ্বে। কিন্তু সেটা স্বাভাবিক নয়। সাধারণ ঘটনা নয়। কারণ যাঁরা ওই "এক-আধজন" নন, তাঁরা কি সব অ-শিল্পী, অ-কবি ? সুতরাং ভাইসব, অমন করে আমার দিকে চেয়ে থেকো না ! আমি ঠিক আছি। ভালো আছি। হেঁ হেঁ ! দেখো না হাসছি কেমন ! এই ভ্যাখো না কেমন আমি ছবি এঁকেছি !

তবু ওরা চোখ সরাচ্ছে না কেন !

নিজের দিকে, পোশাকের দিকে দেখলুম ! কই, আজ তো ধুতি-পাঞ্জাবি নেই ! ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। হতে পারে, আমাকে হয়তো বিধবার মতো দেখাচ্ছে। অথবা আমার বিয়ে হ'তে-হ'তেও হল না, নাগর পালিয়েছে ; এমনি দেখাচ্ছে। গালে-কপালে চন্দনের টিপ মুছে, গয়না-গাটি খুলে ফিরে এসেছে নাকি ময়না ? টিয়া, সন্ধ্যারাণীরা বোবার মতো দেখছে তাকিয়ে।

এক পা' এগিয়ে এলেন মাদাম দ্যুবোয়া। ধরা গলায় বললেন,

—"আমি দুঃখিত, ইণ্ডিয়ান ! তোমার মনের অবস্থা আমি বোঝবার চেষ্টা করছি। পেইন্টিংগুলো আজ আর নিতে হবে না। কাল সকালে এসে আমি দেওয়াল থেকে নামিয়ে রাখবো'খন নিচের ঘরে। নতুন শিল্পীর প্রদর্শনী কাল থেকে শুরু। তুমি যখন খুশি এসো।—"

আরো কি সব বললেন। 'শুভরাত্রি' জানিয়ে কখন যেন চলে গেলেন মাদাম। ফুটপাথে দাঁড়িয়েই আছি আমি।

ঈভলীন কাছে এসে আমার হাত ধরল। বলল,

—"চলো।"

—"কোথায় ?"

—"যে কোনো জায়গায়। এইখানেই তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারো না সারারাত। চলো।"

আবার বললুম, ঘুমের মধ্যেই নাকি,

—"কোথায় যাবো ?"

মঁসিয় কোর্তোয়া সান্ত্বনার গলায় বললেন,

—"কিচ্ছু ভেবো না, ইণ্ডিয়ান। তোমার কাজের পারমিট যোগাড় হয়ে যাবে। তুমি আবার আমাদের সঙ্গে মোঁমার্ত্রে ছবি আকবে।"

মোঁমার্ত্রে! যেখানে যিশু নেই! যিশু তো কোথাও নেই। ভগবান তো' মরে গেছে কবে! আমি মোঁমার্ত্রে যাবো না। যাবো না কোথাও। যাবার জায়গা নেই। পথ নেই, ক্ষমতা নেই। শিরা-উপশিরার শীর্ণ, শুষ্ক ডালপালা মেলে গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকবো। মৃত গাছের মতো। তোমরা আর আমাকে কেউ কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না।

লিয়ঁ কিছু বলছে না। ও ঠিক নিজের মতোই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ে আছে আমার দিকে। লিয়ঁরা যেমন, ঠিক তেমনি। আবাহন নেই, বিসর্জন নেই। যেন, এই সব কিছু আগে থেকে জানা হয়ে গেছে ওর।

দেনিস খুব জোরে আমার কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল,

—"কি হচ্ছে কি, ইণ্ডিয়ান! চলো, দু'পাত্তর মদের সঙ্গে দুঃখ গিলে ফেলি!"

গলার স্বর নরম করে বললে,

—"পাশেই যে 'রোতোঁদ' রোস্তোরাঁ, ওখানে আমাদের পূর্বপুরুষরা বসে আড্ডা মেরে গেছেন। তখন ওঁদের কেউ চিনতো না। দেগা, মাতিস এরা সব্বাই।—"

ছেলে-ভোলানো গল্পের মতো বললে,

—"একবার কি কাণ্ড, জানো! মাতিস ওরা তো রোজই লা রোতোঁদের টেবিল-চেয়ারে বসে গপ্প-সপ্প করে, কয়েকদিন ধরে দূরে কোণের টেবিলে একটি মুখকে বসে থাকতে দেখা গেল। আপন মনে একা-একা কফি-টফি খায়। এরা হাসি-হল্লা করলেও তার কিচ্ছু আসে-যায় না। হয়তো একটু মিটিমিটি হেসে দিল, কিংবা দিল না। মাতিসের দল ভাবলে, লোকটা কে? বিদেশী মনে হয়। কৌতূহল চাপতে না পেরে ওরা লোকটির কাছে গিয়ে একদিন জিজ্ঞেস করলে, 'দিনের পর দিন একা-একা বসে এখানে করছোটা কি?' লোকটি বললে 'ভাবছি!' 'কি ভাবছো এতো?' 'ভাবছি, কি করে শোষকদের হাত থেকে রাশিয়াকে স্বাধীন করা যায়।' মাতিসরা হোহো হেসে লুটোপুটি। সেদিন লোকটি ওদের হাসির জবাব দেয় নি। পরে দিয়েছিল।"

দম নিয়ে দেনিস জিজ্ঞেস করলে ধাঁধার মতো,

—"একা লোকটি কে বল তো, ইণ্ডিয়ান?"

চুপ করে দেনিসকে দেখছি।

ও আমার পিঠ চাপড়ে বললে, হাসি-হাসি মুখে,

—"লেনিন, হে, লেনিন।"

আমি চেয়ে আছি।

হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা ঝাঁকালো দেনিস। বুকের কাছে আমার কলার চেপে ধরল। হতাশা এবং রাগের ভাঙা-ভাঙা গলায় চাপা চীৎকার করে উঠল,

—"ধাৎ-ধাৎ! এইসব ভাবলেশহীন ফ্যাকাসে মড়ার মতো ইণ্ডিয়ানের মুখ আমি সহ্য করতে পারি না। ঘুষি মেরে চোয়াল নাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে! ধুর্! আমি যাই।"

জামার কলার ছেড়ে দিয়ে মাথা নুইয়ে কখন ধীরে ধীরে চলেই গেল দেনিস ক্যাস্তেল।

মেজোন্দ্যল্যান্দের কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলুম। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, সাক্ষী-সাবুদ কেউ নেই। শুধু ছায়ার মতো ঈভলীন দাঁড়িয়ে।

জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি চাই তোমার?"

খুব সামান্য মাথা নেড়ে জানালো,

—"কিছু না।"

কাউণ্টারের পাশ দিয়ে উঠে আসছি মঁসিয় শাঁজাল ডাকলেন। একটি কাগজ হাতে ধরিয়ে বললেন,

—"তেলিগ্রাম মঁসিয়।"

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে ঘরের সামনে দাঁড়ালুম। দরজা খুললুম চাবি ঘুরিয়ে। আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে শুনতে পেলুম দরজা বন্ধ করল ঈভলীন।

ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে কাঁপা হাতে ছিঁড়ে ফেললুম টেলিগ্রাম। পড়লুম। প্রথমবার বুঝতে পারলুম না। আরো দু'একবার পড়ে দেখলুম! কাগজটা কখন উড়ে উড়ে মেঝেয় শুয়ে পড়ল। মনে হল, ঈভলীন দ্রুত হাতে তুলে নিল ওটা। পড়ল। আমাকে দেখে নিয়ে পড়ল আর একবার। ভীত মুখে পিছিয়ে গিয়ে হেলান দিল দেওয়ালে।

ছোটো ঘরটি ধীরে ধীরে আরো ছোটো হয়ে এল। চারপাশ থেকে চারটে দেওয়াল পায়ে পায়ে হেঁটে এসে আমার গায়ের সঙ্গে দাঁড়ালো। এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল চারজনে। কানে তালা লেগে যায়, এমন চীৎকার। দু'হাতে কান ঢাকলুম। রাবণের চিতার ভাষায় ওরা দাউদাউ করে বলতে লাগল,

—"ডীপ্‌লী রিগ্রেট—ইওর ওয়াইফ্‌ গেভ্‌ বার্থ্‌ টু এ স্টিল্‌-বর্ন্‌ বেবি।"

—"ডীপ্‌লী রিগ্রেট্‌—"

—"রিগ্রেট্‌—"

—"স্টিল্‌ বর্ন্‌—"
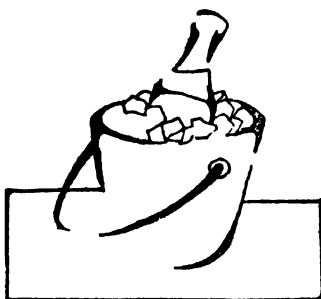
তোমাকে ঠিক ঈভলীনের মতো দেখতে, বউ। অথবা, ঈভলীনকে ঠিক তোমারই মতো। হাসলে এবং ভয় পেলে। এখন খুব ভীত চোখে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কালো লম্বা চুল মাঝখানে সিঁথি কেটে দু'পাশে ভাগ হয়ে আছে। ছোট্ট কপালে বা সিঁথিতে একবিন্দু সিঁদুর নেই। দুই পাপড়ির গোলাপ ফুল ঠোঁট কাঁপছে তিরতির। চোখের নীল সমুদ্রের মধ্যে ভয় এবং ব্যথার ঢেউ।

ভয় নেই, ভয় নেই, বউ! আমি তোমাকে কিচ্ছু বলব না। কিছুই বলার নেই আমার। কাউকেই আর আমার কিছু বলবার নেই। বলা-কওয়া তো সব শেষ হয়ে গেছে। তোমার কিসের ভয়? তুমি তো কোনো দোষ করো নি! তুমি আমার স্বপ্নসাধ আশা-আকাঙ্ক্ষার আধার মাত্র। তোমার তো কিছু করবার ছিল না, নেইও। হেরে গেলুম। বিশাল পরাজয়ের গ্লানি অন্ধকারের মতো চারপাশ থেকে চেপে ধরেছে। সেই তরল অন্ধকারে আমার পূর্বপুরুষদের মুখগুলি ভাসছে। ওঁদের হাসি আমাকে নিদারুণ আঘাত করছে হৃদয়ে, মস্তিষ্কে। দেলাক্রোয়া, গেরিকোল্ট। গগ্যাঁ, ভ্যান্‌গগ, লোত্রে। দেগা মাতিস্‌ পিকাসো। সবুজ ঘোড়ায় চেপে এলো না তো কেউ ভয় ভাঙাতে!

আসলে, এখন তোমাকে আমার খুব মারতে ইচ্ছে করছে। এলোপাতাড়ি। এই ছোটো ঘরটিতে আমরা শুধু দু'জনে আছি। একা একা। কোনো সাক্ষীসাবুদ নেই। থাকলেও কিছুই যায়-আসে না। তোমাকে গলা টিপে হত্যা করলে বোধ

হয় একটু আরাম হত, বউ। তোমার দম বন্ধ হতে হতে টের পেয়ে যেতে, আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। আমি শ্বাস নিতে পারছি না।

তাই, খুব ধীর পায়ে হেঁটে এসে তোমার মুখোমুখি দাঁড়ালুম। তুমি চোখ নামিয়ে মাথা নত করলে। দু' কাঁধে হাত রাখলুম। আমার আঙুলগুলি কি সুন্দর ভঙ্গীতে হেঁটে হেঁটে, তোমার গলার দু'পাশে এসে থামলো। তোমার সিঁথিতে চোখ রেখে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলুম,

—"এ কী করলে, বলতো ?"

তুমি মাথা নিচু করেই রইলে, যেমন ছিলে।

আবার বললুম,

—"তুমি কি ঠিক করেছো, মনে হয় ? ঠিক হয়েছে সব ?"

মাথা নাড়লে। এপাশে ওপাশে। জানিয়ে দিলে, 'না'। বললুম,

—"আমার কি কিছুই পাওনা ছিল না ?"

এইবার, মুখ তুলে তাকালে তুমি ঠিক প্রকৃতির মতো। পৃথিবীর গাছপালা, পাহাড় এবং স্বাভাবিক নদীর মতো। সেইসব সবুজ এবং রুক্ষ মাঠ, প্রান্তর, সূর্যের আলো, মহীরুহের ছায়া এবং শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাকে আপন দুটি হাতের অঞ্জলিতে ধরে আদর করলুম। চুমু খেলুম গোলাপ ফুলের পাপড়িতে। তুমি কাঁদছো। বন্ধ চোখ ফেটে নিঃশব্দে শীর্ণ জলের ধারা নেমে আসছে তোমার গাল বেয়ে চিবুকে। তারপর আমরা দু'জনে দু'জনকে খুব জোরে আঁকড়ে ধরলুম। আমার বুকে মুখ গুঁজে থরথর কাঁপছো, কাঁদছো তুমি।

আমার ভালো লাগছে না। এক ধাক্কায় সরিয়ে দিলুম ঈভলীনকে। ছিটকে দূরে সরে গেলে তুমি। ফিরে দেখলুম না।

ঘরটি এখন প্রায় খালিই বলা যায়। অগোছালো পড়ে আছে। মেঝেয় রঙের টিউব, তুলি, স্প্যাচুলা এবং প্যালেট ছত্রাকার। ঈভলীনের দেওয়া শেষ ক্যানভাসটি দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। প্রদর্শনী আরম্ভ হয়ে গেলে ও আমাকে এনে দিয়েছিল। বলেছিল,

—"আমাকে কি দেবে, এই নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল তো তোমার, এই নাও। একটা ছবি তুমি এতে আমার জন্যে এঁকে দাও এবার।"

হাসতে হাসতে বলেছিল, "সব দেনা শোধ হয়ে যাবে।"

—"কি ছবি আঁকবো ?"

—"তোমার ওইসব দুঃখ-কষ্ট-জ্বালা-যন্ত্রণার ছবি চাই না। আমাকে একটা ছবি এঁকে দাও। সুখের ছবি।"

তারপর, আমার চিবুক নেড়ে বলেছিল,

—"আমার শত্তুরের সুখের ছবি!"

আমার সুখের ছবি! সে তো একটাই হতে পারে। লুভ্র্ জাদুঘরের সামনে বিশাল তিন রাস্তার মোড়ে সেই শূন্য বেদীটিকে মনে পড়ল। দেড় দু'ফুট উঁচু। বিখ্যাত মানুষের প্রতিমূর্তি যে ধরনের বেদীর ওপরে বসানো হয়, সেইরকম শান বাঁধানো চৌকো বেদী। শূন্য পড়ে আছে।

ঈভলীনকে হেসে বলেছিলুম, "বেশ, তোমার শত্তুরের সুখের ছবি এঁকে দেব'খন।"

শেষ করতে পারি নি। শূন্য বেদীটি আঁকা হয়ে গেছে ঠিকঠাক আমার পছন্দ মতোন। শুধু একটি মুখ বসানো বাকী। নিজের মুখ। কিছুই তো হল না। অন্তত আপন আকাঙ্ক্ষার, সুখের একটি ছবি করে যাই, এই ভেবে বসে পড়লুম আধা-শেষ ছবিটির সামনে। বেদীটিতে হাত বোলালুম। যাক, শুকিয়েছে রং। এখন নিজের পোর্ট্রেটটি এঁকে ফেললেই হল।

কর্নিকের মতো ধারালো স্প্যাচুলায় খানিকটা লাল ভার্মিলিয়ান্ তুলে নিয়ে বেদীটির দিকে ফিরে তাকাতেই রোজমারীর মুখটি ভেসে উঠল। ছায়ার মতো। হাসছে। হাসলেই ওর মুখে বয়েস লাফিয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি খবর? সুখী তো?"

বয়েস বাড়িয়ে বিষণ্ণ হাসল,

"খুব। খুব সুখী। নোয়েল আর প্যারিসে আসে নি তো, তাই। ওখানেই বিয়ে-সাদি করে ঘর-সংসার।"

একটু থেমে বললে,

—"অনেক অনেকদিন আগে তোমাকে আমি অপমান করেছিলুম। মনে আছে? ক্ষমা করে দিও আমাকে। সেদিন তোমার সঙ্গে শুয়ে পড়লেও কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হতো না বোধ হয়।"

বললাম,

—"দূর হয়ে যা।"

স্ট্যালিনের মতো সেই গোঁফ নিয়ে দুলতে দুলতে জর্জের মুখটি এসে দাঁড়াল

বেদীর সামনে। সাদা হয়ে গেছে গোঁফ। লুকোনো ঠোঁটে অসহ্য দুষ্টুমীর হাসিটি যায় নি। মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, "বঁ জুর, মঁসিয়।"

জানীর মুখটি পাশাপাশি। ওর দিকে চেয়ে জর্জ বললে,

—"আমরা দু'জন তো হিজড়ে শিল্পী। সন্তান হল না। শুধু সঙ্গমই করে করে গেলাম নাগাড়ে।"

মুচকি হেসে আবার বললে,

—"কিছুতেই মনে পড়ছে না। গাও না, ইণ্ডিয়ান! সেই যে, সোনার ডালে কাক বসালি, গেঁথে ওই মোতির মালা কোন্ বাঁদরের গলায় দিলি – "

মাথা নিচু করে ছিল জানী। ওকে বোধহয় বেদীর ওপর থেকে টানতে টানতে সরিয়ে নিয়ে গেল। ফিলিপ জিজ্ঞেস করে গেল গম্ভীর মুখে,

—"ছবি আঁকা কি দোষের, মঁসিয়?"

রাণাঘাটের গোবিন্দ, প্যারিসের মিশেল, কলকাতার করুণাময়, সব একে একে তাদের পরাজিত, বিধ্বস্ত মুখগুলি দেখিয়ে গেল আমাকে। সবাইকে বললুম, "দূর হ'! দূর হ'!"

অ্যানির বিয়ের সাদা পোশাক রক্তে মাখামাখি! বিশাল একটি ক্রুশচিহ্ন কাঁধে হেঁটে এল! বলল,

—"তোমার যিশু ভাখো না কী ভারী সুখের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেল। বয়ে বেড়াচ্ছি। খুঁজছি ওকে সমস্ত গীর্জায় গীর্জায়।"

যেতে যেতে বলে গেল,

"কই গো, নিতবর! যাবে না আমাদের সঙ্গে? গীর্জায়—"

অসম্ভব কষ্টে রাগে চিৎকার করে বললুম,

—"যাও! সরে যাও আমার বেদীর ওপর থেকে—"

খোঁচা খোঁচা কয়েক দিনের বাসি দাড়ি, টাক মাথার দু'পাশে পাতলা সাদা চুল হাওয়ায় উড়ছে। আমার শূন্য বেদীর ওপরে কি যেন লিখতে বসে গেল বুড়ো মানুষটি! আমি জানি ও কি লিখবে। ধমকে তাড়িয়ে দিলুম পাগলটাকে।...

প্যালেটে গাঢ় সবুজ রং গুলে উঠে দাঁড়ালুম। তুলি হাতে দেওয়ালে লিখতে যাব, ঈভলীন ছুটে এল,

—"কী করছো, ইণ্ডিয়ান। দেওয়াল নোংরা কোরো না।"

এক ধাক্কায় ওকে সরিয়ে দিয়ে ঘরের সব কটি দেওয়ালে লিখে দিলুম, বড় বড় সবুজ অক্ষরে,

—"আবার আসিব ফিরে এই বাংলায়। জল পড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে। গরু চরিতেছে। কাক ডাকিতেছে।"

কাঁচা তেল-রং অক্ষরগুলির গা বেয়ে কি সুন্দর কান্নার মতো ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে নামছে! ভারি সুন্দর। হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল। ঈভলীন কী বুঝবে, বিদ্যাসাগর-জীবনানন্দ লিখলে পৃথিবীর কোনো দেওয়ালই নোংরা হয় না। বরং আশ্চর্য সুন্দর দেখায়।

দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে দরজার কাছে, কোণে বসে আছে ঈভলীন। ফুলে ফুলে কাঁদছে। আহা রে, কষ্ট হচ্ছে বেচারির! আমার জন্যেই বুঝিবা।

মুখ তুলে তাকিয়ে ধীরে ধীরে উঠে এলো আমার কাছে। সামনাসামনি এসে দাঁড়াল। চোখ দু'টি, গাল, চিবুক কান্নায় ভিজে আছে। যথাসর্বস্ব দেবার মতো করে বললে, ভাঙা ভাঙা অস্ফুট গলায়,

—"আমার সঙ্গে তুমি শোবে, ইণ্ডিয়ান? আমাকে তুমি নেবে? আমার শরীর, সকল উষ্ণতা গ্রহণ করলে কি একটু তৃপ্তি পাবে? আরাম পাবে তুমি?"

সবুজ রং দিয়ে ওর সাদা গালে একটি ছোট্ট গাছ আঁকতে ইচ্ছে করলো। নাকে তার ছায়া। কপালে সূর্যাস্ত। এবং চিবুকের উপত্যকায় ঘোলাটে গঙ্গার মতো কোনো হলুদ নদী আঁকতে চাইলুম। না, ঈভলীন, না! কেউই আমাকে আর কিছু দিতে পারবে না। কোনো উষ্ণতাই আর আমাকে শীতের আড়ালে রাখতে পারবে না এখন। তবুও, তোমাকে একটি চুমু খেলুম। ধন্যবাদ জানাবার জন্যেই বোধহয়। অসংখ্য ধন্যবাদ, ঈভলীন। মেরসী বোকু, মাদাম!

মাথার উপরে অজস্র পাখার ঝাপটানি। মুখ তুলে দেখি, অসংখ্য সাদা সাদা পায়রার ঝাঁক চক্রাকারে উড়ছে। উড়তে উড়তে, উড়তে উড়তে সব কালো। কালো দাঁড়কাক চিল-শকুনের দল ভয়ংকর শব্দে পাখা ঝাপটাচ্ছে। উড়ছে আমাকে ঘিরে।

তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে বসে পড়লুম। দু'হাত নেড়ে সরাতে চাইলুম ওদের। গেল না।

ভারমিলিয়ান মাখা স্প্যাচুলা হাতে তুলে নিলুম আবার। শূন্য বেদীটির ওপর আমার মুখ আঁকতেই হবে। অন্তত একটি সুখের ছবি তো থাকবে অনামী, মূল্যহীন এক ইণ্ডিয়ান শিল্পীর।

অথচ, কী কাণ্ড! আঁকার বদলে কেমন করে জানি না, ধারালো স্প্যাচুলাটি বেদীর মধ্যে ঢুকে গেল। ক্যানভাস্ ছিঁড়ে যেতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে আমার

ভিজিয়ে দিল। টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌ সবুজ ঘোড়া ছুটিয়ে কে আসছে না? ছোট্ট কচি শিশু যার মুখ দেখতে পেলুম না, আমার কাটা তর্জনী খুদে মুঠোয় ধরে বলছে,—"চলো বাবা। আমরা দু'জনে মিলে স্বপ্ন দেখতে যাই।"

শিল্পীর স্বর্গরাজ্যের সব কেমন ভেঙেচুরে যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় কালো ইস্পাতের আইফেল টাওয়ার গলে পড়ছে মাটিতে। তপ্ত লোহার স্রোত অজস্র সাপের মতো ঢাল বেয়ে ঘুরে ঘুরে এসে মিশছে স্যেন নদীর জলে। প্যারিসের প্রাণনদীতে আগুন ধরে গেল। ফেঁপে ফুলে উঠল এবং তার দুই তীরে দিগেনদার লেখা বাংলা অক্ষরগুলি ধুয়ে মুছে দিতে চাইল। পারল না। গলিত আইফেল টাওয়ার এবং স্যেন নদী মিলেমিশে দুই পাড় ভাঙতে লাগল।

শাঁজেলিজের সেই উজ্জ্বল প্রশস্ত রাস্তাটি কাদায় ডুবে যাচ্ছে। কাদামাটির মধ্যে ডুবতে লাগল সুবিশাল 'আর্ক'-দ্য-ত্রিয়ঁফ্‌। লুভ্র্‌ জাদুঘরের সমস্ত ছবিরা দল বেঁধে বেরিয়ে আসছে। মোনালিসা, অ্যাব্‌সিন্থ্‌, ভাইরুমতি। দেলাক্রোয়া, গেরিকোন্টের সমস্ত প্রাচীন ছবিরা। কাচের শো-কেস ভেঙে বেরিয়ে আসছে পল গগ্যাঁর বিখ্যাত প্যালেট। ভ্যানগগের সান্‌-ফ্লাওয়ার। দেগার নাচিয়ে মেয়ের দল। লোত্রেক মুল্যা রুজ্‌। জাদুঘরের বিরাট বিরাট দরোজা-কপাট সব হাট করে খোলা। বুকের ভেতর থেকে দলে দলে বেরিয়ে এল সমস্ত ছবিরা। ঠিক যেন মিছিল। রঙিন, ঐতিহাসিক মিছিল। তারপর, ওরা সবাই ভয়ংকর ঝড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া অসহায় পাতার মতো, ছোটো ছোটো চঞ্চল রঙ্গিলা চড়ুই পাখির মতো দোল খেয়ে উড়তে লাগল লুভ্র্‌র দালানগুলোকে ঘিরে। ইতিহাসের হাজার হাজার শিল্পী সামনের শূন্য বেদীটির ওপরে দাঁড়িয়ে লক্ষ হাত আকাশে বাড়িয়ে দিয়েছেন। ধরবার চেষ্টা করছেন ছিন্ন পাতার মতো উড়ন্ত ছবিদের। পারছেন না। মোঁমার্ত্রের টিলাটি এখন আগ্নেয়গিরি হয়ে গেছে। বমি করছে তপ্ত লাভা-স্রোত। মেলা ভেঙে গেছে কবে। প্রলয় ঝড়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই পৃথিবীতে।

ঈশ্বরের মৃত্যুর পর নিদারুণ পরাজয়ে স্বর্গরাজ্য ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমার আর যাওয়া হল না কোথাও। কোথাও হল না ফেরা। রক্তাক্ত দু'হাতে নিজের মুখ খুঁজলুম। নেই।

মুখ নেই আমার।

—